আজবনগরের কাহিনী

পৃথিবীর কোথাও আজবনগর বলে কোন স্থান নেই .
কিন্তু আজবনগরের মধ্যে সমস্ত পৃথিবীই আছে।

আজবনগরের কাহিনী

নবেন্দু ঘোষ

ডি. এম. লাইব্রেরী
৪২, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা—৬।

দাম ছয় টাকা মাত্র

প্রথম সংস্করণ, পৌষ

ডি, এম, লাইব্রেরীর পক্ষে শ্রীগোপালদাস মজুমদার কর্তৃক ৪২নং কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট কলিকাতা হইতে প্রকাশিত এবং বাণী-শ্রী প্রেসের পক্ষে শ্রীসুকুমার চৌধুরী কর্তৃক ৮৩।বি, বিবেকানন্দ রোড কলিকাতা হইতে মুদ্রিত। প্রচ্ছদপট-শিল্পী—আশু বন্দ্যোপাধ্যায়, [illegible] ফটোটাইপ ষ্টুডিও।

মালতীদি'কে

এই লেখকের লেখা—

নায়ক ও লেখক (২য় সংস্করণ)

ডাক দিয়ে যাই (৫ম সংস্করণ)

প্রান্তরের গান

কাঞ্চনপুরের ছেলে

এই সীমান্তে

মানুষ

ইস্পাত

কান্না

পৃথিবী সবার

কালো রক্ত (১ম খণ্ড)

বসন্ত-বাহার

ফিয়ার্স লেন

দ্বীপ (যন্ত্রস্থ)

এক

নদীর নাম রূপসী।

মিষ্টি একটা স্বপ্নের মতো নদীটা। উত্তরের কোন তুষারাবৃত পাহাড় থেকে যে সে নেমে এসেছে তা জানা নেই। তন্বী কুমারীর মত মানানসই তার রজতশুভ্র দেহখানি সে পাথর আর বালুকণার তৈরী শয্যার ওপর এলিয়ে দিয়ে দিনরাত গান গায়। তীরের ওপর গড়িয়ে যায়, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত শিলাখণ্ডের ওপর আছড়ে পড়ে রূপসী নদী দিনরাত শুধু গান গায় আর গান গায়। সেই গান শুনে বাতাস মাঝে মাঝে উদাস হয়ে ওঠে, নদীর সুরে সুর মেলায় আর ওপারের শালবনে প্রশংসার মর্মর ধ্বনি ওঠে, শালবনের সব পুতুলে আকাশের পটভূমিতে আঁকা ধূসর পর্বতশ্রেণীর ওপরে খচিত যে মেঘরাশি হঠাৎ আবেগাপ্লুত হয়ে ছুটে আসে। আর তাদের ওদের দিকছিল করে উড়ে আসে যত যাযাবর বুনো হাঁসের দল, আসে ভিজে বাহানা কত বিচিত্র বর্ণের পাখী। রূপোর পাতের মত নদীটার আর নাতে বসে তারা তাদের ক্লান্ত পক্ষকে বিশ্রাম দেয়, জলের মধ্যে বসানো ছোড় মাছ ধরে, বন্য উল্লাসের ধ্বনিতে চারদিক কাঁপিয়ে তোলে। কালস্রোতহঠাং একসময়ে তারা দল বেঁধে উড়ে চলে যায়, ডানার বিচিত্র বায়ুস্তরকে বিক্ষুব্ধ করে দিগন্তে মিলিয়ে যায়। রূপসী নদীর হয়ে বসে আবার নিঃশব্দতা ঘনিয়ে আসে। কখনো কখনো নদীর ওপারের রস-স্রষ্টারাকে ময়ূরেরা উড়ে আসে। কখনো বা নেমে আসে একদল নৃত্যবিদ হরিণ, সন্তর্পণে জলের ধারে এসে তারা থমকে দাঁড়ায়। গলিত তিমিরকারে মত শুভ্র, স্বচ্ছ জলের বুকে তারা নিজেদের প্রতিবিম্ব দেখে

অবাক হয়ে যায়, মন্ত্রোহিতের মত খানিকক্ষণ স্থির হয়ে থেকে হঠাৎ তারা লাফিয়ে উঠে পালায়, শালবনের নিরাপদ ছায়ায় অদৃশ্য হয়ে যায়। রূপসী নদী একই ভাবে বয়ে যায়। কলকল ছলছল ধ্বনি ওঠে তার লক্ষকোটি নিরীহ তরঙ্গ থেকে, এক টুকরো নীলাকাশ তার বুকে চিরকালের জন্য বন্দী হয়ে থাকে, সূর্যোদয় আর সূর্যাস্তের সময় সে সোনার আবীর মেখে শৃঙ্গার সারে, রাতের নক্ষত্রেরা তার বুকে তারা নানা বাসনার প্রদীপের মত জ্বলে, কাঁপে। আর তার বুকের মধ্যে বয়ে যায় এক মুগ্ধ জীবনের প্রবাহ, ঝিরঝিরে বাতাসের মত একটা মৃদু স্রোত। স্বপ্নের মত রূপসী নদী।

নদীর ওপারে শালবন, তার পেছনে পর্বতশ্রেণী। এপারে তরঙ্গায়িত ... প্রান্তরে মানুষ প্রমাণ বুনো ঘাস, এখানে ওখানে আম জাম ও তাল গাছের অচেনা বুনো ফুলের রাশি। এপারের মাটি নরম, ভিজে ভিজে। বুনো ফুলের গন্ধের সঙ্গে ভিজে মাটির বিচিত্র গন্ধ এখানে ভেসে বেড়ায়। শালিক, শ্যামা আর দোয়েলেরা সব প্রান্তরে নেমে কি যেন খুঁটে খুঁটে খায় আর ... চির করে। ঝোপঝাড়ের আড়ালে বসে ঘুঘুরা মাত... ন ঝিরঝিরে বাতাসে ঘাসের ডগাগুলো নুয়ে পড়তে থাকে ... মি গুলো যেন কোন এক অশ্রুত সঙ্গীতের মুগ্ধ শ্রোতার মা... অ দোলায়। গাছপালা লতাপাতা আর ঝোপঝাড়ের ... চুমি নিবিড় ও ঠাণ্ডা ছায়ায়, উড়ন্ত প্রজাপতি আর ফড়িং... য়ে প করে। বুনো ফুলের মধু খেয়ে তাদের শরীর ... তারপর নেশায় অবশ হয়ে ওঠে আর আধবোজা চোখে ... আঘাতে একটা মধুময় রক্তপদ্মের আকার ধারণ করে। দু'পাশে অ

রূপসী নদীর জলের শব্দ, শালবনের মর্মর, শালবন থে... হরিণের পায়ের আওয়াজ, বাতাসের গান, বুলোন্তচঞ্চু হ... পাখীর ডাক—সব মিলিয়ে একটা সম্মিলিত শাঁ...য়ে মুক্তো

হয়ে সূর্যদেব অস্তে যান। ওপারের শালবন থেকে নিশাচর জন্তুদের ডাক ক্ষীণভাবে ভেসে আসে। ঘাসের আভাসে রোমাঞ্চিত প্রান্তরের বুকে বসে ঝিঁঝিঁ পোকারা ঐকতান সুরু করে দেয়। গাছপালাগুলো চুপ করে ঝিমোয়, প্রজাপতিরা ঘুমোয় আর পাখীরা দিনান্তের গান শেষ করে। চরাচরের ওপর রহস্যময়ী রাতের ছায়া ঘনায়। ঠিক সেই সময়েই দ্বিতীয় ঘরটাতে গিয়ে দাঁড়ায় বুড়ো। মণিমাণিক্য-যুক্ত ঘরের দে'য়াল থেকে সাতরঙা বিচিত্র আলো বেরোচ্ছে সেখানে আর সেই স্নিগ্ধ আলোর মাঝে সারি সারি অসংখ্য পুতুল সাজানো আছে। বুড়ো কারিগর হাতের পুতুলটাকে তাদের একপাশে দাঁড় করিয়ে দেয়, বিচিত্র হেসে বলে, "সুখে থাকো"—তারপরে এককোণে বসে পড়ে সে, পুতুলগুলোর দিকে মুগ্ধ দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকে। অসংখ্য পুতুল আর তাদের প্রত্যেকটিকেই বুড়ো কারিগর তৈরী করেছে। তৈরী করেছে তার সারা জীবন ধরে।

হ্যাঁ, এই ঘরেই পুতুলেরা থাকে। বিচিত্র বিচিত্র বেশভূষায় সজ্জিত সব পুতুলেরা। পুরুষ ও নারী দু'রকমের পুতুল। বহুমূল্য মণিমাণিক্য-খচিত ঘরের মাঝে ওরা সানন্দে দিন কাটায়। সুখস্বপ্নের মত সুন্দর ওদের দিন আর রাত। প্রজাপতিরা ওদের খাবার জন্য মধু বয়ে আনে, ভিজে বাতাস নিয়ে আসে ওদের পানীয়। ওরা শুধু খায় দায় ঘুমোয় আর নাচগান করে। দুঃখ শোক জরামৃত্যু নেই ওদের, ঘরের দে'য়ালে বসানো হীরেমুক্তোর আলোর মতই স্থির ওদের জীবন ও যৌবন। কালস্রোত ওদের ভাসাতে পারে না।

বিচিত্র ও আনন্দরস-ঘন পুতুলদের জীবন। ঘর জুড়ে, গাদাগাদি হয়ে বসে আছে ওরা আর ওদের মাঝখানে বসে আছে ওদের শিল্পীরা, রস-স্রষ্টারা। বেহালা-বাদক টিমথি, বীণকার শ্রীমন্ত, গায়ক কীর্তিমান, নৃত্যবিদ পুষ্পসেন, নর্তকী মারিয়াণা, লেখক অংশুমান, দার্শনিক তিমিরকান্তি এবং চিত্রকর জ্যোতির্ময়। ভোর হয়, দুপুর কাটে, সন্ধ্যে

হয়, রাত্রি কাটে, আবার রাত্রি প্রভাত হয়। এক সুরে-বাঁধা বীণার আলাপের মতই নিখুঁত ওদের প্রাত্যহিক জীবন। একইভাবে চলে তা, একইভাবে পুনরাবৃত্তি করে।

ভোরবেলা।

সমস্ত পুতুলদের পেছনে যে বলিষ্ঠ পুতুলটা একটা তলোয়ার হাতে দাঁড়িয়ে আছে, প্রতিদিনকার মত আজো সেই প্রহরী চেঁচিয়ে ওঠে, বলে, "ভাইসব জাগো-ও-ও-ও—একিনী রাত চলে গেছে, ভোর হয়েছে এ-এঁ-এ"—

কীর্তিমান তানপুরার তারে ঝঙ্কার তুলে ভৈরব রাগে গান ধরে। পৃথিবীর সদ্য-জাগ্রত চোখের সামনে এ কী বিস্ময়! পাখীরা গলা ছেড়ে গান গাইছে, অকারণে হাওয়ায় গা ভাসাচ্ছে! শালবন আকাশের উন্মুক্ত তোরণদ্বারের দিকে ঊর্ধ্বমুখে চেয়ে আছে, রাতের ঘুম কুয়াসার মত জড়িয়ে আছে বহুদূরবর্তী পাহাড়ের গায়ে আর রূপসী নদীর বুকে রাঙা মুখ দেখছেন সূর্যদেব!

তিমিরকান্তি তার বড় বড় চুলের মধ্যে হাত বুলিয়ে বলে, "ভোর হয়েছে—ভোরের বাতাসে, ভোরের আলোতে, মহান আত্মার মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াও ভাইসব"—

কলম নেড়ে অংশুমান বলে, "এই স্বর্ণোজ্জ্বল ভোরের বেলা থেকে আবার নতুন করে ভালবাসো ভাইসব, মনে রেখো—ভালবাসাই জীবনের সেরা ঐশ্বর্য"—

...এক কোণে যে পুতুলটা পাখোয়াজ নিয়ে বসে থাকে, তার হাত দ্রুতগতিতে চলে! গম্ভীর, মেঘমন্দ্র ধ্বনি ওঠে। কীর্তিমানের উদাত্ত কণ্ঠস্বরও ধাপে ধাপে ওপরে ওঠে। পাখোয়াজের গুরু গুরু শব্দ ও

গায়কের ভারী গলা একসঙ্গে মিশে যায় মনে হয় যেন একটা অগ্নিময় শব্দ-স্তম্ভ আকুল ভাবে আকাশকে স্পর্শ করতে চাইছে।

মুগ্ধ হয়ে শোনে পুতুলেরা। প্রজাপতির ঠোঁট থেকে মধু আহরণ করে, ভিজে বাতাস থেকে পানীয় শোষণ করে ওরা স্থির হয়ে কীর্তিমানের গান শোনে। দিনের প্রথম প্রহর বিভাসের তানে শেষ হয়।

শ্রীমন্ত অনেকক্ষণ ধরেই বীণাটা বাজাবার জন্ম ব্যগ্র হয়ে ছিল, কীর্তিমান থামতেই সে তারে ঝঙ্কার দেয়। মুক্তপক্ষ বিহঙ্গমের গানের মতই অপূর্ব সে ধ্বনি।

পুতুলেরা হাসাহাসি করে।

জ্যোতির্ময় পরিহাস করে বলে, "বীণা বাজাবার জন্ম ক্ষেপে উঠেছে বীণকার, শোন—তোমরা ওর প্রাণে আঘাত দিও না—"

পুতুলেরা বলে, "না না, তুমি বাজাও শ্রীমন্ত, বাজাও"—

শ্রীমন্ত বীণার তারে ঝঙ্কার দেয়। আশাবরীর আলাপ সুরু হয়। পৃথিবীময় এ কী বিস্ময়! পার্বত্য ঝরণা বয়ে যায়, দল বেঁধে পাখীরা আকাশে ওড়ে। আর আকাশটা কী গাঢ় নীল! তাতে সাদা সাদা মেঘের পুঞ্জ নিরুদ্দেশ-যাত্রীদের মত ভেসে চলেছে। শালবনে শুকনো পাতা ঝরে পড়ছে, তার ওপর দিয়ে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে হরিণ শিশুরা। রূপসী নদীর ধারে বকেরা বসে আছে আর প্রান্তরে কোথায় যেন কোকিল ডাকছে। মাটির গর্ভ ভেদ করে বেরোচ্ছে শ্যামল তৃণের অঙ্কুর, বুনো ঘাসের ডগায় তার লোভী প্রাণের পিপাসা আকুল হয়ে উঠছে। বীণার তারের অপরূপ ঝঙ্কারে ঘরটা গমগম করতে থাকে, মণি-মাণিক্য-খচিত দেওয়ালগুলো যেন পুতুলদের স্বপ্নলোকের মতই সজীব হয়ে ওঠে।

আশাবরী রাগিনী শেষ হয়, গান্ধারী সুরু হয়। নীল মখমলে মোড়া আকাশের সিঁড়িপথ বেয়ে সূর্য্যদেব এগিয়ে চলেন। ঘাসবনের নিভৃত ছায়ায় বসে প্রজাপতিরা পাখাগুলোকে বিশ্রাম দেয়। আমজাম বট গাছের পাতাগুলো নিস্পন্দ হয়ে কোকিলের ডাক শোনে। শাল-

বনের অন্তরালে, রূপসী নদীর তীরে, বিস্তৃত প্রান্তরের এখানে ওখানে, অজস্র রকমের ফুল ফোটে। নানা রংয়ের ফুল। প্রান্তরের বুকে, ছোট ছোট বিল আর পুকুরে পদ্মফুলও ফোটে। আর এইসব নানা ফুলের গন্ধে বাতাস ভারী হয়ে ওঠে, সৌখীন বিলাসীর মত অভিজাত ও মন্থর গতিতে তা বয়ে যায়।

উন্মাদের মত বাজাতে থাকে শ্রীমন্ত, বীণার তারগুলো যেন তাদের হৃদয় নিংড়ে নিংড়ে ঝঙ্কার তোলে। শুনতে শুনতে কীর্তিমান দুলতে থাকে, গভীর আবেগের সঙ্গে মাথা নাড়তে থাকে। সেই নামহীন পাখোয়াজ-বাদক সজোরে হাত চালায়, বীণার দ্রুত লয়ের সঙ্গে লয় মিলিয়ে তাল রাখে। আর সব কিছু শুনতে শুনতে চিত্রকর জ্যোতির্ময় যেন স্বপ্ন দেখে। আহা, ফুল ফুটছে। ক-ত ফুল! গোলাপ, টগর, চামেলী, পলাশ আর কৃষ্ণচূড়া। শালবনের ছায়ায় বসে দীর্ঘশৃঙ্গ হরিণেরাও স্বপ্ন দেখছে। দু'চোখ জ্বলে জ্যোতির্ময়ের, দ্রুতগতিতে সে ছবি আঁকতে সুরু করে।

তিমিরকান্তি মাথা নাড়ে, ঝাঁকড়া চুল দুলিয়ে বলে, "আনন্দই অমৃত, আনন্দই আত্মার ধর্ম, ভাইসব—তোমাদের স্বরূপ আনন্দময়"—

অংশুমান উঠে দাঁড়ায়, ডাগর ডাগর স্বপ্নালস চোখ দুটোকে সামনের দিকে নিবদ্ধ রেখে সে আবিষ্টের মত বলে, "সুন্দর—পৃথিবী বড় সুন্দর। ভাইসব, সুন্দরই সত্য, সুন্দরই শিব—তাকে ভালবাসো"—

গান্ধারী রাগিনী কখন শেষ হয়ে যায় কারো খেয়াল থাকে না। হঠাৎ যখন পুতুলেরা সচেতন হয় তখন তারা শোনে যে ঘরের মধ্যে যেন এক বিরহিনীর আবির্ভাব হয়েছে, গম্ভীর তার স্বর, প্রচ্ছন্ন বেদনা ভরা। টোড়ি রাগিনী। এ কী দুঃখ, তবু এ কী সান্ত্বনা! হৃদয়ের গভীরে কি যেন এক আকুল কামনা, একটা সুবিপুল শূন্যতা! গভীর দুঃখ, তবু একা নয় কেউ। গাছ, লতা, ফুল, পাখী, হরিণ আর নক্ষত্র আছে। পৃথিবী প্রাণময়।

হঠাৎ সেই তলোয়ারধারী প্রহরী [illegible] ওঠে। ঘরের মধ্যে প্রচ্ছন্ন বেদনা বয়ে যাচ্ছে! না, না, [illegible] সতর্ক করে দিতে হবে। সে যে প্রহরী। এই ঘরে, এই প[illegible]র পৃথিবীতে নিষ্কলুষ সৌন্দর্য ও অনাবিল আনন্দের জগতে তো [illegible]নাকে প্রধান হতে দেওয়া হবে না। এখান থেকে বহুদূরে, মানুষদের পৃথিবীতে নাকি দুঃখ আছে, ব্যাধি ও অভাব আছে, পাশব সমস্ত অন্ধবৃত্তি আছে, পাপ আর অন্যায় আছে। সেখানকার অশুভ আত্মা এই পুতুলদের সৌন্দর্যলোককে প্রতিনিয়ত গ্রাস করার চেষ্টা করে। পুতুলেরা বেদনায় মূহ্যমান হয়ে পড়লে তারা এসে পুতুলদের নিশ্চিহ্ন করে ফেলবে। না, তা হতে পারে না। মানুষদের বিষয়ে বুড়ো কারিগরের মুখে নানা কথা শুনে সে ভয়ানক আকৃষ্ট হয়েছে কিন্তু তাই বলে সে তার কর্তব্যে অবহেলা করবে না। না, সে বাধা দেবে।

তলোয়ারটা তুলে ধরে প্রহরী গর্জে ওঠে, "সাবধান, সাবধান—বেদনা প্রধান হতে চলেছে—"

বাজনা থেমে যায়।

শ্রীমন্ত মাথা নেড়ে বলে, "বুঝেছি প্রহরী, বুঝেছি—তোমাকে ধন্যবাদ।"

তখন বেহালাবাদক উঠে দাঁড়ায়, বলে "দাঁড়াও শ্রীমন্ত, আমি এবার একটু ঝড়ের বাজনা বাজাই। প্রহরীর ভয় আর টোড়ি রাগিনীর বেদনাকে আমি এখনি দূর করে দিচ্ছি—"

পুতুলেরা হাসাহাসি করে।

জ্যোতির্ময় তাদের পরিহাসের সুরে বলে, "বুড়ো টিমথির কাণ্ড দেখেছ তোমরা, বেহালা বাজাবার জন্য অধীর হয়ে উঠেছে লোকটা! আহা বাজিয়ো টিমথি, বাজিয়ো, তার আগে একবার আমার ছবিটা ওদের দেখাতে দাও—"

বলেই সে নিজের ছবিটা তুলে ধরে। জলের ওপর একটা রক্তপদ্ম

ফুটেছে। কি বিচিত্র তার বর্ণ, কি মসৃণ তার পাপড়িগুলো! পুতুলের রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে, আনন্দের নিঃশ্বাস ফেলে।

উত্তেজিত হয়ে ওঠে সবাই।

একটি যুবক পুতুল তার সঙ্গিনীকে বুকে টেনে নিয়ে চাপা গলায় বলে ওঠে, "জ্যোতির্ময়ের রক্তপদ্মের একটি পাপড়ির মতই তোমার ঠোঁট—একটা চুমু দেবে?"

সঙ্গিনী লাজরক্ত হয়ে চোখ বোজে, ধীরে ধীরে নিজের মুখটা তুলে ধরে, ঠোঁট দুটোকে আলতো করে একটা দীর্ঘস্থায়ী চুম্বনের জন্য প্রতীক্ষা করে।

অংশুমান বলে ওঠে, "ভালবাসো পুতুলেরা, ভালবাসার চেয়ে বড় সাধনা আর কিছুই নেই"—

কিন্তু টিমথির মুখ তখন অন্ধকার হয়ে ওঠে, বেহালাটা বগলে চেপে একপাশে বসে পড়ে সে।

জ্যোতির্ময় তাকায় তার দিকে, সহাস্যে বলে, "আরে, তুমি যে বসে পড়লে টিমথি? নাও, এবার বাজাও"—

টিমথি মাথা নাড়ে, ধরা গলায় বলে, "না।"

"কেন?"

টিমথি ঠোঁট উলটে বলে, "তুমি আমায় বুড়ো বললে কেন?"

জ্যোতির্ময় হেসে ওঠে।

পুতুলেরা প্রবোধ দেয় টিমথিকে, "না, না, তুমি বাজাও টিমথি"—তারা অনুরোধ করে টিমথিকে, "তোমার ঝড়ের বাজনা আমাদের শোনাও টিমথি, টিমথি"—

টিমথি উঠে দাঁড়ায় আবার, থুৎনি দিয়ে বেহালাটা চেপে ধরে ছড়িটা চালাতে সুরু করে। মুহূর্তে ঘরের মধ্যে যেন ইন্দ্রজাল ঘটে। বিরাট এক অরণ্য যেন ঘরের মধ্যে তার ছায়ানিক্ষেপ করে। টুপ টাপ শুকনো পাতা পড়ছে, দু'একটা পাখী ডাকছে। আর কোনো শব্দ নেই।

থমথমে নিঃশব্দতা। অরণ্য প্রতীক্ষা করছে। ঝড় আসছে। মধুর বেহালা যেন পরিষ্কার বুঝিয়ে দেয় যে দূরে একটা শোঁ শোঁ শব্দ অমনই শোনা যাচ্ছে। ক্রমে সে শব্দ বাড়ে, কাছে আসে। টিমথি তালের হয়ে জোরে জোরে ছড়ি টানে এবার। প্রমত্ত ভৈরবের মত সগর্জন আসে ঝড়। অরণ্যের শান্তি বিঘ্নিত হয়। গাছপালার আর্তনাদ, ভগ্ন শাখার অন্তিম চীৎকার। ঝড় কথা বলে। আমি মুক্তি, আমি বিপ্লব, আমি পরিষ্কার করি, আমি জীর্ণ পাতার জঞ্জালকে দূর করি, বনস্পতির গর্বোদ্ধত মাথাকে আমি তৃণের সাথে সমান করি। ঝড় তার কথা রাখে। ঝড় থেমে যায়। আবার নিঃশব্দতা, গভীর নিঃশব্দতা। শান্তি। টুপ্ টাপ্ পাতা পড়ার শব্দ, ঝিরে ঝিরে বাতাসের নিঃশ্বাস, নাইটিংগেল পাখীর ডাক আর ডেজী ফুলের গন্ধ। টিমথিকে আর চেনাই যায় না।

মুগ্ধ পুতুলেরা সোৎসাহে বাহবা দিয়ে ওঠে, "অপূর্ব হয়েছে টিমথি—চমৎকার হয়েছে তোমার বাজনা, তুমি আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি নাও"—

টিমথি জবাব দেয় না, কোনো কথাই তার কানে যায় না, তার সমস্ত বাহ্যজ্ঞানই তখন যেন বিলুপ্ত হয়ে গেছে। একমনে সে বাজিয়েই চলেছে।

তিমিরকান্তি গম্ভীর হয়ে বলে, "বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর থেকে নিরন্তর যে সুরের উৎপত্তি হচ্ছে, টিমথির অন্তর তার সঙ্গে সুর মিলিয়ে ছন্দোময় হয়ে উঠেছে—টিমথি ভাগ্যবান"—

অংশুমান মাথা নাড়ে, সায় দিয়ে বলে, "হ্যাঁ, টিমথি ভাগ্যবান—তার অন্তরের এই বিচিত্র সঙ্গীতের কথাকে আমি লিপিবদ্ধ করব"—

তারপরে সময় কাটে। বৃন্দাবনী সারঙ্গের আলাপে দিনের দ্বিতীয় প্রহর শেষ হয়।

পুতুলেরা বলে, "তৃতীয় প্রহর আরম্ভ হল, সূর্যদেবের অবরোহণও সুরু হল, এবার আমরা নাচ দেখব"—

ফুটেছে। বিহীন পাখোয়াজবাদক তখন তার বাজযন্ত্রে আঘাত করে। রোমাঞ্চিত তাদের বাজনা সুরু হয়। পুষ্পসেন উঠে দাঁড়ায়। পুতুলেরা উচ্ছে করতালি দিয়ে তাকে সংবর্ধনা জানায়। নাতিদীর্ঘ দেহ ...নের, টানা টানা চোখ, মাথাভর্তি কোঁকড়ানো চুল। পেছন থেকে বেরিয়ে আসে আর একটা পুতুল, এসে তার হাতের বাঁশীতে ফুঁ দেয়। কীর্তিমান পূর্ব-রঙ্গ আরম্ভ করে। শ্রীমন্ত তার বহুতন্ত্রী বীণাকে মুখর করে তোলে। সম্পূর্ণ জাতি রাজবিজয় রাগের আরোহণ ও অবরোহণ সুরু হয়, তার গমক ও মূর্ছনায় সারা কক্ষ স্পন্দিত হয়ে ওঠে। স্থানক ভঙ্গীতে দাঁড়ায় পুষ্পসেন। বাঁ কাঁধের ওপর মাথাটা ঈষৎ হেলিয়ে, হংসপক্ষ মুদ্রাযুক্ত বাঁ হাতকে কাঁধের সঙ্গে সমান করে, কটিদেশ থেকে গ্রীবা পর্যন্ত ডানদিকে আনত করে ও আলপদ্ম-যুক্ত ডানহাতকে বুকের কাছাকাছি রেখে বিচিত্র ভঙ্গীতে দাঁড়ায় পুষ্পসেন। একটি রক্তপদ্মের জন্মকাহিনীকে সে নৃত্যাকারে বর্ণনা করবে। অস্তগামী সূর্যদেবের বেদনারাগকে সঞ্চয় করে জলাশয় তা নিজের বেদনা-রসে জারিত করে, তারপরে পূর্বাকাশে যখন সোণার হাঁসুলির মত বঙ্কিম চন্দ্রদেবকে দেখা যায় তখন জলাশয়ের পঙ্ক-হৃদয় থেকে নির্গত হয় তার প্রণয়-কুসুম। একটি রক্তবর্ণ পদ্মকলি। ছোট জলাশয়ের রক্তঝরা প্রণয়-কুসুম। কিন্তু বিরাট ব্রহ্মাণ্ড তাকে নিস্পলকনেত্রে দেখে। মেঘচুম্বী আকাশের শিখর থেকে নেমে আসে অপ্সর লোকের অনন্তযৌবনারা, মহান নীলাকাশ চেয়ে থাকে তার কোটি কোটি নক্ষত্র-চক্ষু মেলে, ঊর্ধ্বলোকের আনন্দরস কুয়াসা আর শিশির হয়ে ঝরে পড়ে। পুষ্পসেন নাচে। রক্তপদ্মের জন্মকাহিনী। কিন্নর-কণ্ঠ-নিঃসৃত গানের মত মিষ্টি কাহিনী। নানা-মুদ্রা-যুক্ত হাতের ভঙ্গী আর ডাগর ডাগর চোখ দিয়ে সে তা বর্ণনা করে। সঙ্গে সঙ্গে পায়ের নূপুর দিয়ে সে তাল রাখে। হাতের ভঙ্গীকে তার দৃষ্টি অনুসরণ করে, দৃষ্টিকে অনুসরণ করে মন, মনকে অনুসরণ করে ভাব এবং একমুখে পরিচালিত ও সমাবিষ্ট এই সঙ্গীত, ভঙ্গী,

দৃষ্টি, মন ও ভাব থেকে উৎপত্তি হয় রসের। শান্ত ও মধুর পুতুলদের চেতনা স্তিমিত হয়ে আসে। রসই আনন্দ। আনন্দই অমৃত। পুতুলেরা বিচিত্র তেজ অনুভব করে, সারা দেহে তাদের রোমাঞ্চকর শিহরণ খেলে যায়। পদ্ম ফোটে। আসে ভ্রমর। গুন্ গুন্ গুঞ্জরণে সে তার হৃদয়কে ব্যক্ত করে। রক্তপদ্ম নিঃশব্দে আত্মত্যাগ করে, নিজেকে নিঃশেষ করে, মনে মনে সে বলে যে প্রেম আত্মত্যাগী, আত্মদাহী। পাখোয়াজের গম্ভীর ধ্বনি, বীণার বিচিত্র ঝঙ্কার, কীর্তিমানের মধুস্রাবী গান, বাঁশীর উদাস স্বর ও পুষ্পসেনের নূপুরনিক্কণ—সব মিলিয়ে যেন অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের চক্রধ্বনির সঙ্গে মিলে মিশে একাকার হয়ে যায়।

অংশুমান বলে ওঠে, "ভালোবাসো পুতুলেরা, ভালোবাসো। অনন্ত বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ পৃথিবী, স্বপ্নদর্শী নানাবর্ণের মেঘমালা, অসংখ্য পুষ্পের সৌরভ, চারদিকের জ্যোতিষ্কলোক আর জানা অজানা লক্ষকোটি গ্রহরাজি—ভালোবাসো পুতুলেরা ভালোবাসো—"

দীর্ঘকেশ দুলিয়ে আবিষ্টের মত বলে তিমিরকান্তি, "আর ভালবেসে শক্তি অর্জন কর—আলো, বাতাস, জল, সৌরভ, সঙ্গীত আর ছন্দোময় ব্রহ্মাণ্ডের রহস্যকে উদ্ঘাটন করার জন্য আমাকে অনুসরণ কর। সুন্দর পুতুলেরা, শোন—আমাদের যাত্রাপথ ওপরের দিকে। অজ্ঞাত রহস্য-লোকের দুর্গমতাকে ভেদ করে আমাদের সেই শেষ বিস্ময়কে আবিষ্কার করতে হবে—যার পরে আর কিছুই জানবার থাকবে না। বিশ্বাস কর, আমি অনুভব করেছি—সেই শেষ বিস্ময় আমাদের মতই একটি ছোট্ট পুতুল, নীলবর্ণ স্থির বিদ্যুতের মতই তার অপরূপ জ্যোতির্ময় মূর্তি"—

তলোয়ারধারী সেই প্রহরী হঠাৎ সবার চেতনা ফিরিয়ে আনে, হঠাৎ সে সবাইকে শিহরিত করে তোলে, তিক্তকণ্ঠে বলে ওঠে, "ক্লান্ত, বড় ক্লান্ত মনে হচ্ছে"—

"ক্লান্ত!" পুতুলেরা শিউরে ওঠে, বিবর্ণ হয়ে যায়। এ কি অশুভ কথা!

প্রহরী মাথা নাড়ে, বলে, "হ্যাঁ, ক্লান্ত, আমি ক্লান্ত।"

তিমিরকান্তি গর্জে ওঠে, তিরস্কার করে বলে, "মূর্খ প্রহরী, চুপ কর। পুতুলের মুখে কখন এমন কথা শোভা পায় না। পুতুলের সুন্দর জীবন আর অফুরন্ত আনন্দের ভাণ্ডার পেয়েও তোমার ক্লান্তি কেন?"

প্রহরী ভয় পায় না, থামেও না, একইভাবে সে বলে, "কারণ আমরা সৃষ্টি করি না। পঙ্গুর মত বসে বসে এই নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ-বিলাস আমার কাছে দুর্বলতা বলে মনে হয়।"

"মূর্খ—তুমি মূর্খ—"

"কারণ আমরা বাইরে যাবার চেষ্টা করি না, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কুৎসিং ও অসুন্দর সব কিছুকে নিশ্চিহ্ন করতে চাই না—"

"প্রহরী তুমি হতভাগ্য"—

"কারণ আমরা খণ্ড জীবনের অধিকারী শুধু পুতুল হয়েই থাকতে চাই"—

অংশুমান হেসে ওঠে, প্রশ্ন করে, "তা তো বুঝলাম, কিন্তু তুমি কি চাও?"

প্রহরী যেন স্বপ্ন দেখে, স্বর নামিয়ে সে বলে, "আমি পূর্ণাঙ্গ জীবন চাই।"

"তার অর্থ?"

"আমি পৃথিবীর বুক থেকে সমস্ত অশুভকে দূর করতে চাই, বহুদূরের পৃথিবী থেকে আমি"—

"তুমি কি?"—

"তুমি কি?"—

নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে প্রশ্ন করে পুতুলেরা, "তুমি কি?"—

সেই তলোয়ারধারী প্রহরী যেন হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে ওঠে, বলে, "হ্যাঁ, আমি মানুষ হতে চাই"—

"ছি ছি ছি"—

"ধিক্ প্রহরী—ধিক্"—

পুতুলেরা শিউরে ওঠে। একি অমঙ্গলের কথা! একি পশুর মত বুদ্ধি! অনাবিল সৌন্দর্য আর সীমাহীন আনন্দকে চায় না! প্রাণবান পৃথিবীর সেরা জীব পুতুল হয়েও নিজেকে খণ্ড-জীবনের মনে করে! পৃথিবীর সব চেয়ে দুর্বোধ্য জীব মানুষ হতে চায়! ইচ্ছে করে দুঃখ পেতে চায়!

অংশুমান ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলে, "প্রহরী, তুমি উন্মাদ, উন্মাদ"—

পুতুলেরা গর্জে ওঠে, "প্রহরী, তুমি স্তব্ধ হও।"

প্রহরী মাথা নেড়ে হাসে, বলে, "ভয় করি না তোমাদের—আমার হাতে অস্ত্র আছে"—

আর কোনো কথা বলে না সে, তলোয়ারের হাতলটাকে সে মুঠোর মধ্যে শক্ত করে ধরে হঠাৎ চুপ করে যায়, খোলা জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকে আর কি যেন ভাবে।

কানাকানি করে পুতুলেরা। নৃত্যগীত বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু তা ক্ষণকালের জন্য। কীর্তিমান আর শ্রীমন্ত যেন মৃদুকণ্ঠে কি সব ঠিক করে নিজেদের মধ্যে, তারপরে তারা খুসী হয়ে প্রহরীর দিকে তাকায়।

তারা বলে, "প্রহরী, তোমার ক্লান্তিকে আমরা দূর করব, পুতুলের জীবন সম্বন্ধে তোমাকে আমরা গর্বিত করে তুলব।"

দিনের চতুর্থ প্রহরও সুরু হয় তখন। শ্রীমন্ত বীণা বাজায়, মুলতানী সুরে গান গায় কীর্তিমান। সময় কাটে। অপরাহ্নের গান গায় পাখীরা, সূর্যদেব পশ্চিমাকাশে হেলে পড়েন, তালদীঘির ছায়া দীর্ঘায়ত হয়ে পূবদিকে পড়ে। মুলতানী শেষ হয়, কুমারী রাগিনী সুরু হয়। কীর্তিমান গায়, শ্রীমন্ত বাজায়। ওদের ক্লান্তি নেই। জীবন ওদের কাছে দুর্লভ বলে মনে হয়, তাই ওরা সময় নষ্ট করে না। প্রতিটি মুহূর্তই দামী। যত আনন্দ পাওয়া যায় ততই তো লাভ। কুমারী রাগিনীর পর সুরু হয় মালবী রাগিনী। প্রজাপতিরা লতাপাতার ছায়ায় ঝিমোয়, মধুসিক্ত স্তিমিত

চেতনা দিয়ে তারা তৃণখণ্ডের প্রাণস্পন্দন শোনে, শোনে নরম মাটির গর্ভস্থিত অসংখ্য বীজের প্রার্থনা। পাখীরা ডাকে, হাওয়ায় গাছপালা দোলে, দীর্ঘশ্বাস ফেলে। সূর্যদেব আরো পশ্চিমে ঢলে পড়েন, রূপসী নদীর বুকে কাঁপে আকাশের প্রতিবিম্ব, বুনো হাঁসেরা তীরের পাশ ঘেঁষে জলে ভাসে। ওপারের শালবন থেকে হরিণের পাল নেমে আসে জলের ধারে। শ্রীরাগের আলাপ সুরু হয়। লাল ফুলেরা কান পেতে শোনে। পশ্চিমাকাশে চিতার আগুন জ্বলে, তার মধ্যবর্তী রক্তবর্ণ সূর্যদেবকে সাক্ষাৎ অগ্নিদেবের মত মনে হয় আর ভাসমান জ্বলন্ত জাহাজের মত রক্ত-রঙীন মেঘস্তূপেরা আকাশপথে ভেসে বেড়ায়। শ্রীরাগের গম্ভীর সুর যেন একটা যজ্ঞাগ্নিশিখার মত, ভস্মের মত পুতুলদের ওপরে নিয়ে যায়, ফুৎকারে ফুৎকারে ঊর্ধ্বলোকে ঠেলে দেয়। সেখানে নীল শূণ্যতা ধূধূ করছে, অনন্ত সেই শূণ্যতার বুকে জ্বলছে কোটি কোটি নক্ষত্রের আলো। তারা যেন আরো ওপরে ওঠে। শ্রীরাগের আলাপ যেন তাদের আত্মার ধ্বনিময় পিপাসা। আরো কিছু চাই, আরো কিছু চাই। এই অসীম, অনন্ত, জ্ঞানাতীত সৃষ্টিরহস্যের সীমান্তে পৌছুতে হবে। কত দিন লাগবে? কোটি কোটি কোটি বৎসর? লাগুক। কিন্তু সীমান্ত-শেষের সেই উৎস-স্থলকে খুঁজে বের করতেই হবে। সেখানে আছে এক অনির্বাণ নীল আগুনের জ্যোতির্ময় মূর্তি। তার স্বপ্ন থেকে গড়া এই বিচিত্র ব্রহ্মাণ্ড। স্বপ্ন থেকে স্বপ্নান্তর। কত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হল আবার লয় পেল, কত গ্রহ উপগ্রহ বুদ্বুদের মত শূণ্যতার সমুদ্রে ভেসে উঠল আর মিলিয়ে গেল, কত নক্ষত্রের জন্ম আর মৃত্যু হল! কিন্তু অচঞ্চল, অমলিন, অমর সেই আদি ও অন্তের নীল আগুন। পুতুলের ক্ষুদ্র প্রাণের মনিপদ্মে সেই আগুনের আলো আছে বলেই তার এত পিপাসা। আনন্দ চাই, আনন্দ-লোকের উৎসে গিয়ে পৌছানো চাই। ওদিকে রূপসী নদীর ওপারে, শালবনের অন্তরালবর্তী ধূসর পর্বতশ্রেণীরও ওপারে

সূর্য্যদেব ডুবে যান, দিনের যবনিকাপতন হয়। সঙ্গে সঙ্গে ক্ষীরোদ-সমুদ্র-স্নাত চন্দ্রদেবকে দেখা যায় পূর্বাচলে, আকাশের বুকে দেখা যায় সপ্তর্ষি মণ্ডলকে। দেখা যায় কালপুরুষ, শুক্র, বৃহস্পতি, মঙ্গল আর শুকতারাকে। আরো ক-ত নক্ষত্র। রাত হয়। শ্রীরাগের আলাপ শেষ হয়, ধোঁয়ার মত ধীরে ধীরে তার মূর্চ্ছনা মিশিয়ে যায়।

তবু প্রহরী মাথা নাড়ে, উদাস কণ্ঠে তবু সে বলে, "ক্লান্ত, আমি বড় ক্লান্ত, আমার এই খণ্ড জীবনের বৈচিত্র্যহীনতা আমাকে অবসন্ন করে তুলেছে—"

"স্তব্ধ হও মূর্খ প্রহরী—প্রকৃতিস্থ হও—"

পুতুলেরা প্রহরীর জন্য শঙ্কিত হয়ে ওঠে। কি হল প্রহরীর? কেন সে অমন অভিযোগ করছে? পুতুলের জীবন তার কাছে সন্দেহের কারণ কেন? কেন তাকে সে খণ্ডকাব্য বলে মনে করছে? কি হল? প্রহরী কি অসুস্থ হল? প্রহরী কি উন্মাদ হয়ে যাবে? মণিমাণিক্য-খচিত ঘরের মাঝে হঠাৎ সঙ্গীতহীন স্তব্ধতা ঘনিয়ে আসে।

আর ঠিক সেই সময়ে, সোনার চাবি দিয়ে সোনার তালা খুলে, বুড়ো কারিগর রূপোর দরজা ঠেলে ঘরে ঢোকে। তার হাতে একটা নতুন পুতুল।

পুতুলেরা সশ্রদ্ধ অভ্যর্থনা জানিয়ে বলে, "আসুন শিল্পীরাজ, আসুন, উপবেশন করুন।"

বুড়ো কারিগর হাতের পুতুলটাকে একপাশে দাঁড় করিয়ে দেয়, বিচিত্র হেসে, স্নেহসিক্ত কণ্ঠে সে পুতুলদের ভাষায় বলে, "সুখে থাকো—"

তারপর সে এককোণে বসে পড়ে, পুতুলগুলোর দিকে মুগ্ধদৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকে। অসংখ্য পুতুল আর তাদের প্রত্যেকটিকেই সে তৈরী করেছে, তৈরী করেছে তার সারাজীবন ধরে।

নতুন পুতুলকে অভ্যর্থনা জানায় অন্যান্য পুতুলেরা, বলে, "সুস্বাগতম্। হে নবজাতক, শুদ্ধ আনন্দলোকের হে নবীন নাগরিক—তোমাকে

আমরা সাদর অভ্যর্থনা জানাচ্ছি, মর জীবজগতের এই অমর কল্পলোকে তুমি আজ থেকে সগৌরবে ও সমানাধিকার নিয়ে বাস কর।"

বুড়ো কারিগর সহাস্যে বলে, "কিন্তু তোমরা থামলে কেন? তোমাদের নৃত্যগীত আবার আরম্ভ হোক—"

তখন কীর্তিমান গান সুরু করে—নটনারায়ণ রাগের গান। বাইরে রাত ঘনাচ্ছে, পুঞ্জ পুঞ্জ রহস্য এসে পৃথিবীকে আবৃত করছে। স্পন্দিত নক্ষত্রালোকের নীচে শান্ত পৃথিবী। প্রান্তরে গাছপালারা ঝিমোচ্ছে, প্রজাপতি ও পাখীরা ঘুমোচ্ছে, মহান নিঃশব্দতার বুকে পরি.াগিনীর মৃদু ঝঙ্কারের মত ঝিঁ ঝিঁ পোকারা তান তুলেছে। মায়াচ্ছন্ন পৃথিবী ধ্যানমগ্না। ওদিকে রূপসী নদী একই ভাবে বয়ে চলেছে, নদীর বুকে নক্ষত্রদের প্রতিবিম্ব যেন তার নানা বাসনার প্রদীপের মত জ্বলছে ও কাঁপছে। ওপারের শালবনে অন্ধকার গাঢ়তর, অগ্নি-নেত্র নৈশ প্রহরীদের চীৎকারে তা প্রতিধ্বনিত, ময়ূর ও মৃগযূথের স্বপ্নে রহস্যময়।

অংশুমান গানের তালে তালে দুলে ওঠে, বলে, "আমি গল্প বলব, তোমরা শুনবে?"

পুতুলের মাথা নেড়ে সায় দেয়, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, শুনব—"

কীর্তিমান থামে। শ্রীমন্ত বীণার তারে নটমল্লারের আলাপ করে।

অংশুমান গল্প বলা সুরু করে। সৌর-জগতের শেষ সীমান্তে যে পৃথিবীটা আছে সেখানকার একটি তরুণ ও একটি তরুণীর কথা। তরুণ বাঁশী বাজাত, তরুণী ফুলের মালা তৈরী করত। পূর্ণিমার এক রাতে তাদের দেখা হল, তারা ভালবাসল। কিন্তু বাধা এল, বিপত্তি এল সেই পৃথিবীতে বাস করা তাদের অসম্ভব হয়ে উঠল। তখন এক চন্দ্রহীন রাতে তারা সেই পৃথিবী থেকে বেরিয়ে পড়ল, ছায়াপথের পা দিয়ে চলতে চলতে হঠাৎ তারা নক্ষত্রদেহ ধারণ করল, পাশাপাশি জ্বলে জ্বলতে আকাশের বাসিন্দা হয়ে নিজেদের প্রেমকে চিরন্তন করল অংশুমানের কথাটি ফুরোয়।

পুতুলেরা উচ্ছ্বসিত হয়ে প্রশংসা করে বলে, "সাধু সাধু—তোমার গল্প সত্যি বড় মনোরম অংশুমান —"

তিমিরকান্তি অনেকক্ষণ ধরে নির্বাক ছিল, এবার সে বলে, "সত্যি একটি মহৎ কাহিনী শোনালে অংশুমান। প্রেম জীবনের শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য এবং তা ঐশ্বর্য বলেই তার শত্রু থাকে। কিন্তু কি যায় আসে? প্রেম নিজের জন্য পৃথিবী সৃষ্টি করে নেবেই। কারণ সৃজনই তার ধর্ম।"

টিথমি হঠাৎ উঠে দাঁড়ায়, বেহালার তারের ওপর ছড়ি টানতে টানতে সে বলে, "শোন প্রিয় পুতুলেরা, আমার যন্ত্রের হৃদয় মথিত করে তোমাদের আমি প্রেমের গান শোনাব।"

টিমথি বাজাতে সুরু করে। প্রেম আত্মার পিপাসা। প্রেমই শ্রেষ্ঠ । সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড প্রেমের পিপাসায় অধীর। আকাশ ভালবাসে ীকে। পৃথিবী ভালবাসে সূর্য আর চন্দ্রকে। অরণ্যচর পশু, জলচর আর নভোচারী পাখী ভালবাসে পরস্পরকে। আর মানুষ ভালবাসে ক। পুরুষ ভালবাসে নারীকে। পিপাসা। সৌন্দর্যের পিপাসা, র্ময় অনুভূতির পিপাসা। যুগ-যুগান্তের ইতিহাস শুধু ভালবাসার। আর তাতে বাধা পাওয়ার ইতিহাস। কদম্বতলায় সুন্দরী অভিসারিকা চিরকাল গোপবালকের বংশীধ্বনি শুনে মুগ্ধ হয়, চিরকাল প্রেমিক পুরুষ ক্রুশবিদ্ধ হয়েও ভালবাসে, মানুষকে ভালবেসে রাজৈশ্বর্য ত্যাগ করে ভিখারী হয়, ভালবাসতে গিয়ে অগ্নিশায়কের আঘাতে মৃত্যুবরণ করে। দেহপঙ্কের রক্তপদ্ম, অন্তরের একটি মাত্র প্রদীপশিখা এই ভালবাসা।

টিমথি বাজিয়ে চলে। রাত গভীর, নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে পুতুলেরা বাজনা শোনে। বহুদূরে কোথায় যেন গুঁড়ো গুঁড়ো বরফ পড়ছে, বড় বড় ওক গাছগুলো যেন অভ্রের মত তুষারে গা ঢেকে আছে, আর বরফ-জমা পর্বতশৃঙ্গ যেন আকাশের দিকে নিঃশব্দে তাকিয়ে আছে। ভোরের আলোতে স্কাইলার্ক গান গায়, রবিন পাখী কিচিরমিচির করে,

গোল্ড ফিঞ্চেজ্‌রা আকাশে ডিগবাজী খায়। শান্ত-সলিলা নদীর তীরে, নিভৃত নিকুঞ্জে বসে প্রেমিক যুগল পরস্পরকে অন্তর-পদ্মের রক্তবানী শোনায়। ওয়াইল্ড্‌ বেরীর গন্ধের সঙ্গে ভেসে আসে নাইটিংগেলের ডাক। বিকেলের পড়ন্ত রোদে কোথায় যেন গ্রাম্য অর্কেষ্ট্রা বাজে এবং যুগলে নাচে সবাই। নৃত্যের তালে তালে তাদের হৃদয় কাঁপে, চোখের নীলাভ তারা চকচক করে। আর বহুদূরে কাঁপে নীল সমুদ্রের বিরাট হৃদয়—ঝড় আগতপ্রায়। ফুলে ফেঁপে ওঠে সমুদ্র, উত্তেজিত সিংহের মত কেশর ফুলিয়ে গর্জে ওঠে সে আর বড় বড় রোলারের মত গড়িয়ে যায় তার কামনার তরঙ্গ।

পুতুলেরা প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে, মুগ্ধকণ্ঠে বারংবার বলে, "অপূর্ব, তোমার বাজনা সার্থক টিমথি—অন্তরের এই গভীর ভাষাকে সব চেয়ে গভীরভাবে তুমিই প্রকাশ করেছ, তুমি ধন্য।"

টিমথি থামে না, বাজিয়েই চলে। তখন বাজনার তালে তালে উঠে দাঁড়ায় মারিয়ানা।

পুতুলেরা সোৎসাহে বলে, "নাচো মারিয়ানা" আমরা তোমার নাচ দেখব।"

মারিয়ানা নাচতে স্বরু করে। টিমথির বাজনার সুর বদলে যায়। পার্বত্য ঝরণার কলকল আওয়াজ শোনা যায়। মারিয়ানা নাচে। সোনালী রেশমের মত তার মাথার চুল, ডাগর ডাগর চোখের তারাতে তার আকাশের নীলিমা। আপেলের মত রক্তিম তার গাল, লাল পদ্মের পাঁপড়ির মত মধুময় তার দুটো রসালো ঠোঁট। তন্বীদেহী মারিয়ানার যুগল স্তন যেন দুটি শ্বেত পদ্ম, ক্ষীণ কটির নীচে তার সুঠাম শ্রোণীদেশ আর দুটি স্ফটিকস্তম্ভের মত তার যুগল উরু। সমুদ্রোত্থিতা দেবী ভেনাসের মত সে, উর্বশীর মত। মারিয়ানা নাচে। ফুল ফোটে, ফুল ঝরে, কোকিল ডাকে, সূর্যালোকের স্পর্শে তুষার গলে। পৃথিবী বিচিত্র। মৃগশাবক মুগ্ধ হয় পৃথিবীকে দেখে, অব্যক্ত আনন্দধ্বনি

করে সে আলোর উৎসের দিকে লাফ দেয়। কত বর্ণের পাখী ডাকে। সোনালী ফসলে ভরা ক্ষেতের কোথায় যেন রাখাল ছেলে গান গায়। মৃদুস্বরে কথা বলে প্রণয়ীযুগল, রাজহাঁসেরা পুকুরের বুকে সাঁতার কাটে আর গ্রাম্যপথে ধাবমান দুরন্ত ছেলেমেয়েরা খিলখিল করে হাসে। ছন্দোময় পৃথিবী। নটরাজের নৃত্যের তালে তাল মিলিয়েছে সমস্ত পৃথিবী।

নৃত্য শেষ হয়।

পুতুলেরা নিঃশ্বাস ফেলে বলে, "অপূর্ব, আমাদের সুন্দরী মারিয়ানার নৃত্য অপূর্ব।"

অংশুমান বলে ওঠে, "ভালবাসো পুতুলেরা, ভালোবাসাই আমাদের ধর্ম।"

হঠাৎ বুড়ো কারিগর কথা বলে। সবাই তাকায় তার দিকে, চুপ হয়ে যায়, সশ্রদ্ধভাবে শোনে তার কথা।

বিড়বিড় করে বলে বুড়ো, "ভালোবাসা সবার ধর্ম—সবার। কিন্তু মানুষেরা তা বোঝে না, তারা হিংসায় উন্মত্ত, হিংসাই তাদের ধর্ম।"

পুতুলেরা ক্ষণকালের জন্য স্তব্ধ হয়ে যায়। মানুষদের বিষয়ে তাদের গভীর শঙ্কা। মানুষদের পৃথিবীতে যে দুঃখ, দারিদ্র্য, ব্যাধি ও বেদনা আছে তাকে তারা ভয় পায়। তাদের অসিধারী প্রহরী তো তার জন্যই সর্বদা জাগ্রত হয়ে আছে। মানুষ বড় দুর্বোধ্য জীব—পঙ্কোত্থিত আকাশমুখী পদ্ম নয় তাদের জীবন, তাদের জীবন পঙ্কমুখী। পুতুলেরা জানে যে বুড়ো কারিগরও মানুষ। কিন্তু মানুষেরা সবাই তো বুড়ো কারিগর নয়। আর বুড়ো কারিগর মানুষ হলেই বা, সে শিল্পী, সে আনন্দলোকের বাসিন্দা, সে রস-পিপাসু। তার সঙ্গে তো পুতুলদের প্রভেদ নেই।

তাই কীর্তিমান বলে, "শিল্পীরাজ, মানুষেরা বড় দুর্বোধ্য জীব—বড় নিকৃষ্ট, তাদের ধর্মের খোঁজে আমাদের দরকার নেই।"

বুড়ো কারিগর মৃদু হাসে, ধীরে ধীরে গম্ভীর কণ্ঠে বলে, "কিন্তু মানুষই যে জগতের শ্রেষ্ঠ জীব—"

পুতুলেরা গুঞ্জনধ্বনি তোলে, তাদের চোখে মুখে নিঃশব্দ প্রতিবাদের ভাষা ফুটে ওঠে।

অংশুমান উত্তেজিত হয়ে প্রশ্ন করে, "মানুষ কি আমাদের চেয়েও শ্রেষ্ঠ জীব?"

প্রশান্ত হেসে বুড়ো কারিগর জবাব দেয়, "না।"

"তবে?"

"তোমরা মানুষের আনন্দময় জীবনের মূর্তি। যেদিন মানুষেরা পরস্পরকে ভালোবাসতে পারবে, সেদিন তারা তোমাদের মতই আনন্দময় জীবন যাপন করবে। তোমরা মানুষের কল্পলোকের জীব—আনন্দময় পুতুল—প্রেমের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করলে মানুষেরাও তোমাদের মত সুখী হবে—"

পুতুলেরা গর্ববোধ করে, নিজেদের দুর্লভ জীবন নিয়ে আলোচনা সুরু করে। তারা মানুষের কল্পলোকের জীব!

দার্শনিক অবাক হয়ে প্রশ্ন করে, "তাহলে মানুষ সেই সাধনা করে না কেন?"

আদ্যিকালের বদ্যিবুড়োর মত দেখতে সেই বুড়ো কারিগর মাথা নাড়ে, দুঃখমিশ্রিত কণ্ঠে উত্তর দেয়, "তারা হিংসায় উন্মত্ত, অন্ধ হয়ে গেছে—তারা পরস্পরকে ভালোবাসে না।"

"শিল্পীরাজ—"

বুড়ো কারিগর মাথা ঘুরোয়, দেখে যে তার ডান দিকে এসে দাঁড়িয়েছে সেই অসিধারী প্রহরী। তার চোখে মুখে গভীর ঔৎসুক্য জলজল করছে। কখন যে সে পেছন থেকে ভীড় ঠেলে এগিয়ে এসেছে তা জানাই যায়নি। সেই প্রহরীই ডাকছে।

"বল প্রহরী—"

"আপনি মানুষদের গল্প বলুন—আমরা শুনব।"

পুতুলেরা চুপ করে থাকে। মানুষের বিষয়ে তাদের শুনবার আগ্রহ আছে, আবার ভয়ও আছে। কে জানে বাবা, কি সব ভয়াবহ কথা শুনতে হবে!

বুড়ো কারিগর স্নেহপূর্ণ দৃষ্টি মেলে প্রহরীর দিকে তাকায়, জিজ্ঞেস করে, "মানুষের কথা শুনতে তোমার ভয় করবে না প্রহরী?"

প্রহরী সোজা হয়ে দাঁড়ায়, বুক ফুলিয়ে বলে, "ভয়! হুঃ—আমার হাতে তলোয়ার আছে না?"

"তাহলে তুমি শুনবেই?"

"শুনব, শুনব—আপনি বলুন কারিগর—"

"তাহলে শোন—"

বুড়ো কারিগর মানুষদের কথা বলতে আরম্ভ করে। মানুষ প্রকৃতির সর্বকনিষ্ঠ সন্তান। মানুষ পশুর কল্পনা—একরকমের উন্নত পশু। মানুষ যেমন দুর্বোধ্য তেমনি বিচিত্র। নগ্ন, অসহায় অবস্থা থেকে সে আজকের সভ্য মানুষ হয়েছে। অন্ধ প্রকৃতির নির্মম নিয়মের চাকাকে সে বাধা দিয়েছে, প্রকৃতির ভাণ্ডার থেকে সে শক্তি আহরণ করছে। মানুষ পাহাড় ভাঙ্গে, অরণ্যকে নিশ্চিহ্ন করে সমুদ্রকে শাসন করে, পাখীর মত পাখা মেলে আকাশে ওড়ে, সহস্র মাইল দূরবর্তী মানুষের সঙ্গে কথা বলে। নক্ষত্রলোকের রহস্য উদঘাটন করতে চায় মানুষ, গ্রহ উপগ্রহের সঙ্গে মিতালি পাতাতে চায়, বাতাসে ভাসমান অদৃশ্য ব্যাধির জীবাণুদের সে ধ্বংস করার স্বপ্ন দেখে। মানুষ দিগ্বিজয়ী। মানুষ বিশ্বকর্মা কিন্তু ক'জন? ক'জন মানুষ এই মানুষের পরিচয় দিতে পারে? মাত্র কয়েকজন মানুষই মানব সভ্যতাকে আজকের চেহারায় রূপান্তরিত করেছে। বাকী সব কারা? বাকী সব মানুষ নয়। বাকী সব কোটী কোটী মানুষেরা সবাই ছদ্মবেশী, পশু। তাই সাম্রাজ্যের পর সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়, নগরীর পর নগরী সমাধিস্থ হয়, কঙ্কালের স্তূপে যুগান্ত হয়। স্বার্থ,

লোভ, হিংসা, দ্বেষ, লালসা—অন্ধকার জগতের সব সর্পক্রুর দানবেরা তাদের অন্তরের বাসিন্দা। তাই মুষ্টিমেয়ের সাধনা ব্যহত হয়, ব্যর্থ হয়। তাই অশ্বারোহীর দল দেশ আক্রমণ করে, লুণ্ঠন করে, রক্তস্রোতে মাটি ভিজে ওঠে। তাই আগ্নেয় গোলার ঘায়ে অট্টালিকা ভেঙ্গে পড়ে, মানুষের গলিত রক্তমাংসে বাতাস বিষাক্ত হয়। তাই একদল চায় আর একদলকে শোষণ করতে। তাই মুষ্টিমেয় মানুষেরা কোটি কোটি মানুষকে পদানত রাখে, নির্যাতিত করে, শোষণে পেষণে বঞ্চিত ও মুমূর্ষু করে। একই ইতিহাস। শতাব্দীর পর শতাব্দী শুধু হাহাকার আর দীর্ঘশ্বাস। যুগে যুগে, এক আধজন যারা সভ্যতাকে এক এক ধাপ এগিয়ে দিয়েছে, সেই সব দৈত্যের মত মানুষেরা প্রতিবাদ করেছে, নির্ভয়ে ঘোষণা করেছে— 'ভালোবাসো, পরস্পরকে ভালোবাসো, মানুষেরা, ভালোবেসে সুখী হও, শান্তি পাও।' কিন্তু কেউ শোনেনি তাদের কথা, সেই সব মহৎ মানুষদের তারা কণ্টক-মুকুটে ভূষিত করে কীলক-বিদ্ধ করেছে, বিষপান করিয়ে তাদের মহত্ত্বকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে, বন্দুক আর গুলি দিয়ে তাদের কণ্ঠরোধ করেছে এবং মানুষ যে এখনো পশু তাই প্রমান করেছে। একই ইতিহাস। শতাব্দীর পর শতাব্দী শুধু লোভ, হিংসা, লুণ্ঠন, ধর্ষণ, হত্যা, হাহাকার আর দীর্ঘশ্বাস। যন্ত্র-যুগেও মানুষের মনে প্রস্তর-যুগ।

বুড়ো কারিগর থামে, উত্তেজনায় হাঁপাতে থাকে সে।

পুতুলেরা ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল, দুরু দুরু কেঁপেছিল তাদের কোমল হৃদয়, বুড়ো থামতেই তারা বলে, "থামুন শিল্পীরাজ থামুন, দুর্ভাগা মানুষদের বিবরণ শুনিয়ে আর আপনি আমাদের শঙ্কিত করবেন না।"

কিন্তু প্রহরী ভয় পায় না, আগুনের মত জ্বলে তার দুই চোখ, আরো কাছে এসে সে প্রশ্ন করে, "কিন্তু চিরকাল কি এমনি চলবে কারিগর, মানুষ কি আর পুতুল হতে পারবে না?"

বুড়ো কারিগর মেঘের মত গম্ভীর গলায় জবাব দেয়, "পারবে, নিশ্চয় পারবে। মৃতের স্তূপ থেকে অপরাজেয় প্রাণের অঙ্কুর মাথা তুলবে,

কোটি কোটি নির্যাতিত মানুষ হঠাৎ একদিন ধূমকেতুর মত করাল মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করবে। শক্ত হাতের নিদারুণ খড়্গ দিয়ে তারা মানবতা আর সভ্যতার শত্রুদের নির্মূল করবে। তখনই মানুষদের জীবনে পুতুলদের আনন্দময় জীবন এসে ধরা দেবে— প্রেমের দ্বারা সেই জীবনকে তারা তখন আরো আনন্দময় করে তুলবে। আর মানুষ ভালোবাসবে মানুষকে, ফুলকে, ফলকে, প্রকৃতিকে—অখণ্ড শান্তির স্রোতে জীবন ও ধরিত্রী তখন শুদ্ধ ও স্নাত হবে।"

বুড়ো কারিগর থামে, চোখ বুজে কি যেন সে ভাবতে থাকে। বোধ হয় তার মুদ্রিত চোখের সামনে ভবিষ্যতের এক স্বর্ণোজ্জ্বল জীবন-চিত্র জীবন্ত হয়ে ফুটে ওঠে। সেই মহান চিত্রের বিচিত্র রসের গভীরতায় সে যেন তখন নিমজ্জিত হয়ে যায়।

অসিধারী প্রহরী আরো কাছে আসে, তলোয়ারের হাতলটাকে আরো শক্ত করে চেপে ধরে হঠাৎ সে জ্বলন্ত দৃষ্টি মেলে উচ্চারণ করে, "আমি মানুষ হতে চাই—"

পুতুলেরা গর্জে উঠে, "প্রহরী, স্তব্ধ হও—"

প্রহরী থামে না। সে বলে, "হ্যাঁ, আমি মানুষ হতে চাই। মানুষই পৃথিবীর সব চেয়ে মহৎ জীব, দুঃখ ও বেদনার মহৎ আগুনে তার জীবন পরিশুদ্ধ, চিন্তায় ও শ্রমে তার জীবন অপরূপ—"

"প্রহরী, প্রকৃতিস্থ হও—"

"আমি মানুষ হতে চাই, আমার এই তলোয়ার দিয়ে আমি মানবতার শত্রুদের ধ্বংস করব, তাদের পুতুলের মত সুন্দর হতে সহায়তা করব—"

"প্রহরী, তুমি উন্মাদ—"

"আমি মানুষ হতে চাই, কারণ তখনই পুতুলের জীবন সার্থক মনে হবে। কারিগর, আমাকে মানুষ করে দিন—"

বুড়ো কারিগর অবাক হয়ে চোখ মেলে, তার দৃষ্টিতে প্রশংসা ও স্নেহ। প্রশান্ত হাসিতে ভরে যায় তার মুখ, শিশুর মত সরল হয়ে ওঠে,

মৃদুকণ্ঠে সে বলে, "প্রহরী, তুমি চমৎকার পুতুল। আমি জানি যে তুমি পুতুল হতে চাইবেই কারণ জীবনের এক বেদনা-বিহ্বল মুহূর্তে আমি তোমাকে সৃষ্টি করেছিলাম। সেই মুহূর্তে বেদনাকে ধ্বংস করতে চেয়েছিলাম বলেই তো তোমার হাতে ঐ তলোয়ার। কিন্তু আমাকে তুমি মিথ্যে অনুরোধ করছ, আমি তো মানুষ তৈরী করতে পারি না—"

"পারেন না! কেন? কেন?" হতাশায় রুদ্ধ হয়ে যায় প্রহরীর কণ্ঠ।

বুড়ো কারিগর মাথা নাড়ে, "পারি না। মানুষ প্রকৃতির সন্তান——প্রকৃতিই তাকে তৈরী করে।"

প্রহরী স্তব্ধ হয়ে যায়। হতাশায় মূক হয়ে যায় সে। বিবর্ণ মুখে নিষ্প্রভ দৃষ্টি মেলে সে একবার বুড়ো কারিগরের দিকে তাকায় তারপরে ধীরে ধীরে নিজের জায়গায় ফিরে যায়।

পুতুলেরা আশ্বস্ত হয়, হাঁফ ছেড়ে বাঁচে, হাসাহাসি করে বলে, "বাঁচা গেছে, প্রহরীর প্রলাপ বন্ধ হয়েছে।"

আবার গান আরম্ভ হয়, বীণা ঝঙ্কৃত হয়, নৃত্যরত পদযুগলের তালে তালে পাখোয়াজের ধ্বনি ওঠে। সময় কাটে। বাইরে কুহকিনী রাতের গান শুনে তন্দ্রাচ্ছন্ন পৃথিবী স্বপ্ন দেখে, পাহাড়েরা মাথা নীচু করে কুয়াসার চাদরে মুড়ি দেয়, আর রূপসী নদী ঘুমন্ত রূপসীর মত মৃদু শব্দ করে। আকাশ অতন্দ্র, তার অসংখ্য নক্ষত্র-চক্ষুর স্পন্দনে ঘুম বিতাড়িত আর ক্ষীরোদ-সমুদ্র-স্নাত চন্দ্রদেব অস্তচূড়াবলম্বী। গভীর, মৌন প্রশান্তি। ধ্যানমগ্ন চরাচর। অখণ্ড নিঃশব্দতার অতল [illegible]কে, গভীর জলোত্থিত বিরাট বুদ্বুদের মত এক বিচিত্র অনাহত ধ্বনি ওঠে। মহান বিশ্বের গান। কীর্তিমানও গান গায়। বেহাগের সুরে রাত্রি তৃতীয় প্রহর শেষ হয়। সোহিনী ঘোষণা করে রাত্রি চতুর্থ প্রহরের। রাত কাটে, রাত কাটে। রহস্যময়ী প্রকৃতির সৃষ্টি-মুহূর্তে-ভরা মায়াময় রাত কেটে যায়। রাত ও দিনের সন্ধিস্থলে শ্রীমন্তের সপ্ততন্ত্রী বীনা গায় ললিতা রাগিনী। রাত্রি

শেষ ভাই। দ্রুত লয়ে ঝঙ্কার ওঠে। চরাচর-ব্যাপী রাতের অন্ধকার গলে গলে জবাকুসুম-সঙ্কাশ সূর্যদেবের জন্ম দেয়।

বুড়ো কারিগর উঠে দাঁড়ায় তখন। তার যাবার সময় হয়েছে।

পুতুলেরা সশ্রদ্ধভাবে রাস্তা করে দেয় তাকে, বুড়ো এগোয়। হঠাৎ সে প্রহরীর পাশে গিয়ে থমকে দাঁড়ায়। বিষণ্ণ, গম্ভীর সেই অভিমানী প্রহরী, হতাশায় ম্লানমুখ।

বুড়ো কারিগর তার ওপর ঝুঁকে পড়ে, নিম্নকণ্ঠে বলে, "প্রকৃতিই ইচ্ছা পূরণ করে প্রহরী, তোমার হতাশা কেন? ইচ্ছা থেকেই উৎপন্ন হয় সব কিছু। কোন একদিন, কোন এক আশ্চর্য্য মুহূর্ত্তে তুমি হয়ত হঠাৎ মানুষ হয়ে যাবে—কে জানে?"

বুড়ো কারিগর চলে যায়। রূপোর দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ হয়ে যায়, সোনার তালাতে সোনার চাবি ঘোরানোর শব্দটা উঠে মিলিয়ে যায়।

প্রহরীর মুখ আশায় ঝলমল করে ওঠে, নতুন প্রাণের সঞ্চার হয় তার ধমনীতে, প্রাত্যহিক কর্ত্তব্য সমাপনের জন্য সে এবার চেঁচিয়ে ওঠে, বলে, "ভাইসব জাগো [illegible]—দুঃখিনী রাত চলে গেছে, ভোর হয়েছে-এ-এ"—

•

সেদিন থেকে প্রহরী ভারী অন্যমনস্ক হয়ে থাকে। নিঃশব্দে, নির্ভুলভাবে সে তার কর্ত্তব্য করে যায় তবু সে অন্যমনস্ক থাকে। আর পুতুলেরা তার দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকায়। "কি হল প্রহরীর? বুড়ো কারিগরের কথায় কি তার মনে প্রত্যয় জন্মায়নি? অত নিঃশব্দ কেন সে?

প্রহরী নির্বাক হয়ে থাকে, একটিও কথা বলে না সে। ভালো

লাগে না তার। একটি মাত্র ইচ্ছায় তার অন্তর ফুলে ওঠে, একটিমাত্র কামনার শিখায় তার অন্তর পুড়তে থাকে। সে মানুষ হবে, তাকে মানুষ হতেই হবে। বুড়ো কারিগরের কাছে শোনা মানুষদের কাহিনী স্মরণ করে সে রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। সে মানুষ হবে। মণিমাণিক্য-খচিত এই অপরূপ কক্ষে, এই আনন্দ-বন্যা-প্লাবিত সুরের পৃথিবীতে তার ভালো লাগে না, বড় ক্লান্ত, বড় অবসন্ন বোধ করে সে। হাতের তলোয়ারে তার মরচে ধরেছে, তার সব বিস্বাদ মনে হয়। মানুষের বলিষ্ঠ জীবন কি লোভনীয়! দুঃখে, বেদনায়, প্রেমে ও কর্মে, চিন্তায় ও স্বপ্নে, ঘাত প্রতিঘাতে বহু-বিচিত্র মানুষের জীবন কি অপরূপ! সেই জীবনে যখন পুতুলের জীবন এসে মিশবে তখন ইন্দ্রধনুর মত অপরূপ হবে সেই জীবন। হ্যাঁ, সে মানুষ হবে। লোভ, নীচতা, শঠতা, স্বার্থ, ব্যাধি, দারিদ্র্য, দুঃখ, পরাধীনতা, শোষণ ও নির্যাতন——অন্ধকার জগতের সেই সব সর্প-ক্রূর দানবদের সে একে একে অপসারিত করবে।

সময় কাটে, প্রহর কাটে। প্রান্তরের বুকে পাখীরা ডাকে, প্রজাপতিরা ওড়ে, ফুল ফোটে আর গাছপালাদের মর্মরধ্বনি ওঠে। একইভাবে বয়ে যায় রূপসী নদী, বয়ে যায় আর গান গায়। তার হীরকচূর্ণের মত উজ্জ্বল বালুকণা মেশানো তীরভূমির ওপর নিরুদ্দেশযাত্রী যাযাবর বুনো হাঁসেরা এসে বিশ্রাম করে। ওপারের শালবন দীর্ঘশৃঙ্গ মৃগযূথ ও ময়ূরেরা সোল্লাসে সময় কাটায়। আকাশে উদয়াস্তের পথ পরিক্রমা করেন সূর্যদেব ও চন্দ্রদেব, অনির্বাণ ইন্দ্রকান্তমণির মত জ্বলে নক্ষত্রেরা, হংসপক্ষ-তুল্য শুভ্র মেঘপুঞ্জ উড়ে যায় দূরদূরান্তের দেশে। আর মণিমাণিক্যখচিত ঘরের মাঝে পুতুলেরা নাচে, গায়, গল্প শোনে ও ছবি দেখে। ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিনীর আলাপে ও মূর্ছনায় সারা ঘর জমজমাট হয়ে ওঠে। তবু ভালো লাগে না প্রহরীর। নিঃশব্দে কর্তব্য সারে সে, পুতুলদের যখন বেদনা আচ্ছন্ন করতে চায় তখন সে

অসি আস্ফালন করে বাধা দেয়, সবাইকে সতর্ক করে। কিন্তু সে নেহাৎই কর্তব্য। সব কিছুই বিস্বাদ লাগে তার। শুধু একটিমাত্র ইচ্ছা তার অন্তরে ভারী হয়ে ওঠে। সে মানুষ হবে। সময় কাটে, দিন কাটে, শুধু একটিমাত্র কামনার শিখা তাকে দহন করতে থাকে। বুড়ো কারিগরের শেষ কথাগুলোকে স্মরণ করে সে প্রতিনিয়ত ইচ্ছা করে—
সে মানুষ হবে, মানুষ হবে, মানুষ হবে—

দিন কাটে। দিনের পর দিন কেটে যায়।

. . .

হঠাৎ একদিন এক কাণ্ড হল।

পুতুলেরা দেখল যে আকাশ মেঘে মেঘে অন্ধকার হয়ে উঠছে। ক্রমে কয়লার মত কালো মেঘের ছায়ায় আকাশ মিলিয়ে গেল আর মেঘের ডাক গড়িয়ে গেল আকাশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত। যেন ঢেউখেলানো লোহার পাতের ওপর দিয়ে এক অদৃশ্য দৈত্যরাজ তার রথের চাকা চালিয়ে গেল। শালবন, রূপসী নদী আর এপারের প্রান্তরে নামল থমথমে ভাব, একটা নিরুদ্ধ-নিঃশ্বাস প্রতীক্ষা। তখন সবে মধ্যাহ্ন অতিক্রান্ত হয়েছে অথচ সূর্যদেব মেঘাবৃত হয়ে গেছেন। পাখীরা উত্তেজিত চীৎকার করতে করতে গাছের ডালে লাফালাফি করছে, আর শূণ্যপথ বেয়ে দ্রুত পাক খেতে খেতে চিলেরা নেমে আসছে।

পুতুলেরা ভয় গেল, সম্মিলিত কণ্ঠে তারা ধ্বনি তুলল, "প্রহরী, সতর্ক হও—ঝড় আসছে"—

কর্তব্যপরায়ণ প্রহরী তার তলোয়ারকে তুলে ধরে সোজা হয়ে দাঁড়াল, নির্ভীক কণ্ঠে জবাব দিল, "তোমরা নির্ভয়ে থাকো ভাইসব, আমি আছি-ই-ই—"

বলতে বলতেই বায়ুকোণের দিক থেকে একটা গোঁ গোঁ শব্দ শোনা গেল। অতি মৃদু। মুহূর্তে তা প্রবল হল, প্রবলতর হল, প্রবলতম হয়ে আছড়ে পড়ল পুতুলদের পৃথিবীতে। রূপকথার রাজপুত্র যখন প্রাণ-ভ্রমরকে টিপে মেরেছিল তখন হাজার হাজার রাক্ষসীরা যেমন গোঁ গোঁ শব্দে আর্তনাদ করেছিল ঠিক তেমনি। বোবা কান্নার মত একটানা শব্দ। গাছের ডাল ভেঙে পড়তে লাগল, দুটো অদৃশ্য হাত দিয়ে কে যেন সব কিছু উলটে-পালটে দিতে চাইল।

পুতুলেরা আর্ত কোলাহল তুলল, "প্রহরী—বাঁচাও, রক্ষা করো—"

লোহার মূর্তির মত শক্ত হয়ে উঠল প্রহরী, বলল, "ভয় নেই, ঝড় আমাদের শত্রু নয়—"

ঝড় বাড়ল। রূপসী নদীর জলে বড় বড় ঢেউ উঠল, তার শান্ত মূর্তি হঠাৎ বদলে গেল। ঝড়কে প্রতিহত করার জন্য সে যেন নাগিনী মূর্তি ধারণ করে গর্জাতে লাগল। ওপারের শালবন ধ্রুপদ গান সুরু করল। মৃগকুল ভয়ে নিস্তব্ধ হয়ে গেল, ময়ূরেরা পেখম তুলে নাচতে সুরু করল আর বহু দূরবর্তী পর্বতশ্রেণী যেন যাদুমন্ত্রবলে অদৃশ্য হয়ে গেল। সেই অসিধারী প্রহরী এক বিচিত্র ও রোমাঞ্চকর অনুভূতিতে বারংবার কাঁপতে লাগল।

পুতুলেরা চীৎকার করে বলল, "গবাক্ষ-পথ পাহারা দিয়ো প্রহরী—সাবধান—"

প্রহরী মৃদুকণ্ঠে বলল, "তোমরা শান্ত হও, আমি আছি-ই-ই—"

মেঘের ডাক আবার শোনা গেল। গুরু গুরু গুরু—ঢেউ খেলানো লোহার পাতের ওপর দৈত্যরাজের রথের চাকা গড়িয়ে যাচ্ছে। আর একটানা শোঁ শোঁ গোঁ গোঁ শব্দ। প্রহরী জানালার ধারে স্থির হয়ে দাঁড়াল, বাইরের দিকে তাকিয়ে সে বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেল। প্রকৃতি অন্ধ কিন্তু কী আশ্চর্য রূপবতী! আকাশে, বাতাসে, জলে, স্থলে—প্রকৃতির প্রচণ্ড শক্তির ঢেউ খেলে যাচ্ছে! আর এই প্রকৃতিকে

বশ মানাতে চাইছে মানুষ! সে মানুষ হবে, সে মানুষ হবেই, মানুষ তাকে হতেই হবে। দু'চোখ জ্বলতে থাকে তার, নাকটা ফুলে ওঠে, উত্তেজনায় বুকটা তার বারংবার ওঠানামা করে।

হঠাৎ কি যেন হল। আকাশে ফাটল ধরিয়ে বারংবার বিদ্যুৎ চমকাল। নীল বিদ্যুতের প্রখর আলোতে সব কিছু ঝলসে উঠল। সে কী তীব্র আলো! প্রহরীর চোখে ধাঁধাঁ লাগল, তার মাথা ঘুরে উঠল, একটা বৈদ্যুতিক তরঙ্গ যেন তার সারা দেহ আর পায়ের নীচেকার মাটিকে কাঁপিয়ে তুলল। তার দু' চোখের সামনে পুঞ্জ পুঞ্জ কালো মেঘের মত অন্ধকার ঘনিয়ে এল, ধোঁয়ার মত মিলিয়ে গেল তার চেতনা। বিস্মৃতি। আর সেই বিস্মৃতির মাঝে একটা চাপা যন্ত্রণা, প্রতি অঙ্গে এক সুতীব্র বেদনা।

অনেকক্ষণ পরে জ্ঞান ফিরে পেল প্রহরী, দেখল যে ঝড় একইভাবে বইছে, মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। বাতাসের শোঁ শোঁ শব্দ আর বৃষ্টির ঝম্ ঝম্ শব্দের সঙ্গে গাছপালার মর্মরধ্বনি মিশে গেছে। বৃষ্টস্নাত পৃথিবী যেন সিক্তবসনা সুন্দরীর মত শুভ্র, পবিত্র। হঠাৎ চমকে উঠল প্রহরী, নিজের দিকে তাকিয়ে সে বিস্ময়ে ও আনন্দে হতবুদ্ধি হয়ে গেল। নিজের হাত পা, নাক চোখ, বুক পিঠ, সব সে হাৎড়ে হাৎড়ে দেখল, অনুভব করল। তার অচৈতন্য অবস্থায় প্রকৃতি তার ইচ্ছাপূরণ করেছে! মানুষ, সে মানুষে রূপান্তরিত হয়েছে! কি স্বচ্ছ তার দৃষ্টি, কি প্রখর তার অনুভূতি, কি নিবিড় তার আনন্দ! সে মানুষ হয়েছে! হাতের নখাগ্রভাগ থেকে পায়ের নখাগ্র পর্যন্ত এক বৈদ্যুতিক চেতনার স্রোত। সে মানুষ! পেশীতে পেশীতে, পেশল মাংসের আড়ালে, লাভাস্রোতের মত দুরন্ত ও উষ্ণ শক্তি। আঃ—সে মানুষ—

কথা বলতে চাইল সে কিন্তু পারল না, শুধু তার কণ্ঠ থেকে একটা বিচিত্র আনন্দধ্বনি নিঃসৃত হল। পুতুলেরা চমকে উঠল,

তার দিকে তাকাতেই তাদের চোখের তারায় ত্রাস ঘনাল। এ কে? কে?

ভয়ার্ত কোলাহল তুলল তারা, "মানুষ! মানুষ! সাবধান হও—"

প্রহরী হাসল। পুতুলেরা ভয় পেয়েছে। তাদের ভয় দূর করার জন্য সে কিছু বলতে গেল কিন্তু পারল না। পুতুলের তলোয়ারটা তার হাতে এখন একটা ছুরির মত দেখাচ্ছিল, সেটাকে ফেলে দিয়ে সে সহাস্যে পুতুলদের দিকে এগিয়ে গেল।

পুতুলেরা আর্তনাদ করে ডাকল, "প্রহরী—প্রহরী—প্রহরী—"

কিন্তু কোথায় প্রহরী? পুতুল প্রহরী তো ঘরে নেই। মানুষ প্রহরীকেই বা তারা চিনবে কেন?

"প্রহরী, তুমি কোথায়?"

প্রহরী আবার কথা বলতে গিয়ে যখন পারল না তখন সে থামল। পুতুলেরা তাকে চিনবে না, তাকে দেখে তারা ভয় পাচ্ছে, অতএব আর এখানে থাকার দরকার নেই। তা ছাড়া এখানে তো আর কাজ নেই। তার কাজ তো এখন মানুষের পৃথিবীতে।

রূপোর দরজা বন্ধ, তাই সে জানালার ওপরে উঠল, পুতুলদের দিকে ফিরে তাকাল। সূক্ষ্ম একটা বেদনা বোধ করল সে, পুতুলদের জন্য মমতা বোধ করল। কিন্তু না, দুঃখ কেন? আবার সে ফিরে আসবে, মানুষের জগতের সঙ্গে পুতুলের জগতের সেতু হবে সে। তাছাড়া পেছনে তাকানো তো মানুষের ধর্ম নয়। তার ধর্ম এগিয়ে চলা।

হাত নেড়ে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে সে জানালা দিয়ে বাইরে লাফ দিল।

মাটিতে পা দিতেই সে আর একবার পুতুলদের আর্তনাদ শুনল। পুতুলেরা প্রহরীকে ডাকছে।

"প্রহরী, তুমি কোথায়, কোথায়?"

প্রহরী হাসল, মুহূর্তকাল স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, তারপর সোজা হয়ে সে পা বাড়াল। তরঙ্গায়িত প্রান্তরের ওপর দিয়ে সে ঝড়ের ধাক্কা ঠেলে

এগোতে লাগল। আশ্চর্য একটা মদির অনুভূতিতে তার দেহ গরম হয়ে উঠল। আঃ—মানুষের জীবন কী প্রখর ও তীব্র!

এগিয়ে চলল প্রহরী।

পায়ের নীচে ভিজে মাটির কি আশ্চর্য স্পর্শ! বৃষ্টিধারার আঘাত কি অদ্ভুত!

কিন্তু আর চলা যায় না। ঝড়ের বেগ প্রবল। শুধু তাই নয়, ঝড়ের বেগ যেন আরো বাড়ছে। গুম্ গুম্ গুম্ একটা শব্দ শোনা যাচ্ছে বাতাসে। হঠাৎ তা আরো বাড়ল, বাঁধ-ভাঙ্গা বন্যার জলের মত প্রবল শক্তিশালী ঝোড়ো হাওয়া হঠাৎ প্রহরীকে শুক্‌নো পাতার মত শূন্যে তুলল, তারপর আঘাতে আঘাতে তাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে চলল। মাটিতে নামবার চেষ্টা করল সে কিন্তু পারলনা না, অসহায় খড়কুটোর মত সে বাতাসের মুখে উড়ে চলল।

দূরে—দূরে—আরো দূরে—

বহুদূরে উড়ে গেল প্রহরী। দিগন্তকে অতিক্রম করে সে একটা খাড়া জমির ওপরে গিয়ে আটকে গেল, তাকিয়ে দেখল যে সেটা একটা পাহাড়ের চুড়ো, তার ওপারে গভীর ও অতলস্পর্শী খাদ। নিজেকে সামলে সে নীচে নেমে যেতে চাইল কিন্তু প্রকৃতি তাকে রেহাই দিল না। বন্য একটা পশুর মত আবার তাকে প্রমত্ত বাতাস এসে ঠেলা দিল আর সে পাহাড়ের চূড়ো থেকে ওপারের অতলস্পর্শী খাদের দিকে পড়তে লাগল।

কিন্তু কি আশ্চর্য! পর্বতশৃঙ্গের ওপিঠের সেই শূণ্যতার মধ্যে বাতাস নেই, নেই কোন আলোড়ন! সেখানে তার পতনের বেগও মন্দীভূত হল। থমথমে একটা গুরুভার আবহাওয়া তার চেতনাকে

ক্রমশঃ আচ্ছন্ন ও স্তিমিত করে তুলল। সর্বাঙ্গ প্রায় অবশ হয়ে এল তার, শুধু তার অর্দ্ধ-নিমীলিত চোখের সামনেকার শূণ্যতাকে সে দেখতে লাগল। আর নীচে গড়তে লাগল সে—নীচে, আরো নীচে, আরো নীচে—

হঠাৎ যেন ইন্দ্রজাল ঘটতে লাগল তার চোখের সামনে। প্রহরী কিছু বুঝল না, নির্বাক দৃষ্টি মেলে অসহায় ভঙ্গীতে সে শুধু দেখতেই লাগল।

বহুদূরে যেন একটা বিরাটকায় পটহ নিনাদিত হল। গম্ভীর ও চেতনা বিলুপ্তকারী একটা শব্দ যেন সেই শূণ্যতার মাঝে গড়িয়ে যেতে যেতে আলোড়ন সৃষ্টি করল। সঙ্গে সঙ্গে বাতাসের স্পর্শ পাওয়া গেল। শূণ্যতা মথিত হয়ে একটা প্রদীপ্ত চঞ্চল বাষ্পের সৃষ্টি হল। শূণ্যতায় উত্তাপ বোধ হল। সেই অদৃশ্য পটহ-ধ্বনির তালে তালে যেন বাষ্প-মণ্ডলীর মধ্যে তেজ সঞ্চারিত হল। পরস্পরকে আকর্ষণ করতে লাগল বাষ্পকণারা। মহাকর্ষের টানে স্থানে স্থানে বাষ্প-পরমাণুর ভীড় জমতে লাগল। হঠাৎ তা জ্বলে উঠল। তা থেকে জলন্ত অগ্নিপিণ্ডের মত নানা আকারের নীহারিকার সৃষ্টি হল, প্রবল বেগে অগ্নিমূর্তি দানবের মত তারা শূণ্যতাকে বিমথিত করে ঘুরে বেড়াতে লাগল। নীহারিকারা আবার গতিবেগে টুকরো হয়ে অসংখ্য নক্ষত্রের জন্ম দিল। মহাশক্তিশালী ও সাক্ষাৎ অগ্নিমূর্তি সেই নক্ষত্র-দেহগুলো থেকে জন্মাল নানা গ্রহ ও উপগ্রহ। আশ্চর্য! বিরাট শূণ্যতার মধ্যে কোটি কোটি সূর্য ও পৃথিবীর সৃষ্টি হল।

অর্ধ-চেতন অবস্থাতেও প্রহরী বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেল। কি ব্যাপার? কি দেখছে সে? হঠাৎ সে দেখল যে একটি ক্ষুদ্রকায় গ্রহ তার অগ্নিময় আকৃতি নিয়ে সবেগে ছুটে আসছে। প্রহরী চোখ বুজল। না, কিছু হল না তো! চোখ মেলল প্রহরী। সেই গ্রহের অগ্নিমূর্তি শান্ত হয়ে উঠছে। কিন্তু সেখানে প্রচণ্ড ঘূর্ণিবাত্যা, প্রবল বৃষ্টিপাত, ভয়াবহ

ভূমিকম্প। ক্রমে আরো শান্ত হল সেই গ্রহ। তাকে তখন চেনা গেল। সেই গ্রহের নাম পৃথিবী। নদ, নদী, মৃত্তিকার সৃষ্টি হল। সমুদ্রগর্ভে জন্মাল প্রাণের বীজ। মাটির ওপরে জন্মাল প্রাণের অঙ্কুর। লতাপাতা, কাঁকড়ার মত প্রাণী। গাছ। অতিকায় সরীসৃপ ও দানবেরা। প্রাকৃতিক পরিবর্তনের ফলে আবার তারা নিশ্চিহ্ন হতে লাগল। চতুষ্পদ জন্তুদের আবির্ভাব ঘটল। হাতী, ঘোড়া, হরিণ, বাঘ, গণ্ডার, গরিলা, বনমানুষ। হঠাৎ বিচিত্র এক জীবের আবির্ভাব ঘটল—তার নাম মানুষ। প্রাগৈতিহাসিক জগতের সেই মানুষ অরণ্যচর জন্তুদের মতই হিংস্র, ভয়ঙ্কর। কিন্তু আকাশের বিদ্যুৎ তার মস্তিষ্কে বুদ্ধির জন্ম দিল। সে আগুন আবিষ্কার করল। নিত্য-নব উদ্ভাবনী বুদ্ধি তাকে নিত্য নব পথ দেখাল। মাটি চষে ফসল উৎপাদন করতে লাগল সে, বস্ত্র দিয়ে নগ্নতা পরিহার করল। কিন্তু অরণ্যের ছাপ তার মনের মধ্যে একটু রয়েই গেল। পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়ল মানুষ। যারা তাকে বাধা দেয় তাদের সে দমন করতে লাগল। হিংস্র জন্তু, প্রাকৃতিক দুর্যোগের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে করে সে আত্মরক্ষার নানা উপায় বের করল। মানুষ সভ্য হল, শৃঙ্খলিত জীবন যাপনের প্রয়াস করতে লাগল, তার বহিরঙ্গ, সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনের কাঠামো সে তৈরী করে ফেলল। মানুষ জীবজগতে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করল।

প্রহরী রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকথা তার চোখের সামনে ছবির আকারে উদ্ঘাটিত হয়ে গেল। এবার উদ্ঘাটিত হচ্ছে মানুষের কথা। একের পর এক সাম্রাজ্য এল, গেল। কিছুই চিরস্থায়ী হল না। লৌহদুর্গে ভরা বিরাট সাম্রাজ্যগুলো সব একের পর এক ধূলো হতে লাগল। বিরাট বিরাট জাতির অভ্যুত্থান হল, কিন্তু চিরকাল কেউ শ্রেষ্ঠ থাকতে পারল না। পৃথিবী-শাসনকারী সম্রাটদের প্রস্তরমূর্তি ও অট্টালিকা ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট রইল না। শেষে তাও ধূলোয়

মিশে গেল। চিরকালের ইতিহাস। মানুষ চাইল শুধু প্রভুত্ব করতে, সাম্রাজ্য গড়তে, লুণ্ঠন ও হত্যা করে ভোগৈশ্বর্য উপভোগ করতে। মাঝে মাঝে বাধা দিল কয়েকজন, তারা সবাইকে মানুষ হতে বলল, পরস্পরকে ভালোবাসতে ও ক্ষমা করতে বলল, নির্লোভ ও সংযত হতে বলল। সেই সব জ্যোতির্ময় মানুষদের কথা কেউ শুনল না, পরিবর্তে তাদের তারা অপমান করল, হত্যা করল, বন্দী করে রাখল। এরি মাঝে দু' একজন পাগলাটে লোকের মস্তিষ্ক-বিকৃতির ফলে মানুষ প্রকৃতির ভাণ্ডার থেকে শক্তি আহরণ করতে শিখল, নানা সত্যকে আবিষ্কার করল, যন্ত্র গড়ল; জীবনকে সুস্থ, উন্নত, মহৎ ও সুখী করার কথা ভাবতে শিখল। কিন্তু তার সঙ্গেই শিখল ধ্বংসাত্মক নানা অস্ত্রের নির্মানকার্য। মানুষ পৃথিবীর সেরা জীব হয়েও—

অন্ধকার। আবার সব কিছু অন্ধকার হয়ে এল।

জ্ঞান হারাতে হারাতে প্রহরী অনুভব করল যে সে আবার শূণ্যপথ দিয়ে নীচে পড়ছে। এবার দ্রুত, অতি দ্রুত বেগে।

নীচে—নীচে—আরো নীচে—

দুই

প্রহরী চোখ মেলল।

চোখ মেলতেই সে দেখতে পেল যে গ্রামপ্রান্তে, কচুরীপানা আর শালুকফুলে ভরা পুকুরের ধারে, ঘন দুর্বা ঘাসের বিছানার ওপর সে শুয়ে আছে। আশেপাশে লোকজন নেই, কেউ নেই। কেবল দূরে দু' একটা গরু, মোষ আর ছাগল চরে বেরাচ্ছে। নিঃশব্দতা। শুধু পাখীর শিষ্ আর জলের মধ্যবর্তী পোষা হাঁসদের সাঁতার কাটার শব্দ শোনা যাচ্ছে। গাছপালার ফাঁক দিয়ে দূরবর্তী কুঁড়ে ঘরগুলোকে দেখা যাচ্ছে আর মাঝে মাঝে অদৃশ্য কোন বালকের কণ্ঠনিঃসৃত ডাক ভেসে আসছে। জল, লতাপাতা, ঘাস আর মাটির একটা মৃদু সুবাস পেয়ে প্রহরীর চেতনা স্নিগ্ধ হয়ে উঠল।

হঠাৎ যেন স্বপ্নের মত মনে পড়ল তার। পুকুরের জল থেকে তার মনে পড়ল যে কোথায় যেন একটা নদী আছে যার নাম রূপসী। সেই নদীর ধারে, একটা মনিমাণিকা-খচিত কক্ষে যেন অসংখ্য সুন্দর পুতুলেরা থাকে এবং তারা গান গায়, নাচে, আনন্দ-সায়রে দিনরাত অবগাহন করে। সে, সেও যেন সেখানে ছিল আর তার হাতে ছিল একটা তলোয়ার। কোথায় গেল সেটা? তারপরে হঠাৎ একদিন ঝড় উঠল, কি যেন হল। অসীম শূন্যতার মধ্যে সে ব্রহ্মাণ্ডের ক্রমবিবর্তনের পরিচয় পেল, জানতে পারল মানব-সভ্যতার কথা। তারপর—তারপর—

আর কিছু ভাবতে পারল না প্রহরী। অন্যমনস্কভাবে একটা ছোট্ট মাটির ঢেলা কুড়িয়ে নিয়ে সে জলে ফেলল। টুপ্ করে একটা শব্দ হল। বৃত্তাকারে একটা তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়ল পানাভরা পুকুরটার বুকে।

চমৎকার। প্রহরী জলের ওপর ঝুঁকে পড়ল। প্রতিবিম্ব। ও কে? হাত নাড়ল প্রহরী, মাথা নাড়ল। প্রতিবিম্বও অনুরূপভাবে হাত নাড়ল, মাথা নাড়ল। ওঃ, এ যে সে!

"আমি!" মুগ্ধ প্রহরী উচ্চারণ করল, "আ-মি!"

নিজের চেহারা দেখল প্রহরী। একটি বলিষ্ঠ ও শ্যামবর্ণ যুবক, সুদর্শন দেহকান্তি তার। পরণে একটা ছোট্ট রঙীন ধুতি আর গায়ে একটা চাদর। বয়স কত? দেখলে পঁচিশ মনে হয় কিন্তু সত্যি কি তাই? মাথা নাড়ল প্রহরী। না, তার বয়স লক্ষাধিক বছর। মানুষের বয়স যে তারও বয়স। সে প্রকৃতির সর্বকনিষ্ঠ সন্তান হলেও তার বয়স কম নয়।

আলোড়িত জলের দিকে তাকিয়ে নিজের প্রতিবিম্ব দেখতে দেখতে সে অনুভব করল যে সে কথা বলতে পারে, মানুষের যা কিছু জানবার তা জানে। নিজেকে দেখে তার মনে বিস্ময় জন্মাল, গর্বে ও আনন্দে ভরে উঠল তার হৃদয়।

ধীরে ধীরে সে আবার উচ্চারণ করল, "আমি—আমি—আ-মি!"

নিজের কণ্ঠস্বর শুনে সে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল, হেসে উঠল, তারপরে আবার উচ্চারণ করল, "আমি মানুষ"—

কয়েক মুহূর্ত কেটে গেল।

হঠাৎ সে শরীরের মধ্যে একটা বিচিত্র অনুভূতির সন্ধান পেল। শরীরটা কেমন যেন দুর্বল বোধ হচ্ছে, সূচীমুখ একটা যন্ত্রণা যেন নাভিকুণ্ডলের তলা থেকে বিদ্যুৎ-তরঙ্গের মত চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। চেতনার মধ্যে ধ্বনিত হচ্ছে একটা অতি-ক্ষীণ ঝিল্লীরব। কি ব্যাপার? এর অর্থ কি? প্রহরী খুব ভাবল এবং তার মস্তিষ্কের কোটরে তার বুদ্ধি তাকে জবাব দিল। ক্ষুধা। প্রহরীর খাদ্য চাই। জীব-জগতের নিয়ম। আলো, জল ও বাতাসের মত প্রতিদিন তার খাদ্য চাই। তার জঠরের মধ্যে যে যন্ত্রণা এখন

সাপের মত ফণা তুলেছে তাকে নিবৃত্ত ও শান্ত করতে হলে তাকে খাদ্য-সংগ্রহ করতে হবে। প্রহরী বুঝল সব। কিন্তু কি করে পাওয়া যাবে এই খাদ্য? প্রহরী মানুষদের বিষয়ে যা জানবার তা জানে। সে জানে যে মানুষ গ্রাম ও সহর তৈরী করেছে, নানা জিনিষ আবিষ্কার করেছে। কিন্তু মানুষের বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থা, সেখানকার খুঁটিনাটি সমাজরীতি, চালচলন ও আদব-কায়দা সে জানে না। সে জানেনা যে কি করলে খাদ্য পাওয়া যায়।

প্রহরী চারদিকে তাকাল। আশে পাশে কোন ফলের গাছ কিংবা বাগান কি নেই? না, নেই। দূরে গ্রামবাসীদের পর্ণকুটীর, টিনের আটচালা। তার পিছনে ধূ ধূ ক্ষেত; দূর দিগন্তে গাছপালার ঘনশ্যাম রেখা, তারও পেছনে ধূসর পাহাড়ের সারি। কিন্তু খাদ্যের সন্ধান কোথায়?

বোধ হয় অন্য কোনো মানুষ তাকে সব কিছু বলে দিতে পারবে। প্রহরী ভাবল। কিন্তু সে তো কাউকে চেনে না! কেউ তো তাকে চেনে না! মুহূর্তে নিঃসঙ্গতা-বোধ ঘনিয়ে উঠল তার মনে, পাহাড়ের মত বিরাট, প্রান্তরের মত বিশাল একাকীত্ব-বোধ তার হৃদয়কে ভারাক্রান্ত করে তুলল। সে একা। সম্পূর্ণ একা।

হঠাৎ প্রহরী চমকে উঠল। পেছনে শুকনো পাতার খচমচ শব্দ। সে ফিরে তাকাল। একজন বুড়ো চাষী এগিয়ে আসছে তার দিকে। তার হাতে ছোট একটা লাঠি।

প্রহরীর বুকে আশা জাগল। এই একজন মানুষ! তার রক্তের মধ্যে একটা গভীর উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ল। তারই মত আর একজন মানুষ! রক্ত, মাংস, অস্থি, মজ্জা, মন, বুদ্ধি-সমন্বিত আর একজন মানুষ। তারই আর একটি মূর্তি। তার একান্ত আপনজন। সে তাকাল বুড়োর দিকে, তাকিয়ে হাসল।

বুড়ো থমকে দাঁড়াল, সবিস্ময়ে তাকাল প্রহরীর দিকে। তার চোখে অপরিচয়ের প্রশ্ন।

প্রহরী আবার হাসল।

বুড়ো এবার তার কাছে এগিয়ে এল, প্রশ্ন করল, "তুমি-কে?"

প্রহরী বুড়োর দিকে তাকাল। ষাটের ওপর বয়স হবে তার, মাথার চুল আর ভুরুজোড়া সাদা হয়ে গেছে, তবু তার দেহের কাঠামো শক্ত, পেশল। আর তার চোখে মুখে মাটির মত মোলায়েম মমতা।

"তুমি কে?" বুড়ো আবার প্রশ্ন করল।

প্রহরী মৃদু হেসে জবাব দিল, "আমি—আমি একজন মানুষ।"

বুড়োর মুখেও হাসি ছড়িয়ে পড়ল, সে ঘাসের ওপর বসে পড়ল, লাঠিটাকে এক পাশে রেখে দিয়ে বলল, "তুমি তো ভারী অদ্ভুত ভাই। আরে মানুষ তো সবাই, আমি তো তা জানতে চাইছি না। আমি তোমার নাম জানতে চাইছি—"

"নাম!" প্রহরী ভাবতে বসল। তাইতো, তার তো একটা নাম চাই। নাম? কিন্তু পেটের মধ্যে সেই বিচিত্র যন্ত্রণা যেন বাড়ছে! ক্ষুধা।

প্রহরী বলল, "নাম? আমার নাম অরিন্দম—"

"অরিন্দম কি?"

"মানে?"

"মানে তোমার উপাধি?"

"তার মানে?"

বুড়ো একটু বিরক্ত হল, "আহা তুমি বামুন, কায়েত, বদ্যি, তিলি, না কি?"

"আমি কোনটাই না।"

বুড়ো এবার চটল, "তা কি হয়? একটা কিছু তো বটেই। নামের শেষে একটা কিছু নিশ্চয়ই থাকা উচিত—"

প্রহরী হাসল। সে এখন সব বুঝতে পারছে। জাতিভেদ নামে এক বিচিত্র শব্দ সৃষ্টি করেছে মানুষেরা। পরস্পরকে পরস্পরেরা ছোট বড় শ্রেণীতে ভাগ করেছে। গুণগত শ্রেণীভেদের প্রথাটা আজ জন্মগত হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিচিত্র। সেই সাপটা ফণা দোলাচ্ছে। তীক্ষ্ণ নখের আঘাতে তার চেতনাকে ক্ষতবিক্ষত করেছে একটা পশু। ক্ষুধা।

প্রহরী মাথা নাড়ল, বলল, "ব্যাপার কি জানো ঠাকুরদা? আমি ঐ পূবদিকের পাহাড়ের ওপারের দেশ থেকে এসেছি আর আসতে আসতে আমার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে, আমি সব ভুলে গেয়েছি।"

বুড়োর চোখে সহানুভূতি দেখা দিল, "ওঃ, ওঃ—তা কোথায় যাবে তুমি?"

"জানি না। কোথায় যাব বলত?"

"তুমি কি করতে চাও?"

"বাঁচতে চাই।"

"তোমার সঙ্গে কি পয়সা আছে?"

"না।"

"টাকা পয়সা না থাকলে বাঁচবে কি করে ভাই?"

টাকা পয়সা! প্রহরী কথাটা পুরো বুঝল না। সে শুধু এইটুকু বুঝল যে টাকাপয়সা একরকমের জিনিষ যা থাকলে বাঁচা যায়। সে চুপ করেই রইল।

বুড়ো বলে চলল, "আমাদের গাঁয়ে তো তেমন কোনো কাজ নেই, ফসল কাটা হয়ে গেছে কোন কালে। তা এক কাজ করনা কেন?"
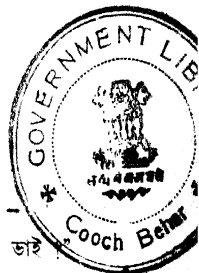
"কি ?"

"তুমি আজবনগরে যাও।"

"আজবনগর !"

"হ্যাঁ, এ দেশের রাজধানী, দক্ষিণের ঐ পাহাড়ের ওপারে, গৌরী নদীর ধারে সেই সহর—মস্তবড় সহর—আজবনগর"—

"সেখানে গেলে কি করে বাঁচা যাবে ?"

"কাজ করবে। কত লোক সেখানে, কত দপ্তর, কত কল-কারখানা ! আমাদের দেশের, মানে বিচিত্রপুরের কোটি কোটি লোক থাকে সেখানে, বিদেশের জাহাজ আসে সমুদ্র পার হয়ে, গৌরী নদীর স্রোত ঠেলে। সেখানে কাজের অভাব কি ? কাজ করবে, পয়সা পাবে, খাবে দাবে ফুর্তি করবে।"

প্রহরী হাসল, "তাহলে সেখানে তোমরা যাওনা কেন ?"

বুড়ো মাথা নাড়ল, "আজবনগরে সবার জায়গা হবে কেন ? আমরা এখানেই থাকব—আমাদের এখানে অনেক কাজ,"—

"কি কাজ ?"

"আমরা ফসল ফলাই—আমরা চাষী"—

"বটে !"

"হ্যাঁ, আমরা আজবনগরের মানুষদের মুখে অন্ন জোগাই।"

"তাহলে তোমরা তো খুব ভালো লোক—খুব খাতির পাও সবার কাছে ?"

বুড়ো বিষন্ন হেসে ঘাড় নাড়ল, বলল, "একটুও না, এ দেশে সবাই খাতির পায় না। যারা দেশকে শাসন করে শুধু তারাই খাতির পায়। আর তারা থাকে আজবনগরে"—

প্রহরী উৎসাহিত হয়ে বলল, "ঠিক, আমি আজবনগরে যাব, তা কতদূরে ঠাকুর্দা ?"

"সে অনেক দূর। দক্ষিণের ঐ পাহাড় পেরোতে হবে

তোমাকে, তারপর অনেক হেঁটে যখন গৌরী নদীর ধারে পৌঁছুবে তখন নদীর ওপারে আজবনগরকে দেখতে পাবে।"

"ওঃ—

"তা তোমার গিয়ে—আজ দুপুরে রওনা দিলে কাল দুপুর নাগাদ গিয়ে পৌঁছোবে সেখানে।"

"ওঃ—আচ্ছা—"

প্রহরী অন্যমনস্কভাবে বলল কথাটা। পেটের মধ্যে একটা সুতীব্র যন্ত্রণা। একটা প্রাগৈতিহাসিক জন্তুর নখরাঘাত। ক্ষুধা।

বুড়ো তার দিকে একবার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকাল, তারপর বলল, "এক কাজ কর ভাই"—

"কি ?"

"মুখ দেখে মনে হচ্ছে যে তুমি কিছু খাওনি। তা আমার ওখানে চল, চাট্টি ডাল ভাত খেয়ে জিরিয়ে নিয়ে তারপর রওনা দিও"—

প্রহরী বুড়োর দিকে তাকাল। হ্যাঁ, এই একজন সত্যিকারের মানুষ। মানুষ হওয়ার গর্বে তার বুক ফুলে উঠল। আশ্চর্য! লোকটা ঠিক বুঝেছে তার কষ্টের কথা!

"তাহলে ওঠ—চল আমার সঙ্গে"—বুড়ো বলল।

প্রহরী উঠে দাঁড়াল, কৃতজ্ঞ হয়ে বলল, "চল।"

বেলা কত হবে ? চলতে চলতে আকাশের দিকে তাকাল প্রহরী। দিনের তৃতীয় প্রহর সুরু হল বলে। আকাশে সূর্যদেব। সূর্যই তার আদর্শ। অন্ধকারকে দূর করতে হবে। বুড়োকে অনুসরণ করল প্রহরী। পায়ের নীচে মখমলের মত নরম ঘাস। এখানে ওখানে গরু মোষ। কুকুর, হাঁস, পাখী। আম জাম আর তাল গাছ। ঝিরঝিরে হাওয়ায় বাজে পাতার ঝঙ্কার। আর বিচিত্র একটা ছবির মত দূরের অনাবৃত ধূ ধূ ক্ষেত, দিগন্তের শ্যামরেখা, আকাশলগ্ন ধূসর পাহাড়ের সারি। ছোট ছোট কুঁড়েঘর। এখানে ওখানে গোবর আর খড়

ছড়ানো। তার গন্ধ। আরো এগোল দুজনে। এবার মানুষ দেখা গেল—নগ্ন ছেলে মেয়ে, যুবক যুবতী, বুড়ো বুড়ী। তাদের চোখে কৌতূহল। প্রহরীর দু'চোখে আরো কৌতূহল। এতগুলো মানুষ! তাদের চোখে হরিণের দৃষ্টি, মুখে সরলতা। কিন্তু তারা এমন নগ্নপ্রায় কেন? প্রহরীর মনে খটকা জাগল। কিন্তু কোন কিছুই বলল না সে, শুধু নিঃশব্দে বুড়োকে অনুসরণ করেই চলল।

বুড়োর বাড়ীতে গিয়ে থামল প্রহরী। বুড়ো তাকে বসাল, যত্ন করল। বাড়ীতে তার বৌ, জোয়ান ছেলে, মেয়ে, পুত্রবধূ আর নাতিনাতনী আছে। একপাশে গোয়াল, সেখানে একটা হাড়-জিরজিরে গরু ও একটা বলদ আছে। বুড়ো তাকে খেতে বসাল। তার বাড়ীর সবাই কাছে এসে খাওয়া দেখতে লাগল। প্রহরীর ভারী ভালো লাগল। তার বুকের ভেতরে যেন একটা সমুদ্র উদ্বেলিত হয়ে উঠল। বুড়োর বৌ, তার মেয়ে এবং তার পুত্রবধূর দিকে তাকিয়ে তার মনটা কেমন যেন প্রশান্ত হয়ে উঠল এবং সে এই পরিবারের প্রত্যেকের সঙ্গে যেন গভীরভাবে জড়িত হয়ে পড়তে চাইল। মানুষে মানুষে সম্বন্ধটা তো ভারী সুন্দর, ভারী আশ্চর্য!

ডাল আর ভাত দেখল সে তার সামনে। এক পাশে চাট্টি শাক। এই খাবারই খেতে হয়! ডাল ভাত মেখে সে এক গ্রাস মুখে দিল। মুহূর্তে একটা অনির্বচনীয় শিহরণ ছড়িয়ে পড়ল তার শিরায় শিরায়। যেন একটা অদৃশ্য সাঙ্কেতিক বার্তা চারদিকে ছড়িয়ে গেল—খাদ্য! খাদ্য! প্রহরী গ্রাসের পর গ্রাস তুলতে লাগল, চিবিয়ে তা গিলতে লাগল। আর জঠরদেশের সেই সূচীমুখ যন্ত্রণাটা যেন ক্রমেই ভোঁতা হয়ে মিলিয়ে গেল, সেই অদৃশ্য সাপের ফণাটা যেন গুটিয়ে এল, সেই প্রাগৈতিহাসিক জন্তুটা যেন হঠাৎ মরে গেল। পেটটা ভারী হয়ে উঠল, সেখানে যে অগ্নিকুণ্ডটা দাউ দাউ করে জ্বলছিল তা যেন হঠাৎ নিভে গেল। প্রহরীর চোখে তৃপ্তির গাঢ় ছায়া ঘনাল এবং সেই ছায়া

ভেদ করে ঘন বাষ্প বেরিয়ে এল। কি আশ্চর্য্য ক্ষমতাশালী এই ক্ষুধা! আর তার কাছে মানুষ কত অসহায়!

খাওয়া শেষ হল। প্রহরী বিশ্রাম করল। পরিবারের ছেলেমেয়েরা তার সঙ্গে নানা কথা বলল। প্রহরী সব কথার জবাব দিতে পারল না, দু'একটা কথা বলে সে তাদের কথাই শুনতে লাগল। সময় কেটে চলল।

খানিক বাদে বুড়ো বলল, "ও ভাই অরিন্দম, এবার ওঠ"—

প্রহরী চমকে উঠল।

"এ্যাঁ?"

"এবার আজবনগরের দিকে রওনা হও, সন্ধ্যে হওয়ার আগে পাহাড়টা পার না হতে পারলে তো মুস্কিলে পড়বে"—

"ওঃ—আচ্ছা"—

প্রহরী উঠে দাঁড়াল। কিন্তু কি হবে গিয়ে? এই শান্ত গ্রাম, এই সব ভালো মানুষদের ছেড়ে গিয়ে কি লাভ হবে? মায়া। প্রহরী সবার দিকে তাকাল।

হঠাৎ মিলিয়ে-যাওয়া স্বপ্নের মত তার মনে পড়ল। রূপসী নদীর ধারে, পুতুলদের অপরূপ রাজ্য। আর সেখানে যেন তার হাতে একটা তলোয়ার ছিল। হঠাৎ সে মানুষ হয়েছে। কিন্তু সেই তলোয়ারটা যেন এখনো অদৃশ্য হয়ে আছে তার হাতে। তাকে সংগ্রাম করতে হবে। মানুষের পৃথিবী থেকে সমস্ত অশুভ ও পশু-শক্তিকে দূর করতে হবে। তার অনেক কাজ। প্রহরী কেঁপে উঠল। মায়া। তার এখানে থাকলে চলবেনা। সেই সব শত্রুদের তাকে খুঁজে বের করতে হবে। তার অ-নে-ক কাজ।

প্রহরী পা বাড়াল।

বুড়ো বলল, "তাহলে এসো অরিন্দম। আবার যদি এপথ দিয়ে ফেরো তাহলে আমাদের সঙ্গে দেখা করো।"

প্রহরী মাথা নেড়ে চলতে সুরু করল।

চলতে চলতে সে মনে মনে মাথা নাড়ল। হ্যাঁ, তার নাম অরিন্দম। অরিকে দমন করে যে সেই অরিন্দম। হ্যাঁ, সে শত্রুদের ধ্বংস করবে।

দক্ষিণ দিকে, যেখানে আকাশের গা ঘেঁষে ধোঁয়াটে রেখার আকারে এক সারি পাহাড়ের আভাস, সেদিকে এগিয়ে চলল অরিন্দম। মধ্যগগন থেকে সূর্যদেব তখন পশ্চিমে হেলে পড়েছেন। দিনের তৃতীয় প্রহর শেষ হল বলে। বহুদূরে, রূপোর পাতের মত ঝকঝকে সেই রূপসী নদীর ধারে, মণিময় সেই আশ্চর্য কক্ষে এখন পুতুলেরা কি করছে? সেই সুকণ্ঠ গায়ক পুতুলটি এখন কোন রাগিণীর আলাপ করছে?

•

এগিয়ে চল। নিজেকে নিজেই আদেশ করে অরিন্দম, পরিচালিত করে। সামনের দিকে এগিয়ে চল। পায়ের নীচে তৃণাবৃত মাটি, উঁচুনীচু শূন্য মাঠ, ছোট ছোট খাড়ি পার হয়ে এগিয়ে চলল অরিন্দম। মাঝে মাঝে কয়েকটা আম, তাল আর বাবলা গাছ, কিছু ঝোপঝাড়, বড় বড় বুনো ঘাসের জটলা দেখা যায়। দেখা যায় নানা পাখী, শালিক, ময়না, চড়ুই, ফিঙে। এখানে ওখানে কাক ডাকে, ঘুঘু ডাকে। আকাশের বুকে উড়ন্ত চিলেরা ডাকে। দিগন্ত-বিস্তৃত অসমতল প্রান্তরে যেন স্বপ্নের জাল। তার ওপর খাঁ খাঁ রোদ। নিঃশব্দে দুপুর কাটে। ধনুকের মত বাঁকা আকাশের বুক বেয়ে সূর্যদেব পশ্চিমে ঢলে পড়েন, তাঁর আলো ক্রমশঃ সোনার মত রং ধরে। নিস্তব্ধতা। হাওয়া বয়, পাখী ডাকে; তবু নিস্তব্ধতা। প্রকৃতি নিঃশব্দে আত্ম-ঘোষণা করে। আশেপাশে কেউ কোথাও নেই। অরিন্দমের একা বোধ হয়। ভারী একা। আবার কখন সে মানুষের মুখ দেখতে পাবে? কখন?

বেলা পড়ে আসে। কিন্তু পাহাড় তো এখন দূরে। বোঝা যায়নি, হাঁটতে পারছে না অরিন্দম। ক্লান্তিতে ভেঙ্গে আসছে তাঁরই কি শরীর। অথচ থামবার সময় নেই। আর কোথায়ই বা থামবে? না, পাহাড় পার হয়ে তবেই সে থামবে। অরিন্দম এগিয়ে চলল।

ক্রমে বিকেল হল, বিকেলও শেষ হল। নীড়-প্রত্যাশী পাখীরা ডানার আঘাতে বায়ুস্তরকে মথিত ও সচকিত করে মাথার ওপর দিয়ে চলে গেল। তাতানো সোনার মত লাল্চে ও বড় হয়ে সূর্যদেব পশ্চিম দিগন্তকে স্পর্শ করলেন। আকাশে ভাসমান মেঘের টুক্রোগুলোর হঠাৎ বহুরূপীর মত বর্ণান্তর ঘটতে লাগল। সন্ধ্যে হল। একটা পাহাড়ের চূড়োকে একটা প্রজ্জ্বলিত আগ্নেয়গিরির মুখের মত ঘোর লাল করে সূর্যদেব অস্তে গেলেন। পৃথিবীর বুকে ছায়া ঘনাল, . আকাশের বুকে রাত্রিলোভী বাদুড়েরা এবার চলাচল সুরু করল, পূরু একটা সোনার হাঁসুলীর মত বঙ্কিম চন্দ্রদেবকে দেখা গেল পূর্বাচলে। নিস্তব্ধতা রাতের স্পর্শে ঘনীভূত হল। বাতাসে যেন বেদনার স্রোত বয়ে এল। বড় একা মনে হতে লাগল। এমনি সময়ে পাহাড়ের কাছে গিয়ে পৌছোল অরিন্দম।

ক্লান্তি, গভীর ক্লান্তি। তবু থামল না অরিন্দম। পাহাড়ের গা বেয়ে সে ওপরে উঠতে লাগল। শালগাছের অরণ্য, জানা অজানা আরো কতরকমের বন্য গাছ। গায়ে গা লাগিয়ে তারা প্রাচীরের মত দুর্ভেদ্য হয়ে আছে। তার ভেতর দিয়ে পথ করে এগোল সে। রাত বাড়তে লাগল। চন্দ্রদেব আকাশের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে লাগলেন। অসংখ্য নক্ষত্র-খচিত নীলাকাশ। তাতে রাতের প্র[illegible]ী কালপুরুষ। ছায়াপথের জ্যোতির্ময় রেখাটা যেন কোন সুদূর রহস্যলোকের যাত্রা-পথ। অত্যুজ্জ্বল জ্যোৎস্নালোকে, পাহাড়ের নীচেকার পৃথিবীকে মনে হল অপরূপ—যেন মন্ত্রমুগ্ধ কোন রূপসী। জঙ্গলের ভেতর দিয়ে চলা যায় না। রীতিমত কষ্ট হয়, তবু এগিয়ে চলল অরিন্দম। কাঁটায় গা ছড়ে গেল তার,

প্রহরী মাথা খেয়ে পা কেটে গেল, ঘামে গা ভিজে গেল। আর চলতে চ্ভতর আবার সুরু হল সেই সূচীমুখ যন্ত্রণাটা। ক্ষুধা। কিন্তু অরিন্দমের নেই। সে ওপরে উঠতেই লাগল। গাছপালার ঘন পত্রাবরণ ভেদ করে ছেঁড়া ছেঁড়া আলোর টুকরো পড়েছে পাহাড়ের গায়ে, তাতেই পথ ঠাহর করে এগোতে হল। আর ঠিক সেই সময়েই শোনা গেল নানা অরণ্যচর শ্বাপদের চীৎকার ও গর্জন। শেয়াল, নেকড়ে, বাঘ। কিন্তু ভয় পেল না অরিন্দম। কালো বাঘের মত সেও নির্ভয়ে এগিয়ে চলল। আশে পাশে অগ্নিদেহ অসংখ্য জোনাকী জ্বলছিল, তাদেরি মত ক্ষণে ক্ষণে তার দু'চোখের তারা জ্বলতে লাগল। ক্রমে মাঝরাত হল। অরিন্দম একটা পাহাড়ের চূড়োয় পৌছোল। তখন তার শীত করতে লাগল, চাদরটা ভালো করে গায়ে জড়াল সে, সেখান থেকে চারদিকে তাকাল। আকাশ থেকে যেন একটা শক্তির প্রবাহ সারা পৃথিবীর ওপর ছড়িয়ে পড়ছে। রাতের অবকাশে যেন নানা ইন্দ্রজাল ঘটছে চারদিকে। হঠাৎ তার নিজেকে খুব শক্তিমান মনে হল, অমিত তেজে অপরাজেয় মনে হল। সে আকাশের দিকে তাকিয়ে হাসল। আমি মানুষ, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র এক কীট, প্রকৃতির কাছে এক নগণ্য জীব—তবু আমি কম নই। পৃথিবীর বুকে যেমন আমি তেমনি আমার বুকেও পৃথিবী আছে। না, আমার মধ্যেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আছে। আর যে দেবতাদের মানুষেরা পূজো করে তারা তো আমার মধ্যেই জন্মলাভ করে। হে আকাশ, হে পৃথিবী, হে নক্ষত্রলোক, শোন—আমি একজন দেবতা।

•

পাহাড়ের চূড়ো থেকে অরিন্দম দেখেছিল যে, পাহাড়ের ওপিঠে, দূরে, একটা রূপোর হারের মত নদী দেখা যাচ্ছে আর সেই নদীর

ওপারে নক্ষত্রের মত জ্বলছে অনেক আলো। বাকী সব বোঝা যায়নি, কুয়াসাচ্ছন্ন মনে হয়েছিল। কিসের আলো ওগুলো? ওই নদীই কি গৌরী নদী? আর ঐ আলোগুলি কি আজবনগরেই জ্বলছে? কে জানে।

পাহাড় পার হয়ে নীচে নেমে এল অরিন্দম। তখন রাতের তৃতীয় প্রহর শেষ হয়ে এসেছে। সোজা সামনের দিকেই চলল অরিন্দম। না, সে থামবে না, কারণ থামলে সে আর চলতে পারবে না।

অনেক, অনেকক্ষণ পর সে হঠাৎ থামল। সামনেই এক নদী। চন্দ্রদেব অস্তে গেছেন তখন, অন্ধকারে অবলুপ্ত হয়ে গেছে সব কিছু। তবু অরিন্দম বুঝল যে সামনে একটা নদী। ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাকের সঙ্গে সে নদীর কল্লোলধ্বনি শুনতে পেল। নদীর ওপারে তখন আর সেই নক্ষত্রের মত আলোগুলো বেশী জ্বলছে না, শুধু একটা দুটোকে ক্ষীণ-দ্যুতি মৃত নক্ষত্রের মত টিম টিম করে জ্বলতে দেখা গেল। অরিন্দম বসল। অন্ধকারে সব কিছু দেখা না গেলেও সে এটা বুঝল যে, তার গন্তব্যস্থলে না পৌছোলেও তাকে আপাততঃ এখানে থামতে হবে। কারণ সামনেই নদী।

যেখানে অরিন্দম বসল, সেখানে ঘাস ছিল। রাতের শিশিরে ভিজে উঠেছে সেই ঘাস, তার ভিজে স্পর্শটা যেন শরীরকে ঠাণ্ডা করে দিল। নদীর বুক থেকে আসছে একটা বাতাসের ঢেউ, নদীর নিঃশ্বাসের মত। শরীর জুড়িয়ে গেল, ঘাসের ওপর টান হয়ে শুয়ে পড়ল সে। আঃ। আঃ। সমস্ত চেতনা যেন আরামে মর্মরিত হয়ে উঠল, চোখের পাতা দুটো বুজে এল, পুঞ্জ পুঞ্জ অন্ধকার এসে চোখের সামনে একাকার হয়ে গেল, খাড়া পাড়ের নীচেকার নদীটা যেন ফুলে ফেঁপে সমুদ্র হয়ে তাকে গ্রাস করল আর তাকে টেনে নিয়ে চলল—তলে, অতলে, অতল তলে—। ঘুম এল।

হঠাৎ গায়ের ওপর একটা উত্তাপ অনুভব করল অরিন্দম। গুম্ গুম্ একটা শব্দ আর অজস্র ভ্রমরের গুঞ্জরণের মত একটা আওয়াজ শুনতে পেল সে। শুনতে পেল নদীর কল্লোলধ্বনি আর মানুষের পদশব্দ। সে চোখ মেলল। অপূর্ব দৃশ্য!

সামনে নদী। তরঙ্গসঙ্কুল, গভীর। নদীর ওপরে অসংখ্য নৌকো, ডিঙ্গি। বিদেশাগত ছোট বড় সংখ্যাতীত জাহাজ। দূরে, নদীর এপার থেকে ওপার পর্যন্ত একটা গগনস্পর্শী বিরাট সেতু। নিরেট ইস্পাতে তৈরী। জলের ওপর দিয়ে তা ধনুকের মত বেঁকে গেছে, জলকে স্পর্শও করেনি। আশ্চর্য। আর তার ওপর দিয়ে চলেছে মানুষের পর মানুষ, অগণন মানুষ। সব মানুষ মিলিয়ে একটা জীবন্ত স্রোতের মত মনে হল অরিন্দমের কাছে। বিস্ময়কর অনুভূতিতে তার দেহ কেঁপে উঠল। এত মানুষ! মানুষের জীবনে এখানে কি প্রচণ্ড গতিবেগ! প্রত্যেকে যেন ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে চাইছে। আর ছুটছে বহুরকমের গাড়ী। কতকগুলো গরু মোষ টানছে, কতকগুলো ঘোড়া টানছে, কতকগুলো আপনা থেকে চলছে, কতকগুলো শূন্যে বিলম্বিত তারের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে চলছে। আর সব মিলিয়ে এক বিচিত্র যান্ত্রিক শব্দ উঠছে। ওদের নাম কি? অরিন্দম ভেবেও বুঝতে পারল না।

আর নদীর ওপারে, নদীর ধার ঘেঁষে ঘেঁষে দক্ষিণে ও বামে বিস্তীর্ণ হয়ে আছে একটা বিরাট সহর। দু'চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়েও সব কিছু বুঝতে পারেনা অরিন্দম। শুধু সে দেখে যে বিরাট অট্টালিকার পর অট্টালিকা মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে আকাশের দিকে। অট্টালিকার পর অট্টালিকা। তাদের সুউচ্চ শীর্ষদেশ যেন আকাশকে তর্জনী-সংকেতে শাসাচ্ছে। কারখানার লম্বা লম্বা ধূম্রনলের ভেতর থেকে গলগল করে বেরোচ্ছে পুঞ্জ পুঞ্জ ঘন কালো ধোঁয়া। দেহ-লোলুপ দস্যুদের মত যেন তা আকাশের কুমারী-শুচিতাকে হরণ করতে চায়। পাহাড়ের

মত শক্ত, উঁচু সব অট্টালিকা আর সৌধাবলী যেন আকাশের গায়ে মিশে গেছে। আর সেই সব অট্টালিকার অরণ্য থেকে সূর্যদেব উদিত হচ্ছেন। রাতের প্রাচীর ভেঙ্গে, মহানগরের কারাগার থেকে যেন বিজয়ী বীর বেরিয়ে এসেছে। তার স্বর্ণ-শোণিত-লিপ্ত সর্বাঙ্গে অন্ধকার-জয়ী আশীর্বাদ। তার সেই অপরূপ কনকচ্ছটায় সব কিছু জ্যোতির্ময় হয়ে উঠল। আকাশ, অট্টালিকাশ্রেণী, নদীর জল, মানুষ, জাহাজ, সেতু—সব কিছুই যেন স্বর্ণমণ্ডিত রূপৈশ্বর্যে মহিমময় হয়ে-উঠল। অরিন্দম উঠে দাঁড়াল, সূর্যের দিকে তাকাল, মনে মনে বলল, সূর্যদেব তোমার জয় হোক। যেখানেই যাই তুমি আছ, যেখানেই যাই তুমি যেন থাক, হৃদয় ও পৃথিবীর অন্ধকারকে যেন তুমি চিরকাল অপহরণ কর।

দৃঢ় পদক্ষেপে সে সেতুর দিকে এগিয়ে চলল।

ক্রমেই সেতুটা নিকটবর্তী হল, অতিকায় হয়ে উঠল। কিছুদূর গিয়ে একটা রাস্তা পেল সে। মসৃণ কালো পাথরের মত বাঁধান রাস্তা। তার ওপর অজস্র নরনারী আর যানবাহন চলেছে। নদীর এপারে, অরিন্দমের ডানদিকেও মানুষের বসতি, বড় বড় বাড়ী। সেদিক থেকেই লোকেরা আসছে, সেতু পার হয়ে ওপারে যাচ্ছে। ওপারেই কি আজবনগর? গভীর কৌতূহল জন্মাল তার মনে।

চলমান জনতার দ্রুত পদক্ষেপের সঙ্গে সে পা মেশাল। আশ্চর্য একটা গতিবেগ তার দেহে সঞ্চারিত হল। চলতে চলতে পার্শ্ববর্তী একজন লোককে সে প্রশ্ন করল, "একটা কথা বলবে?"

লোকটা তার দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টি মেলে তাকাল।

"ওপারের ওই সহর—ওর নাম কি?"

লোকটা হাসল, বলল, "তুমি বিদেশী?"

অরিন্দম মাথা নাড়ল।

লোকটা বলল, "হ্যাঁ, সেতুর ওপারে ওই যে সহর, ওর নাম

আজবনগর। পৃথিবীর একটা সেরা সহর, সেরা বন্দর, ঐশ্বর্যে ও সমারোহে যেন সাক্ষাৎ ইন্দ্রপুরী।"

ইন্দ্রপুরী! হাঁ, তাই বটে। অরিন্দম মাথা নাড়ল। তাই বটে। অন্যমনস্কভাবে সে সেতুর দিকে এগিয়ে চলল। শব্দ, কোলাহল আর গতিবেগ তাকে আচ্ছন্ন করে তুলল। আর এরি মধ্যে জঠরের সেই সূচীমুখ যন্ত্রণাটা আবার অনুভূত হল। আবার ক্ষুধা তাকে অসহায় করে ফেলেছে।

হঠাৎ সে কর্কশকণ্ঠের ডাক শুনল, তাকাল। হাঁ, তাকেই ডাকছে দু'জন লোক। তাদের মাথায় রক্তবর্ণ উষ্ণীষ। বোধ হয় তারা নগর-রক্ষী। তার পার্শ্ববর্তী লোকটি বলল, "তোমাকে রক্ষীরা ডাকছে হে—শুনছ?"

সেই দুজন রক্ষী তাদের ভারী জুতোর শব্দ তুলে এগিয়ে এল কাছে, বলল, "এই—তুমি দাঁড়াও"—

অরিন্দম দাঁড়াল, দেখল যে সেতু-মুখে প্রতিটি লোককে থামিয়ে পরীক্ষা করছে নগর-রক্ষীরা। ব্যাপার কি?

সঙ্গে সঙ্গেই সে আবার সচকিত হয়ে উঠল, একজন রক্ষী তাকে প্রশ্ন করল, "তুমি কে?"

অরিন্দম রক্ষীদের দিকে তাকাল, বলল, "আমি একজন মানুষ, আমার নাম অরিন্দম—"

সেই রক্ষীটি মুখ বিকৃত করে কর্কশকণ্ঠে বলে উঠল, "ইয়াকি হচ্ছে, না, ইয়াকি হচ্ছে? বেশী চেঁচিয়ে কথা বললে তোমাকে শালা হাজতে নিয়ে যাব।"

অরিন্দম অবাক হল। রক্ষীটি এমন অভদ্র ব্যবহার করছে কেন? কি হয়েছে? আবার সে রক্ষীদের দিকে তাকাল। হৃষ্টপুষ্ট শিকারী জন্তুর মত তাদের মুখগুলো কঠিন, চোখগুলো তীক্ষ্ণ।

দ্বিতীয় রক্ষীটি বোধ হয় ব্যাপারটা বুঝেছিল, সে এক পা এগিয়ে

প্রশ্ন করল, "আরে ভাই, আসল কথা বল—তুমি কি এই প্রথম সহরে আসছ? দেখে তো তাই মনে হচ্ছে।"

অরিন্দম মাথা নেড়ে জবাব দিল, "হ্যাঁ—তাই।"

"তাহলে এখানে এস"—

অরিন্দম তাদের অনুসরণ করল।

সেতুমুখের এক পাশে চার পাঁচজন লোক চেয়ারে বসে ছিল, তাদের সামনে টেবিল। টেবিলের ওপর দোয়াত কলম আর কাগজ-পত্তর। সেখানে গিয়ে দাঁড়াল অরিন্দম। আরো লোক সেখানে ছিল, বোধ হয় তারই মত নবাগত, আগন্তুক।

তিন চার জন লোকের পেছনে অরিন্দমকে দাঁড়াতে নির্দেশ দিল একজন রক্ষী, বলল, "লাইনে দাঁড়াও, তোমার পরিচয়-পত্র নাও—"

কয়েক মিনিট বাদে অরিন্দম গিয়ে টেবিলের সামনে দাঁড়াল।

উপবিষ্ট লোকদের মধ্যে একজন তার দিকে প্রখর দৃষ্টি মেলে তাকাল, প্রশ্ন করল, "তোমার নাম?"

"অরিন্দম।"

"কি জন্যে সহরে এসেছ?"

"কাজ করতে।"

"আগে কোথায় ছিলে?"

"ঐ—ঐ পাহাড়ের ওপরে"—হাত নেড়ে উত্তর দিকে দেখাল অরিন্দম।

লোকটি মাথা নাড়ল, "হুঁ—গাঁয়ে ছিলে"

"হ্যাঁ"—

"গাঁয়ের নাম?"

অগ্রবর্তী লোকদের উত্তরগুলো শুনেছিল অরিন্দম তাই সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল, "চন্দনপুর"—

লোকটি একটা মোটা কাগজে কি সব যেন লিখল, তারপর মুখ

তুলে অরিন্দমের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, "এবার আসল কথা বল দেখি"—

"কি ?"

"দেশে তোমার জমি-জায়গা আছে ?"

"না।"

"সঙ্গে টাকাকড়ি নিশ্চয়ই আছে ? কত ?"

অরিন্দম মাথা নাড়ল, "কিছু না।"

"কিছু না ? তাও কি হয় ? কত আছে দেখাও।"

"একটা পয়সাও নেই আমার কাছে—একটাও না।"

"হুঁ—দাঁড়াও"—

সেই লোকটি একটা হলদে রংয়ের কাগজে কি সব লিখে একটা সই করল তারপর তা এগিয়ে দিল অরিন্দমের দিকে, বলল, "এই নাও তোমার পরিচয়-পত্র, সহরের শেষ দিকে, নীচুপাড়ায় থাকবে তুমি—যাও"—

অরিন্দম প্রশ্ন করল, "এই কাগজ দিয়ে কি করব ?"

"কি করবে ? আরে এইটেইতো তোমার প্রাণ হল—এইটে দেখালে পরে রোজকার খাবার পাবে, পরবার কাপড় পাবে। এটা না থাকলে মরবে।"

"ওঃ—আচ্ছা"—

অরিন্দম সরে এল একপাশে। বটে ! এই একটুকরো কাগজের এত ক্ষমতা ! আশ্চর্য, আজবনগরের সবই আজব !

"এ্যাই—শুনছ ?"

সেই দু'জন রক্ষী কাছে এগিয়ে এল।

"কি বলছেন ?"

"একজন রক্ষী মৃদু হেসে বলল, "কিছু খসাও বাবা ?"

"কি খসাব ?" অরিন্দম অবাক হয়ে প্রশ্ন করল। কথাটা সে বুঝতে পারল না।

রক্ষীটি আরো কাছে এল, বুড়ো আঙুল নাচিয়ে মৃদুকণ্ঠে বলল, "কিছু পয়সা বের কর। আমরা তোমাকে তাড়িয়ে দিইনি বলেই তো পরিচয়-পত্র পেলে, সহরে ঢুকতে পারলে। তার জন্য কিছু সেলামী চাই। জানোনা, রক্ষকেরাই যে ভক্ষক"—

"কিন্তু আমার কাছে তো ক নেই ভাই।"

"আর মজাক্ করিসনা শালা, বের কর।"

"সত্যি কিছু নেই—সত্যি"—

রক্ষীটি সক্রোধে তার ডান হাতটা চেপে ধরল, চোখ পাকিয়ে বলল, "ফের মিছে কথা! দেখি শালা, তোর ট্যাঁক দেখি"—বলেই সে অরিন্দমের কোমরে হাত দয়ে পয়সা খুঁজতে লাগল। কিন্তু পেল না কিছুই। আক্রোশে, হতাশায় তার কঠিন মুখমণ্ডল কঠিনতর হয়ে উঠল।

অরিন্দমকে হিড় হিড় করে এক পাশে টেনে নিয়ে গেল রক্ষীটি, তার হাতে প্রচণ্ড একটা ঝাঁকুনী দিয়ে সে বলল, "শালা একেবারে ভিখমাংগা ফকির। কিন্তু তোমাকে এমনি এমনি ছেড়ে দিচ্ছি না বাছাধন—নে, পা টিপে দে খানিকক্ষণ"—

দ্বিতীয় রক্ষীটি হা হা করে হেসে উঠল, "আরে ইয়ার, তুই তো কম নস্ দেখছি। হটা—ছেড়ে দে ব্যাটাকে"—

প্রথম রক্ষী মাথা নাড়ল, "না, তা হবে না। নে শালা, পা টেপ এবার"—

অরিন্দম প্রথম রক্ষীর দিকে তাকাল। জন্তুর মত নির্বোধ, নিষ্করুণ ও কঠিন লোকটার চোখমুখ। হিংস্র ও লোভী জন্তুর মত। পা টিপতে বলছে। পদসেবা! কেন? রক্ষী বলে, শক্তির অধিকারী বলে। কিন্তু কেন? হঠাৎ তার মনে পড়ল। সেও একজন প্রহরী ছিল। আনন্দের রাজ্যে তার হাতে ছিল একটা ক্ষুরধার অসি। এখনো যেন তা অদৃশ্য হয়ে আছে তার হাতে। সুতরাং সে কম কিসে?

মাথা নীচু করবে কেন সে? লোভ ও হিংস্রতার কাছে সে অবনত হবে? না।

সে মাথা সোজা করে দৃঢ়কণ্ঠে বলল, "না।"

"না!"

"না"—

"তবেরে শালা, শুয়ারকা বাচ্চা"—

শক্ত ও ভারী জুতো-পরা পা দিয়ে প্রথম রক্ষী অরিন্দমকে একটা লাথি মারল, বলল, "তোর হিম্মৎ তো কম নয়, মুখের ওপর না বললি!"

ইস্পাতের মত কঠিন হয়ে উঠল অরিন্দমের দেহ, একবার তা দুলে উঠল। সে তাকাল। কি করবে সে? শোধ নেবে? কিন্তু তাতে ফল কি হবে? তার ব্রতপালনে বাধা পড়বে। না, তাকে সহ্য করতে হবে।

কিছুই করল না সে, শুধু মুখ ফুটে বলল, "সাবধান—আমাকে আর অপমান কোরনা"—

"কি! কি বললি?" রক্ষীটি আবার পা তুলল।

কিন্তু বাধা পেল সে। দ্বিতীয় রক্ষী এসে তার হাত ধরে আকর্ষণ করল, "ছেড়েদে ইয়ার, সময় নষ্ট করে লাভ কি? এই উল্লুকটাকে না মেরে চল ততক্ষণে আরো দু'একটা লোককে পাকড়াও করিগে"—

প্রথম রক্ষী থামল, একবার কটমট করে অরিন্দমের দিকে তাকিয়ে বলল, "আচ্ছা চল্"—

ভারী জুতোর শব্দ তুলে তারা এগিয়ে গেল।

অরিন্দম হাসল। তার সংগ্রাম আরম্ভ হয়েছে।

সেতু পার হয়ে সাবধানে, সন্তর্পনে এগিয়ে গেল অরিন্দম। জনাকীর্ণ রাজপথ। বিদ্যুদ্বেগে গাড়ীগুলো ছুটছে। জনতার মাঝখানে চলতে চলতে একটা উত্তেজনা বোধ হয়। মনে হয় যেন উত্তাল সমুদ্রের একটা তরঙ্গমুখে সে ভেসে চলেছে।

কোলাহল। কত রকমের নরনারী!

"চলতে চলতে পার্শ্ববর্তী লোকদের সে প্রশ্ন করে। আপনা থেকে চলছে যে গাড়ীগুলো, তাদের নাম কি? লোকেরা হাসে, তবু বুঝিয়ে দেয়। বাষ্পযান—এগুলো বাষ্পর দ্বারা চলে, বিদ্যুৎ-যান বিদ্যুতের সাহায্যে চলে। রাস্তার আলোক-স্তম্ভগুলোও বিদ্যুতের সাহায্যে এক মুহূর্তে জ্বলে ওঠে। ইচ্ছেমত। আশ্চর্য! অরিন্দম অবাক হয়ে যায়। মানুষের কত শক্তি! প্রাকৃতিক জগতের দৈত্যদানবেরা মানুষের কাছে বশ্যতা স্বীকার করেছে, তাদের সেবা করছে! বটে! তার বুক ফুলে ওঠে, বড় বড় পা ফেলে সে বাঁধানো, মসৃণ পথ পার হতে থাকে, সামনের দিকে এগিয়ে চলে, চলতে চলতে বিস্ময়-বিমুগ্ধ দৃষ্টি মেলে সে চারদিকে তাকায়।

ছোট বড় কত অট্টালিকা। ত্রিকোণ, চতুষ্কোণ, গোলাকার। একতলা, দোতলা, পাঁচতলা। ছোট ছোট পাহাড়ের মত গায়ে গা লাগিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ইট, কাঠ, লোহা, চুণ, সুড়কী দিয়ে মানুষ ইমারত গড়েছে। প্রত্যেকটিই দর্শনযোগ্য। আর কত দোকানপাট। খাদ্য, বস্ত্র, ফল, তরকারী, খুঁটিনাটি অজস্র জিনিষের দোকান। সেখানেও মানুষের ভীড়।

বহুরকমের মানুষ। একজনের সঙ্গে আর একজনের যেমন চেহারার মিল নেই তেমনি তাদের বেশভূষারও মিল নেই। একজন হয়ত রেশমী জামা কাপড় পরে আছে, আর একজন হয়ত ছেঁড়া ও ময়লা একটা ধুতি পরে আছে। কেন? ব্যাপারটা বুঝতে পারে না অরিন্দম। সন্তর্পণে, কৌতুহলী দৃষ্টি মেলে সে শুধু এগিয়েই চলে।

ক্রমে বেলা বাড়ে, রাজপথের জনতা বাড়ে, সূর্যালোকের উত্তাপ-বৃদ্ধি হয়। বিরাট সহর আজবনগরটা অরিন্দমের কাছে একান্ত অপরিচিত। কিন্তু তার ওপরকার আকাশটা তার বহু-পরিচিত। আকাশের রং এখানে গাঢ় নয়, ধূসর নীল। তবু পরিচিত। সেই আকাশের দিকে

তাকিয়ে তার আর একটা পৃথিবীর কথা মনে পড়ে। সেখানে সে ... আনন্দময় জীবনের স্রোত ঝরণার মত ক্ষিপ্র বেগে বয়ে যায়। সেই জীবন-স্রোতের শব্দ শোনা যায় বাণার ঝঙ্কারে, বেহালার তারে, পাখোয়াজের ধ্বনিতে, কিন্নর-কণ্ঠ সুগায়কের আলাপে। জীবন লোভী মানুষের কর্মব্যস্ততায় এখন আজবনগর চঞ্চল হয়ে উঠেছে, কিন্তু রূপসী নদীর ধারে, সেই আনন্দলোভী পুতুলেরা হয়ত এখন আশাবরীর আলাপ শুনছে আর শালবনে পাতা ঝরছে, মাটির গর্ভ থেকে তৃণাঙ্কুর মাথা তুলছে, কোকিল ডাকছে—

অথচ পুতুলদের সেই আনন্দের পৃথিবী তো সে দূরে, বহুদূরে ফেলে এসেছে। এটা মানুষের পৃথিবী। এখানেও গানে চলছে। সে গানে সুর নেই, মিষ্টতা নেই। যন্ত্রের শব্দ, পদধ্বনি, কোলাহল, হাসি, যানবাহনের আওয়াজ—সব মিলে একটা গম্ভীর গুম্ গুম্ শব্দ—মানুষের সংগ্রামশীল, কঠিন জীবনের ঘোষণা। মন্দ কি? অরিন্দম হাসল। এগিয়ে চল।

কিন্তু কোথায় যাচ্ছে সে? তাকে তো নীচুপাড়ায় যেতে হবে। কোথায় তা? কতদূরে? এদিকে সে পরিশ্রান্ত বোধ করছে, জঠরদেশের সেই যন্ত্রণাটা ক্রমশঃ তীব্র ও অসহ্য হয়ে উঠছে। সে থামল, চারদিকে তাকাল।

তার ডানদিকে একটা খাবারের দোকান। কাঁচের আলমারীতে নানারকমের মিষ্টি থাক থাক করে সাজানো আছে। দেখে অরিন্দমের খেতে ইচ্ছে হল। দোকানের বাইরে, রাস্তার এক পাশে দাঁড়িয়ে একজন বয়স্ক লোক কি যেন চিবোচ্ছিল। বেশ শক্ত জিনিষ, কড়মড় শব্দ হচ্ছিল তা চিবোতে। দেখে অবাক হল অরিন্দম, লোকটির কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

লোকটি তাকাল।

"নীচুপাড়া কোথায় বলতে পারো ভাই?"

লোকটি মাথা নাড়ল, "পারি"—

"কোথায় ?"

"সহরের পেছনদিকে"—

"ও:—আচ্ছা"—

"তুমি বুঝি সহরে নতুন এসেছ ?"

"হ্যাঁ"—

"তাহলে তো চিনতে পারবে না, গাড়ী চড়ে যাও"—

"চড়তে দেবে আমাকে ?"

"হ্যাঁ, পয়সা থাকলেই দেবে।"

পয়সা! কোথায় তা? দোকানে কত সুন্দর সুন্দর খাবার। অথচ কি খাচ্ছে লোকটা ?

"আপনি কি খাচ্ছেন ?"

"ছোলাভাজা।"

"কেন, এই দোকানের খাবার খাচ্ছেন না কেন ?"

"পয়সা নেই।"

অরিন্দমের মুখের ওপর যেন একটা ঘুষি পড়ল। সব কিছুতেই পয়সা! তাহলে হলদে রঙের ঐ কাগজটা দিয়ে কি হবে ?

সে কাগজটা বের করে লোকটিকে দেখাল, প্রশ্ন করল, "কেন, এই কাগজ দেখালে খাবার দেবে না ?"

লোকটি হেসে উঠল, "তুমি পাগল নাকি, এ্যাঁ? আরে ঐ পরিচয়-পত্র থাকলে তুমি জিনিষ কিনতে পারবে বটে কিন্তু কিনতে গেলে পরিচয়-পত্র ছাড়াও আর একটা জিনিষ লাগবে—তা পয়সা। পরিচয়-পত্র বাঁচবার অধিকার দিল বটে কিন্তু বাঁচতে হলে টাকাপয়সা খরচ করতে হবে। আর আসল কথা কি জান? টাকাকড়ি হাজার হাজার থাকলে তোমার পরিচয়-পত্রেরও দরকার নেই, এমনিতেই সব কিছু পাবে"—

"বা:, তাহলে এই পরিচয়-পত্র দিল কেন ?"

"ওগুলো গরীবদের জন্য।"

"গরীব মানে? যাদের পয়সাকড়ি নে ?"

"হ্যাঁ, যাদের টাকাপয়সা থাকে না, থাকলেও কম থাকে।"

"আর যাদের পয়সাকড়ি থাকে তারা কি?"

"তারা বড়লোক, ধনী।"

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল অরিন্দম। আজবনগরের কাণ্ডকারখানা ভারি জটিল মনে হচ্ছে। না, উপায় নেই। ক্ষুধার যন্ত্রণা তাকে মুখ বুজেই সহ্য করতে হবে। তাকে এখন একটা কাজ সংগ্রহ করতে হবে। কাজ করলে পয়সা পাবে সে। সেই পয়সা দিয়ে খাবার কিনবে, ক্ষুধাকে দমন করবে। তারপর তার আসল কাজ।

সেই লোকটি রাস্তার ধারে, একটা কল থেকে দু'তিন আঁজলা জল খেল, কাপড়ের খুঁট দিয়ে মুখটা মুছতে মুছতে হঠাৎ প্রশ্ন করল, "তুমি নীচুপাড়ায় যাবে বলছিলে না? যাবে তো চল, আমিও সেখানে যাচ্ছি"—

ব্যগ্রকণ্ঠে অরিন্দম বলল, "চলুন, চলুন"—

দু'জনে চলতে সুরু করল। চলতে চলতে তারা পরস্পরের পরিচয় সংগ্রহ করল। অরিন্দম নিজের বিষয়ে ভাসা ভাসা জবাব দিল। আর লোকটি বলল যে তার নাম বলরাম। বলরামের বয়স প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি। লম্বা, তামাটে রংয়ের চেহারা তার। পাটকলের কারখানায় সে কাজ করে। রাতের বেলাতে কাজ ছিল, এখন বাড়ী ফিরছে। বাড়ীতে তার বৌ আছে, একটি জোয়ান ছেলে ও দুটি সোমত্ত মেয়ে আছে। বড় মেয়ে বিধবা। তাছাড়াও আরো চারটি ছোট ছেলেমেয়ে আছে বলরামের। ছেলের নাম মুকুন্দ, কোন একটা মোটর কোম্পানীতে কাজ করে সে, পায় চল্লিশ টাকা। আর বলরাম পায় বিয়াল্লিশ টাকা। তাতে সংসার চলে না। ছেলেটা মদ খায়, দিনরাত ঘুরে বেড়ায়। আজকাল বাজার চড়া, জিনিষ-পত্র আগুন, বাঁচা কঠিন। অল্প আয়ে সংসার চলেনা-চলেনা করেও চলে। নিভন্ত পিদ্দিমের মত। ভবিষ্যৎ অন্ধকার। মৃত্যুর মত।

বলরাম বুড়ো হতে চলেছে, অকালে। কিন্তু অনেকেই আছে, অনেক জোয়ান ছেলেরা—তারা মাঝে মাঝে জটলা পাকায় আর কি যেন আলোচনা করে। তাদের দুচোখে মাঝে মাঝে আগুন জ্বলে। ভবিষ্যতের অন্ধকারকে তারা নাকি দূর করবে, তারা নাকি একদিন—পাগল, ছেলেগুলো সবাই পাগল।

বলরাম একটা বিড়ি ধরিয়ে হাসতে লাগল, বলল, "বেহদ্দ পাগল ছেলেগুলো—একেবারে হতভাগা"—

অরিন্দম হাসল না, শুধু বিড়বিড় করে বলল, "তবু, ঐ সব পাগলদের সঙ্গেই আমি ভাব করব, আলাপ করব"—

তারা এগিয়ে চলল। বড় বড় অট্টালিকার মাঝখান দিয়ে এদিকে ওদিকে অসংখ্য রাস্তা গেছে। রাস্তাগুলো থেকে বেরিয়েছে সংখ্যাতীত গলি। ঝকঝকে তকতকে পথঘাট। চকচকে গাড়ী। সুসজ্জিত পুরুষেরা। দেখতে ভালো লাগে। আর সুসজ্জিতা মেয়েরা। রসালো ফলের মত মুখ, খঞ্জনপাখীর মত চোখ, মেঘের মত চুল, ধনুকের মত ঠোঁট, উন্নত বুক আর সুগঠিত অঙ্গরেখা। বুকের মধ্যে একটা অনাস্বাদিত পুলক, অপরূপ কামনা। দেহের বিচিত্র ধর্ম। ক্ষুধা। শব্দ, কোলাহল, ব্যস্ত ত্রস্ত মানুষেরা। এ রাস্তা সে রাস্তা করে এগোল তারা। পথ যেন ফুরোবেই না। একটা রাস্তা শেষ হতেই আর একটা রাস্তা পাড়ি দিতে হয়। একটা অট্টালিকার পর আর একটা অট্টালিকা। ইট, কাঠ, লোহার রসায়ণ। আজবনগর।

কিন্তু ক্রমেই পথ শেষ হয়ে আসে। সরহটা ঢালু হয়ে নীচের দিকে নেমে যায়। অট্টালিকার ঘন সারি হঠাৎ পাৎলা হয়ে আসে, মাঝে মাঝে ফাঁকা জায়গা দেখা যায়। তারপরে বেশ খানিকটা ফাঁক, ছোটখাটো একটা খেলার মাঠের মত। আর তার ওপারে, বিস্তৃত এলাকা জুড়ে, যতদূর দৃষ্টি যায় ততদূর শুধু ছোট বড় আটচালা, টালি, টিন আর শণের ছাউনী দেওয়া বাড়ী। মাটির দেয়াল, কাঠের দেয়াল, হোগলা পাতার

দেয়াল। মাঝে মাঝে ভাঙ্গা ভাঙ্গা দোতলা তেতলা পাকা বাড়ী। অপরিচ্ছন্ন, মলিন, ময়লা। আর এই বিরাট ও বিস্তৃত এলাকার শেষ সীমান্তে, পুবদিকে, দিগন্তের কোল ঘেঁষে রয়েছে বড় বড় কারখানা। তাদের গগনস্পর্শী ধূম্রনলগুলো সারিবদ্ধ লৌহদানবের মত নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তাদের পুঞ্জ পুঞ্জ কালো নিঃশ্বাস আকাশকে বিষাক্ত করার চেষ্টা করছে।

বলরাম বলল, "দেখতে পাচ্ছ?"

অরিন্দম মুখ ফেরাল, "কি?"

"ওইটেই নীচুপাড়া।"

"বটে!"

অরিন্দম তাকাল। নীচুপাড়ার চেহারাটা তো ভালো নয়। নোংরা, কুৎসিৎ, হতশ্রী। পেছনে ফেলে-আসা বড় বড় অট্টালিকা ও দোকান-পাটের সৌন্দর্য এখানে নেই। এখানকার সব কিছুই যেন শূন্যতায় মোড়া, অন্ধকারে ঢাকা, কুৎসিৎ।

"তাহলে ওদিকটার নাম কি—ঐ সব ভালো ভালো রাস্তা আর বড় বড় বাড়ী যেখানে?"

বলরাম হাসল, "ওটা হচ্ছে উঁচুপাড়া—আমরা বলি বাবুপাড়া"—

"হুঁ"—

"আরো একটি পাড়া আছে দক্ষিণে, সেটা ছোট—সেখানে যারা থাকে তারা বড়লোকও নয়, গরীবও নয়। সেই পাড়ার নাম মাঝারিপাড়া"—

অরিন্দম অবাক হল, সে প্রশ্ন করল, "আচ্ছা, এই তিন পাড়ার মানুষে প্রভেদ কি?"

বলরাম জবাব দিল, "শুনে বোঝা যায় না, দেখে বুঝতে হয়। নাও, এবার তুমি নীচুপাড়ায় গিয়ে বাড়ী খোঁজগে—আমি যাই, পরে হয়ত দেখা হবে।"

"হ্যাঁ, হয়ত—"

বলরাম বাঁদিকে চলে গেল। অরিন্দম কি ভেবে ডানদিকে চলল। একটা থাকার জায়গা চাই তার। প্রথমে তা ঠিক করে সে কাজ ও আহারের খোঁজে বেরোবে। ঢালু জমির ওপর দিয়ে সে নীচুপাড়া গিয়ে পৌছুল, তারপর ঘুরতে আরম্ভ করল। এখানে রাস্তা মসৃণ নয়, পাথর আর খোয়া-উঠা, পিচ-ভাঙ্গা। উঁচুপাড়ার মত নালি নর্দমা ভূগর্ভে নয়, মাটির ওপরে। উঁচুপাড়ার ময়লা ও নোংরা জল সব এখানকার খোলা নালি দিয়ে চলে যায়। পচা জল, তার ওপরে মরা মাছি অনবরত ভনভন করে। রাস্তার ত্থ'পাশে টিনের আবর্জনা-পাত্রে স্তূপীকৃত আবর্জনা, তা উপচে রাস্তায় পড়েছে। কলাপাতা, এঁটোকাটা, ছাই, তরকারীর খোসা, নোংরা ন্যাকড়া, ভাঙ্গা কাঁচ, ফুটো টিন আর মরা ইঁদুর। দুর্গন্ধ। মাটির দেওয়াল, নোনাধরা ইটের দেওয়াল। সরু সরু আঁকাবাঁকা গলি। অসংখ্য। গরুর গাড়ী, রিক্সা। আশ্চর্য! মানুষ জন্তুর মত মানুষকে বয়ে বেড়ায়! চায়ের দোকান। পবিত্র ভোজনালয়। শিখাধারী মানুষ, দাড়িওয়ালা লুঙ্গি-পরিহিত মানুষ, দাড়িওয়ালা পাগড়ি-পরিহিত মানুষ। বিড়ির ধোঁয়া, চায়ের ধোঁয়া। জিভে জল আসে। ক্ষুধা। লোহালক্কড়ের দোকান। কামার, ছুতোর, মিস্ত্রী। বাক্স তৈরীর কারখানা, দর্জির দোকান। মাংস-বিক্রেতা। এঁকেবেঁকে গেছে রাস্তা। সর্বত্র মাথা নাড়ে লোকে। না, থাকার জায়গা নেই। কোথাও বলে, আছে, দশটাকা ভাড়া, থাকা খাওয়া চল্লিশ টাকা। কিন্তু কোথায় টাকা? বিসর্পিল পথ। তবুও চলতে হবে। পান বিড়ির দোকান। বড় বাড়ী। অগুনতি মানুষের ভীড়। কারখানা, দোকান, অফিস-যাত্রী মানুষ। নানা দৃশ্য। বুড়ো বুড়ীরা বারান্দায় চটের ওপর বসে আছে। একটা ছোট ছেলে ন্যাংটো হয়ে বসে রুটি চিবোচ্ছে। একজন লোক গোগ্রাসে ভাত গিলছে। ক্ষুধা অসহ্য হয়ে উঠেছে। মুড়ির দোকান। জলের কল। তাকে কেন্দ্র করে মেয়েরা ভিড় করেছে। ঝগড়া চলছে।

"আর কত জল নিবি লা?"

"কেন না? এই এক কল্মীই তো নিচ্ছ"—

"মর ছুঁড়ী, মিথ্যে কথা বলিসনি। বলি ঘরে কি পুকুর কাটছিস নাকি না?"

"দেখ শৈলী, মুখ সামলে কথা বলিস—নইলে তোর মাথার চুল টেনে তোকে নেড়ী করে দেব"—

"তবেরে হারামজাদী, দে দেখি"—

অরিন্দম এগিয়ে চলল। মেয়েদের ঝগড়া বড় বিয়োগান্ত ব্যাপার। একটা বটগাছ, তার নীচে কতকগুলো লোক। তারা তাস খেলছে আর ট্যাঁক থেকে পয়সা বের করছে। খেলার শেষে যে জিতছে সে পয়সাগুলো টেনে নিচ্ছে।

"কি খেলা হচ্ছে ভাই?"

"তিন পাত্তি"—

"মানে?"

"মানে জুয়া, বুঝেচ এবার?"

টাকা পয়সার খেলা। লোভ। এগিয়ে চল। একটা বাড়ীতে একজন ষণ্ডাকৃতি লোক তার আট বছরের ছেলেকে মারছে। ছেলেটা তারস্বরে কাঁদছে। মুরগী ডাকছে। একটা রোঁয়া-ওঠা কুকুর আস্তাকুঁড়ের মধ্যে সযত্নে খাবার খুঁজছে। একটা পাঁঠা ছুটেছে একটা ছাগীর পেছনে। একজন রোগামত লোক একটি যুবতীকে মারছে, সেখানে হাস্যমুখ ভীড় জমেছে। কি ব্যাপার? ওদিকে কারখানা থেকে তীব্র বাঁশীর আওয়াজ ভেসে আসে। বেলা বাড়ে। সর্ব্বাঙ্গে ঘাম ঝড়ে। ক্ষুধার জ্বালায় পেটের ভেতরটা কেমন যেন করতে থাকে। আর অনেক ঘুরেও এক কথা—থাকার জায়গা নেই, সহরে ভীড় বেড়েছে। কিংবা থাকতে হলে টাকা লাগবে। না, আর পারা যায় না। অরিন্দম থামল, একটা গাছতলায় গিয়ে বসল। গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে সে চোখ বুজল। মাথার ভেতরে, বন্ধ চোখের সামনে যেন বিদ্যুৎ চমকে যেতে লাগল।

সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ল একটা মৃদু শিহরণ। ক্লান্তি। ক্লান্তিকর ক্ষুধা। সূর্যদেব এখন কোথায়? মাথার ওপরে। মধুমাধব সারঙ্গের মূর্ছনা কি এখানকার বাতাসে নেই?

"ও মশাই, কি হল?"

অরিন্দম চোখ মেলল। বলরাম সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

"কি ব্যাপার? গাছতলায় বসে যে? জায়গা পাওনি কোন?"

"না। পেলেও এখুনি টাকা দিতে হবে—অথচ টাকা নেই।"

"তাহলে? কি করবে?"

"ভাবছি।"

"হুঁ"—

বলরাম অরিন্দমের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল। অরিন্দমের চেহারা থেকে সে তার অন্তরকে জানতে চাইল, তারপরে কি ভেবে নিয়ে বলল, "একটা কাজ করতে পার"—

"কি?"

"আমার বাড়ীতে বাইরে একটা খালি ঘর আছে। ঘরটা একটু ভাঙ্গা—তবু থাকা যেতে পারে। যাবে?"

অরিন্দম হাসল, "আমার যে টাকা নেই?"

"পরে দিও, তার জন্যে এখন আর তোমাকে ভাবতে হবে না।"

অরিন্দম খুশী হল। আজবনগরেও মানুষের মত মানুষ আছে। সে উঠে দাঁড়াল বলল, "চলুন"—

বেশী দূরে নয় বাড়ীটা। একটা স্যাঁতসেঁতে ও অন্ধকার গলির শেষে বাড়ীটা। মেঝে আর দেয়াল বাঁশের ওপর মাটি লেপে তৈরী হয়েছে, দরজা জানালাগুলো কাঠের আর ছাউনিটা টালির। বাইরের ঘরটাতে একজন মানুষ থাকতে পারে, তবে একটা কোণের টালি ভেঙ্গে পড়ায় ভেতরে জল হাওয়া আসে। অব্যবহৃত অবস্থায় বহুদিন পড়ে থাকার দরুণ ধুলোয় অন্ধকার হয়ে আছে ঘরটা, ভিজে ভিজে

একটা গন্ধে ভরে আছে। কবরের গন্ধ। যেন বাড়ীটা—নীচুপাড়ার সমস্ত বাড়ীগুলোই যেন কবরের তলা থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। আর মানুষগুলো সবাই প্রেত। রক্ত ছিল, মাংস ছিল, এখন আর নেই। আবার রক্ত চাই, মাংস চাই, তবে তারা মানুষ হবে। তাতে যদি পুতুলের রঙীন হৃদয় যোগ হয় তবে হবে পরিপূর্ণতা। দূরে, বহুদূরে সেই মনিমাণিক্য খচিত কক্ষ। অনেক কাজ। হাতের তলোয়ার কবে ঝলসাবে ?

বলরাম বলল, "ঘরটা পরিষ্কার না করলে দেখছি থাকা দায় হবে, তাই না ?"

অরিন্দম হাসল, "তা নয়, তবে পরিষ্কার করলে ভাল হয়। ঠিক আছে, আমি সব ঠিক করে নিচ্ছি"—

"না, না, তা কি হয়, আমি আমার মেয়েকে ডাকছি। ললিতা—ওরে অ' ললিতা"—

একটি নারীকণ্ঠ ভেসে এল, "যাই বাবা"—

নারীকণ্ঠ না কোকিলের ডাক !

অরিন্দম তাকাল। দরজার গোড়ায় একটি ষোল সতের বছরের যুবতী এসে দাঁড়াল। যেন কবরে ফুল ফুটলো। যেন জীবন এসে বলল যে মৃত্যুই শেষ নয়।

অরিন্দম দেখল যে ললিতা সুন্দরী। যেন ললিত রাগের ভার্যা। সাধারণ ও মোটা একটা সাড়ী তার পরণে। হাতে কয়েকটা কাঁচের চুড়ী। বেশভূষা ও অলঙ্কার মাত্র এই। কারণ তার বেশী আর দরকার নেই। রূপের মধ্যে খুঁত থাকলেই তো অলঙ্কার দিয়ে তা ঢাকা হয়। ললিতার খুঁত নেই। বিক্ষুব্ধ কালো সমুদ্রের মত তরঙ্গায়িত তার কেশপাশ, অর্দ্ধচন্দ্রের মত ললাটদেশ। উড়ন্ত বাজপাখীর ডানার মত একজোড়া ভুরুর নীচে তার পক্ষ্মভারাবনত কালিন্দী-কালো চোখ। বাঁশীর মত নাক, রক্তিম গাল, প্রবাল-দনূর মত ঠোঁট। কণ্ঠদেশে

দুটো রক্তিম রেখা, যেন পদ্মফুলের পাঁপড়ির ওপরকার লেখা। তন্বী, মৃণালভুজ, পীনোন্নত ঘনস্তন, ক্ষীণকটি, গুরু নিতম্ব, স্তম্ভের মত উরুদেশের রেখা। আর গায়ের রং যেন শিশিরে ধোওয়া আমের মঞ্জরীর মত। অপরূপ ছন্দোময় একটি কবিতা। সব মিলিয়ে একটি নবমল্লিকা ফুল। কিন্তু রূপ শুধু তো অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আর দেহবর্ণ নয়। আরো কিছু ছিল, আরো কিছু। সেই সৌন্দর্যকে বর্ণনা করা যায় না। তাকে শুধু অনুভব করে জানা যায়। তা অদৃশ্য আর অদৃশ্যভাবেই তা এল, নিঃশব্দে তা রক্ত মাংস, অস্থি মজ্জার ভেতরে ছড়িয়ে গেল, সমগ্র চেতনাকে সুরভিত ও পুলকিত করে তুলল এবং অরিন্দম গর্বিত হয়ে উঠল। মানুষের জীবনের এই আশ্চর্য অনুভূতি কী আশ্চর্য ব্যাপার! দেহ থেকে দেহাতীতের অনুভূতি, স্থূল হতে সূক্ষ্মের জন্ম। অপূর্ব্ব।

ললিতা এসে অপরিচিত লোক দেখে একটু বিব্রত বোধ করল, রুদ্ধকণ্ঠে সে তাই বাপকে প্রশ্ন করল: "কি জন্যে ডাকছ বাবা? কি চাই?"

বলরাম বলল, "এই ঘরটা একটু পরিষ্কার করে দে তো মা"—

"কেন বাবা?"

"এখানে এই ছেলেটি থাকবে এখন থেকে—ওর নাম অরিন্দম"।

অরিন্দম দেখল যে ললিতা একবার তার দিকে তাকিয়েই মুখটা ফিরিয়ে নিল, তারপর বলল, "আচ্ছা, আমি সব ঠিক করে দিচ্ছি বাবা—"

ললিতা ভেতরে গেল।

বলরাম বলল, "আমার মেজ মেয়ে। বড় মেয়েও আছে, নাম অমিতা—মাত্র উনিশ বছর বয়েস তার, দু'বছর আগে বিয়ে হয়েছিল, বছর না পেরোতেই হতভাগী বিধবা হয়েছে—"

ললিতা একটা ঝাড়ু নিয়ে ফিরে এল। পেছনে দুটি নগ্ন ছেলেমেয়ে। একটি তিন বছরের মেয়ে, আর একটি পাঁচ বছরের ছেলে। এবং সবার

পেছনে আর একজনকে দেখা গেল, যাকে দেখেই অরিন্দম অনুমান করল যে সে অমিতা।

অমিতা যেন বিদ্যুল্লতা। ললিতার চেয়েও উজ্জ্বল তার গায়ের রং —যেন আগুন। কিন্তু বোনের মত তার দেহরেখা সুস্পষ্ট নয়, একটু মেদসমৃদ্ধ। থান ধুতি পরাতেও তার জ্বালাময়ী রূপের বিকৃতি ঘটেনি বা ঔজ্জ্বল্য কমেনি। অরিন্দম দেখল যে তার দু'চোখে ক্ষুরধার দীপ্তি, প্রখর ও হিংস্র তার চাহনি, যেন সে মানুষের দিকে তাকালেই তার অন্তরদেশ পর্যন্ত দেখতে পায়। আর তার সারাদেহে মদির লাস্য। একটা নির্লজ্জ আমন্ত্রণ। অরিন্দম মুখ ফিরিয়ে নিল, অমিতার দিকে তাকিয়ে থাকা যায় না।

বহুদিনের সঞ্চিত ধূলোতে আলোড়ন জাগল, উড়ন্ত ধূলিকণার চাঞ্চল্যে ঘরটা যেন জীবন্ত হয়ে উঠল। অরিন্দম ও বলরাম গিয়ে বাইরে দাঁড়াল। বাইরে যাবার সময় অরিন্দম আবার দেখতে পেল যে অমিতা তাকে কৌতূহলের সঙ্গে তখনো দেখছে।

হঠাৎ অমিতা মুখটা ফিরিয়ে নিল, ঘরের ভেতর ঢুকে ললিতার হাত থেকে ঝাড়ুটা কেড়ে নিয়ে বলল, "আমি ঝাঁট দিচ্ছি, তুই না হয় জল নিয়ে আয়গে—"

ললিতা থমকে দাঁড়াল, একবার দিদির দিকে একটা বিচিত্র প্রতিবাদের দৃষ্টি নিক্ষেপ করে ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। অরিন্দম দেখল যে ললিতার গমনভঙ্গীতে শান্ত আত্মপ্রত্যয় আছে। যেন সে কোন রাজবংশের মেয়ে।

খানিকবাদেই পরিষ্কার হয়ে গেল। একটা মাদুর এনে মেঝেতে বিছিয়ে দিল ললিতা। নারী-হস্তের কল্যাণস্পর্শে ভাঙ্গা ও নোংরা ঘরটা হঠাৎ যেন বদলে গেল। বিষণ্ণ একটা শুচিতা দেখা দিল সেখানে। অরিন্দম হাসল। মানুষের মধ্যে পুরুষ ও নারী। নারীই শ্রেষ্ঠ। কারণ নারী শুধু সুদর্শনাই নয়, সে জাতশিল্পী, জীবন-শিল্পী।

বলরাম বলল, "এবার? খাওয়া দাওয়াটা—"

অরিন্দম তাড়াতাড়ি বলল, "সে সব হবে, আপনি ভাববেন না—শুধু একটা ছেঁড়া জামা দিন আমাকে"—

অমিতা ও ললিতা তখনও একপাশে দাঁড়িয়ে ছিল।

অমিতা বলল, "চাট্টি ভাত চাপাব নাকি বাবা?"

বলরাম সায় দিল, "নিশ্চয়ই, মা'কে বলগে—"

অরিন্দম মাথা নাড়ল, "না। আপনারা ভাববেন না, আমার বাকী ব্যবস্থা আমি করে নেব। কেন জানেন? যথেষ্ট সাহায্য পেলাম, আরো সাহায্য পেলে আমার আত্ম-প্রত্যয় নষ্ট হবে।"

বলরাম হাসল, "আচ্ছা বাবা, যা ভালো বোঝ তাই কর। আমি তাহলে আসি।"

"আসুন।"

বলরাম চলে গেল। ললিতা একটা পুরোন জামা এনে দিয়ে চলে গেল, বাচ্চারা তাকে অনুসরণ করল। সবার পেছনে গেল অমিতা। ভেতরে যাবার দরজাটা পার হবার সময় সে হঠাৎ একবার ঘুরে দাঁড়াল, অরিন্দমকে এক ঝলক দেখে নিয়েই আবার মুখ ফিরিয়ে ভেতরে চলে গেল। সেই এক ঝলক চাহনির সঙ্গে অতি সূক্ষ্ম একটা হাসির রেখাও দেখা গেল তার ঠোঁটের কোণে। কেন তা অরিন্দম বুঝতে পারল না। ঘরের ভেতরে গিয়ে সে মাদুরের ওপর বসল। ললিতা বিছিয়ে দিয়েছে। ললিতা শান্ত নদী। অমিতা খরস্রোতা। ললিতা সূক্ষ্ম ও অমিতা স্থূল। ললিতা গভীর, অমিতা তা নয়। কে জানে? তার দু'দিকে জীবন। মানুষ হিসেবে নারী-দের বিষয়ে তার একটা মোটামুটি জ্ঞান আছে, কিন্তু তা কতটুকু? ধীরে ধীরে জানতে হবে সব কিছু। নারী প্রকৃতির অংশ। প্রকৃতি দুর্বোধ্য, দুজ্ঞেয়, শক্তিশালী। মানুষ প্রকৃতিকে জয় করে, পুরুষ জয় করে নারীকে। প্রয়োজন। একে একে দুই। আবার দু'য়ে

দু'য়ে এক। আশ্চর্য। মাত্র দু'দিনের জীবনে তার কত কাণ্ড ঘটল! কত মানুষ এল তার জীবনে! এতো সবে সুরু। আরো কত ঘটনা ঘটবে। এখনো তো সংগ্রাম ঘোষণা করেনি সে। কিন্তু আর পারা যাচ্ছে না। ক্ষুধা। টাকা পয়সা? বেরোতে হবে। উঁচুপাড়ায় গিয়ে কাজ খুঁজতে হবে, সেখানেই নাকি তা সহজে পাওয়া যায়। বলরাম তাই বলছিল। নীচুপাড়ায় কাজ নেই। এখানকার সবাই কাজ করে। কাজ করতে হবে। কাজ করলে পয়সা আসবে। তবে খাদ্য। আর বেঁচে না থাকতে পারলে কোন সংগ্রামই করা যাবে না।

অরিন্দম উঠে দাঁড়াল। ক্লান্তি। তবু যেতে হবে। বেঁচে থাকা মানুষের কর্তব্য। আর সংগ্রামের জন্য বেঁচে থাকা একটা পবিত্র কর্তব্য। এগিয়ে চল।

উঁচুপাড়ার জীবন যেন বর্ষার নদীর মত। উদ্দাম, স্রোতসঙ্কুল। মানুষ, জন্তু ও যন্ত্রের সম্মিলিত চীৎকার ও পদধ্বনিতে তার আকাশটা যেন বারংবার কেঁপে ওঠে। আর সেই আকাশকে আলোকিত ও উত্তপ্ত করে, তার বুকে আগুনের আখরে অদৃশ্য ঘোষণা লিখে সূর্যদেব পশ্চিমে চলে পড়েন। তাঁর আলোকে আলোকিত মহানগরকে মনে হয় নির্মম, কঠিন ও উজ্জ্বল। আকাশপথে বিলম্বিত বিদ্যুৎ ও সংবাদবাহী তারগুলো যেন রূপোর সুতোর মত চকচক করে। দ্রুত-বেগে হাজার হাজার বাষ্পযান ছুটোছুটি করে। রাজপথে প্রোথিত লোহার লাইনের ওপর দিয়ে সশব্দে ছুটে চলে বিদ্যুৎ যানগুলি। সূর্যাতপ-তপ্ত লোহার লাইনের সঙ্গে লোহার চাকার সংঘর্ষ হয়—কর্কশ অথচ ছন্দোযুক্ত ধ্বনি ওঠে, উগ্র একটা ধাতব ও পোড়া গন্ধ

ছড়ায় বাতাসে, বিদ্যুতের চকিত কটাক্ষে সূর্যালোক শিহরিত হয়। আর প্রশস্ত রাজপথটাকে যেন উত্তপ্ত দর্পণের মত, মরিচীকাময় মরুভূমির মত নিষ্করুণ মনে হতে থাকে।

অরিন্দম থামল। সামনেই একটি শাসনবিভাগীয় দপ্তরখানা, সেখানে নাকি লোক চাই। রাস্তায় একজন বলেছিল তাকে। দেখা যাক ভেতরে গিয়ে।

ভেতরে একজন লোক তাকে আটকাল।

"কি চাই?"

অরিন্দম বলল, "আ ম কাজের খোঁজে এসেছি।"

"কাজ মানে? চাকরী?"

"হ্যাঁ।"

"দাঁড়াও—হুজুরকে খবর দিই। তোমার নাম?"

অরিন্দম নাম বলল। লোকটি ভেতরের দিকের ছোট ঘরটাতে গিয়ে ঢুকল। কয়েক মুহূর্ত বাদেই লোকটি বেরিয়ে এসে অরিন্দমকে ভেতরে যেতে ইঙ্গিত করল।

অরিন্দম সেই ঘরটার ভেতরে ঢুকল।

ঝকঝকে ঘরটা। মাঝখানে কার্পেট বিছানো, তার ওপরে দামী কাঠের টেবিল ও চেয়ার। টেবিলের ওপর নানা কাগজপত্র সাজানো আছে। টেবিলের ওধারে, দরজার দিকে মুখ করে, মূল্যবান পোষাক-পরিহিত একজন প্রৌঢ় লোক বসে আছে। তার মাথায় টাক, চোখে সোনার চশমা, হাতে দামী ধূম্রবর্তিকা। অরিন্দম দাঁড়াল।

প্রৌঢ় লোকটি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে একবার অরিন্দমের আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করল, তার মোটা মোটা ঠোঁটের কোণে সূক্ষ্ম ও অবজ্ঞাসূচক একটা হাসি খেলে গেল, সে প্রশ্ন করল, "কি চাই তোমার?"

অরিন্দম জবাব দিল "আমার একটা কাজ না হলেই নয়।"

"কতদূর লেখাপড়া শিখেছ তুমি ?"

"মানে ?"

লোকটি ভ্রূকুঞ্চিত করল, কর্কশ কণ্ঠে বলল, "মানে উপাধি—ডিগ্রি ?"

"আমার তা নেই।"

"হুঁ। তুমি দরখাস্ত করেছিলে ?"

"না।"

"তোমার জন্য ওকালতি করার কেউ আছে ? ধর, কোন মন্ত্রী, কোন দেশনেতা কিংবা কোন উচ্চপদস্থ কর্মচারী ?"

"না।"

প্রৌঢ় লোকটি অসহিষ্ণুভাবে মাথা নাড়ল, "না ! তাহলে তুমি এবার আসতে পার, তোমার চাকরী হবে না।"

"হবে না ? আচ্ছা তবে আসি"—

অরিন্দম পা বাড়াল।

প্রৌঢ় লোকটির মুখ হাসিতে ভরে উঠল, বিড় বিড় করে সে আপন মনে বলল, "উন্মাদ, পুরোপুরি উন্মাদ।" হঠাৎ সে থামল, কি ভেবে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ডাকল, "ওহে, শোন শোন"—

অরিন্দম ঘুরে দাঁড়াল।

প্রৌঢ় বলল, "তুমি নিশ্চয়ই আবার চাকরীর চেষ্টা করবে, কেমন ?"

"হ্যা।"

"তাহলে একটা উপদেশ দিচ্ছি তোমায়—মনে রাখলে ফল পাবে।"

"বলুন।"

"চাকরি পেতে হলে কোন বড় লোকের সুপারিশ দরকার—তা নইলে আমার মত উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের খোসামোদ করতে হয়। মানে খুব 'হুজুর' 'হুজুর' করে কথা বলবে, বলবে 'হুজুর,

আমি আপনার একান্ত অনুগত ভৃত্য হুজুর, আমি আপনার দাস, ভিক্ষে বুঝলে ? তাতেও ফল না পেলে পা ধরে লেহন করবে—”

“বুঝেছি।”

অরিন্দম বেরিয়ে এল সেখান থেকে। বাইরে দাঁড়িয়ে সে মনে মনে হাসল। একটা অদ্ভুত জগতে সে এসে হাজির হয়েছে। এখানকার চালচলন সবই বিচিত্র। কিন্তু ‘হুজুর হুজুর’ করতে হবে কেন ? কর্মপ্রার্থীরা কি উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের দাস ? মানুষ কি মানুষের ক্রীতদাস ? প্রৌঢ় লোকটির কথা থেকে তো তাই মনে হচ্ছে। ভাবতে ভাবতে অরিন্দমের মন কঠিন হয়ে উঠল, তার সারা দেহের রক্তস্রোত যেন হঠাৎ উত্তপ্ত হয়ে তার মস্তিষ্কে এসে আশ্রয় নিল। আজবনগরের মানুষেরা কি মানুষকে শ্রদ্ধা করেনা ?

আবার হাঁটতে সুরু করল সে। রৌদ্রালোকিত রাজপথকে ভেদ করে। সারিবদ্ধ সুউচ্চ অট্টালিকাশ্রেণীর পাশ দিয়ে, কর্মব্যস্ত উত্তেজিত জনতার মাঝখান দিয়ে। বাঁধাই কালো পথটা যেন কালো পাথরের মত গরম হয়ে উঠেছে, পায়ের তলা পুড়ে ছাই হতে চায়। ক্লান্তিতে পা ভেঙ্গে আসতে চায়, বসে পড়তে ইচ্ছে করে, ঘামে সর্বাঙ্গ ভিজে ওঠে। তবু চলতে লাগল সে। রাস্তার ডানদিকের সঙ্কীর্ণ পদপথটার ওপর দিয়ে অরিন্দম এগিয়ে চলল। একটা কাজ চাই।

আরো কয়েকটা জায়গায় ঘুরল সে। রাস্তার লোকদের কাছ থেকে খবর সংগ্রহ করে আরো কয়েকটা জায়গায় সন্ধান করল সে। সর্বত্র একই ইতিহাস। না কাজ নেই। এমনিভাবে দুপুর কাটল, বিকেল কাটল, সূর্যদেব পশ্চিমদিকে আরো, আরো ঢলে পড়লেন, দিগন্তের পরপারবর্তী এক অদৃশ্যলোকবাসিনী বিরহিনী কান্তা’র উষ্ণ বক্ষে আশ্রয় গ্রহণ করে নিজের জ্বালা দূর করার কামনায় তিনি রক্তিম-জ্যোতি হয়ে উঠলেন। নির্মম সূর্যদেবের এই স্নিগ্ধ রূপ দেখে

পুলকিত হল, বিকাশোন্মুখ নানা পুষ্পকলিরা এবার নির্ভয়ে ওদের পরাগ-হৃদয় মেলে ধরল আর আকাশের বিবাগী মেঘেরা রঙীন উত্তরীয় উড়িয়ে নিরুদ্দেশের পথে পা বাড়াল।

ক্লান্তি। আর পা চলে না, চোখের সামনে মাঝে মাঝে সব কেঁপে ওঠে, কানের মধ্যে ভোঁভোঁ শব্দ শোনা যায়, দেহের প্রতি গ্রন্থিতে একটা তীব্র বেদনা টনটন করতে থাকে। অরিন্দম থামল, চলতে চলতে রাস্তার পশ্চিম দিকস্থ বিস্তীর্ণ মাঠের ধারে বসে পড়ল। সতেজ ও সবুজ ঘাসের ঘন আস্তরণে ঢাকা মাঠের স্পর্শটা কি রোমাঞ্চকর! বসতেই সারা দেহ জুড়িয়ে গেল, ঘাস ও মাটির গন্ধ-মাখা বাতাস এসে গায়ের ঘাম শুকিয়ে দিল। অরিন্দম চারদিকে তাকাল। ভ্রমণ-বিলাসীদের ভীড়ে রাস্তা জমজমাট, গাড়ীরও ভীড় বেড়েছে, কর্মশ্রান্ত নরনারীরা বাড়ীর দিকে ফিরে চলেছে। অস্ত-গামী সূর্যদেবের রাঙা আলোর মাঝে আসন্ন সন্ধ্যার ছায়া। অট্টালিকা শ্রেণীর গায়ে এবার রহস্যময় গাম্ভীর্যের ছোপ লেগেছে, মনে হচ্ছে যেন ওগুলো পাঁচশো হাজার বছরের পুরোন। তাদের ওপর আকাশ। তার ঘননীল রং এবার কালো হয়ে এসেছে, সূর্যদেব ডুবে যাচ্ছেন, সারিবদ্ধ পাখীর দল শনশন শব্দে উড়ে যাচ্ছে—দূরে, বহুদূরে—

কিন্তু না। অরিন্দম নড়ে উঠল, শুকনো ঠোঁটের ওপর জিভ বুলিয়ে ঢোঁক গিলল। তার মধ্যে একটি শক্তিশালী শত্রুর আবির্ভাব ঘটেছে। ক্ষুধা। আগুনের মত। জঠরদেশ যেন পুড়ে যাচ্ছে, শরীরটাকে হালকা মনে হচ্ছে, দেহসন্ধিগুলো আলগা ঠেকছে, মানুষ, যন্ত্র ও যানবাহনের সম্মিলিত শব্দ যেন মস্তিষ্কে এসে জড় হচ্ছে। কখন খাবে সে? কাজ পেলে? কবে কাজ পাওয়া যাবে? কাল? মাঝখানে সুদীর্ঘ রাত। আজবনগরে তো খাদ্যের অভাব নেই—তবে? ক্ষুধার্তদের জন্য কি কোন বন্দোবস্ত নেই? আলো, বাতাস আর জলের মত কি তা পাওয়া যেতে পারে না?

না, সে কারো কাছে চাইবেনা। মানুষ মানুষের কাছে ভিক্ষে করবে না। অসম্ভব। সে সহ্য করবে। কাল নিশ্চয়ই কাজ পাবে সে। তখন সে খাবে। আঃ। কতটা খাবে সে? এত, না এত? মাত্র এতটুকু? উঁহু—সে প্রচুর খাবে। অরিন্দম মুখ বিকৃত করল। এই জৈবিক বৃত্তিটা মানুষকে অসহায় করে ফেলে, তাকে অগ্রগতির পথে বাধা দেয়। ক্ষুধাকে জয় করতে হবে। সূর্যদেব কোথায় গেলেন? কোন পৃথিবীতে? কতদূরে তা? সে কি দূরে? বহুদূরে?—

বহু-দূ-রে, গৌরী নদীর ওপারে, আকাশের গায়ে গা মিলিয়ে যে সব তরঙ্গায়িত পর্বতশ্রেণী আছে তাদেরও ওপারে, কোথায় যেন সেই বিস্মৃত ও পরিত্যক্ত দেশটা। সেখানে, রূপসী নদীর জল এখন কালচে হয়ে উঠছে, প্রজাপতিরা লতাপাতার অন্তরালে ঝিমোচ্ছে, শালবনের অন্ধকারে নিশাচর জন্তুদের চোখের তারা এখন মণি-মাণিক্যের মত জ্বলছে। আর সেই কক্ষের আলোকিত জগতে এখন হয়ত সেই সুকণ্ঠ গায়ক পুতুলটি শ্রীরাগের আলাপ সুরু করেছে। তার গম্ভীর সুরটা যেন একটা যজ্ঞাগ্নিশিখার মত উর্ধ্বলোকের দিকে যাত্রা করেছে। সেখানে অসীম নীল শূন্যতায় কোটি কোটি নক্ষত্রের আলো। নীল আগুনের মূর্তি। জন্মান্তর, স্বপ্নান্তর। আনন্দের পিপাসা। আর পূর্বাচলের যবনিকা সরিয়ে হয়ত দুগ্ধবর্ণ চন্দ্রদেব এখন রাতের রঙ্গমঞ্চে আত্মপ্রকাশ করেছেন—

কে গায়? অরিন্দম চমকে তাকাল চারদিকে। দশ পনের হাত দূরে একটা মস্ত বড় অশ্বত্থ গাছ, তার গুঁড়িতে হেলান দিয়ে একটা রোগামত লোক গান গাইছে। লোকটার পরনে ছেঁড়া, ময়লা ও মোটা ধুতি, গায়ে একটা কালো রংয়ের ফতুয়া, পাশে একটা তামাটে রংয়ের বড় থলি। চোখ বুজে, গলা ছেড়ে লোকটা গাইছিল। ভারী মিষ্টি সুরটা, বহুদূরবর্তী সেই বিচিত্র দেশের সুকণ্ঠ পুতুলটির শ্রীরাগের

আলাপের মত। কিন্তু একটু বিষণ্ণ। তবু ভারী সুন্দর। সে গাইছিল—দিন কেটে যায়, দিনের পর দিন কেটে যায়, যে দিন চলে যায় তা আর কোনদিনই ফিরে আসে না, লাল রক্ত ক্রমেই জল হয়ে ওঠে, পায়ের নীচেকার ধূলোয় মিশবার জন্য দেহটা উন্মুখ হয়ে তার দিকে ঝুঁকে পড়ে, তবু তোমার দেখা পাওয়া যায় না। হে সুদুর্লভে, হে ছলনাময়ী বহুবল্লভা, তবু তোমার পদধ্বনি আমার বুকের মধ্যে প্রতিধ্বনিত হয় না, তোমাকে আমি পাই না, আমার উন্মুক্ত, তৃষ্ণার্ত বুকের মধ্যে তোমাকে মিশিয়ে নিয়ে আমি দেবতা হতে পারি না।

একি শুধুই গান? অরিন্দমের সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে একটা সূক্ষ্ম বেদনাবোধ মাথা চাড়া দিয়ে উঠল, মনে হল যেন সে একা, যেন সে কাউকে চায়, নিবিড়ভাবে চায়।

সে উঠল, ধীরে ধীরে সেই লোকটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। গান শেষ হল, লোকটা চোখ মেলতেই অরিন্দমকে দেখতে পেল।

অরিন্দম হাসল, বলল, "তুমি তো ভারি সুন্দর গাও!"

লোকটা হাসল, "আমার গাইতে খুব ভাল লাগে।"

অরিন্দম তার পাশে বসল, প্রশ্ন করল, "তোমার গানে বেদনা ছিল—তুমি বিরহ জ্বালায় কষ্ট পাচ্ছ?"

লোকটা হেসে উঠল, "দূর, আমার কেউ নেই?"

"বিয়ে করনি?"

"তুমি বোকা।"

"কেন?"

"আমার চেহারা দেখে বুঝি বুঝতে পারছ না আমি কি চীজ? নিজের পেট চালাতে পারি না তায় আবার বিয়ে? দূর—"

পেট! ক্ষুধা। মুহূর্তে সমস্ত চেতনা যেন নিভন্ত দীপশিখার মত

কেঁপে উঠল, বোবা একটা যন্ত্রণার চাপে দু'হাতে মাঠের ঘাস আঁকড়ে ধরল অরিন্দম। কখন? কখন খেতে পাবে সে? দু'মুঠো ভাত সে কখন মুখে দেবে?

লোকটা বলে চলল, "যা দিনকাল পড়েছে, বেঁচে থাকার কোন পথ খুঁজে পাচ্ছি না। মুচিগিরি করি, সারাদিনে কোনদিন চার আনা, কোনদিন আট আনা পাই। ওতে কি চলে?"

অরিন্দম নিজেকে সামলে নিল, বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে জিজ্ঞেস করল, "তুমি মুচি! কেন? তুমি গান গেয়ে বাঁচতে পার না?"

লোকটা হাসল, "দুনিয়া বড় মজার জায়গা ভাই, এখানে যে যা করে আনন্দ পায় তা করে সে বাঁচতে পারে না। এখানে সাধু চুরি করে বাঁচে, চোর রাজত্ব করে, গাইয়ে লোক ঝাড়ুদার হয় আর অক্ষম লোকেরা পাঁচতলা বাড়ীতে থাকে—"

লোকটা থামল। স্তব্ধতা নেমে এল দু'জনের মধ্যে। অরিন্দম ভাবতে লাগল। লোকটার কথার মধ্যে জ্বালা আছে, দুঃখ আছে। আজবনগরের মানুষেরা তাহলে এই! আচ্ছা দেখা যাক, দেখা যাক।

লোকটা উঠে দাঁড়াল, বলল, "আসি ভাই, আমাদের বসতিটা অনেক দূরে—"

অরিন্দম মাথা নেড়ে প্রশ্ন করল, "তোমার নাম কি ভাই?"

"নাম?" লোকটা হাসল, "আমার নাম দামোদর।"

লোকটা সেই তামাটে রংয়ের থলিটা কাঁধে ফেলে সেখান থেকে চলে গেল, উত্তরদিকের রাস্তায় জনতার মাঝে সে মিলিয়ে গেল। অরিন্দম বসে রইল, সন্ধ্যা পার হয়ে গেল, রাজপথের আলোকস্তম্ভগুলি জ্বলে উঠল, অট্টালিকাশ্রেণীর গায়ে লিখিত নানাবর্ণের বিজ্ঞাপনগুলো জ্বলতে লাগল, বিদ্যুৎ ও বাষ্পযানগুলো তাদের বড় বড় চোখের তীব্র আলো দিয়ে রাজপথকে উজ্জ্বল করে ছুটোছুটি করতে লাগল।

মাঠের বুকে, ঘাসের মাঝে, ঠাণ্ডা অন্ধকারে ঝিঁ ঝিঁ পোকারা কখন যে ডাকতে সুরু করেছে তা অরিন্দম টের পেল না।

দামোদর চলে গেল। অরিন্দম ভাবতে লাগল। আজবনগরের কাণ্ডকারখানা ভারী মজার। এখানে মানুষ সব কিছুই করছে কিন্তু তা মানুষের জন্য নয়। বৈষম্যই এখানকার ধর্ম, পরস্পরের বিষয়ে উদাসীনতাই এখানকার স্বাভাবিক ব্যাপার। আচ্ছা, আরো দেখা যাক। আগে সব কিছু দেখে নেবে সে, তারপরে সে লড়াই সুরু করবে। তার মনে আছে যে তার হাতে একটা তলোয়ার ছিল, এখনো যেন তা অদৃশ্য হয়ে আছে তার হাতে। পৃথিবীতে যে অশুভ পশু-শক্তি আজ মানুষকে মানুষ হতে দিচ্ছে না তাকে সে একদিন ধ্বংস করবেই।

কিন্তু দেহ যেন অবসন্ন হয়ে আসছে। পেটের মধ্যে যেন একটা ক্ষিপ্ত পশু গোঁ গোঁ শব্দে গর্জাচ্ছে। জিভ শুকিয়ে যাচ্ছে, গলাটা খস খস করছে, নিঃশ্বাসটা ভারী হয়ে উঠছে। ক্ষুধার জ্বালা। আজবনগরের এই অপরিচিত পরিবেশে তাকে কে সাহায্য করবে? সেই গ্রামের সেই বুড়োর মত কোন মানুষ কি এখানে নেই যে ক্ষুধার্তকে সস্নেহে খাওয়াবে? না আর পারা যাচ্ছে না, বাড়ী ফেরাই ভাল। রাত কাটুক, আবার কাল কাজের চেষ্টা। কাজ পেলে পরে খাওয়া। মানুষ কত অসহায়! না, আর পারা যাচ্ছে না। পেটের মধ্যে যেন একটা অতিকায় রাক্ষস ধীরে ধীরে মাথা তুলছে, তার লোলুপ রসনা মেলে হিংস্রভাবে কামনা করছে পৃথিবীর সমস্ত খাদ্যকে। ক্ষুধা।

উঁচুপাড়াকে পেছনে ফেলে অরিন্দম এগোল। উঁচুপাড়ার ঘরে ঘরে তখন বিদ্যুতের আলো দিবসালোকের সৃষ্টি করেছে। নক্ষত্র-খচিত আকাশ থেকে প্রবাহিত পুঞ্জ পুঞ্জ ঠাণ্ডা অন্ধকার এসে দিনের দাবদাহকে নির্বাপিত করে ফেলছে। রাজপথের আলো, আলোর প্রচারপত্র, এবং প্রতি গৃহের আলোক-সমারোহ তখন উঁচুপাড়ার মাথার ওপরে একটা

হালকা জ্যোতির্মণ্ডলের সৃষ্টি করেছে। পূর্বাচলে উদিতপ্রশের মতই চন্দ্রদেবকে মনে হচ্ছে ভারী বিবর্ণ, ভারী পাণ্ডুর। রাজপথে নরনারীর স্রোত, সুন্দরী নারীর হাত ধরে চলেছে সুদর্শন পুরুষ। দক্ষিণের হুহু বাতাসে তাদের দেহসৌরভ। গৃহে গৃহে, দোকানে দোকানে চলেছে বেতার-যন্ত্রের গান। বহুদূরের সেই পৃথিবীতে কি এখন নটনারায়ণ রাগের আলাপ সুরু হয়েছে? এগিয়ে চল।

কিন্তু দেহ আর্তনাদ করে মাথা নাড়ে। না, আর পারি না। ক্ষুধা। তবু চল। অরিন্দম টলতে টলতে এগোল। মাঝে মাঝে চোখের সামনেকার সবকিছু যেন দুলে ওঠে, কেঁপে ওঠে, ঝাপসা হয়ে আসে। তবু চলে সে। শেষে একসময়ে নীচুপাড়ার সীমানা সুরু হয়। ছোট ছোট চায়ের দোকানে ভাঙ্গা ভাঙ্গা পেয়ালায় চা-পান করছে মানুষেরা। কোথায় যেন একটা ভাঙ্গা যন্ত্রে, যন্ত্রে-লিখিত মানুষের গান বাজছে। ভারী কর্কশ। টিমটিমে বাষ্পীয় আলোগুলোকে ভৌতিক বলে মনে হয়। ক্লান্ত নরনারীরা ছায়ামূর্তির মত চলাচল করে। হাসি, কথা। ভাঙ্গা ভাঙ্গা, প্রানহীন। আবছা-আলোকিত অন্ধকার গলির রহস্যময় ইশারা। একটা আবর্জনা-পাত্রের পাশে কয়েকটা রোঁয়া-ওঠা কুকুর যেন কি নিয়ে কামড়াকামড়ি করছে। ক্ষুধা। অসহ্য। এখন সেই অজানা গ্রামের বুড়োর দেওয়া ভাত ও ডাল যদি সে পেত! আশ্চর্য! খাদ্যের কল্পনা করতেই যেন ক্ষুধাটা কেমন স্তিমিত হয়ে আসে। কিন্তু পরমুহূর্তেই আবার রাক্ষসীয় গর্জ্জন করে ওঠে, বলে, দাও, দাও, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডটা আমাকে দাও। অরিন্দম মনে মনে হাসল। মানুষ বুদ্ধিমান। হবে, কিন্তু তার সমস্ত বুদ্ধিকে হরণ ক'রে এই ক্ষুধা।

বলরামের বাড়ী এসে পড়ল। স্যাঁতসেঁতে, অন্ধকার গলির শেষপ্রান্ত। অন্ধকারেই বাইরের ঘরের দরজাটার সামনে গিয়ে সে

মাঠের বুকে ভাল। শিকল খুলে দরজা খুলতেই ক্যাচ করে একটু যে ডাইল।

"কে ?" ভেতর থেকে বলরামের প্রশ্ন ভেসে এল।

অরিন্দম উত্তর দিল, "আমি—"

"ওঃ, অরিন্দম—"

বলতে বলতে বলরাম ঘর থেক বেরিয়ে এল, তার কোলে সেই পাঁচ বছরের ছেলেটি।

"তারপর ? কি খবর ? আরে, ঘরটা যে অন্ধকার ! তাইত, তোমার সঙ্গে তো আবার কিছুই নেই—দাঁড়াও—ওরে ললিতা, অ'মা, একটা পিদিম জ্বালিয়ে দে তো এই ঘরে—"

"দিচ্ছি বাবা—" ললিতার গলা ভেসে এল।

বলরাম আবার প্রশ্ন করল, "তারপর ? কাজকর্ম পেলে কিছু ?"

অরিন্দম মৃদু হেসে মাথা নাড়াল, জবাব দিল, "না।"

বলরাম একটু থেমে সান্ত্বনার সুরে বল, "তাতে কি হয়েছে ? আজ হয়নি কাল হবে। এত বড় সহরে কি তোমার মত জোয়ান ছেলের একটা চাকরী জুটবে না ?"

অরিন্দমের নিঃশব্দ হাসি তার মুখে অন্ধকারেই মিলিয়ে গেল। মুখে সে কিছু বলল না, শুধু মনে মনে বলল যে আজবনগরের কাণ্ডকারখানা খুব আশাপ্রদ নয়, কাজ পাওয়াটা বলরামের কথার মত সহজ নয়। সুপারিশ, শিক্ষা, কুকুরের মত পদলেহন করা—কাজ পাওয়ার পথ বড় দুর্গম, ক্ষুরধার।

অন্ধকার আলোকিত হয়ে উঠল। ঘর থেকে বেরিয়ে এল ললিতা। তার ডান হাতে একটি তেলের প্রদীপ, প্রদীপের কম্পিত শিখাকে সে বাঁ হাত দিয়ে সযত্নে আগলে আছে। দীপালোকে উদ্ভাসিত তার অনিন্দ্যসুন্দর মুখটাকে অপার্থিব মনে হল, মনে হল যেন তার রূপের স্পর্শেই প্রদীপটা জ্বলে উঠেছে। অরিন্দম দেখে মুগ্ধ হয়ে

গেল। ললিতা যেন মূর্তিমতী বহ্নি-শিখা—দীপক রাগের আলাপের মতই তার লালিত্য যেন অন্তর্দাহী।

প্রদীপটাকে নিয়ে সে বাইরের ঘরের ভেতর ঢুকল, একপাশে রেখে দিয়ে অরিন্দমের দিকে তাকাল।

বলরাম বলল, "বেশ, তুমি তাহলে এবার জিরোও, পরে গল্প করব।"

অরিন্দম মাথা নাড়ল, "আচ্ছা"—

বলরামের সেই পাঁচ বছরের ছেলেটি বলল, "আমায় কিন্তু এবার সেই গপ্পোটা শোনাতে হবে বাবা"—

"কোন গপ্প?"

"সে-ই বেঙমা বেঙমীর গপ্পো"—

বলরামের মুখ মোলায়েম হাসিতে ভরে উঠল, সে বলল, "বটে! আচ্ছা চ' শোনাচ্ছি তোকে গপ্প"—

বলরাম ভেতরে চলে গেল। তার গমন পথের দিকে তাকিয়ে অরিন্দমের বুকটা ফুলে উঠল। ছেলের দিকে তাকিয়ে বলরামের মুখে চোখে যে ভাব ফুটে উঠেছিল তা অরিন্দমের দৃষ্টি এড়ায়নি। ছেলের কথার জবাব দিতে গিয়ে বলরামের কণ্ঠস্বর যে কেমন মিষ্টি ও আর্দ্র হয়ে উঠেছিল তাও লক্ষ্য করেছিল অরিন্দম। গর্বে, বিচিত্র একটা অনুভূতিতে তার চেতনা উত্তেজিত হয়ে উঠল। স্নেহ! ভালবাসা! এই ত মানুষের জীবনের ঐশ্বর্য, সঞ্চয়, মহৎ পরিচয়।

অরিন্দম ঘরের ভেতর গেল। ললিতা ঘর থেকে বেরোতে গিয়ে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল, প্রশ্ন করল, "আপনাকে খুব ক্লান্ত মনে হচ্ছে, খুব ঘুরেছেন বুঝি?"

অরিন্দম সোজা হয়ে দাঁড়াল। আশ্চর্য একটা শিহরণ ছাড়ল তার দেহে। মেয়েটি তার সঙ্গে কথা বলছে? তার দু'দিনের জীবনে এই নারীই তো সর্বপ্রথম তার ইন্দ্রিয়গুলোতে ইন্দ্রিয়াতীত ঝঙ্কার তুলেছে,

আজ আবার সেই নারীই তাকে ডেকে কথা বলছে! পৃথিবীর সমস্ত সৌন্দর্য যেন আজ এই নারীর রূপ ধরেই তাকে আজ জীবনের একটা লোভনীয় ও বিচিত্র দিক দেখাচ্ছে।

সে মৃদু হেসে ঘাড় নাড়ল, জবাব দিল, "হ্যাঁ, অনেক ঘুরেছি।"

"তারপর? কি হল?" সপ্রশ্ন দৃষ্টি মেলে ললিতা তাকাল তার দিকে।

সে ক্লান্তকণ্ঠে বলল, "কিছু না। আবার কাল দেখব।"

"কাল!" কথাটা উচ্চারণ করে ললিতা থামল, তারপর ধীরে ধীরে বলল, "আজবনগরে কাজ পাওয়া খুব সহজ নয়।"

"তা আজ বুঝতে পেরেছি, বুঝেছি যে এখানে কাজের লোকেরা কাজ পায় না।"

"শুধু তাই নয়, কাজ পেতে হলে এখানে গাধার মত সহ্য করতে হবে, কুকুরের মত নির্লজ্জ হতে হবে, বাঘের মত নিষ্ঠুর হতে হবে।"

"কিন্তু কেন? কেন এই অন্যায় নিয়ম?"

ললিতা হাসল, "কেন? তা পরে জানতে পাবেন।"

অরিন্দম কথা বলল না, নিঃশব্দে ভাবতে লাগল। কেন তা কি সে জানে না? বহুদূরের সেই বিচিত্র ও আনন্দময় পৃথিবীতে কি সে জানতে পারেনি যে এখানকার বাতাসে বাতাসে ভাসছে শয়তানের বিষাক্ত নিঃশ্বাস।

"ললিতা"—

ভেতরের ঘর থেকে দুর্গাবতী এসে বারান্দায় দাঁড়াল, ডাকল, "শোন্ তো"—

"যাই মা"—

ললিতা ঘর থেকে বেরিয়ে মায়ের কাছে গেল।

অরিন্দম দুর্গাবতীর দিকে তাকাল। সন্ধ্যার রঙীন আকাশের মত প্রশান্ত ও গম্ভীর তার চেহারা, সুন্দরী মেয়েদের উপযুক্ত মা, সংসারের

নানা দুঃখের ছাপ রয়েছে তার মমতা-মাখা মুখে চোখে। এবং ললিতা তাকে মা বলে ডাকল! হৃদয়ের গভীরে, গভীরতম প্রদেশে যেন জোয়ারের জল ছড়িয়ে গেল। মা, মা। তার যদি এমনি একজন মা থাকত!

দুর্গাবতী মৃদুকণ্ঠে ললিতাকে যেন কি বলল।

ললিতা ঘুরে দাঁড়াল, দরজার সামনে এসে প্রশ্ন করল, "রাতে কি আমাদের এখানে চাট্টি খাবেন? মা জিজ্ঞেস করছে"—

অরিন্দম চমকে উঠল। জঠরদেশের সেই রাক্ষসী অগ্নিজ্বালাটার কথা সে প্রায় ভুলে গিয়েছিল। ক্ষুধা। মানুষকে তা অসহায় করে ফেলে। কিন্তু তাই বলে সে হার মানবে কেন?

সে মাথা নাড়ল, "না, তার দরকার হবেনা, আমায় খাওয়া নিয়ে আপনারা চিন্তিত হবেন না"—

দুর্গাবতী সস্নেহে বলল, "তুমি কিন্তু লজ্জা করো না বাবা। আমি তোমার মায়ের মত, আমাকে না হয় মাসীমা বলে ডেকো তুমি, আর যখন যা দরকার হবে আমাকে বলো"—

মাসীমা। মায়ের মত যে নারী তাকে মাসীমা বলতে হয়।

অরিন্দম হাসল, "না, আমি লজ্জা করব না মাসীমা, দরকার হলে আমি আপনাকে নিশ্চয়ই জানাব।"

"তাহলে তুমি খাবেনা? আচ্ছা, কিন্তু তোমার কি অন্য কিছু এখন চাই?"

অরিন্দম একটু ভেবে বলল, "চাই, একটু জল।"

"আচ্ছা বাবা, ললিতা এনে দিচ্ছে।"

দুর্গাবতী মেয়েকে নিয়ে ভেতরে চলে গেল। অরিন্দম সেদিকে তাকিয়ে অবাক হল। মানুষের মহত্ব এইখানেই—সে মানুষকে ভালবাসে, স্নেহ করে। মানুষের মধ্যে নারী সে বিষয়ে অগ্রণী। তার কাছে পরিচিত আর অপরিচিত সবাই সমান। আশ্চর্য। গর্বে তার

বুক ফুলে উঠল। মনে মনে সে আওড়াল—'আমি মানুষ, আমার মধ্যে ভালবাসার কি বিচিত্র ক্ষমতা আছে!'

ধীরে ধীরে সেই মাদুরটাতে গিয়ে সে বসল। ব্যথা বেদনায় তার সর্বাঙ্গ তখন টনটন করছে, বসতেই চোখ দুটো আরামে বুজে এল। কিন্তু ক্ষুধা। নাছোরবান্দা ভূতের মত, অক্লান্ত পশুর মত শুধু গোঁ গোঁ শব্দে গর্জাচ্ছে, দংশনাহত জীবের মত লাফাচ্ছে তার জঠরদেশের অন্ত্রগুলো। এবার? সে কি করবে? কি খাবে?

পদশব্দ। অরিন্দম তাকাল। চৌকাঠ পেরিয়ে দরজার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছে একটি মোহিনীমূর্তি। অমিতা।

অরিন্দমের দৃষ্টি পড়তেই সে বলল, "আপনি যে এতক্ষণ এসেছেন তা আমি জানতেও পারিনি, মায়ের কথায় বুঝতে পারলুন—"

অরিন্দম জবাব দিল না, কোন কথাই সে খুঁজে পেল না। অমিতার মেদসমৃদ্ধ দেহরেখা আর যৌবন যেন বর্ষার প্রমত্তা নদীর মত। ঘরের মধ্যে হঠাৎ একটা গুরুভার আবহাওয়া সৃষ্ট হল, বারংবার কেমন যেন অস্বস্তিবোধ করতে লাগল সে।

অমিতা তার ঝকঝকে দাঁত মেলে বিচিত্র হাসল, প্রশ্ন করল, "খুব বেড়িয়েছেন, না?"

অরিন্দম সংক্ষিপ্ত জবাব দিল, "হ্যাঁ—"

"কি কি দেখলেন? আজবনগরের প্রাসাদশালাগুলো দেখেছেন, আর শাসন-পরিষদ?"

"না।"

"দেখেন নি? তাছাও তো কত কি আছে দেখার—তাদের মধ্যে সবচেয়ে সেরা দেখার জিনিষ যে জন্তুশালা, তাও বুঝি দেখেন নি?"

অরিন্দম কিছুই বুঝতে পারল না, অস্বস্তিবোধ করলেও তার কৌতূহল জন্মাল, সে জিজ্ঞেস করল, "জন্তুশালা? সেটা কি?"

অমিতার মুখে ক্ষুরধার হাসি খেলে গেল, সে বলল, "কি আবার?

সেখানে পৃথিবীর নানারকমের জন্তুজানোয়ার আছে, দেশের লোকেরা গিয়ে তাদের দেখে—"

"কেন ?"

"বাঃ, আপনি জানেন না ? ওমা, আপনি দেখছি একে গেঁয়ো লোক"—নিঃশব্দ হাসির তরঙ্গে অমিতার সারা দেহ দুলে

অরিন্দম প্রশ্ন করল, "বলুন না, কেন ?"

অমিতা উত্তর দিল, "আজবনগরের কর্তাদের আদেশ মানুষকে জন্তুর মত হতে হবে, যে কোনো জন্তু"—

অরিন্দম বিস্ময়ে বোবা হয়ে গেল, ক্ষণকাল স্তব্ধ থেকে সে বল "সে কি কথা ? জন্তু কেন ? মানুষ কি মানুষ হবে না ?"

ঠোঁটে আঙুল দিয়ে অমিতা উচ্চারণ করল, "শ্‌ শ্‌ শ্‌-চুপ্‌"—মুহূর্তে তার মুখ গম্ভীর হয়ে গেল, কণ্ঠস্বর নামল নীচু ধাপে, সে বলল, "চুপ্‌ করুন, দে'য়ালেরও কান আছে"—

অরিন্দমের কাছে ব্যাপারটা দুর্বোধ্যই রয়ে গেল, তাই সে প্রশ্ন করল, "তার মানে ? কি বলছেন আপনি ?"

অমিতা পূর্ববৎ বলল, "কিছু না, ওর বেশী আমি আর কিছু জানি না। এবিষয়ে আমার দাদা আর ললিতা হয়ত অনেক কিছুই বলতে পারবে।"

"ওঃ"—

অরিন্দম চুপ হয়ে গেল। মানুষকে জন্তুর মত হতে হবে ? এ কেমন কথা ! আজবনগরের সবই এমন অস্বাভাবিক কেন ? কিন্তু না, সমস্ত চিন্তার আড়ালে চলেছে ক্ষুধার করাঘাত। তাকে খেতে হবে। খাদ্য চাই।

দু'চোখের গভীর চাহনি মেলে অমিতা অরিন্দমকে কৌতূহলের সঙ্গে দেখতে দেখতে বলল, "ভাবছেন বুঝি ?"

"হুঁ"—

অমিতা এক পা অগ্রসর হয়ে বলল, "শুনুন"—

"বলুন"—

"আপনার"—বলতে গিয়েই অমিতা থামল, পেছনদিকে তাকিয়ে ে ললিতা আসছে, তার হাতে এক ঘটি জল ও একটা গেলাস। প্রশ্ন করল, "জল নিয়ে এলি বুঝি ?"

দিদির দিকে অবাক হয়ে তাকাল, প্রশ্নটা তার কাছে অর্থহীন ...াই সে সংক্ষেপে জবাব দিল, "হ্যাঁ"—

...স ভেতরে ঢুকছিল, এমনি সময় অমিতা লঘু হেসে বলল, "... জন্য বুঝি তুই কোন কাজই রাখবি না ললিতা ?"

ললিতা থমকে দাঁড়াল, গ্রীবা উন্নত করে সে জলন্ত চোখে একবার অমিতার দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবল, তারপর ঘটির জল উপুড় করে ফেলে দিয়ে সে অমিতাকে বলল, "এই নাও, তোমায় কাজ দিলাম"—

বলেই সে ঘটি ও গেলাস বারান্দার ওপর রেখে দিয়ে সেখান থেকে দ্রুতপদে চলে গেল।

মুহূর্তের মধ্যে ব্যাপারটা শেষ হয়ে গেল। অরিন্দম উঠে দাঁড়াল। ব্যাপার কি ? গর্বিতা রাজকন্যার মত ললিতা চলে গেল কেন ? জল দেওয়ার ব্যাপার নিয়েই বা দু'বোনে ঝগড়া করছে কেন ?

অমিতা স্থির ও নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। শাণিত খড়্গের মত নির্মম ভঙ্গীতে, ভুঁরু কুচকে দু'চোখে হিংস্রতার আলো জ্বালিয়ে সে ললিতার গমনপথের দিকে ক্ষণকাল তাকিয়ে রইল, তারপর ধীরে ধীরে মুখটা ফিরিয়ে নিয়ে সে অরিন্দমের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করল। এতক্ষণ সে ডান পায়ের ওপর ভর দিয়ে ছিল, এবার বাঁ পায়ের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়াল। দেহ, নিতম্ব ও স্তনযুগল তাতে কেঁপে উঠল। মনে হল যেন একটা তরঙ্গ উঠে দেহের বাঁদিক থেকে ডানদিকে চলে গেল। সেই তরঙ্গের আঘাতে যেন ঘরের বাতাসেও আবর্ত জাগল। অরিন্দমের দেহের মধ্যেও জাগল একটা অনাস্বাদিত, বিচিত্র উত্তাপ-তরঙ্গ। অমিতা হাসল।

ঝকঝকে ও সুগঠিত দাঁতগুলো মেলে অমিতা হাসল। পর সেই তারপর তরলকণ্ঠে বলল, "দেখলেন, ললিতার কাণ্ড দেখলেন? চটেকো না? ললিতাটা অমনি—ওর মাথায় ছিট আছে। কেনরে বাপু, একটু ঠাট্টা তামাসাও কি করতে পারব না? যাকগে, আমি যাই—আপনার জন্য জল নিয়ে আসি।"

ঘটি ও গেলাস তুলে নিয়ে অমিতা চলে গেল। ঘরের বাতাস আবার লঘু হল। কিন্তু অরিন্দমের কাছে সর্ব কিছুই দুর্বোধ্য ঠেকতে লাগল। তার দু'দিনের জীবনে অতিদ্রুত কত ঘটনাই না ঘটছে? কত মানুষকে সে আজ দেখল! পুরুষ ও নারী। প্রকৃতির প্রতীক নারী। ললিতা। সে যেন কোন দেবকন্যার মত, সেই অপরূপ পুতুলদের দেশের সেই সুন্দরী নর্তকীর মত। তাকে দেখে চেতনা স্তিমিত হয়ে আসে, বিচিত্র একটা রসাবেশে মনটা আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। আর অমিতা যেন নীল বিদ্যুতের শিখা, তাকে দেখে দেহে উত্তাপ জন্মায়, আশঙ্কায় মনটা কেঁপে ওঠে। একি রহস্য! প্রকৃতির এই ইন্দ্রজাল-মূর্তিরা যেন তাকে নিরন্তর আকর্ষণ করছে। কিন্তু না, সে ভুলবে না। সে ভোলেনি। দূরে, মেঘচুম্বিত পর্বতশ্রেণীর ওপারে, বহুদূরবর্তী সেই রূপসী নদীর তীরে, মনিময় সেই আশ্চর্য্য কক্ষে, পুতুলদের আনন্দময় রাজ্যে সে ছিল প্রহরী। হঠাৎ একদিন প্রকৃতি তার ইচ্ছাপূরণ করল, সে মানুষ হল। কিন্তু তার অন্তরের মনিকক্ষে এখনো সেই প্রহরী অসিহস্তে দাঁড়িয়ে আছে, প্রহরে প্রহরে এখনো সে গান গায় আর ঘোষণা করে "জাগো-ও-ও, বিস্মৃতি ও বিভ্রান্তি ঠেলে উঠে দাঁড়া-ও-ও'—

রাত বাড়ে। নীচুপাড়ার ঘরে ঘরে কেরোসিনের বাতি নিভতে সুরু করে। আঁকাবাঁকা গলির মধ্যে, বিবর্ণ বাষ্পীয় আলোর আশেপাশে, অন্ধকার নিবিড় হয়ে ওঠে। ঘরে ঘরে নিঃশব্দতা ভারী হয়। এখানে সেখানে, আবর্জনা-পাত্রের পাশে, কুকুরেরা বসে বসে ঝিমুতে সুরু করে।

বাড়ীতেও রাতের ছায়া ঘনায়। বাচ্চাদের হাসিকান্না থামে, "মহাবতী, অমিতা ও ললিতার কণ্ঠস্বর থেমে যায়, বলরামের খুক্ খুক্ কাশিও আর শোনা যায় না।

নীচুপাড়ায় রাত বাড়ে। শুধু এক আ... গৃহস্থ বাড়ীতে আলো জ্বলে, জ্বলে ভাঁটিখানায়, চা বিড়ির দোকানে, জুয়ার আড্ডায়। আর জ্বলে উঁচুপাড়ায়। সেখানকার সারি সারি আলোকমালা—শোভিত রাজপথ এবং অধিকাংশ সৌধাবলীতে অন্ধকার পুরোপুরি জমাট বাঁধে না। নৃত্যগীত, ভোজ ও পান উৎসবের মাঝেই ওখানকার আলোকিত রাত তরল হয়ে মিলিয়ে যায়।

অরিন্দম শুয়ে শুয়ে ছটফট করছিল। ক্ষুধা। একটা উন্মত্ত রাক্ষস যেন তার জঠরদেশকে তোলপাড় করছে। ঘরের ভেতর প্রদীপটা জ্বলছে, এখনো তেল আছে তাতে। ললিতা জেলে দিয়েছিল। ললিতার রূপের স্ফুলিঙ্গ ঐ প্রদীপটা। হঠাৎ মনে হল যেন আলোটা নিভে যেতে চাইছে, অন্ধকার এসে ঝাপ্সা করে দিচ্ছে আলোর ঔজ্জ্বল্যকে আর সেই অস্পষ্ট আলো ও অন্ধকারের মাঝে আবির্ভূত হচ্ছে একটা অতিকায় আকৃতি। দীর্ঘ ও রুক্ষ তার মাথার চুল, কুটিল কামনামাখা রক্তনেত্র, বড় বড় ধারালো দাঁতওয়ালা একটা বিরাট মুখবিবর, লোমশ দেহ এবং হিংস্র ও লালসা-কম্পিত নখরযুক্ত হাত। অরিন্দম তাকে চিনল। রাক্ষস, তার জঠরদেশের সেই উত্তেজিত রাক্ষস। নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে তার আগুন বেরোচ্ছে, বুকটা ওঠানামা করছে, খসখসে জিভ্টা বা...র বাতাসকে লেহন করছে।

ক্ষুধা। কিন্তু একি দেখছে সে! চোখ দুটোকে রগড়াল অরিন্দম। না, কিছু নেই, আলোটা জ্বলছে। ললিতাকে দেখতে ভালো লাগে। সাবধান—পায়ের নীচেকার মাটী যেন হঠাৎ ফেটে যাচ্ছে আর সেই ফাটলের মাঝখান দিয়ে তার ক্ষুৎকাতর হাল্কা শরীরটা পাখীর পালকের মত নীচে নেমে যাচ্ছে। অন্ধকার, অন্ধকার, সে পড়ে যাচ্ছে, সে

পাতালের দিকে নেমে যাচ্ছে—কেউ কি আছো? পুতুলদের দেশের সেই গুনবান গায়ক হয়ত এখন বাহারের আলাপ সুরু করেছে—কিন্তু সে তো দূরে, বহুদূরে। অন্ধকার, অন্ধকার আবর্তিত হচ্ছে, তার চেতনাকে আচ্ছন্ন করছে—

"কি মশাই, ঘুমোলেন নাকি?"

একটা কণ্ঠস্বর। একটা অপরিচিত কণ্ঠস্বর যেন সেই পাখীর পালকটাকে ধরল, টেনে তুলতে লাগল। ওপরে, ওপরে। অন্ধকার মিলিয়ে যাচ্ছে। একটা কণ্ঠস্বর যেন তাকে আবার পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনল। অরিন্দম চোখ মেলল, উঠে বসল, দেখল যে ভেজানো দরজাটা ঠেলে সরিয়ে ঘরের ভেতর একজন যুবক এসে দাঁড়িয়েছে।

অরিন্দম প্রশ্ন করল, "কে?"

যুবকটি তার দিকে দু'পা এগিয়ে এসে হাসিমুখে পাল্টা প্রশ্ন করল, "কাঁচা ঘুমটা ভাঙ্গালাম বুঝি?"

অরিন্দম অবাক হয়ে গেল। কে যুবকটি? তাকে তো সে চেনে না, তবু যুবকটি এমন অতি-পরিচিতের মত কথা বলছে কেন? আর লোকটার কথা যেন কেমন জড়ানো জড়ানো? কেন?

সে বলল, "না, আমি ঘুমোইনি, কিন্তু আপনি—"

যুবকটি তার কথা শেষ করতে দিল না, বলল, "আমি কে তা জানতে চাইছেন বুঝি? বলছি। আমার নাম মুকুন্দ, আমার বাবার নাম বলরাম—"

"ওঃ—আপনি!"

"হ্যাঁ, আমি—অমিতা ও ললিতার দাদা।"

অরিন্দম মৃদু হেসে অভ্যর্থনা জানাল, "বসুন—"

মুকুন্দ মাথা নাড়ল, মাথা নাড়তে গিয়ে তার সারা দেহ দুলে উঠল, সে বলল, "না, এখন বসব না। বাড়ী ফিরে এসে যখন আপনার কথা শুনলাম তখন আপনি ছিলেন না, তাই এখন একটু আলাপ করতে

এলাম। তাছাড়া জমিয়ে গল্প করার মত সুস্থ অবস্থায় আমি এখন নেই।"

"কেন?"

"শুনবেন?"

"বলুন।"

"আমি একটু টেনেছি।"

অরিন্দম বুঝল না কিছুই, প্রশ্ন করল, "তার মানে?"

মুকুন্দ অনুচ্চকণ্ঠে হেসে বলল, "মানে আমি একটু মদ্যপান করেছি।"

"তাতে কি হয়?"

"নেশা হয়, দুঃখকে একটু সহজ মনে হয়। কেন, আপনাকে বুঝি বাবা আমার বিষয়ে কিছু বলেনি?"

অরিন্দম মৃদু হেসে মাথা নাড়ল, "বলেছে—নিন্দাসূচক কথা। কিন্তু কেন মদ খান আপনি? দুঃখকে সহজ মনে হওয়ায় তো দুঃখ দূর হয় না।"

মুকুন্দ আবার দুলে উঠল। অরিন্দম তাকাল তার দিকে। নাতিদীর্ঘ আকৃতি মুকুন্দের, লোহার মত শক্ত দেহে তার থাক থাক মাংস-পেশী। মাথায় কোঁকড়ানো রুক্ষ চুলের রাশি, শিশুর মত সরল দুটো চোখের তারায় যেন আগুনের আভা। নেশা হয়েছে তার, দুলছে সে, যেন বাতাসের ধাক্কায় দুলছে একটা তরুণ শালগাছ।

মুকুন্দ মৃদুকণ্ঠে বলল, "না, তা হয় না। দুঃখকে দূর করার পথ সহজ নয়, তার জন্য দীর্ঘকাল সংগ্রাম করতে হবে, তাতে সময় লাগবে।

"তবে নেশা করেন কেন?"

"মুষড়ে না পড়ার জন্য, দুঃখের বিরুদ্ধে নির্মমভাবে সংগ্রাম করার জন্য।"

অরিন্দমের কৌতূহল হল, সে প্রশ্ন করল, "কিন্তু আপনার দুঃখ কি?"

মুকুন্দ বলল, "আমার দুঃখ আমার একার নয়, আমাদের সবার।

আমাদের দুঃখ এই যে আমরা মানুষ হয়েও মানুষের অধিকার থেকে বঞ্চিত।"

"কেন? কে বঞ্চিত করেছে আপনাদের?"

"মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোক—তাদের আমরা ধনী বলি। তাদের চক্রান্তে এবং শক্তিমদমত্ততায় আজ আমরা অজ্ঞ, অন্ধ, নিরানন্দ, দুঃখশোকে অভাবে, ব্যাধিতে, হিংসা ও হীনতায় আমাদের জীবন পরিপূর্ণ; তাদেরই নির্মম শোষণের ফলে আজ আমাদের সঙ্গে জন্তুদের কোন পার্থক্য নেই। কিন্তু তাদের দিন শেষ হয়ে এল, আমরা আমাদের মনুষ্যত্বের অধিকারকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবই।"

ক্ষুধা। তবু মুকুন্দের কথা ভালো লাগে অরিন্দমের। বলরামের কথা মনে পড়ে। অনেক জোয়ান ছেলের চোখে নাকি আগুন জ্বলে—তারা নাকি মাঝে মাঝে জটলা পাকায় আর কি সব কথা আলোচনা করে। মানুষের মঙ্গলের কথা। মুকুন্দও যেন তেমনি কথা বলছে। সে যে ভারি কথা। প্রহরীর কথা। সেই বহু দূরের মনিময় কক্ষে একটা তলোয়ার হাতে নিয়ে সে তো এমনি কথাই ভেবেছিল। সে সাগ্রহে প্রশ্ন করল, "কি ভাবে আপনাদের অধিকারকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবেন আপনারা? আমাকে বলবেন?"

মুকুন্দ হাসল, মাথা নেড়ে বলল, "না, কিন্তু ব্যাপার কি? আপনি কি এসব কথা জানেন না?"

"না।"

"কেন?"

"পরে বলব।"

"তা হলে আমিও পরে বলব সবকথা। তার আগে আপনি সব দেখুন, দেখুন যে মানুষ কিভাবে আছে, জানুন সবকথা, তারপর আপনার সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করব। আচ্ছা, আজকের মত আসি, আপনি ঘুমোন—"

"আচ্ছা।"

মুকুন্দ চলে গেল।

অরিন্দম ঘরের ভেতরকার প্রদীপের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবতে থাকে। মুকুন্দ লোকটি কেমন যেন অসাধারণ। কি একটা জ্বালায় যেন সে অহরহ জ্বলছে। মানুষের দুঃখ দূর করতে চায় সে। তারি মতো। ঠিক, মুকুন্দের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে হবে, তার কাছ থেকে অনেক কিছুই জানতে হবে। রাত বাড়ছে। নীচুপাড়ার কোথায় যেন হল্লা হচ্ছে, কোথায় যেন বাজছে একটা যন্ত্রে লিখিত মানুষের গান। আর কোথায় যেন কাঁদছে একটা কুকুর। গলির অন্ধকারে, রাতের নিঃশব্দতাকে চিরে চিরে যেন নীচুপাড়ার কান্না মহাশূন্যের দিকে উঠতে চাইছে। রাত গভীরতর হয়। কিন্তু কোথায়, ঘুম তো আসে না? প্রদীপের শিখাটা যেন মাঝে মাঝে অস্বাভাবিক মাত্রায় বড় হয়ে ওঠে, অরিন্দম-সমেত সমস্ত ঘরটাকে যেন তা গ্রাস করে ফেলে। চোখের ধাঁধাঁ। তার ক্ষুৎকাতর, দুর্বল দৃষ্টির বিভ্রম। জ্বলুক প্রদীপটা। ললিতার রূপের মত। প্রদীপ নিভে গেলে জাগ্রত চোখের সামনে, অন্ধকারে হয়ত সেই রাক্ষসটা আরো হিংস্র হয়ে উঠবে, তাকে আক্রমণ করে ক্ষতবিক্ষত করে ফেলবে। এই ভালো। আলোই ভাল।

কিন্তু আর পারা যায় না। যাদের বাড়ীতে খাদ্য আছে তাদের বাড়ীতে কি সে হানা দেবে? লুণ্ঠন করবে? বাধা দেবে! কে? কেউ পারবে না। সে তাহলে তারও শক্তির পরিচয় দেবে। যারা বাধা দেবে তাদের কণ্ঠরোধ করবে সে। চাই, তার খাদ্য চাই। পর্বত-প্রমাণ খাদ্য চাই। সমস্ত পৃথিবীটাকে সে অবলীলাক্রমে গ্রাস করতে পারে। হ্যাঁ, জঠরের সেই রাক্ষসের সঙ্গে এখন আর তার কোনো পার্থক্য নেই। সাবধান, হে আজবনগরের অধিবাসীবৃন্দ, সাবধান—তোমাদের মহানগরে এক রাক্ষসের আবির্ভাব ঘটেছে।

"চোর—চোর—চোর—"

হঠাৎ দূর থেকে একটা কোলাহল ভেসে এল। উৎকট কোলাহল।

"চোর—চো-ও-ও-র—ধরো-ও-ও-ও—"

কোলাহল ক্রমেই কর্ণভেদী ও নিকটবর্তী হয়ে উঠল। কি ব্যাপার? অরিন্দম উঠে দাঁড়াল। কোলাহলটা অস্বাভাবিক, উত্তেজিত। কেউ চুরী করেছে। না বলে পরের জিনিষ নেওয়াকে চুরী বলে। চুরী করা অন্যায়, পাপ। কিন্তু তা জেনেশুনেও মানুষ চুরী করে কেন?

"চোর—হ্যাঁ, ওদিকে, ওদিকে—"

গলি দিয়ে জনকয়েক দৌড়ে চলে গেল। কি ব্যাপার? একবার বাইরে গিয়ে দেখা যাক।

অরিন্দম ঘর থেকে বেরোল।

গলির ভেতরে স্যাঁতসেঁতে ও ভিজে অন্ধকার। ঘন কাদার মত। কিন্তু কৈ, কেউ নেই তো। নির্জন ও আঁকাবাঁকা গলিটার শেষ প্রান্তে একটা টিমটিমে বাষ্পীয় আলোক। পাণ্ডুরবর্ণ মৃতের নিষ্প্রভ চোখের মত। তার আলোতে আশপাশের চূণকাম-খসা বাড়ীর দেয়ালগুলোকে বীভৎস ও অপরিচিত জন্তুর কঙ্কালের মত মনে হয়।

হঠাৎ আবার কোলাহল শোনা গেল, "না, এদিকে নেই, এগিয়ে চল"—

সঙ্গে সঙ্গেই অরিন্দমের বাঁ দিকের একটা গলি থেকে একজন লোক ছুটে বেরিয়ে এল। অরিন্দম একটু সরে দাঁড়াবার চেষ্টা করতেই লোকটার সঙ্গে তার ধাক্কা লাগল। হিংস্র একটা দৃষ্টি নিক্ষেপ করে সে চলে যাবার উপক্রম করতেই অরিন্দমের সন্দেহ হল, খপ্ করে লোকটার একটা হাত ধরল সে।

"শোন"—

লোকটা ক্রুদ্ধ শ্বাপদের মত নিম্নকণ্ঠে বলল, "হাত ছেড়ে দাও"—

"কেন? তুমি বিচলিত হচ্ছ কেন?"

"ছাড়ো বলছি—নইলে ভাল হবেনা"—লোকটা প্রাণপণে হাত ছাড়াবার চেষ্টা করে চলল।

অরিন্দম হাসল, "তোমার মনে পাপ আছে বলেই তুমি আমার ওপর রাগ করছ, পালাতে চাইছ। কেন? তুমিই কি চুরী করেছ?"

জবাবে লোকটা অরিন্দমের সঙ্গে ধস্তাধস্তি সুরু করে দিল।

"ছাড়ো—ছাড়ো বলছি—তা নইলে আমি নগররক্ষীদের ডাকব"—

লোহার মত দুটো শক্ত হাত দিয়ে অরিন্দম লোকটাকে চেপে ধরল। ক্ষুৎকাতর দেহে তার বেশী শক্তি ছিল না, তবু সে লোকটাকে কাবু করল, বলল, "কোন ফল হবে না। [illegible] যা জিজ্ঞেস করছি তার জবাব দাও, আমি তোমাকে ছেড়ে দেব প্রতিজ্ঞা করছি।"

"কি জানতে চাও?"

"তুমিই চুরী করতে গিয়েছিলে?"

"হ্যাঁ—"

"কি চুরী করলে?"

"কিছুই না। পারিনি।"

"চুরী করা নাকি পাপ—তা জান?"

লোকটা শ্বাপদের হাসি হেসে জবাব দিল, "জানি, তবু চুরী করতে গিয়েছিলাম।"

"কেন?" অরিন্দম অবাক হল।

লোকটা চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, "তুমি কিছু না বোঝার ভাণ করছ, তা হোক, তবু বলছি। কেন চুরি করি শুনবে? অভাবের জন্য, পেটের জন্য। আমি একা নই, আমার বৌ আছে, ছেলেমেয়ে আছে, তাদের পেটে ভাত নেই, পরণে কাপড় নেই।"

"কেন, এই অভাব কেন?"

"কাজকর্ম পাইনা বলে, আর কাজ পেলেও পোষায় না। মানুষ

যাই করুক না কেন, তার বদলে তাকে যে বাঁচবার মত অন্নবস্ত্র দেওয়া উচিত তা মানুষেরা বিশ্বাস করে না।"

"এরপর কি করবে ?"

লোকটা হাসল, "আবার চুরী করব। এইত বাঁচবার নিয়ম, দেশের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী মানুষ যারা, তারাও চুরী করে। বাঁচবার এই নিয়মটা চালু থাকা পর্যন্ত আমি মহাজনদেরই নকল করে যাব"

"যখন ধরা পড়বে ?"

"চুলোয় যাব। এই অনিশ্চিত জীবনসংগ্রামের চেয়ে তা ঢের ভাল। হয়েছে, এবার হাত ছাড়ো"—

আচম্‌কা একটা টান মেরে অরিন্দমের মুঠো থেকে লোকটা তার হাত ছাড়িয়ে নিল, তাপর সোজা দৌড় দিল। কয়েক মুহূর্তের জন্য তার রোগা ও লম্বাটে আকৃতি গলির বিবর্ণ আলোর পাশে দেখা গেল, তারপর সে অদৃশ্য হল, অন্ধকারে যেন মিশিয়ে গেল।

অরিন্দম চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। আশ্চর্য। তার দু'দিনের মানব-জীবনে আজ কত ঘটনাই না ঘটল! না, দাঁড়াতে কষ্ট হচ্ছে। অরিন্দম ভেতরে গেল। মাথাটা ঝিম্‌ঝিম্‌ করছে, শরীরটা হাল্‌কা মনে হচ্ছে, জঠরের শূন্যতা ক্রমেই বিপজ্জনক হয়ে উঠছে। লোকটা চোর। চুরী করে, পাপ করে সে বাঁচতে চায়। মানুষ অন্যায়কে অন্যায় জেনেও তা করে। মানুষের জগতের এই নিয়ম। পেটের জন্য মানুষ পাপ করে। পেট মানে ক্ষুধা। তারও ক্ষুধা পেয়েছে। সে-ও কি পাপ করবে? অসম্ভব। তার চেয়ে মৃত্যু ভালো। মানুষ মানুষের কথা ভাবে না। প্রত্যেকেই নিজের কথা ভাবে। জন্তু জানোয়ারের মত। যতদিন এই নিয়ম প্রচলিত থাকবে ততদিন মানুষের জীবন হবে অনিশ্চিত। হিংসার বিষে কুটিল মানুষের মন। মৃত্যু, অন্যায় ও অসত্য রাজত্ব করছে। ভেঙ্গে ফেল। না, সে ভোলেনি। তার অন্তরের মণিময় কক্ষের সেই অসিধারী প্রহরীর প্রতিজ্ঞা সে বিস্মৃত হয়নি।

অন্ধকার! দমকা হাওয়ায় প্রদীপটা নিভে গেল। বর্ষার জলের মত গলির ভিজে অন্ধকার এসে ঘরকে প্লাবিত করল। অরিন্দম চমকে উঠল। প্রদীপটা নিভে গেল। ললিতা। ললিতাকে দেখতে বেশ লাগে। প্রদীপটা যদি আবার জলে উঠত আর তার পাশে, ঐ আলোর আত্মার মত যদি ললিতা এসে দাঁড়াত তাহলে কি রোমাঞ্চকর ব্যাপারই না হত! ললিতা সুন্দরী। কিন্তু তাকে আরো দেখতে ইচ্ছে করে। তার সর্বাঙ্গ। না, অমিতাকে আলোর পাশে চাই না। অন্ধকারেই আসতে পারে সে। তার দেহের মাংসে কি অরিন্দমের ক্ষুধা মিটবে? নরম নারীমাংস খেয়ে কি বাঁচা যায় না! না। ক্ষুধা। ভাত চাই তার। অন্ধকার কি পীড়াদায়ক! দেহটা যেন অবশ হয়ে আসছে। চোখের সামনে যেন গুঁড়ো গুঁড়ো আলোর কণা। ললিতার রূপের কণা। সেই বহুদূরের পুতুলের দেশে এখন বোধ হয় বেহালাবাদক তার বাজনা বাজাচ্ছে আর তার বাজনার তালে তালে নাচছে সেই পেলব-যৌবনা নর্তকী। তাদের বাজনা আর নৃত্যচ্ছন্দের মাঝে যেন ডেজী ফুলের গন্ধ, মারীগোল্ডের রং আর নাইটিংগেলের ডাক। হৃদয়ের দ্বার উন্মুক্ত করে দাও। শেষ হবে না, রূপ, রস ও আনন্দের শেষ নেই। ক্ষুধা। ভাত চাই। রাতের কোন প্রহর? বেহাগের আলাপে সেই মণিময় কক্ষ কি এখন কাঁপছে? ভাত চাই। আনন্দ, প্রেম ও কর্মই জীবন। জানতে হবে। দৃশ্য ও অদৃশ্য সব কিছুর পেছনে কে আছে? ভাত চাই। পশুর জীবনে আশ্বাস নেই, নিশ্চয়তা নেই। মানুষকে মানুষ হতে হবে। ভাত চাই। ভাত চাই। মানুষ শুধু নিজের কথা ভাবে না, পরের কথাও ভাবে সে। মানুষ ভালবাসে। ভালবাসার শেষ নেই। এই অফুরন্ত ঐশ্বর্যই মানুষের অস্তিত্বকে চিরস্থায়ী করবে। ভাত চাই। অন্ধকার। অন্ধকারে আলোর ফুলঝুরি। স্তিমিত চেতনায় যেন ঝিল্লীরব। হিংস্র নখের আঘাত আর একটি প্রার্থনা—এক—মুঠো —ভাত—চাই—

মায়াময় রাত কেটে গেল। নীচুপাড়ার পূবদিকে, দিগন্তজোড়া পর্বত-শ্রেণীর আড়াল থেকে সূর্যদেব বেরিয়ে এলেন। একটি আশ্চর্য প্রবাল-পদ্মের মত। সোনালী সুরার মত মাদকতাময় তার আলোর স্পর্শ পেয়ে আজবনগর চঞ্চল হয়ে উঠল। দূরবর্তী কলকারখানা থেকে ভেসে এল বাঁশীর আওয়াজ। শোনা গেল পদধ্বনি। অসংখ্যের।

বাড়ীর সবাই জেগে উঠবার আগেই অরিন্দম রাস্তায় পা দিল। আজ একটা কাজ তাকে জোগাড় করতেই হবে। ক্ষুধা অসহ্য হয়ে উঠছে। শরীর দুর্বল মনে হচ্ছে তার, চলতে কষ্ট হয়। তবু এগিয়ে চলতেই হবে।

কর্মচঞ্চল মহানগর। জনাকীর্ণ রাজপথ। অন্ধ স্রোতের মত চলেছে জনতা। বিদ্যুৎ ও বাষ্পীয় যানগুলো দ্রুতবেগে ছুটোছুটি করছে। শব্দ। কোলাহল। লোহায় লোহায়, পাথরে পাথরে সংঘাত। কঠিন জীবনের ঘোষণা।

"কাজ আছে ?"

"না।"

বেলা বাড়ে। জনতা বাড়ে। মাথার ওপর সূর্যদেবের আলো প্রখর হয়ে ওঠে। উদ্ধত দৈত্যের মত বিরাট অট্টালিকাগুলো তাদের বড় বড় ছায়া ফেলে দাঁড়িয়ে থাকে। ক্ষুধা। একটা অরণ্যচর প্রাগৈতিহাসিক জন্তুর ধারালো দাঁত। রক্ত মাংস ও হাড়ের ভেতরে একটা বিষাক্ত যন্ত্রণা। ভাত চাই, ভাত চাই।

"কাজ আছে ? কাজ ?"

"না, না।"

চারদিকে শুধু দেওয়াল। বাধা ও নিষেধের প্রাচীর। না, নেই, কাজ নেই। অথচ কাজ না হলে চলবে না। খাদ্য চাই। খাবারের

দোকানগুলোতে লোকেরা খাচ্ছে। সুদৃশ্য হোটেলে মানুষেরা হাসিমুখে খাচ্ছে। ক্ষুধার্ত কুকুরের মত চাইতে ইচ্ছে করে—একটা হাড় দাও আমাকে। আবর্জনা-স্তূপের মধ্যে লাফিয়ে পড়ে পচা খাবারের টুকরো খুঁজতে ইচ্ছে করে। অথচ উপায় নেই। তার অন্তরের দেহলীতে আছে এক সৌন্দর্য-পিপাসু পুতুল। সে মাথা নীচু করবে না। এখন কোন প্রহর? রূপসী নদীর ধারে বসে যাযাবর হাঁসেরা কি এখন স্বপ্ন দেখছে? নদীর জলে অরণ্য আর নিজের ছায়া দেখে কি কোন মৃগশাবক এখন বিস্ময়ে আকুল হয়ে উঠেছে? হে বীণকার, তোমার বহুতন্ত্রীর ঝঙ্কার তো আমার হৃদয়ে ধ্বনিত হচ্ছে না। জঠরের ক্ষুধার ভয়ঙ্কর মূর্তি দেখে কি তুমি ভয়-বিহ্বল হয়েছ? ভাত চাই।

"এখানে কি কাজ আছে?"

"না।"

"আমি ক্ষুধার্ত—আমায় একটা কাজ দিন, বাঁচতে দিন।"

"তুমি মরলে আমাদের ক্ষতি হবে না।"

"আমি যে মানুষ।"

"তাতে হয়েছে কি?"

"আমার মৃত্যু যে আপনাদেরও মৃত্যু—"

"তুমি বেরোও—"

রৌদ্র-তপ্ত রাজপথ যেন কালো পাথরের মত। গরম বাতাসে ধাতব গন্ধ। পায়ের নীচে ভূমিকম্প। এগিয়ে চল। এখানে মরুভূমি, এখানে নির্মম, নিষ্করুণ উপেক্ষা। পুড়ুক পা, ক্ষুধায় ক্লান্তিতে চেতনা অবসন্ন হয়ে পড়ুক, তবু হার মেনো না।

"এই, হটে যাও—"

ঠন্ ঠন্ শব্দ তুলে একটা মানুষ-চালিত গাড়ী আসছে তার পেছনে। অরিন্দম সরে দাঁড়াল। অবাক হয়ে দেখল যে গাড়ীটা টানছে কালকের লোকটা। দামোদর।

দামোদর তাকে দেখে হাসল, বলল, "তুমি!"

অরিন্দম মাথা নাড়ল, "হ্যাঁ!"

"এই রোদ্দুরে ঘুরে বেড়াচ্ছ যে?"

"কাজ খুঁজছি।"

দামোদরের হাসি মিলিয়ে গেল, শুষ্ককণ্ঠে সে বলল, "কাজ! খোজ—"

"কোথায় গেলে কাজ পাব জানো?"

"বলা মুস্কিল। কাজ সব জায়গাতেই আছে, কিন্তু সবার ভাগ্যে জোটে না।"

"ভাগ্য!"

"ভাগ্য বৈকি। এসো, এই ছায়াতে দাঁড়াও—"

"ভাগ্য মানে?"

"বিধাতার লিখন—তাঁর নির্দেশ অনুযায়ীই তোমার সুখ দুঃখ নিয়ন্ত্রিত হয়।"

"বিধাতা মানে?"

"ঈশ্বর—যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন।"

"তাহলে তো ঈশ্বর খামখেয়ালী।"

"না। কর্মানুযায়ী মানুষকে ফল দেন তিনি। যে ভাল কাজ করে সে ভাল ফল পায়, যে খারাপ কাজ করে সে মন্দ ফল পায়।"

অরিন্দম অবাক হল, "বাঃ তাহলে আমি কষ্ট পাচ্ছি কেন? আমি তো কোন পাপই করিনি।"

"তাহলে হয়ত আগের জন্মে পাপ করেছিলে তুমি।"

কিন্তু আগের জন্মে তো মানুষ ছিলাম না, অমি ছিলাম একটি আনন্দময় পুতুল—পাপপুণ্য, জরামৃত্যু ও দুঃখ বেদনার উর্ধ্বে—"

দামোদরের চোখের তারায় পুঞ্জীভূত বিস্ময় ঘনাল, "কি বলছ তুমি?"

অরিন্দম সচেতন হয়ে উঠল। এসব কি বলছে সে! কেন বলছে!

সে মাথা নাড়ল, "না না, কিছু নয়, কিছু নয়। কিন্তু তুমি আজ হঠাৎ এই গাড়ী টানছ কেন দামোদর?"

"মুচিগিরিতে আর পেট চলল না বলে—"

"কিন্তু গাড়ীতে মানুষ টানা তো জানোয়ারের কাজ, যন্ত্রের কাজ!"

"আমিও জানোয়ার। আকাশের জগৎ আমার নাগালের বাইরে, তাই শুধু জন্তুর জগৎটাকেই আঁকড়ে ধরেছি, বেঁচে থাকার একটা জান্তব আনন্দ আছে বলেই টিঁকে আছি—"

"কিন্তু মানুষের মত বাঁচার আনন্দ যে অমৃতের মত—"

"তা আমাদের জন্য নয়—"

"কেন?"

"যারা আমাদের শাসন করে তারা এক দানবের পূজারী। সেই দানব তাদের শিখিয়েছে যে সবাইকে বঞ্চিত রেখে ভোগ করাতেই আনন্দ, সবাইকে নির্যাতন করাতেই সুখ, সবাইকে দুঃখ দেওয়াতেই বিলাস।"

"তারা ক'জন?"

"তারা মুষ্টিমেয়।"

"তবু তারা শক্তি বজায় রাখে কি করে?"

"অরণ্যের বাঘের মত, তাদের শক্তিকে যে হরণ করতে চায় তাকে তারা ধ্বংস করে।"

"কিন্তু তুমি আমি তো সংখ্যায় কোটী কোটী;

"কোটী কোটী হয়েও আমরা বিচ্ছিন্ন, দ্বীপের মত—এক হয়ে আমরা মহাদেশ হই কোথায়? তোমার আমার স্ফুলিঙ্গের আগুন মিলে তো দাবানল হয় না।"

দামোদরের দিকে তাকায় অরিন্দম। তার দু'চোখ তখন জ্বলছে। মুখে কোন কথা আর সে বলল না, শুধু মনে মনে বলল যে হবে,

দাবানলের সৃষ্টি একদিন হবে। দ্বীপে দ্বীপে মিলে মহাদেশ হবে, নদীতে নদীতে মিলে মহাসমুদ্র হবে; কোটী কোটী সম্মিলিত মানুষের আঘাতে পাপের জগৎ ও মুষ্টিমেয় বাঘের অরণ্য একদিন নিশ্চিহ্ন হবে। সে তাই করবে। এ তো তারি কাজ। ঈশ্বর! দামোদরের কথা কি সত্যি? তাহলে মানুষ বাঘ হয় কেন? ঈশ্বরের ইচ্ছা! তাহলে তো ঈশ্বর কুটিল।

"দামোদর"—

"বল"—

"ঈশ্বরকে কোথায় পাওয়া যায়?"

"লোকেরা বলে যে মন্দিরে, ধ্যানে, নিজের অন্তরের মণিকোঠায়।"

"মণিকোঠায়? তবে কি ঈশ্বরও পুতুল?"

"কি বলছ তুমি!"

"কিছু না, কিছু না। তুমি—তুমি কি ঈশ্বরকে দেখেছ দামোদর?"

"না।"

"তাকে কি দেখতে পাওয়া যায়?"

"লোকেরা বলে যে ঈশ্বর সর্বব্যাপী, তাঁকে দেখতেও পাওয়া যায়, কিন্তু আমি জানি না। যাক সে কথা, আর নয়, এবার আমি যাই ভাই, এখনো বেশী রোজগার করতে পারিনি"—

"যাও। আবার দেখা হবে তো?"

"কে জানে?"

ঠন্ ঠন্ ঠন্। ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে চলে গেল দামোদর। ভারবাহী বলদের মত। মানুষ মানুষকে বহন করে। লজ্জা। মানুষের ইতিহাস লজ্জাকর। ঈশ্বর। কেমন দেখতে সেই ঈশ্বর? বাঘের মত যে সব মানুষেরা আর সবাইকে বঞ্চিত করে, নির্যাতন করে, তাদেরই শাসনের ফলে তো মানুষের দুঃখ। এখানে ঈশ্বরের নির্দেশ কোথায়? মিথ্যে কথা, ঈশ্বর কিছুই করেন না। কিন্তু মানুষ তাহলে সহ্য করে

কেন, কেন তারা এক হয় না? কেন? কেন? ক্ষুধা। আর পারা যায় না। এক মুঠো ভাত চাই। প্রজাপতি-পক্ষ-বাহিত মধু নয়, আর্দ্রবাতাসের তৈরী পানীয় নয়। বসুন্ধরার হৃদয়-নিংড়ানো অন্ন আর জল চাই। বাঁচতে হবে, রঙীন বাঘদের ধ্বংস করার জন্য বাঁচতে হবে।

অরিন্দম চলতে সুরু করল।

আকাশের সিঁড়ি বেয়ে অস্তাচলের দিকে নামলেন সূর্যদেব। গৌরী রাগিনীর সুর যেন রঙ্ হয়ে লাগল মেঘের গায়ে। চারদিক অন্ধকার হয়ে এল। উদ্দাম, অস্থির জীবনের ছন্দ যেন উঁচুপাড়ার চারদিকে আলো হয়ে জ্বলে উঠল। আলো, আলো, আলোয় আলোয় চারদিক ঝলমল করছে।

ক্লান্তি। দেহের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে বেদনা। যন্ত্রণা। নিঃশ্বাস ফেলতে কষ্ট হয়। আজো হল না, আজো কাজ পাওয়া গেল না।

আবার নীচুপাড়া। খোয়া-ওঠা বন্ধুর পথ। আবর্জনা। কবরের গন্ধবাহী উঁচুপাড়ার নোংরা-জলে-ভরা নর্দমা। মরা মাছি। স্তিমিত বাষ্পীয় আলো। অপরিচ্ছন্ন চায়ের দোকান। অন্ধকার। এখানে উজ্জ্বল আলো নেই। এখানকার আলো গেছে উঁচুপাড়ায় আর উঁচুপাড়ার অন্ধকার এসেছে এখানে।

অন্যমনস্কভাবে চলতে চলতে একটা গলির মধ্যে ঢুকে পড়ল অরিন্দম। কিছুক্ষণ বাদে সে থমকে দাঁড়াল। এই গলি তার অপরিচিত। গলিটাতে খুব ভীড়। তার দু'পাশে নানা রকমের খাবার ও মদের দোকান। আর দোকানগুলোর আশেপাশে, দরজার ধারে, ঝুলানো বারান্দায় দাঁড়ানো নানা বয়সী নারীরা। উগ্রভাবে সজ্জিতা ও অলংকৃতা। তাদের কাজল আঁকা চোখের তারায় ইস্পাতের কাঠিন্য, তাদের তাম্বুল-রাগ-রঞ্জিত ঠোঁটের কোনে যেন কুহকিনীর হাসি। ওরা কারা?

"কি গো নাগর, এসো

অরিন্দম চমকে উঠল।

ব্যাপার কি? এ কোথায় এ

ডাকছে কেন? কি চায় সে?

"কি গো, ভাবছ কি অত?

অরিন্দমের পেছন থেকে একঃ

লজ্জাকেন? দু'চোখ বুজে মুদুং

হাহা হিহি হাসি উঠল। দরজা

দোকানের পুরুষেরা হেসে উঠল।

তাদের দিকে। কেন, ওরা হাসে

হয়ে ফিরে যাবার উদ্যোগ

করল। চমকে ফিরে তা

"এখানে কি করছি

"ভুলে চলে এসেছি

"চলুন।"

"দুজনে চলতে

হাসি যেন তখনো

কেন ডাকল ঐ

কি যেন একটা।

"শুনুন"—

"কি?"

"ওই গলির

মুকুন্দ হাসল.

"তার মানে

"ওরা দেহকে।

"আমাকে একজ

"কি ? চা খাচ্ছেন না কেন ?" ললিতা মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করল।

অরিন্দম বলল, "তোমাকে দেখছি।"

ললিতার মুখ রাঙ্গা হয়ে উঠল কিনা তা বোঝা গেল না, ওপরের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে সে বলল, "আমার মধ্যে অত করে দেখার কি আছে ?"

"সৌন্দর্য।"

"আপনার মাথা খারাপ।" ললিতা ধীরকণ্ঠে বলল।

অরিন্দম বুঝতে পারল না, প্রশ্ন করল, "কেন ?"

"তা নইলে কেউ একদিনের আলাপেই এসব কথা বলে ?"

অরিন্দম মৃদু হাসল, "ওঃ, এসব কথা বুঝি বলা খারাপ ? আচ্ছা, তাহলে আর বলব না।"

চায়ের কাপে চুমুক দিল সে। গরম মিষ্টি একটা পানীয়। মন্দ লাগল না তার। কিন্তু এ তো মরুভূমিতে একবিন্দু জলের মত। অগ্নিতে ঘৃতাহুতির মত। ক্ষুধার কি হবে ?

"আজ কাজ পেলেন ?" ললিতা প্রশ্ন করল।

"না।"

"চিন্তা করবেন না, পেয়ে যাবেন।" নরম গলায় বলল ললিতা। বলে সে ধীরে ধীরে ঘর থেকে চলে গেল।

আশ্চর্য। ললিতার সহানুভূতি যেন তার ক্ষুৎকাতর দেহের ভিতরে শান্তির অমৃত সৃষ্টি করল। কি অপরূপ এই নারী! আর ওখানে, সংকীর্ণ গলির মাঝে, আত্মার মুখে হাতচাপা দিয়ে ওরা [illegible]দে, বাঁচার জন্য দেহকে বিকিয়ে দেয়।

সময় কাটে। চায়ের ক্রিয়া শেষ হয়ে যায়। আ[illegible]া তার হিংস্র নখ দিয়ে আঁচড় কাটে।

পদশব্দ।

অমিতা এল। কি চায় সে ?

"আপনার ঘরে একটু আসব ?"

"কেন ?"

অমিতা হাসল, বলল, "একটা চুলের কাঁটা ফেলেছি আপনার ঘরে"—

শুষ্ককণ্ঠে বলল অরিন্দম, "নিয়ে যান।"

অমিতা ঘরের ভেতরে এল। মাদকতাময় তার দেহভঙ্গী। প্রতি পদক্ষেপে তার নিতম্ব দুলে ওঠে, স্তনযুগল কেঁপে ওঠে। চারদিকে বারকয়েক তাকাল সে, তারপর ঘুরে দাঁড়াল, দু'হাত তুলে সে খোঁপাকে ঠিক করতে লাগল, উন্নত স্তনযুগল তাতে আরো উন্নত হল। হঠাৎ আঁচলটা কাঁধ থেকে খসে পড়ে তার বাহুমূলকে অনাবৃত করে দিল। উত্তপ্ত কামনায় ঘরটা সজীব হয়ে উঠল। প্রদীপের শিখাটা কেঁপে উঠল। অরিন্দম বুঝল। আমন্ত্রণ।

"চুলের কাঁটা পেলেন ?" সে প্রশ্ন করল।

"নাঃ, দেখছি না কোথাও ?"

"তাহলে দাঁড়িয়ে আছেন কেন ?"

অমিতা ভুরু কুঁচকে অরিন্দমের দিকে তাকাল, প্রশ্ন করল, "আপনার শরীর খারাপ বুঝি ?"

"হ্যাঁ ?"

আঁচলটা তুলে নিয়ে ঠিকভাবে গায়ে জড়াতে জড়াতে অমিতা হাসল, "তাহলে জিরোন আপনি।"

অমিতা চলে গেল।

অরিন্দম ভাবে। অমিতার নির্বাক ভাষাকে সে বুঝতে পেরেছে। নারী ও পুরুষের পরস্পরের প্রতি এক রহস্যময় আকর্ষণ। দুটি মিলে একটি সুর হতে চায়। কিন্তু সে পারবে না। তার ভয় পে ললিতা থাকতে সে অন্য কোন নারীকে কামনা করতে পারেনি ললিতা তার চিত্তকে জয় করেছে। ক্ষুধা। ভাত চাই। এখন

নটমল্লারের তানে সেই মণিময় কক্ষ গমগম করছে। হ্যাঁ, মানুষের পৃথিবী বড় দুঃখের, দানবীয় শক্তির কাছে মানুষ পরাজিত। ঈশ্বর। কে সে? কেমন দেখতে? ঈশ্বর সব কিছুর স্রষ্টা, তিনি সর্বব্যাপী! দুর্বোধ্য। ক্ষুধা। ললিতা আমার সামনে এসে দাঁড়াও। সেই গলির নারীরা। টাকা। তারা টাকার জন্য শয্যাসঙ্গিনী হয়। ক্ষুধা! সব কিছু ভেঙ্গে ফেলবে সে, চুরমার করে ফেলবে—

রাত্ত কাটে।

রাত্ত কাটে।

ঘরের প্রদীপ নিভে যায়।

অন্ধকার। বাইরে কুকুর ডাকে, নর্দমার পাশ দিয়ে ইঁদুর ও ছুঁচোরা চলাচল করে, নীচুপাড়ার কোলাহল স্তব্ধ হয়ে যায়। আজব-নগরের আকাশে নক্ষত্রেরা জ্বলজ্বল করতে থাকে। আর চোখের সামনে, জোনাকীর মত বিবর্ণ আলোর কণারা জ্বলে আর নেভে, জ্বলে আর নেভে।

দরজা ঠেলে কে যেন ভেতরে ঢুকল। অরিন্দম চমকে তাকাল।

"কে?"

জবাব দিল না লোকটা।

"কে তুমি? কথা বলছ না কেন?" অরিন্দম উঠে তার দিকে এগোল।

গলির অস্পষ্ট আলোতে লোকটাকে দেখা গেল। মাঝারি গড়নের, মাথায় বড় বড় চুল।

"খবরদার—আর এগিয়ো না"—লোকটা বলল।

"কেন?"

"হ্যাঁ, এগিয়ো না—আমার হাতে ছোরা আছে।"

অন্ধকারেও লোকটার হাতের অস্ত্র ঝকঝক করে উঠল, জ্বলে তার চোখ দুটো।

অরিন্দক অবাক হল, "কিন্তু কেন, আমার ঘরে এসে আমাকেই শাসাচ্ছ কেন তুমি ?"

লোকটা চাপা গলায় বলল, "চুপ করো, ওরা শুনতে পাবে"—

"ওরা কারা ?"

"যারা আমার পেছু নিয়েছে।"

"কেন, কি করেছ তুমি ?"

খুন।"

"খুন !" অরিন্দম শিউরে উঠল, "মানুষ খুন করেছ তুমি !"

লোকটা চাপা গলায় হাসল, বলল, "হ্যাঁ, না করে উপায় ছিল না।"

"কেন ?"

"অভাবের জন্য চুরী করতে গিয়েছিলাম। টাকা পয়সা নিয়ে পালাবার সময় একজন আমাকে ধরতে এল, উপায় ছিল না, তাকে সাবাড় করতে হল"—

"ওই ছোরা দিয়ে ?"

"হ্যাঁ। এই দেখনা, রক্তে কাপড় ভিজে গেছে"—

"ফেলে দাও ঐ অস্ত্র—দূরে"—

লোকটা হাসল, "বেশী মামদোবাজী করোনা আমার সঙ্গে। ছোরা ফেলে দিলেই তো আমাকে ধরবে ওরা"—

দুর্বলকণ্ঠে প্রশ্ন করল অরিন্দম, "মানুষকে খুন করা যে পাপ—তা কি তুমি জানোনা।"

"জানি। আমি আমি নিরুপায়। আমি তো চুরী করতে চাইনি, খুন করতে চাইনি। আমি তো ভালই হতে চেয়েছিলাম"—

"তবে ?"

"শয়তানেরা শাসন করে আমাদের। তাদের নিয়মকানুনের চাপে পাপই করতে হয়, নইলে বাঁচা যায় না। খুন ! তারা তো প্রতিদিন খুন করে ?"

"কি ভাবে?"

"দেশ রক্ষার নামে অন্য দেশ আক্রমণ করে, রাষ্ট্ররক্ষার নামে সবাইকে বঞ্চিত করে। যুদ্ধ, ব্যাধি, অনাহার—প্রতিদিন মানুষ মারা যায়, মারা যায় না—নিহত হয় তারা। সেই সব মহা মহিমান্বিত শয়তানদের তুলনায় আমি কি করেছি? কিছু না। ওরা সবাইকে তিলে তিলে মারে আর আমি এক ঘায়েই শেষ করেছি—হা হা হা"—

অরিন্দমের সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠল, সে বলল, "থামো। হেসো না। শোন—তোমরা সবাই প্রতিবাদ করোনা কেন? কেন এক হয়ে তোমরা মাথা তোল না?"

"সে কি একদিনেই হয়? হবে, সবাই একজোট হবে। মনুষ্যত্বের শত্রুদের আমরা ধ্বংস করতে চাইছি—ওরা ধ্বংস হবেই। আমাদের ইচ্ছা থেকেই আসবে শক্তি, পথ, ইচ্ছাপূরণের উপায়।"

"কিন্তু যতদিন তা না হয়?"

"ততদিন এমনিভাবে চলবে। জঙ্গলে থাকতে হলে জঙ্গলের আইনই মানতে হয়।"

"সে তো হিংসা, হিংসা দিয়ে তো হিংসাকে জয় করা যায় না।"

লোকটা হাসল, "তুমি বোকা। কাঁটা ছাড়া কি কাঁটা তোলা যায়?"

অরিন্দম উত্তেজিত হয়ে উঠল, "জঙ্গলের আইনকে বুঝি, কিন্তু মানুষ কি পশুকে ভালোবাসতে পারে না?"

"পারে। কিন্তু সেই পশু একবার মানুষের রক্তের স্বাদ পেলে আর ভালোবাসার কথা বুঝতে পারে না। তখন একটি মাত্র পথই অবশিষ্ট থাকে—তাকে মেরে ফেলা।"

ভারী জুতোর শব্দ। গলি দিয়ে একজন নগর-রক্ষী যাচ্ছে।

লোকটা ফিসফিস করে বলল, "চুপ"—

নিঃশব্দতা।

রক্ষীর পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেল। লোকটা কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করল, দরজাটা খুলে একবার বাইরের দিকটা ভাল করে দেখে নিল, তারপরে অরিন্দমের দিকে তাকিয়ে বলল, "চল্লাম দোস্ত—তুমি ঘুমোও"—

অরিন্দম জবাব দিল না।

লোকটা চলে গেল।

অন্ধকার। লোকটা খুনী। লাল রক্তে ভেজা ছিল তার কাপড়। ছোরা। হিংসা। ভালোবাসো, সবাইকে ভালোবাসো। কিন্তু কি বলল লোকটা? নররক্তের স্বাদ-পাওয়া পশুদের তো জয় করা যায় না। ক্ষুধা। সেও কি চুরী করবে? খুন করবে? না। ওরা হার মেনে শয়তানের নিয়মকে মেনে নেয় বলেই তো নিয়মটা পালটায় না, শয়তাণের রাজত্ব শেষ হয় না। অন্ধকার। কে? কেউ না। রাতের কোন প্রহর? অন্ধকার। আলো। আলোর কণা। জ্বলে আর নেভে—নেভে আর জ্বলে—ধীরে, ধীরে মন—মাদুরটা কোথায়? অন্ধকার—

সে হারবে না। তার অন্তরের প্রহরী কখনো ক্ষুধার কাছে পরাজয় স্বীকার করবে না। করুণা ও দয়া ভিক্ষা করে সে অন্ন চাইবে না। তাই ভোর হতেই আবার বেরোল অরিন্দম। কাজ চাই, তার কাজ চাই।

আবার রাজপথ। জনতা। কোলাহল।

সময় কাটে।

"কাজ আছে?"

"না!"

বড় বড় অট্টালিকা। সূর্যদেবের অগ্নিবান। দ্রুত ধাবমান গাড়ীঘোড়া। শব্দ। লোহা আর পাথরের সংঘাত। কঠিন জীবন। ক্ষুধা। আর পারা যায় না। তবু আহত কুকুরের মত চলতে হয়। চোখের সামনে সব কিছু মাঝে মাঝে দুলে ওঠে, নড়ে ওঠে, পায়ের নীচেকার পথকে মনে হয় অসমান। কানের পাশে ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাকের মত একটা একঘেঁয়ে শব্দ হতে থাকে। বেলা বাড়ে। না, কাজ নেই। চারদিকে শুধু দে'য়াল।

একটা ফ্যাক্টরী।

মস্ত বড় ফটক।

"কাজ আছে ?"

কে যেন বলল, "ভেতরে যাও, ঐ ঘরে।"

অন্ধের মত একটা ঘরে গিয়ে দাঁড়াল অরিন্দম।

"কি চাই ?" টেবিলের ওধার থেকে একজন লোক প্রশ্ন করল। লোকটার মুখ বারংবার ঝাপসা হয়ে যায়।

"কাজ"—টেনে টেনে জবাব দিল অরিন্দম।

লোকটা অনেক কিছু জিজ্ঞেস করল। যা মাথায় এল তাই জবাব দিল অরিন্দম। অজ্ঞানের মত।

"পঁচিশ টাকা মাইনে পাবে—রাজী ?"

"রাজী।"

একটা কাগজের টুকরো এগিয়ে দিল লোকটা, বলল, "কাল সকাল ন'টায় হাজিরা দেবে।"

"আচ্ছা।"—

হাৎড়ে হাৎড়ে রাস্তায় বেরিয়ে এল অরিন্দম। জয়ী। হে সূর্যদেব, আমি আমার ক্ষুধাকে জয় করেছি। জয় করেছি আমার মন দিয়ে, আত্মা দিয়ে। কিন্তু তবু ক্ষুধা শক্তিশালী—সে আমার কর্মকে হরণ করছে। এগোল অরিন্দম। পা বারংবার ভেঙ্গে যেতে

চাইল, বারংবার মাথাটা বুকের ওপর ঝুঁকে পড়তে লাগল, যন্ত্রণায় বারংবার মুখটা বিকৃত হতে লাগল। না, আর পারা যায় না। ওকি! ঝড় আসছে বুঝি? ভূমিকম্প? অন্ধকার—অন্ধকার। সূর্যদেব, তুমি কোথায়?

অরিন্দম টলতে লাগল, তারপর হঠাৎ রাস্তার ওপর পড়ে গেল।

কোলাহল। লোকেরা ছুটে এল।

"আরে লোকটা পড়ে গেল যে"—

"গরীব"—

"নীচু পাড়ার লোক"—

"চুক্ চুক্ চুক্—বেচারা!"—

"নাঃ, গরীবদের জন্য এবার চাঁদা তুলতেই হবে"—

"কিন্তু লোকটা কি বেঁচে আছে?"

"দেখুনতো মশাই"—

একজন লোক এসে সন্তর্পণে অরিন্দমের গায়ে হাত রাখল, তারপর মুখে বিষাদের ছায়া ঘনিয়ে বলল, "আহা"—

"কি হয়েছে মশাই?"—

"মরে গেছে।"

"মরে গেছে! রক্ষী ডাকুন—হয়ত কোনো বিষাক্ত ব্যাধিতে ভুগছিল লোকটা, নইলে কখনো চলতে চলতে মরে যায়?"

অরিন্দমকে স্পর্শকারী লোকটি লাফিয়ে উঠল।

"সত্যি, ভারী দুঃখের ব্যাপার।"

"লোকটার মৃত্যুসংবাদ একটা কাগজে পাঠিয়ে দেওয়া যাবে।"

ভীড় জমে উঠল।

হঠাৎ অরিন্দম একটু নড়ে উঠল। চোখের সামনে যেন অসংখ্য হায়েনার মুখ! ওরা কারা? সেই পুতুলের দেশে কি এখন অপরাহ্ন নেমেছে? রূপসী নদীর ওপারে হয়ত শালবনের ছায়া এখন

জীর্ণ হয়ে পড়েছে। প্রান্তরে হয়ত প্রজাপতিরা এখন তাদের মধুসিক্ত স্তিমিত চেতনা দিয়ে শুনছে বীজের প্রার্থনা। আর সেই রূপবান গায়ক হয়ত এখন মালবী রাগিনীকে মূর্তিমতী করে তুলেছে— অন্ধকার—

কোলাহল। লোকেরা সরে পড়তে লাগল।

"সরে পড়ুন মশাই"—

"কেন?"

"মরেনি ব্যাটা।"

"তাই নাকি? ইস্, খুব বেঁচেছি, আর একটু হলেই আমি জ্যান্ত মানুষকে দয়া করে ফেলতাম"—

"আরে বোকামী করবেন না মশাই। আজবনগরে জ্যান্ত লোকদের দয়া করতে নেই।"

"হেঁ হেঁ, বুঝেছি। মরা মানুষেরা ঢের ভালো লোক মশাই, কোন দাবীদাওয়া করে না তারা, শুধু চিতায় পৌঁছে দিলেই হল"—

"যা বলেছেন"—

"চলুন সরে পড়া যাক্"—

ভীড় যখন কমে যাচ্ছিল, ঠিক সেই সময় সেখানে এসে দাঁড়াল মুকুন্দ, অরিন্দমকে দেখে সে দ্রুতপদে তার পাশে হাঁটু গেড়ে বসল, তার হৃদস্পন্দন অনুভব করল, তারপর ডাকল, "অরিন্দম— অরিন্দমবাবু"—

জ্ঞান ফিরে এল।

অরিন্দম তাকাল। সে ঘরের ভেতর শুয়ে আছে। তার চারপাশে আছে বলরাম, দুর্গাবতী, মুকুন্দ, অমিতা, বাচ্চারা ও ললিতা। তার দৃষ্টি থেকে যেন অমৃত বর্ষিত হচ্ছে। সেই অমৃতের স্পর্শে যেন তার দুর্বলতা অন্তর্হিত হচ্ছে।

তাকে চোখ মেলতে দেখল সবাই।

ললিতার হাতটা এগিয়ে এল। একটা গেলাস।

"এই দুধটুকু খান"—

সবার দৃষ্টিতেই অনুরোধ। অমিতার চোখেও। আর ললিতার চোখে যেন আদেশ।

অরিন্দম গেলাসটাকে নিঃশেষ করল। আঃ। সমস্ত দেহে যেন জীবনের জীবাণুরা সচল হয়ে উঠল। সে ধীরে ধীরে উঠে বসল।

কারো দিকে না তাকিয়ে মৃদুকণ্ঠে, বিড়বিড় করে সে বলল, "বুঝলাম। মানব সভ্যতার ইতিহাস শুধু মানুষের ক্ষুধার ইতিহাস— আর ক্ষুধা দু'রকমের"—

তিন

একদল দানবের মত গর্জন করছে ফ্যাক্টরীর যন্ত্রগুলো। ইস্পাতের সঙ্গে ইস্পাতের সংঘাত, বাসুকী নাগের নিঃশ্বাসের মত শব্দ আর বয়লারের ভেতরকার জাগ্রত আগ্নেয়গিরির উত্তাপে ফ্যাক্টরী উত্তপ্ত ও কম্পিত। তার মধ্যে দু'হাজার নরনারী কাজ করছে। তাদের পরণে ছেঁড়া কাপড়, তাদের দেহে ঘাম ও কালি।

অরিন্দম ভাবছিল। হ্যাঁ, ক্ষুধাই মানব-সভ্যতার ইতিহাস রচনা করে। আর ক্ষুধা দু'রকমের। জঠরের ক্ষুধা ও আত্মার ক্ষুধা। কিন্তু দুই ক্ষুধার ফল আলাদা। জঠরের ক্ষুধা একটা প্রাকৃতিক নিয়ম, তা নিবৃত্ত করে মানুষ শুধু বেঁচে থাকে। আর নিছক বাঁচা একটা জান্তব ধর্ম। বাঘ, কুকুর, শেয়াল ও ইঁদুরেরাও সেই ধর্ম পালন করে, কারণ শুধু বেঁচে থাকারও একটা বিচিত্র আনন্দ আছে। ক্ষুন্নিবৃত্তি করে পৃথিবীর সমস্ত জীবন্ত প্রাণীই সেই আনন্দ ভোগ করে। আর তার ব্যতিক্রম হলেই বিপর্যয় ঘটে। প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যতিক্রম হলেই যেমন বিপর্যয় ঘটে তেমনি ঘটে ধ্বংস, বিপ্লব, রক্তপাত ও সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষ।

কিন্তু মানুষ শুধু বাঁচার জন্যে বাঁচে না। জঠরের ক্ষুধা নিবৃত্ত হলেও তার ক্ষুধা মেটে না। তার আত্মা দাবী করে আরো কিছু। সাহস, বুদ্ধি, স্নেহ, ভালবাসার জন্ম হয় সেই দাবী থেকে। মানুষ তার জান্তব অস্তিত্বের গণ্ডী পার হয়, তার আত্মাকে জাগ্রত ও প্রতিষ্ঠিত করে মানুষ হয়। তখন সে সৃষ্টি করে দর্শন ও সাহিত্য, জয় করতে চায় তার চারদিকের প্রাকৃতিক বাধাকে। নিছক বেঁচে থাকার আনন্দ এক রোমাঞ্চকর আনন্দের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।

একটা চাবুকের শব্দে অরিন্দমের চমক ভাঙল। সে তাকাল। সামনে একজন কর্মাধ্যক্ষ। খর্বকায়, মেদবহুল, হিংস্র।

"দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছ কিহে, এ্যাঁ?"

"আজ্ঞে কিছু না"—

"কাজ করো—"

"আজ্ঞে হাঁ—"

কর্মাধক্ষ্য মুখ বিকৃত করে বলল, "দশ বারো দিন হল কাজ করতে এসেছ আর এরি মধ্যে ফাঁকি দিতে শিখেছ!"

"আজ্ঞে?"

"যাও যাও কাজ করোগে—"

অরিন্দম নিঃশব্দে কাজে হাত দিল। কাঁচা লোহার তালগুলোকে একটা ঠেলাগাড়ীতে জড় করে একজায়গা থেকে আর একজায়গায় নিয়ে যেতে হয় তাকে।

ফ্যাক্টরী চলতে থাকে। একদল দানবের মত যন্ত্রগুলো গর্জাতে থাকে, তাদের পুঞ্জ পুঞ্জ বিষাক্ত কালো নিঃশ্বাস ফ্যাক্টরীর ধূম্রনল বেয়ে আকাশকে মলিন করে। ইস্পাতে ইস্পাতে কঠিন সংঘাতের একটানা শব্দ শোনা যায়—ধ্বক্ ধ্বক্—স্‌স্‌স্—ঠন্ ঠন্—স্‌স্‌স্—। সে শব্দে কানে তালা লাগে। আগ্নেয়গিরির আগুন জ্বলে বয়লারের গর্ভে। তার উত্তাপে লোহা গলে জলের মত হয়। বাষ্পের ফোঁস ফোঁসানি শোনা যায়। শোনা যায় গুরুভারবাহী যন্ত্র আর হাতুড়ীর শব্দ।

দু'হাজার লোক কাজ করে চলে। সন্ত্রস্ত অথচ ক্লান্ত তাদের ভঙ্গী। ঘামে ভিজে যায় তাদের চোয়ালভাঙা শীর্ণ দেহ, ভিজে যায় তাদের তেল-কালি-লাগানো ছেঁড়া জামাকাপড়। যন্ত্রের চাকার মত বারংবার ওঠানামা করে তাদের শিরযুক্ত মাংসপেশীগুলো। আর অসুস্থ একটা ঔজ্জ্বল্য মাঝে মাঝে তাদের ঘোলাটে চোখের তারায় চক্‌চক্ করে ওঠে।

কেন? আনন্দ নেই কেন? প্রাকৃতিক বাধাকে জয় করতে চায় মানুষ, তার সেই আশ্চর্য ইচ্ছার প্রতীক এই যন্ত্রগুলো। মানুষের শক্তির প্রতীক। তবু মানুষ নিরানন্দ মনে কাজ করছে কেন?

অরিন্দম পাশের লোকটির দিকে তাকাল। তার নাম ইন্দ্র। ভয়ঙ্কর লম্বা ও রোগা, তার বড় বড় দুটো চোখে বন্য দৃষ্টি আর এক মুখ দাড়িগোঁফ।

"শুনছ ভাই?" অরিন্দম ডাকল।

ইন্দ্র লোহার তালগুলো তুলতে তুলতেই বলল, "বলে যাও, কান খোলা আছে—"

"মানুষ শক্তিমান জীব—তার শক্তির নিদর্শন এই যন্ত্র, এই ফ্যাক্টরী—তবু এখানকার শ্রমিকেরা নিরানন্দ কেন?"

নিম্নকণ্ঠে হাসল ইন্দ্র বলল, "তুমি মাইরি একেবারে গেঁইয়া; আনন্দ থাকবে কি করে? যে যন্ত্র আমাদের ক্রীতদাস সে যে আজ আমাদের প্রভু হয়ে দাঁড়িয়েছে—?"

"তার মানে?"

চাবুকের শব্দ শোনা গেল। ডালকুত্তার মত লোলুপ সেই কর্মাধ্যক্ষ এসে সামনে দাঁড়াল।

"কি গুজ্ গুজ্ হচ্ছে, এ্যাঁ!"

বড় বড় দাঁত মেলে ইন্দ্র হাসল, বলল, "কিস্যু না হুজুর—আমাদের পাড়ার একটা মেয়ের কথা বলছিলাম অরিন্দমকে"—

কর্মাধ্যক্ষের চোখদুটো চকচক করে উঠল, "মেয়ে? কোন মেয়ে? কি রকম মেয়ে?"

"এজ্ঞে টগর—পনেরো ষোল বছর বয়েস—কি বলব হুজুর—মুণ্ডু ঘুরে যায়। আহা—"

"তার কে আছে?"

ইন্দ্র গলার স্বর নামিয়ে বলল, "মা ছাড়া তার আর কেউ নেই হুজুর আর টাকার চাহিদাও আছে খুব—"

কর্মাধ্যক্ষ ঠোঁট বাঁকিয়ে হাসল, ছোট ছোট চোখ দুটোকে আরো ছোট করে বলল, "তোমার বাড়ীতে আজ যাবো ইন্দ্র, বুঝলে?"

"এজ্ঞে হ্যাঁ—"

"রাতে—নটার পর—"

"এজ্ঞে হ্যাঁ—"

"কাজ করো—"

কর্মাধ্যক্ষ চলে গেল।

ইন্দ্র সাপের মত ফোঁস করে বলল "শালা—শালা লুচ্চা—"

অরিন্দম অবাক হল "তার মানে? আর কি সব বাজে কথা বলছ তুমি?"

ইন্দ্র হাসল, বলল, "বাজে কথা! ওদের কাছে ওইটেই কাজের কথা। মেয়েছেলের গন্ধ পেলে শালারা ক্ষেপে যায়?"

"কিন্তু—রাতে যে যাবে বলল?"

"যাক্‌না। টগরদের অভাব নেই। শালা লুচ্চা—শালাদের জানোয়ারের মত খাওয়া আর কুকর্ম ছাড়া অন্য কোন কাজ নেই।"

অরিন্দম কথাটা চাপা দিয়ে বলল, "কিন্তু আমার প্রশ্নের জবাবটা শেষ করোনি ইন্দ্র—যন্ত্র আমাদের প্রভু হয়েছে কেন?"

ইন্দ্র কপালের ঘাম মুছে হাসল, বলল, "বুঝতে পারোনি? যন্ত্রকে আমরা চালু রাখি এবং সেইজন্যই যন্ত্র আমাদের অনবরত খাটায়, শোষণ করে। কিন্তু যন্ত্র আমাদের ওপর প্রভুত্ব করে আর একজনের জন্য—"

"সে কে?"

"সে ধনবান। তার আর এক নাম মালিক। প্রকৃতিকে জয় করার সমস্ত জ্ঞান ও যন্ত্রকে সে চক্রান্তবলে নিজের করতলগত করে নিয়ে লক্ষ লক্ষ লোককে দুর্ব্বল করে শোষণ করে।"

"ভাই সব—শোন—"

রুগ্ন, শীর্ণকায় একটা লোক এসে তাদের পেছনে দাঁড়াল, ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল, "আজ রাতে—মনিশঙ্করের ওখানে আমাদের সঙ্ঘের আলোচনা হবে—তোমরা এসো—বুঝলে ?"

লোকটার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ যেন একটা খোলা তলোয়ারের কথা কথা মনে পড়ল অরিন্দমের।

আর ঠিক সেই সময়েই ফ্যাক্টরীর প্রহরী বন্দুক কাঁধে আসতে আসতে ঘোষণা করল, "হুঁসিয়ার হয়ে যাও—হুঁসিয়ার—হাজার হাজার নরনারীর ত্রাণকর্তা, অন্নদাতা, প্রাণদাতা ও পরম দয়ালু মালিক শ্রীচতুরলাল আসছেন—"

"চুপ—"

"চুপ—"

"হুঁসিয়ার হয়ে যাও—হু-সি-য়া-র—"

মুহূর্তে ঘরের চেহারা বদলে গেল। যে যার কাজে তপস্বীর মত মনোযোগ দিল। অতিভক্ত কর্মাধ্যক্ষের চাবুক ঘন ঘন বাতাসকে কাটতে সুরু করল। অরিন্দম, ইন্দ্র এবং সেই রোগা লোকটাও কাজে মন দিল।

চতুরলালকে দূরে দেখা গেল। তাকে দেখে সবাই আড়নয়নে পরস্পরের দিকে তাকাল। যেন তারা নিঃশব্দে বলাবলি করল যে চতুরলালকে তারাই তৈরী করেছে। তাদের রক্ত মাংসকে শোষণ করেই চতুরলালের মেদসমৃদ্ধ, নবনীত কোমল, সোনা হীরে আর মূল্যবান পোষাকে মোড়া দেহটা গড়ে উঠেছে।

চতুরলাল কাছে এগিয়ে এল। মোটা, গৌরবর্ণ, খড়্গের মত নাক, বাজপাখীর মত চোখ, চারটে হীরের আংটি দুহাতে আর গলায় তার মোতির মালা।

অরিন্দম অবাক হয়ে দেখতে লাগল। চতুরলাল এসে থামল।

ফ্যাক্টরীর কর্মাধ্যক্ষেরা এবং দালাল নামক অভিভক্তেরা এসে সসম্ভ্রমে তার চারিদিকে হাঁটু গেড়ে বসল।

চতুরলাল তাদের ওপর একবার নজর বুলিয়ে নিয়ে ভুরু কুঁচকাল, তারপর বলল, "তোমরা সবাই শালা—"

ভক্তেরা বিগলিত হয়ে মাথা নাড়ল, "আজ্ঞে হ্যাঁ—"

"শালার বেটা শালা—"

"আজ্ঞে হ্যাঁ—"

"আর বাকী সব মজুরেরা সবাই কুত্তা—শুয়োরের বাচ্চা—"

"ঠিক বলেছেন হুজুর—"

চতুরলাল থামল: তারপর এদিক ওদিক তাকিয়ে বলল, "আমি থুথু ফেলব—"

অভিভক্তেরা হাত পেতে বলল, "ফেলুন হুজুর—"

চতুরলাল থুথু ফেলল, রুমাল দিয়ে মুখ মুছে বলল, "শোন জানোয়ারেরা—"

ভক্তেরা হাতজোড় করল, "বলুন হুজুর, বলুন—"

চতুরলাল পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে নাড়তে নাড়তে বলল, "বিশেষ জরুরী কথা। গত বছর আমার চারটে ফ্যাক্টরীর মুনাফা ছিল ছ'কোটি, এবছর আমার মুনাফা হয়েছে সাতকোটি—কিন্তু তবু আমার লোকসান হবে। কেন জানো? আমার খরচ বেড়েছে।" সুতরাং সব দিক সামলাতে হলে আমাকে মুনাফাও বাড়াতে হবে—"

"খক্ খক্ খক্—খক্ খক্ খক্—"

"কে কাশে?" চতুরলাল গর্জে উঠল।

তবু কাশি থামল না। একটানা ভাবে কে যেন কেশেই চলেছে। খক্ খক্ খক—খক্ খক্ খক্—খক্ খক্ খক্।

আবার গর্জাল চতুরলাল, "কে? কে কাশ্‌ছে?"

একটানা কাসির শব্দ। সুপরিচিত কুৎসিৎ কাশি। চতুরলালের

গর্জনে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল শ্রমি[illegible] তাদের একাংশ একপাশে সরে দাঁড়াল। হাড়-জিরজিরে প্যা[illegible]র মত দেখতে, কোটরগত দুটো বিবর্ণ বড় চোখে তার অস্থির কাকুতি। সে-ই কাশছে।

লোকেরা সরে যেতেই বুড়োর চতুরলালের ওপর নজর পড়ল। চোখের তারায় ভয় ঘনাল তার। কাশি থামাবার জন্য সে মুখে হাত চাপা দিল। কাশি থামল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই আঙুলের ফাঁক দিয়ে দিয়ে লাল রক্ত চুঁয়ে চুঁয়ে পড়তে লাগল, শরীরটা থরথর করে কেঁপে উঠল।

শিউরে চীৎকার করে উঠল চতুরলাল, "যক্ষা! কি সংঘাতিক কথা! শিগ্‌গীর সরাও ওকে—শিগ্‌গীর বরখাস্ত করো—জল্‌দি—"

বুড়ো কেঁদে উঠল হাউহাউ করে, "হুজুর, মালিক—দোহাই আপনার—বরখাস্ত করবেন না হুজুর—চাকরী গেলে কি খাবো হুজুর?"

চতুরলাল হাসল, "কি কথা! কি খাবে তা আমি কি বলব বাপু—"

"মরে যাব হুজুর—"

"পৃথিবীতে কেউই বেঁচে থাকে না।"

"হুজুর আমার দিকে তাকান—"

"না বাপু, তোমার দিকে তাকালে আমার স্বাস্থ্য খারাপ হবে—"

"ভগবান আপনার মঙ্গল করবেন হুজুর—"

চতুরলাল হাসল, "ভগবান! আমিই তো ভগবান—না কি বল হে?" অতিভক্তদের দিকে তাকাল সে।

অতিভক্তেরা আবেগাপ্লুত কণ্ঠে ধ্বনি তুলল, "নিশ্চয়ই। আপনিই তো স্বয়ং ভগবান হুজুর—যুগে যুগে আপনিই তো অবতার হয়ে আসেন—"

বুড়ো তবুও হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, "আপনার ফ্যাক্টরীতে কুড়ি বছর কাজ করছি হুজুর—"

"তাতো করবেই। তুমি কেন, হাজার হাজার লোকেরা করবে। আমার ক্রীতদাসত্ব করার জন্যেই তো তোমরা জন্মেছ"—

"হুজুর—হুজুর"—

হঠাৎ ক্ষিপ্তের মত ফ্যাক্টরী কাঁপিয়ে গর্জে উঠল চতুরলাল, "নিয়ে যাও—ওকে ভাগাও—কুত্তারা সব দাঁড়িয়ে আছিস কেন।"

কর্মাধ্যক্ষ ও অতিভক্তেরা বুড়োর দিকে ছুটে গেল। উত্তেজিত শিকারী কুকুরের মত।

"বেরো"—

"বেরিয়ে যা বুড়ো"—

"তুই অসুস্থ"—

"তোর দরকার নেই"—

"তুই মর"—

বুড়োকে টানতে টানতে তারা ফ্যাক্টরীর বাইরে রেখে আবার ফিরে এল। বুড়ো যেখানে বসে রক্তবমি করেছিল সেখানে তারা ওষুধ ঢেলে দিল, ওষুধের তীব্র গন্ধটা সবার নাকে ভেসে এল।

চতুরলাল সেই কাগজের টুক্‌রোটা নাড়তে নাড়তে আবার বলতে শুরু করল, "হ্যাঁ যা বলছিলাম। আমার মুনাফা এবারে দশ কোটি করতে হবে। কেন শুনবে? আমার খরচ বেড়েছে। বুঝতে পারছ না, মদ মেয়েমানুষের দাম অনেক—তাছাড়া আরো দু'তিনটে ব্যবসা ফাঁদব, আজবনগরের কর্তা হবার চেষ্টা করব, আত্মপ্রচারের জন্য টাকা ঢালতে হবে—অনেক খরচ। সুতরাং ফাঁকি দিলে চলবে না—রোজ আরো দু'ঘণ্টা করে তোমাদের বাড়তি খাটতে হবে"—

শ্রমিকেরা অস্ফুটকণ্ঠে বলে উঠল, "আরো দুঘণ্টা!"—

চতুরলাল দাঁত খিঁচিয়ে উঠল, "হ্যাঁ, আরো দুঘণ্টা—যার পোষাবে না—সে চলে যেতে পারে। বাজারে ক্রীতদাসের অভাব নেই—। আর শোন, কাল থেকে শতকরা পাঁচ টাকা করে মাইনে কমল তোমাদের"—

শ্রমিকেরা আর্তনাদ করে উঠল, "না-না—আমাদের মাইনে কমাবেন না হুজুর"—

"চোপ্ রও জানোয়ারেরা"—

শ্রমিকেরা চুপ করল। শুধু অরিন্দমের পার্শ্ববর্তী সেই রুগ্নকায়, শীর্ণ লোকটা উত্তেজিত হয়ে পা বাড়াল।

ইন্দ্র লোকটির হাত চেপে ধরে চাপাগলায় বলল, "পাগ্লামী করোনা শোন"—

লোকটা পাগলের মত হাত ছাড়িয়ে সবাইকে ঠেলে সামনে এগিয়ে গেল, চতুরলালের মুখোমুখী গিয়ে দাঁড়াল।

"হুজুর, একটা কথা"—

"বল"—চতুরলাল ভুরু কুঁচকে তাকাল তার দিকে।

শীর্ণ লোকটার চোখে যেন তলোয়ার ঝলসাল, সে বলল, "আপনি আমাদের মানুষ মনে করেন না—তাই না ?"

চতুরলাল তার দিকে রোষকষায়িত লোচনে তাকাল, মাথা নেড়ে বলল, "মানুষ! কি সাংঘাতিক কথা! তোমরা মানুষ! কখনো না—?"

"কিন্তু কেন ?"

"কারণ তোমরা মানুষ নও। গরীবেরা কখনো মানুষ হয়না"—

"শোন চতুরলাল"—

চতুরলাল লাফিয়ে উঠল, "কি বললি !"

অতিভক্তেরাও লাফিয়ে উঠল, "কি বললি !"

শীর্ণ লোকটা দাঁত মেলে হাসল, বলল, "সাবধান হও চতুরলাল, কে মানুষ আর কে জানোয়ার তার বোঝাপড়া এবার শিগ্গীরই হবে—"

কর্মাধ্যক্ষেরা চাবুক চালাল, বাতাসে যেন বিষাক্ত সাপের হিস্‌হিস্ শব্দ শোনা গেল। শীর্ণকায় লোকটার চামড়া কেটে রক্ত বেরোল। তবু সে বলল, "চতুরলাল, তুমি জানোয়ারেরো অধম—"

"মারো, ওকে মেরো ফেলো—" চতুরলাল হিংস্রভাবে আদেশ করল।

কর্মাধ্যক্ষ ও অতিভক্তেরা ছুটে গেল শীর্ণ লোকটার দিকে, ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর। ঐশ্বর্য আর পশুত্বের কাছে সর্বস্ব বিকিয়েছে যারা তারা লোকটার গলা টিপে ধরল।

"মারো—শালাকে মেরো ফেলো—"

অসহায়, রুগ্ন লোকটার দুর্বল প্রতিরোধ ব্যর্থ হয়ে গেল। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই তার দেহ নিস্পন্দ হয়ে গেল, বড় বড় চোখ দুটো যন্ত্রণায় আরো বিস্ফারিত ও স্থির হয়ে গেল।

একজন কর্মাধ্যক্ষ মৃদু হেসে বলল, "সাফ করেছি হুজুর—"

চতুরলাল এগিয়ে গেল শবদেহটার কাছে, তার গায়ে একটা পদাঘাত করে বলল, "শালার কি সাহস দেখেছ! এঁ্যা! ঠিক আছে, রাস্তায় ফেলে দাও ওটাকে আর নগররক্ষীদের একটা খবর দাও যে আমাকে খুন করতে এসেছিল বলেই প্রাণ গেল লোকটার—"

"আজ্ঞে আচ্ছা—"

"আমি চল্লাম—আমার কথা মনে রেখে কাজ করো জানোয়ারেরা—"

চতুরলাল চলে গেল। তার পেছনে সেই বন্দুকধারী প্রহরী। দু'জন অতিভক্ত শীর্ণ লোকটার শবদেহকে বাইরে ফেলে দেবার জন্য টানতে টানতে নিয়ে গেল।

কর্মাধ্যক্ষেরা চাবুকের ঘায়ে বাতাস কেটে বলল, "কাজ করো—কাজ করো সবাই—"

নিঃশব্দে সবাই কাজ শুরু করল। নির্বাক পাথরের মত।

অরিন্দমও কাজ করতে লাগল।

ফ্যাক্টরীর লৌহ-দানব গর্জাতে থাকে। সবাই নিঃশব্দে কাজ করে। কিন্তু তাদের অন্তরেও একটা দানব গর্জাচ্ছে।

চাপাগলায় ইন্দ্র বলল, "এবার বুঝতে পেরেছ অরিন্দম—কেন আমরা নিরানন্দ?"

অরিন্দম মাথা নাড়ল।

ইন্দ্র বলে চলল, "ঐ সব ঐশ্বর্যবান শক্তিমদমত্তদের জন্মই আমাদের এই দুর্দশা—মানুষের মাঝে এই অসাম্য। ক্রমেই বুঝতে পারবে সব। বুঝতে পারবে যে ওদের জন্যই মানুষ এগোতে পারছে না, পশুত্বের সীমা লঙ্ঘন করতে পারছে না—"

একজন যুবক কাছে এল, ফিস্‌ফিস্ করে বলল, "তোমার আমার চোখের সামনে একজনকে হত্যা করল ওরা সেকথা ভুলো না আজ রাতে সন্ধ্যে মণিশঙ্করের ওখানে—অবশ্যই আসবে—অবশ্যই—"

সে এগিয়ে গেল আর একজনের কাছে। সবাই কান পেতে শুনল সে কথা। দু'হাজার লোকের চোখে যেন ছাইচাপা আগুন ধিকি ধিকি জ্বলতে লাগল।

কাজ চলতে থাকে। যন্ত্রও চলতে থাকে। লৌহদানবেরা গর্জায়। বিরাট বিরাট লোহার চাকা ঘোরে, ইস্পাতের সঙ্গে কঠিন ইস্পাতের সংঘাতে ফ্যাক্টরী কাঁপে, বয়লারের উত্তাপে চামড়া পুড়ে যেতে চায়। দু'হাজার লোকের মাংসপেশীগুলো অতিশ্রমে অবশ হয়ে আসে, শরীর ঘামে ভিজে যায়, কালিতে কলঙ্কিত হয়ে ওঠে আর গগনস্পর্শী ধূম্রনল বেয়ে যন্ত্রদানবের কালো নিঃশ্বাস আকাশকে অশুচি করে।

ঝক্-ঝক্-ঠক্-ঠক্—ধ্বক্-ধ্বক্—ঠন্-ঠন্—একটানা শব্দ হতে থাকে। ব্যস্ত, ত্রস্ত পদক্ষেপ, পঞ্চাশ মণি হাতুড়ির শব্দ, বাষ্পের ফোঁসফোঁসানি—তালে তালে চলতে থাকে। যেন দ্রুতলয়ে কেউ ভৈরব রাগের আলাপ করছে। এখন ক'টা? কোন প্রহর? রূপসী নদীর ধারে কি এখনো অপরাহ্নের রোদ রঙীন হয়ে ওঠেনি?

সন্ধ্যার অন্ধকারে ফ্যাক্টরীর কর্কশ বাঁশি বেজে উঠল। ক্লান্ত শ্রান্ত, ঘর্মাক্ত মানুষেরা কাতারে কাতারে বাইরে বেরোল। মাথা ঝিম্‌ঝিম্ করছে তাদের, কানের কাছে তখনো যেন লোহার দানবেরা গর্জাচ্ছে।

বেরোতেই ইন্দ্র এসে দাঁড়াল পাশে, ফিস্‌ফিস্ করে প্রশ্ন করল, "সভ্যে যাবে না?"

অরিন্দম মাথা নাড়ল, "যাব—"

"চল—"

দুজনে এগোল। উঁচুপাড়ার অট্টালিকা ও আলোক-সমারোহকে পেছনে ফেলে তারা নীচুপাড়ার সীমানায় এসে পড়ল। আঁকাবাঁকা গলি আর রাস্তার মধ্যে কাঁচা কয়লার ধোঁয়া যেন মূর্চ্ছাহত কুয়াশার মত স্থির হয়ে আছে। তার মাঝে টিমটিমে ভৌতিক আলো। চারদিকে কবরের গন্ধ। শবযাত্রীদের মত শ্রান্ত, ক্লান্ত নরনারীর মিছিল। সব অতিক্রম করে তারা নীচুপাড়ার সীমান্তে এসে থামল।

একটা কানা গলির শেষে একটা ভাঙ্গা পুরোন বাড়ী। বাষ্পীয় আলোক থেকে অনেক দূরে—আবছা অন্ধকারে।

ইন্দ্র ফিস্‌ফিস্ করে বলল, "দাঁড়াও—"

বাইরের ঘরে একটা কেরোসিনের কুপি জ্বলছিল। সেই ঘরে ছিল দু'জন লোক। অরিন্দম একজনকে চিনল। তাদের ফ্যাক্টরীর একজন যুবক সহকর্মী। অপরজন প্রৌঢ়, ইস্পাতের মত ধারালো তার চোখমুখ, শক্ত তার দেহের কাঠামো। মাথায় টাক, মুখে ছোট্ট দাড়ি আর গোঁফ।

ইন্দ্র বলল, "ওরি নাম মণিশঙ্কর অরিন্দম—আমাদের একজন নেতা—"

সহকর্মী যুবকটি মণিশঙ্করের দিকে তাকিয়ে বলল, "আমাদের লোক—"

মণিশঙ্কর মৃদু হেসে বলল, "সোজা ভেতরে যাও—অন্দরমহল পেরিয়ে, খিড়কির দরজা দিয়ে পেছনকার জঙ্গলে যাও—"

অরিন্দম ও ইন্দ্র এগিয়ে গেল নির্দেশমত।

চলতে চলতে ইন্দ্র বলল, "বুঝলে? স্ত্রীপুত্র সব খুইয়েছেন মণিশঙ্কর—শাসকদের খপ্পর থেকে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন উনি আমাদেরই মঙ্গলের জন্য—"

শুনে অরিন্দমের চোখে শ্রদ্ধার ছায়া ঘনাল। তাহলে মানুষ আছে!, অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য প্রহরী আছে! আবছা আবছা মনে পড়ে। সে-ও যেন এক প্রহরী ছিল—তার হাতে ছিল একটা বাঁকা তলোয়ার—

"চেয়ে দেখ—"

অরিন্দম তাকাল। একটা জঙ্গল। বড় বড় আমজামের গাছ। আগাছা আর ঝোপঝাড়কে কেটে পরিষ্কার করা হয়েছে। সেখানে প্রায় হাজার খানিক লোক। তাদের সামনের দিকে ছোট্ট একটা বেদীর মত, তার পাশে একটা অত্যুজ্জ্বল আলো। মৃদুকণ্ঠে কথা বলাবলি করছে সবাই। তাদের সেই গুঞ্জনধ্বনির সঙ্গে ঝিঁঝিঁ পোকাদের মধ্যম লয়ের ঐক্যতান মিশে যাচ্ছে।

অরিন্দম আর ইন্দ্র একপাশে বসল। হঠাৎ পেছন থেকে কে যেন অরিন্দমের কাঁধে হাত দিল। অরিন্দম ফিরে তাকাল। মুকুন্দ।

"তুমি!" অরিন্দম খুশী হয়ে হাসল।

"চুপ্!" মুকুন্দ ঠোঁটে হাত দিয়ে ফিস্‌ফিস্ করে বলল, "আস্তে।"

"কেন?"

"সত্যের ও ন্যায়ের শত্রুরা বাতাসেও ভেসে বেড়ায়।"

"তাতে ভয়ের কি?"

"তৈরী হওয়ার আগেই যে ধরা পড়ে যাবে?"

"হুঁ—"

"তুমি এসেছ দেখে খুশী হলাম।"

"কেন আসব না? সত্য ন্যায় এবং শান্তির জন্যই তো আমার জন্ম।"

"তুমি লক্ষী ছেলে।"

চারপাশ থেকে মৃদুকণ্ঠের সতর্কবাণী উত্থিত হল, "চুপ করো—সভা সুরু হল"—

নিঃশব্দতা। বেদীর ওপর মনিশঙ্কর এসে দাঁড়াল। সমাহিত তপস্বীর মত, ধূম্রহীন আগ্নেয়গিরির মত, বজ্রগর্ভ প্রশান্তির মত।

মণিশঙ্কর একবার তাকাল চারদিকে, তারপর ধীরে ধীরে বলতে শুরু করল, "ভাইসব, আমাদের এবার তৈরী হতে হবে। পশুশক্তির অত্যাচার সইবার ক্ষমতা আর আমাদের নেই—"

অরিন্দম তাকাল চারদিকে। সত্যপিপাসু জনতার মুখে কি বিচিত্র আলো, কি আশ্চর্য্য জ্যোতি তাদের চোখে!

একটার পর একটা কথা বলে চলল মণিশঙ্কর। একটার পর একটা অগ্নিমন্ত্র উচ্চারণ করে চলল সে। পৃথিবীতে অশুভের রাজত্ব কায়েম হয়ে আছে। সেই বর্বরযুগ থেকে মানুষ মানুষ হবার চেষ্টা করছে, কিন্তু পারছে না। শুধু মুষ্টিমেয়ের জন্য। তারা পশুবৃত্তির তাড়নায় চিরকাল প্রভুত্ব করার লোভে সমাজগঠন করেছে, জাতিবর্ণের সৃষ্টি করেছে, ধর্মের প্রতিষ্ঠা করেছে, নীতিবাক্য রচনা করেছে, সভ্যতার নামে বিচিত্র ধন-তন্ত্রের সৃষ্টি করেছে। মানুষের ক্ষুধার সুযোগ নিয়ে তাদের তারা শৃঙ্খলিত করেছে, কুসংস্কার, অশিক্ষা ও ব্যাধির চাপ দিয়ে তাদের শোষণ করে চিরকাল দাসত্ব করতে বাধ্য করেছে। দার্শনিকের দর্শন, বৈজ্ঞানিকের আবিষ্কার, মহাপুরুষদের বাণীকে তারা নিজেদের লালসা চরিতার্থ করার ব্যাপারে প্রয়োগ করেছে। নিজেদের শক্তি অক্ষুন্ন রাখার জন্য তারা শান্তি বজায় রাখার নামে গড়েছে সৈন্যদল। কিন্তু মানুষ পাথর নয়। দারিদ্র, অশিক্ষা, ব্যাধি ও অত্যাচারের একটা অনিবার্য শিক্ষা আছে।

সেই শিক্ষায় মানুষ উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছে, তারা বুঝতে পেরেছে যে তাদের জ্ঞান চাই, তাদের অভাব দূর করতে হবে, নীরোগ হতে হবে, মুক্ত হতে হবে। তাদের চারদিকে যে বিচিত্র চক্রান্তজাল দীর্ঘকাল ধরে বিছানো রয়েছে তা তারা দেখতে পেয়েছে। তাই তারা আর সহ্য করবে না। পথ এক। যে মুষ্টিমেয় পশুরাজেরা তাদের পশুবৎ গণ্য করছে তাদের তারা ধ্বংস করবে। কিভাবে তা জানা কঠিন নয়। কারণ মহৎ ইচ্ছার ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতা আছে। শূণ্যতার মধ্যেও সেই ইচ্ছা ব্রহ্মাণ্ডকে সৃষ্টি করতে পারে। সুতরাং সবাইকে তৈরী হতে হবে। ইস্পাতের মত কঠিন ও নির্দয় হওয়ার ব্রত পালন করতে হবে।

একটার পর একটা অগ্নিক্ষরা কথা। দেহের মধ্যে রক্তের স্রোত যেন উদ্দাম হয়ে উঠল, পেশীগুলো যেন পাথর হয়ে উঠল, হৃদয়ের মধ্যে যেন কেউ অনেকদিনের ঘুম থেকে জেগে উঠল, চোখের মধ্যে যেন মধ্যাহ্ন-সূর্যের দীপ্তি ঝলমাল। হ্যাঁ, ব্রতপালন কওতে হবে, মানুষকে মানুষ হতে হবে।

সভা সাঙ্গ হল। কয়েকদিন পরে আবার মিলিত হবে সবাই। তাদের তৈরী হতে হবে। সবাইকে তৈরী করতে হবে। তারপর তারা মালিকদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে সংগ্রাম শুরু করবে।

নিঃশব্দে, একে একে সবাই বেরিয়ে যেতে লাগল। অরিন্দমও বেরোল।

গলিতে নামতেই মুকুন্দ এসে দাঁড়াল পাশে, বলল, "চল, আমিও যাই।"

নিঃশব্দে চলে দু'জনে।

একটা বাষ্পীয় আলোক পার হয়ে আর একটা বাতি আসে। তাদের

ছায়া দুটো বড় হয়, ছোট হয়, বড় হয়—। ক্লান্তিতে অবয়বহীন ছায়ামূর্তির মত মানুষেরা চলে। নর্দমার পাশ দিয়ে ছুঁচোরা দৌড়ে পালায়। সস্তা মদ খেয়ে টলতে টলতে বাড়ী খোঁজে অনেকে।

"অরিন্দম—"

"উঁ?"

"কয়েকজন মানুষ মিলে পৃথিবীকে কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করে তা বুঝতে পারলে?"

"খানিকটা।"—অন্যমনস্কভাবে অরিন্দম জবাব দিল, পাল্টা প্রশ্ন করল, "কিন্তু—কিন্তু মানুষকে সচেতন করে, শিক্ষিত করে কি মানুষ করা যায় না?"

"যায়—কিন্তু তা টেঁকে না। কারণ মানুষ হয়ে বেশীদিন তুমি বাঁচতে পারবে না। সমাজব্যবস্থার এমনি মজা যে তোমাকে মনুষ্যত্ব বিক্রি করে জন্তু হয়ে বাঁচতে হবে। অতএব স্থায়ীভাবে মানুষ হতে গেলে তোমাকে সঙ্ঘবদ্ধ হতেই হবে—সংগ্রাম করে বিষবৃক্ষের শিকড়কে তুলতেই হবে—"

অরিন্দম জবাব দিল না, নিঃশব্দে সে শুধু চলতেই লাগল।

হঠাৎ মুকুন্দ বলল, "থামো অরিন্দম—"

অরিন্দম থামল, "কেন?"

মুকুন্দ মৃদু হেসে বলল, "আমার সঙ্গে একজায়গায় চল।"

"কোথায়?"

"শক্তিমানদের আইনকানুন আর ন্যায়নীতির আর একটা দিক দেখাব তোমাকে। এসো—"

"রাত হয়েছে—"

"হোক্‌না একটু, কি যায় আসে?"

"ক্ষিদে পেয়েছে—"

"কিছুমিছু খাওয়া যাবে। এসো"—

"চল"—

ক্ষুধা। অরিন্দম হাসল। সত্যি কি তাই? মোটেই না। মনের নিভৃতে কিন্তু আর একটা কথা। একটা আকণ্ঠ পিপাসা। একটা কামনা। নীচুপাড়ার অন্ধকারে মানুষের আত্মা জাগ্রত হ'চ্ছে, সেই আত্মার ঘোষণা শোনার পরই একবার ললিতাকে দেখতে ইচ্ছে করছিল। যেন অজস্র পুষ্প-গরবিণী ঋতু বসন্ত। বহুদূরের সেই মনিমাণিক্য খচিত আশ্চর্য জগতের এক নর্তকীর মত—যার নৃত্যরত পদক্ষেপে ফুল ফোটে, কোকিল ডাকে, তুষার গলে জল হয়—

"এদিকে এসো—"

অরিন্দম সবিস্ময়ে বলল, "আবার যে উঁচুপাড়ার কাছে এলে?"

"হ্যাঁ, এখানেই—ওই লাল আলোর হরফে লেখা দোকানে"—

"বাবু ভোজনালয়?"

"হ্যাঁ।"

নীচুপাড়া আর উঁচুপাড়ার সংযোগস্থলে একটা দ্বিতল বাড়ী। বাড়ীটার একপাশ থেকে একটা সুদীর্ঘ স্তম্ভ আকাশের দিকে উঠে গেছে স্তম্ভের গায়ে কেল্লার ছবি আঁকা অসংখ্য কেল্লা। রাস্তা থেকে অনেক গুলো প্রশস্ত সিঁড়ির সারি পেরিয়ে ভেতরে ঢুকতে হয়। বাইরের দিকে ডাইনে বাঁয়ে সুসজ্জিত দ্বার-রক্ষী। তারা উদ্ধত বিনয়ের সঙ্গে হাত তুলে অভিবাদন করল।

ঢুকতেই মস্ত বড় হলঘর। তার দরজার গোড়ায় গিয়ে মুকুন্দ থামল। অরিন্দমও থামল।

"মুকুন্দবাবু—আরে ও মশাই—"হলঘরের একপাশ থেকে ডাক শোনা গেল। মুকুন্দ তাকাল সেদিকে, মৃদু হেসে এগোল।

"ওকে?" অরিন্দম প্রশ্ন করল।

"আজবনগরের একজন নামজাদা লেখক, আমার সঙ্গে আলাপ আছে—"

মুকুন্দ গিয়ে দাঁড়াল সেই লোকটির কাছে।

"নমস্কার ললিতবাবু—"

ললিতকুমার মিষ্টি করে হাসল, "আঃ। বসুন—তারপর, কি খবর?"

মুকুন্দ বসল, অরিন্দমকে বসতে বলে সে ললিতকুমারের দিকে তাকিয়ে বলল, "ইনি আমার বন্ধু অরিন্দম ললিতবাবু—আপনার পরিচয় উনি জানেন—"

"বটে! নমস্কার অরিন্দমবাবু—আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান বলে মনে করছি।"

অরিন্দম বিনীতভাবে হাসল। তার দু'চোখে শ্রদ্ধা ঘনাল। লেখক! শিল্পী! মানুষের আত্মাকে চিরজাগ্রত রাখার গুরুতর দায়িত্ব যার ওপর! বাঃ!

ললিতকুমার মুকুন্দের দিকে তাকাল, "তারপর? কি খবর বলুন?"

"আর খবর—বুঝতেই তো পারছেন"—

"হ্যাঁ, তা পারছি বৈকি—সময় বড় খারাপ—সত্যি"—

অরিন্দম তাকাল। বিরাট হলঘর। তার মাঝে বড় বড় স্তম্ভ। দেয়ালের রং হালকা নীল, তার গায়ে পাখী, ফুল আর অর্দ্ধ-বিবসনা সুন্দরী নারীদের লাস্যময়ী ছবি। অনেকগুলো টেবিল আর তার চার-দিকে চেয়ার। বহুরকমের নরনারী। সামনে একটি যুবক একটি যুবতীর দিকে তাকিয়েই আছে। দু'জনেরই সামনে সোনালী চা। যুবতী চা পান করছে, যুবক তাই নিষ্পলকনেত্রে চেয়ে দেখছে, নিজের চা খেতে সে ভুলে গেছে। হাসি, গুঞ্জনধ্বনি, [illegible]কার। পানীয় ও খাদ্যবাহকদের ত্রাস্ত চলাফেরা। নেপথ্য থেকে ভেসে আসছে চটুল বাদ্য-যন্ত্রের ধ্বনি। বিচিত্র পরিবেশ।

"খান অরিন্দমবাবু"—ললিতকুমারের গলা শোনা গেল।

অরিন্দম তাকাল সামনে। এক পাত্র খাবার। সে বিনীতভাবে হাসল। চমৎকার লোক ললিতকুমার। দীর্ঘকায়, সুদর্শন যুবক ললিত-

কুমার। তার সারা দেহে যেন তার শিল্পীমনের ব্যঞ্জনা। টানা টানা চোখ, কোঁকড়ানো চুল, টকটকে রং।

"হিমালয়ের এক দুর্গম অঞ্চল নিয়ে যে উপন্যাসটি লিখেছেন—তা অপূর্ব হয়েছে ললিতবাবু"—মুকুন্দ মুগ্ধকণ্ঠে বলল।

বিদগ্ধ হাসি হেসে ললিতকুমার বলল, "আপনার ভালো লেগেছে! ধন্যবাদ"—

"আচ্ছা, আপনি কি ঐ দুর্গম অঞ্চলে কখনো গিয়েছিলেন?"

ললিতকুমার মৃদু মৃদু হাসতে লাগল।

"নিশ্চয়ই গিয়েছিলেন তা নইলে ওখানকার মানুষদের নিয়ে অত নিখুঁতভাবে লেখা সম্ভব হত না"—

ললিতকুমার একটু ঝুঁকল, চাপাগলায় বলল, "তাহলে আপনাকে বলেই ফেলি"—

"কি?"

"আমি ওখানে মোটেই যাই নি—"

"যান নি!"

"আপনি ক্ষেপেছেন—অত কষ্ট করার দরকার কি?"

"সত্যের খাতিরে?"

"সত্য! ফুঃ—আমার কল্পনাশক্তি সত্যের চেয়েও সুন্দর জিনিষ সৃষ্টি করতে পারে। তাছাড়া কে সত্যকে চায় মশাই? সত্যকে পরিবেশন করলে প্রকাশক টাকা দেবে না—পাঠক বই ছোঁবে না। ব্যবসা মশাই, ব্যবসা—সত্যকে শিকেয় তুলে রাখুন—

মুকুন্দ অরিন্দমের দিকে তাকিয়ে একটু হাসল।

আরো লোক এসে যোগ দিল তাদের টেবিলে। ললিতকুমারের দুজন সমসাময়িক সাহিত্যিক। নাগবর্ধন ও অবলাকান্ত।

"খাওয়াতে হবে ভাই ললিতকুমার"—

"দেখা যাক্।"

"ওসব বুঝি না—ওহে পানীয়বাহক, নিয়ে এসো—"

"কাটলেট্, ক্ষীর-তুষার, ঠাণ্ডা কাফি"—

"জী হুজুর"—

গল্প জমে উঠল। অরিন্দম সকৌতুকে শুনতে লাগল সবার কথা। সাহিত্য-সম্বন্ধীয় আলোচনা। ললিতকুমার নীচুপাড়ার লোককের সুখ দুঃখ নিয়ে লেখার চেষ্টা করে। নাগবর্ধন শুধু নীচুপাড়ার শ্রমিক এবং ফ্যাক্টরীর মালিকদের নিয়ে উত্তেজনাপূর্ণ কাহিনী লেখে। অবলাকান্ত লেখে সাধারণ নরনারীর অবৈধ প্রেমের কাহিনী।

"তোমার হিমগিরির প্রান্তে' বইটা চমৎকার হয়েছে ললিতকুমার—"

"আরে তোমার 'শেকল ছেঁড়' বইটা আরো ভালো হয়েছে—"

"না না—আমারটা অবলাকান্তের 'অবৈধ প্রেমের' মত হয়নি"—

"সত্যি কথা শুনবে? আমাদের প্রত্যেকটাই ভালো হয়েছে। নতুন পরিবেশ নিয়ে নতুন ভঙ্গীতে লেখা, নীচুপাড়ার নির্য্যাতিতদের নিয়ে গরম গরম কথা আর অবৈধ প্রেমের কাহিনা—এই-ই তো চায় পাঠকেরা—"

"যা বলেছ—"

নতুন আর একজন লেখক এল এবার। নাম চিত্রসেন।

"এসো এসো—চিত্রসেন এসো—"

বেঁটে, মোটা ও কদাকার চিত্রসেন হাসল।

"তারপর, কি খবর চিত্রসেন?"

"আমার 'শোন পতঙ্গ' বইটা পড়েছ?"

"চমৎকার হয়েছে চিত্রসেন—"

"চমৎকার—"

"তুমি নীচুপাড়ার লোককের চমৎকারভাবে নীচু বলেছ—"

চিত্রসেন বিগলিত হয়ে বলল, "যখন যা দরকার ভাই—বুঝলে না, এখন একটু নীচুপাড়ার লোকদের গাল দেওয়া উচিত। তবে

ওরা একটু চটেছে, বুঝেছ? তাই এবার উঁচুপাড়ার লোকদের নীচু করে একটা বই লিখছি—নাম 'শোন ভুজঙ্গ'—"

"সাধু—সাধু"—

"চমৎকার"—

"ঠিক বলেছ ভাই—টাকা দিয়ে কথা। হাওয়া বদ্‌লালেই সুর বদ্‌লাবে"—

মুকুন্দ মাথাটা বাড়াল, চাপাগলায় প্রশ্ন করল, "কিন্তু সত্য?"

চারজন লেখক একসঙ্গে বলে উঠল, "সত্যকে শিকেয় তুলে রাখুন"—

"কিন্তু কেন?" মুকুন্দ উদ্ধতভাবে আবার বলল, "সত্যকে পরিহার করলে যে মানুষের সর্বনাশ হবে"—

ললিতকুমার হাসল, বলল, "ভাই মুকুন্দবাবু—মানুষের ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিতভাবে ধ্বংসের পথে এগিয়ে যাচ্ছে। সত্যের সাধনাতেও তার সেই ধ্বংস-যাত্রা থামবে না—এ প্রাকৃতিক নিয়ম। সুতরাং আপ্‌শোষ করে লাভ নেই। হাওয়া বুঝে দরকার মত মাঝে মাঝে দু'একটা সত্য কথা বলবেন, আবার হাওয়া বুঝে উল্‌টো কথা বলবেন। বুঝলেন না, বাঁচতে হবে।"

অবলাকান্ত মৃদুকণ্ঠে বন্ধুদের বলল, "আর সত্য অসত্যের দ্বন্দ্ব থেকে যদি পরিত্রাণ পেতে চাও তাহলে আমার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করো তোমরা। বুঝলে না—সমস্ত বিশ্বে নরনারীর ঐ আদিকাণ্ডটিই সব চেয়ে বড় কাণ্ড—সবচেয়ে বেশী উত্তেজক ও মধুর ব্যাপার।"

নাগবর্ধন উত্তেজিতভাবে সায় দিয়ে বলল, "যথার্থ বলেছ। যখন গোলমাল দেখি তখন তো তোমাকেই অনুসরণ করি ভাই। ভাল চিত্রকরের ভাল ছবি যখন পয়সা টানে না তখন সে যেমন নারীদেহের নগ্নকান্তি উদ্‌ঘাটন করে—আমরাও তেমনি করি। যেভাবেই হোক—টাকা চাই"—

ললিতকুমার একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, "যথার্থ। আমাদের বন্ধু মুকুন্দবাবু হয়ত প্রশ্ন করবেন—"কিন্তু আদর্শ? আমি তার জবাবে বলব যে আদর্শ আমাদের ঠিকই আছে। আগে বাঁচি তবে তো আদর্শ?"

নাগবর্ধন, অবলাকান্ত ও চিত্রসেন সমস্বরে বলে উঠল, "যথার্থ—যথার্থ"—

অরিন্দমের দম যেন আটকে আসতে চাইল। বাতাসে যেন বিষ মেশানো মনে হচ্ছে। সে চারদিকে তাকাল। অসংখ্য যুবক যুবতী আর নরনারী। হাসি, কথাবার্তা। সেই যুবক এখনো সঙ্গিনী যুবতীটির দিকে তাকিয়ে আছে। যুবতীটির শাড়ীর আঁচল বুকের ওপর থেকে সরে গেছে। বক্ষবাসের অন্তরাল থেকে তার দক্ষিণ স্তনটি যেন ফেটে বেরিয়ে আসতে চাইছে। বহু পুরুষ সেদিকে তাদের লুব্ধ চোরা-চাহনি নিক্ষেপ করছে। উত্তেজিত বানরের মত। বাতাসে যেন বিষ মেশানো আছে।

"ওঠা যাক্"—ললিতকুমার উঠে দাঁড়াল।

"হ্যাঁ হ্যাঁ, ওঠ"—নাগবর্ধন এবং চিত্রসেনও উঠে দাঁড়াল।

সবাই বেরোল। সিঁড়ির সাড়ি পার হয়ে কথা বলতে বলতে এগোল লেখকেরা। ইতিহাস, দর্শন এবং যৌনশাস্ত্র নিয়ে আলোচনা করতে করতে। মুকুন্দ এবং অরিন্দম নিঃশব্দে চলতে লাগল তাদের সঙ্গে।

একটা গলির সামনে এসে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল ললিতকুমার। অবলাকান্তের দিকে তাকিয়ে গলির দিকে ইসারা করে বলল, "যাবে নাকি হে?"

অবলাকান্ত এবং চিত্রসেন হাসল।

"যাব না মানে?"

"কি যে বল অবলাকান্ত"—

"ললিতকুমার যাবে?"

ললিতকুমার মাথা নাড়ল, "না ভাই—আমার বাড়ীতেই আছে"—

চিত্রসেন কুৎসিৎভাবে হাসল, "সেকিহে—কবে বাগালে ?"

"বাগাইনি—আপনি এসে ধরা দিয়েছে"—

"সাধু—সাধু"—

অরিন্দম গলির দিকে তাকাল। গলিতে ভীড় আছে। বাড়ীর পর বাড়ীর সারি। মাঝে মাঝে বাষ্পীয় আলো। প্রতিদ্বারে সুসজ্জিতা নারীমূর্ত্তি। বাড়ী গুলোর ভেতর থেকে আসছে অশ্লীল গান ও ঘুঙুরের শব্দ। একটা ক্লেদপঙ্কিল উত্তাপের তরঙ্গ যেন গলির ভেতর থেকে গলগল করে বেরিয়ে আসছে। বাতাসে বিষ।

"চল্লাম মুকুন্দবাবু"—অবলাকান্ত সহাস্যে বলল।

"ওই গলিতে—নরকে ?"

"হ্যাঁ—তাতে ক্ষতি কি ? জীবন সম্পর্কে আসল জ্ঞান তো ওখানেই পাওয়া যায়"—

ওরা তিনজনে চলে গেল সেই গলির ভেতর। সত্যি। জীবনের আসল জ্ঞান তো ওইখানেই। বহুভোগ্যা নারীর মাংসে, বহু পুরুষের ঘর্মসিক্ত শয্যাতে, মত্ত রাত্রির নির্লজ্জ অন্ধকারে শুধু এই জ্ঞানই লাভ হয় যে জীবন একটা জৈবিক ব্যাপার।

"চলুন"—ললিতকুমার ডাক দিল।

মুকুন্দ সাড়া দিয়ে বলল, "চলুন"—

"অপদার্থ"—ললিতকুমার ঘৃণায় নাক কুঁচকে বলল।

"কে ?" মুকুন্দ প্রশ্ন করল।

"ঐ তিনজন। যত সব পচা লেখা লিখে পয়সা কামাচ্ছে ভাই"—

মুকুন্দ একটু হাসল, "আপনিও তো পয়সা কম কামান না ?"

ললিতকুমার উত্তেজিত হয়ে উঠল, "কামাই কিন্তু ভালো লিখে। ওদের লেখার সঙ্গে আমার লেখার তুলনাই হয় না"—

"কেন ?"

"কি আছে ওদের? ভাষা, বর্ণনা, কল্পনাশক্তি, চরিত্রসৃষ্টি, সামাজিক দৃষ্টি, বাস্তববোধ, রাজনৈতিক জ্ঞান—কোনটা আছে ওদের? অথচ কি রকম জোর গলায় আত্মপ্রচার করল! অহঙ্কারে ফেটে পড়ছে সবাই! শয়তানের দল!"

"কিন্তু ওরা তো আপনার বইয়ের খুব প্রশংসাই করল।"

"ছাই। আড়ালে গিয়ে ওরাই আবার আমার মুণ্ডু চিবোবে, ছদ্মনামে পরস্পরকে গালিগালাজ দেবে"—

মুকুন্দ নিঃশব্দে হাসল শুধু। অরিন্দমের চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল। রাত কত? ললিতার দুটো চোখে যেন রহস্যের অতল সমুদ্র।

"আমার বাড়ীতে যাবেন মুকুন্দবাবু?"

"আজ্ঞে আজ থাক ললিতবাবু—অন্যদিন যাব?"

"আচ্ছা বেশ। আমি তাহলে যাই, মানে একটু কাজ আছে। বিজ্‌লীর কারখানায় গিয়ে বৈদ্যুতিক পাখাটা নিয়ে যেতে হবে। বুঝলেন না, শ্রমিক আর দুঃখীদের নিয়ে লিখতে গেলে বড় পরিশ্রম হয়, তাই একটু হাওয়া দরকার হয়। তাছাড়া এই মোটা কাপড় জামাতে বড় কষ্ট হচ্ছে"—

"কষ্ট হলে পরেন কেন?"

"বাঃ নীচুপাড়ার লোকদের সুখদুঃখ নিয়ে লিখি আমি—বাইরে মিহি পোষাক পরলে লোকে শ্রদ্ধা করবে কেন?"

"তা বটে"—

"তাছাড়া সরকারী দপ্তরের জন্য একটা গল্প দিতে হবে—বিষয়—'রাজভক্ত হও'"—

মুকুন্দ অবাক হয়ে গেল, "আপনি তাই লিখবেন?"

"কেন লিখব না?" ললিতকুমার আহত হল।

"রাজভক্ত হও মানে ক্রীতদাস হও—এই তো?"

"হ্যাঁ। লিখব না কেন? একশো টাকা দেবে যে মশাই—মাত্র

চারপাতার জন্য। তাছাড়া সেটা আবার বেতার যন্ত্রযোগে সারা আজবনগরের জনসাধারণকে শোনানো হবে। কি সম্মান বলুন তো? আচ্ছা চলি, নমস্কার। আসবেন, আসবেন কিন্তু মুকুন্দবাবু—আর অরিন্দমবাবুকেও নিয়ে আসবেন—নমস্কার”—

ললিতকুমার দ্রুতপদে চলে গেল সেখান থেকে।

স্তব্ধতা।

মুকুন্দ হাসল, বলল, “দেখলে অরিন্দম?”

অরিন্দম মাথা নাড়ল, “হ্যাঁ, দেখলাম, কিন্তু পুরোপুরি বুঝতে পারলাম না।”

“বুঝবে—বোঝাব সব।”

“আচ্ছা মুকুন্দ”—

“বল”—

“আজবনগরের শিল্পী সাহিত্যিকরা যদি এমনি হয়—তাহলে জনসাধারণের অবস্থা কি হবে?”

“কি আবার হবে? যা হয়েছে। কিন্তু শোন অরিন্দম, ওরাই সম্পূর্ণ সত্য নয়। অন্ধকার রাত যেমন সত্যি তেমনি তার অন্তরালবর্তী অপেক্ষমান সূর্যও সত্যি।”

“তার মানে?”

“আমার সঙ্গে আর একজায়গায় চল”—

“আবার কোথায়?” অরিন্দমের গলায় ক্লান্তি ও বিস্ময়।

“দেখতে চাওনা?” মুকুন্দ হাসল, “তুমি কি মানুষকে মানুষ করতে চাও না?”

মুহূর্তে অরিন্দমের শরীর মন ইস্পাতের মত কঠিন হয়ে উঠল, দু'চোখে বিদ্যুৎ ঝলসাল, “সে বলল, চল”—

“চল”—

নীচুপাড়ার একটা গলি ধরে তারা এগিয়ে চলল। কালো,

স্যাতস্যেঁতে, অজগরের মত এঁকেবেঁকে গেছে গলিটা। দু'পাশে নোনা-ধরা ইটের বাড়ী, টিনের চাল, দরমার বেড়া। কুকুর, বেড়াল আর জোংরা আবর্জনা। ইঁদুর ও ছুঁচোর রাজ্য। উঁচুপাড়ার পাপে-ভরা খোলা নর্দমা। অবশেষে একটা ভাঙ্গা বাড়ীর দরজা।

কড়া নাড়ল মুকুন্দ।

দরজাটা খুলে গেল।

একটি নারীমূর্তি। পরনে ছেঁড়া সাড়ী। শীর্ণা তবু সুন্দরী। যেন পঞ্চমীর শীর্ণকলা চাঁদ।

"আসুন ভাই"—সস্নেহে আহ্বান করল সেই নারী।

মুকুন্দ প্রশ্ন করল, "তাপসদা কেমন আছেন বৌদি?"

সেই নারীর চোখ মুহূর্তে বাষ্পাকুল হয়ে উঠল, তবু সে প্রশান্ত হেসে বলল, "একই রকম—ভেতরে আসুন"—

"আপনার আর একটি ভাইকে এনেছি, বৌদি—ওর নাম অরিন্দম"—

"তাই নাকি?" সেই নারী মধুমাখা হাসি হাসল, "আসুন ভাই, আসুন"—

বাইরের ঘরে, এককোণে দু'টি ছেলেমেয়ে ঘুমিয়ে আছে। কঙ্কালসার। তবু ফুলের মত। ঘর রিক্তশ্রী। অভাব। নিদারুণ অভাবের বোঝায় দে'য়ালের চূণ অনবরত খসে পড়ছে। যেন কুষ্ঠ ব্যাধিতে দেহের মাংস খসে পড়ছে। ছেঁড়া কাঁথা, ছেঁড়া জামা কাপড়, বিবর্ণ আলো।

তারপরে দ্বিতীয় ঘর। ভাঙ্গা খাট, ভাঙ্গা বাক্স, কয়েকটা বাসন, কিছু বই আর কাগজপত্র। আর দেয়ালের গায়ে তিনটি ছবি। দীর্ঘশ্মশ্রু ঋষিমূর্তি একটি। দ্বিতীয়টি এক শীর্ণদেহ বৃদ্ধের—তার মুখে বিচিত্র এক মধুর হাসি। তৃতীয়টি এক প্রৌঢ়ের—তার চোখে বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্য, মাথায় টাক, ছোট্ট দাড়ি ও গোঁফ। অরিন্দম তাদের চিনতে পারল না।

ঘরের মাঝখানে ভাঙা খাটের ওপরে, জীর্ণ, ছিন্ন, মলিন বিছানার ওপরে একজন গৌরবর্ণ পুরুষ শুয়ে আছে। তার দু'চোখ মুদ্রিত, তিন চারদিনের ক্ষৌরহীন মুখ। শীর্ণ, রুগ্ন, রাহুগ্রস্ত সূর্যের মত নিষ্প্রভ।

সেই নারী একটি আসন পেতে মৃদুকণ্ঠে বলল, "আপনারা বসুন ভাই"—

অরিন্দম ও মুকুন্দ বসল। সেই নারী চলে গেল সেখান থে স্তব্ধতা। ঘরের মধ্যে ব্যাধির জমাট ছায়া, মৃত্যুর শীতল নি অরিন্দম শিউরে উঠল। মৃত্যু কি?

মুকুন্দ ডাকল, "তাপসদা—তাপসদা"—

শয্যাশায়ী ব্যক্তি ধীরে ধীরে চোখ মেলল, তাকাল মুকুন্দের পথ। যেন বহুদূর থেকে চিনবার চেষ্টা করছে সে। তারপরে ধীরে ধ ক্ষীণকণ্ঠে বলল, "মুকুন্দ—ভালো আছ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ—আপনি কেমন আছেন?"

"আমি?" তাপসকুমার হাসল, "আমার দিন শেষ হয়ে এসেছে। কিন্তু দুঃখ নেই আমার—আমার গ্রন্থও শেষ হয়ে এসেছে, জীবনের কাছে আমি পরাজিত হইনি"—

"গ্রন্থ শেষ হয়ে এসেছে?" মুকুন্দের মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

"হ্যাঁ! আমার দুঃখ নেই।"

"গ্রন্থ কে ছাপবে?"

"জানিনা। হয়ত কেউই ছাপবে না। সত্যকে ওরা ভয় পায় কিন্তু কিছু যায় আসে না। আমি যে সত্যকে পরিত্যাগ করিনি—এইকথা শুনে রাখো মুকুন্দ। আমি মারা গেল আমার গ্রন্থ নিয়ে নীচুপাড়ার ঘরে ঘরে পড়ে শুনিও সবাইকে—তাতেই আমার কাজ শেষ হবে। তাদের বুঝিও যে তাদের ভয় নেই, সত্যই শেষ পর্যন্ত টিঁকে থাকে"—

হঠাৎ অদম্য একটা কাশির বেগ উঠল তাপসকুমারের, যন্ত্রণায় তার

চোখ মুখ বিকৃত হয়ে উঠল। পাশের ঘর থেকে ছুটে এল সেই নারী, স্বামীর পাশে বসে তালপাতার পাখা দিয়ে তাকে বাতাস করতে লাগল।

কাশি থামল। একতাল রক্ত বেরিয়ে এল মুখ থেকে, সেই নারী একটি মাটির সরা ধরল স্বামীর মুখের কাছে। তার চোখে আর্তনাদ র ভালবাসা। সস্নেহে একটা গামছা দিয়ে স্বামীর মুখটা মুছে দ্র সে।

পঙ্কমীর ক্ত্তা।

ক্তর রং কি লাল!

মুপসকুমার ধীরে ধীরে তাকাল, ঘোলাটে দৃষ্টি মেলে বলল, "মাঝে একটু কাবু করে ফেলে ভাই। মনটা খারাপও হয়—আরো বলতে ইচ্ছে করে। পৃথিবী ভারী সুন্দর—সত্য আরো সুন্দর"—

সেই নারী অনুযোগ করল, "কথা বলো না—একটু চুপ করে থাকো"—

মুকুন্দ উঠে দাঁড়াল, "আপনি জিরোন তাপসদা—অন্য একদিন দিনের বেলা আসব—আপনার গ্রন্থ পড়ব"—

তাপসকুমার বিশীর্ণ হেসে মাথা নাড়ল।

মুকুন্দ ও অরিন্দম ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

রক্তের রং কি লাল।

সেই নারী পেছন পেছন এল।

বাইরের ঘরে সেই কঙ্কালসার শিশু দু'টি ঘুমোচ্ছে। দু'টি শুকনো ফুলের মত।

"আবার আসবেন ভাই"—

দ্বারপ্রান্তে সেই শীর্ণা নারীর ছায়া। তার মুখের হাসিতে অমৃত। শোক, দুঃখ, দারিদ্র্য, ব্যাধি ও রিক্ততার মন্থনেই সেই অমৃতের সৃষ্টি অপরূপ।

মুকুন্দ মাথা নাড়ল, "আসব দিদি—কালকেই আসব, কাল থেকে একজন কেউ তাপসদার দেখাশোনা করার জন্যে থাকবে।"

সেই নারী হাসল। নিঃশব্দে। অরিন্দম অবাক হল। আশ্চর্য সেই হাসি। আঘাতে আঘাতে নির্ভয় হলেই বোধ হয় মানুষ ওভাবে হাসতে পারে।

স্তব্ধতা।

দুজনে ফিরে চলল।

আবার সেই অজগরের মত আঁকাবাঁকা গলির স্যাঁতসেঁতে পথ। দুর্গন্ধ। অসমান পথের ওপর দু'জনের জুতোর শব্দ।

আবার রাস্তা।

মুকুন্দ অরিন্দমের দিকে তাকাল, বলল, "বুঝতে পারলে এবার?"

অরিন্দমের ঠোঁটে মৃদু হাসি খেলে গেল, সে ধীরে ধীরে বলল, "পারলাম। সত্যের দিকেও লোক আছে। কিন্তু ক'জন?"

"মুকুন্দদা—ও মুকুন্দদা"—

প্রাণপণে চীৎকার করে কে যেন ডাকছে। মুকুন্দ অরিন্দমের কথার জবাব দিতে পারল না, পেছন ফিরে তাকাল। একজন যুবক তার দিকে দৌড়ে আসছে।

যুবকটি কাছে এসে হাসল, "কেমন আছেন মুকুন্দদা?"

"মন্দ না।"

যুবকটি হাঁপাচ্ছিল, বলল, "অনেকদূর থেকে আপনাকে ধরার জন্য দৌড়েছি—চলুন না ঐ চায়ের দোকানে, এ্যাঁ?"

মুকুন্দ মাথা নাড়ল, "না ভাই শশাঙ্ক, থাক।"

যুবকটি শুনতে চাইল না সে কথা, "না না, আসতেই হবে। আমার দরকার আছে।"

সামনেই একটা চায়ের দোকান। সাত আটজন লোক বসে চা খাচ্ছিল, গল্প করছিল। সেখানে গিয়েই বসল তিনজনে।

মুকুন্দ প্রশ্ন করল, "কি ব্যাপার বলত?"

শশাঙ্ক চাপা গলায় বলল, "আপনাদের ফ্যাক্টরীতে নাকি লোক নেবে?"

মুকুন্দ মাথা নাড়ল, "হ্যাঁ, নেবে কয়েকজন।"

শশাঙ্কের গলায় অনুরোধ ধ্বনিত হল, "তিনমাস ধরে বেকার হয়ে আছি মুকুন্দদা, একটু ব্যবস্থা করে দেবেন।"

"কি ব্যবস্থা?"

"আপনাদের কর্মাধ্যক্ষকে একটু বলে দেবেন।"

"চেষ্টা করব।"

"কাল যাব?"

"এসো"—

শশাঙ্ক খুশী হয়ে চেঁচিয়ে উঠল, "পানীয়বাহক, তিনপাত্র চা—"

চা খাইয়ে শশাঙ্ক চলে গেল। তার দরকারী কাজ আছে। সঙ্গে সঙ্গেই তার আসনে এসে একটি লোক বসল।

লোকটি বলল, "মুকুন্দ, একটা কথা"—

মুকুন্দ তাকাল তার দিকে, "আরে, নরেশ্বর যে!"

নরেশ্বর মাথা নাড়ল, চাপাগলায় বলল, "তোমাদের ফ্যাক্টরীতে যে চাকরী খালি আছে তা আমি জানি। আমার জন্যে একটু চেষ্টা করতে হবে ভাই। শশাঙ্কের চেয়েও আমার দরকার বেশী"—

নতুন আর একটি লোক এসে দাঁড়াল সেখানে, ভূমিকা না করে বলল, "আমার অবস্থা আরো কাহিল মুকুন্দ। শশাঙ্ক, নরেশ্বরের চেয়েও"—

নরেশ্বর গর্জে উঠল, "কি বললে? আমার চেয়েও?"

"হ্যাঁ। আমি বা বাপকে খাওয়াই"—

"আমিও বৌ ছেলেকে খাওয়াই"—

"মা বাপ বৌএর চেয়েও বড়।"

"বটে! তুমি তো এখনো চাকরী করছ বইয়ের দোকানে"—

"তুমিও তো চাকরী কর্‌ছ বরফের কলে"—

"তুমি মিথ্যেবাদী"—

"তুই মিথ্যেবাদী"—

"চোপরও শুয়ার"—

"কি বললি! শুয়ার! তুই শুয়ারকা বাচ্চা"—

"শালা কায়েতের বেটা—চুপ থাক্"—

"বটে! বামুন বলে খুব চোখ রাঙাচ্ছিস্! ওরে আমার বামুন রে—শালার চণ্ডালের চেয়েও তো অধম তোরা"—

পেছন থেকে একজন অসুরের মত লোক লাফিয়ে এগিয়ে এল কাছে, "কি বললি রে? চাঁড়ালদের শালা বলছিস্! চাঁড়ালেরা বামুন কায়েতের চেয়েও মানুষ ভালো"—

"আহা—কেন ঝগড়াঝাটি ভাই?" পেছন থেকে একজন বেঁটে মত লোক উঠে দাঁড়াল, মিষ্টি গলায় ঝগড়া থামাতে চাইল।

"তুমি ফোঁপড় দালালি নাই বা করলে ভাই"—

"কি বললি রে ব্যাটা!"

"খবরদার—ব্যাটা ব্যাটা করিস্ না শালার ভুজ্যির কলা—এ্যায়সা ঝাপড় মারব কি"—

"যা যা শালার চাঁড়াল"—

"মুখ সামলে কথা বলিস রে বাম্বির বেটা"—

"মুকুন্দ, আমার জন্যে চেষ্টা করবে ভাই"—

"না, আমার জন্যে—আমার দরকার বেশী"—

"তুই মর। আমার দরকার বেশী"—

"তবেরে শালা"—

হঠাৎ কুরুক্ষেত্র বেঁধে গেল। নরেশ্বর লাফিয়ে পড়ল তার

প্রতিদ্বন্দ্বীর ওপর। তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল পেছনের অসুরাকৃতি লোকটি—আবার তার ওপর লাফিয়ে পড়ল সেই বেঁটে লোকটি। কিল চড়, ঘুষি আর গালিগালাজ একটা বিচিত্র পরিবেশের সৃষ্টি করল।

অরিন্দম তাকাল মুকুন্দের দিকে।

মুকুন্দ মৃদু হেসে বলল, "চুপচাপ্ বসে থাকো। থামাতে গেলে মিছিমিছি কিল খাবে ওদের।"

দোকানের মালিক হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ, তারপর হাঁ হাঁ করে ছুটে এল, "ও মশাইরা, শুনছেন! আরে ও মশাই"—

অন্যান্য যারা বসে ছিল, তারা এগিয়ে এল কাছে, ঝগড়া থামিয়ে সরিয়ে দিতে চাইল যুধ্যমান বীরদের। ফল উলটো হল। শান্তিকামীরাই দু'তিন ঘা খেয়ে ক্ষেপে মারামারিতে লেগে গেল।

"তবেরে শালা"—

"মেরেই ফেলব"—

"কেটে ফেলব"—

দোকানের মালিক লাফাতে লাগল বিবর্ণমুখে, "আরে থামুন, থামুন! শুনছেন—আমর্, গুখেগোর ব্যাটারা যে আমার দোকান পাট ভেঙে ফেললি!"

চেয়ার উলটোল, টেবিল ভাঙল, ভাঙল কাপ প্লেট, কাঁচের গ্লাস ছিট্‌কে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেল। বন্য উত্তেজনার ঝড় বইতে লাগল দোকান ঘরে।

মুকুন্দ উঠে দাঁড়াল। উত্তেজনায় তার সারা মুখ লাল হয়ে উঠেছে।

"বাইরে চল অরিন্দম।"

বাইরে গেল দুজনে, হাঁটতে লাগল।

মুকুন্দ দাঁতে দাঁত চেপে অস্বাভাবিক কণ্ঠে বলল, "জানোয়ার—সবাই জানোয়ার হয়ে গেছে"—

"কি হল মুকুন্দ?" অরিন্দম ঠিক ধরতে পারল না।

মুকুন্দ তার দিকে তাকাল, বলল, "ওরা যখন মারামারি[illegible] তখন তোমার কি মনে হচ্ছিল বল ত?"

অরিন্দমের মুখে মৃদু হাসি খেলে গেল, সে বলল, "মনে হল যেন একদল কুকুর এক টুকরো মাংস নিয়ে কাড়াকাড়ি করছে।"

"ঠিক বলেছ। তখন ওদের মুখের চেহারা দেখেছিলে? কি গভীর ঘৃণা ওদের চোখে মুখে?"

"দেখেছি।"

মুকুন্দ মাথা নাড়ল, "মুষ্টিমেয় সবলের বিধানের এই অনিবার্য পরিণতি। সর্বনাশা পরিণতি। সবচেয়ে আগে তোমাকে মনুষ্যত্বকে বর্জন করতে হবে। শোন অরিন্দম, সত্যিকারের ক্ষুধার্তেরা হয় দুর্ভিক্ষের শ্মশানে মরে না তো বিপ্লবের আগুনে শোধন করে সভ্যতাকে। কিন্তু আজ যাদের দেখলে তারা অর্ধ-ক্ষুধার্ত জানোয়ারের দল। কেউ সাপ, কেউ বাঘ, কেউ বাঁদর, কেউ শেয়াল। এরা মরতেও চায় না, মারতেও চায় না। এরা চায় শুধু জান্তব জীবনটাকে চালিয়ে যেতে। খেতে, ঘুমোতে আর সঙ্গম করতে—এবং তারই জন্য এরা যে কোনও একটা কাজ করে। অধিকাংশ শিল্পী সাহিত্যিকদের চেহারা দেখলে তো? আদর্শের নাম করে এরা গণিকাবৃত্তি করে সবাইকে খুশী রাখে, অন্নাভাবের জ্বালাতে এরা পরস্পরকে ঘৃণা করে, ঈর্ষা করে, পরস্পরের নিন্দে করে, কটাকাটি করে, পরস্পরের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে নিজেদের বুদ্ধির বড়াই করে। আদর্শের কথা বলছ? পচা ইঁদুরের মত তাকে আবর্জনা-পাত্রে ছুঁড়েফেলে দাও"—

"কিন্তু কেন? কিসের জন্য এমন হয়?" অরিন্দম রীতিমত উত্তেজিত হয়ে উঠল।

চলতে চলতেই মুকুন্দ বলল, "কেন? আজ মণিশঙ্করের ব্যাখ্যা কি বুঝতে পারলে না? কেন আবার? সমাজ-ব্যবস্থার জন্য।"

"মানুষ কি বদলাতে পারে না?"

"সবা[illegible]র না। সাহিত্যিকদের তো দেখলে, সবাই এই রকম। [illegible]দের কথা বলবে? তারাও একই ধাঁচের—পরে টের [illegible]ত। ব্যাপার কি জানো? যেমন আবহাওয়ায় বাস করবে, [illegible]ও ঠিক তেমনি হবে।"

অরিন্দম বাধা দিতে গেল, মুকুন্দ হাত নেড়ে তাকে থামাল, সহাস্যে বলল, "গোড়া থেকেই বলছি। পৃথিবীর সৃষ্টি হল। বুদ্ধিমান পশু মানুষ জন্মাল এবং জন্মাবার সঙ্গেই সে একটা শব্দ উচ্চারণ—'আমি'। এক বস্তু অপর বস্তুর মত হয় না—প্রকৃতির এই বৈচিত্র্যগুণে কয়েকজন আবিষ্কার করল যে তারা বুদ্ধি বা দৈহিক বলে অনেকের চেয়ে বড়। সেই কয়েকজন তখন নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বকে নিরাপদ করার জন্য নীতি, ধর্ম ও আইনকানুন তৈরী সুরু করল। তারা প্রচলন করল টাকার। টাকা ছাড়া কিছুই হবে না। আর টাকা পেতে হলে খাটতে হবে। সবাই খাটতে শুরু করল। কিন্তু খাটাতে লাগল জনকয়েক। এবং যারা খাটতে লাগল তারা সবাই একই দাম পেল না, ফলে অসাম্যের সৃষ্টি হল। কেউ এক, কেউ দুই, কেউ দশ। একজন চাকার ওপরে, একশো জন চাকার নীচে, একজন ধনী, হাজার জন গরীব। আদিম যুগের সেই 'আমি'টা এখনো বেঁচে আছে। কিন্তু মজা এই যে যারা তলায় আছে তাদেরো 'আমি' আছে। তাদের 'আমি' তাদের সঙ্গে অপরের পার্থক্য দেখিয়ে দিতে লাগল। একজন একটা জিনিষ ভোগ করছে, আর একজন তা পাচ্ছে না। ফলে জন্মালো লোভ, লালসা, ঘৃণা, হিংসা। তারপর—" মুকুন্দ অরিন্দমের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, "আরো জানতে চাও?"

অভিভূতের মত অরিন্দম বলল, "চাই।"

"বেশ—"

অরিন্দমের সমস্ত চেতনা কণ্টকিত হয়ে উঠেছে। আগ্রহে, জ্ঞানলাভের অদম্য কৌতূহলে। মুকুন্দ যেন আজ ক্ষেপে গেছে। এদিকে

রাত হয়েছে। ক'টা? তা হোক। কিন্তু ললিতা? তার দুটো কালিন্দী-কালো চোখ। কি আশ্চর্য! একটি নারীর মুখ কেন বারংবার মনে পড়ে?

"বাবাগো—একটা পয়সা দাও না বাবা—"

ভিখিরীর আকুল প্রার্থনা। অরিন্দম তাকাল সেদিকে। কুষ্ঠ-রোগাক্রান্ত, বীভৎস দেখতে সেই ভিখিরী একটা পয়সা ভিক্ষে চাইছে।

একজন লোক দাঁড়াল, পকেট হাৎড়ে একটা পয়সা বের করে ভিখিরীর প্রসারিত হাতের ওপর আলগোছে ফেলে দিল।

মুকুন্দ অরিন্দমকে ঠেলা দিল, "দেখ, পাশাপাশি অসাম্যের নিদর্শন। একজন অসহায়, ব্যাধিতে কুৎসিৎ, ভিখিরী—অন্যজন মোটামুটি ভদ্রভাবে বেঁচে আছে, যখন তখন অনুকম্পাভরে দু'একপয়সা দান করে আত্মতৃপ্তি অনুভব করার সুযোগ পাচ্ছে।" এগিয়ে গেল সে। দাতা লোকটি চলতে আরম্ভ করেছিল, তার পাশে গিয়ে দাঁড়াল সে, ডাকল, "ও দাদা, শুনছেন—"

"এ্যাঁ?" লোকটি দাঁড়িয়ে ঘুরে তাকাল।

পকেট থেকে একটা বিড়ি বের করে মুকুন্দ বিনীতভাবে জিজ্ঞেস করল, "দাদার কাছে কি দেশলাই আছে?"

"দেশলাই? হ্যাঁ আছে। এই নিন্—"

লোকটি দেশলাইটা এগিয়ে দিল।

বিড়ি ধরাতে ধরাতে মুকুন্দ প্রশ্ন করল "দাদা বুঝি চাকরী করেন কোথাও?"

"না তো—" লোকটি মাথা নাড়ল. "আমার কাপড়ের দোকান আছে।"

"ওঃ, কাপড়ের দোকান! খুব ভালো ব্যবসা। দাদা তো তাহলে ঠাকুরের ইচ্ছেয়—"

লোকটি মুখ বিকৃত করল, "আমার অবস্থাটা খুব ভালো ভাবছেন

বুঝি? মোটেই না। ছোট্ট একটা দোকান চালাই মশাই, এক পাল ছেলেমেয়ে—"

"ধীরে ধীরে আরো ভালো অবস্থা হবে—"

লোকটি হাসল, "হয়ত—কে জানে।"

"কার মত বড় হতে চাইছেন আপনি বলুন তো? কিছু মনে করবেন না—স্রেফ কৌতূহল।"

লোকটি আবার হাসল, "না না, কিছু মনে করিনি। কার মত আবার? আমাদের ব্যবসা করে ত্রিদিববাবু কত বড়লোক হয়েছেন বলুন দেখি—বড় হলে তাঁরই মত হব—"

"আচ্ছা, নমস্কার—"

লোকটি চলে গেল।

মুকুন্দ বড় রাস্তায় পা দিয়ে ডাকল, "এইদিকে এসো অরিন্দম—"

দু'মিনিটের পথ।

উঁচুপাড়ার রাস্তা তখনো সরগরম। গাড়ী ঘোড়া, আলো আর মানুষের ভীড়। আকাশে কৌতূহলী তারার মিছিল।

রাস্তার পাশে একটা সুন্দর দোতলা বাড়ী। বাইরে সুদৃশ্য বাষ্পীয় যান দাঁড়ানো, দ্বাররক্ষী পাহারা দিচ্ছে।

দ্বাররক্ষী বাধা দিল, "কাকে চাই?"

মুকুন্দ দ্রুতকণ্ঠে বলল, "দোকান থেকে আসছি আমরা—জরুরী দরকার—"

"যান—"

ভেতরে ঢুকল দু'জনে। সোজা বাইরের কামরায় গিয়ে হাজির হল তারা।

অরিন্দম তাকাল চারদিকে। চকচক্ ঝক্‌ঝক্ করছে ঘরদোর। মসৃণ মেঝের মাঝখানে কার্পেট, দামী চেয়ার টেবিল, মূল্যবান কাপড়ের পর্দা, দেয়ালে টাঙানো সুন্দর সুন্দর ছবি। আর মাঝখানে একজন

অর্দ্ধ-প্রৌঢ় সুবেশ লোক বসে বসে ধূমপান করছেন ও কাগজপত্র দেখছেন। ত্রিদিবাবু।

ত্রিদিবাবু তাকালেন, "কে! আরে, মুকুন্দবাবু যে! কি ব্যাপার? হঠাৎ এত রাত্তিরে যে?"

মুকুন্দ হাসল, "আজ্ঞে এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম ত্রিদিববাবু তাই একবার শ্রদ্ধা জানাতে এলাম—"

ত্রিদিববাবুর তেল চুকচুকে গোলগাল মুখে হাসির তরঙ্গ খেলে গেল। তিনি বললেন, "তা বেশ করেছেন বসুন—"

"কেমন আছেন?"

"খুব ভালো না।"

"কেন?"

"আর বলেন কেন? একসের ক্ষীর খেতে ইচ্ছে করে অথচ আধসেরের বেশী খেতে পারছি না—পেটটা শত্রুতা করছে।"

মুখে চোখে দুঃখের ছায়া ঘনিয়ে তুলে মুকুন্দ বলল, "সত্যি, ভারী দুঃখের কথা—"

ত্রিদিববাবু সমবেদনা পেয়ে উৎসাহিত হয়ে বললেন, "দুঃখের ব্যাপার নয়?" গলার স্বরটা হঠাৎ নীচু ও ভারী করে ত্রিদিববাবু আবার বললেন, "সত্যি, মনটা বড় খারাপ যাচ্ছে আজকাল—"

মুকুন্দ মাথা নাড়ল, "সত্যি—"

ত্রিদিববাবু দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। ফোঁস করে।

"ব্যবসাপত্তর কি রকম চলছে ত্রিদিববাবু?" মুকুন্দ আলগোছে প্রশ্নটা করল।

ত্রিদিববাবু হাই তুললেন, "খুব ভালো না—"

মুকুন্দ হাসল, "কিন্তু তা তো মনে হচ্ছে না"—

ত্রিদিববাবু তাকালেন, দু'চোখ বড় করে প্রশ্ন করলেন, "মনে হচ্ছে না! তার মানে?"

"মানে দেখেশুনে তো ভালই মনে হচ্ছে।"

ত্রিদিববাবু ঠোঁট উলটে বললেন, "হুঁ—আপনারা এতেই ভালো বলছেন! কি আর ব্যবসা করলাম মশাই। শুধু মস্ত বড় একটা দোকান করেছি। তাতে কি অভাব মেটে? পুণ্ডরীকবাবুর মত চারপাঁচটা কাপড়ের কলের মালিক হতে পারলেই না বুঝি"—

"আপনি পুণ্ডরীকবাবু হতে চান?"

"চাই-ই তো"—

মুকুন্দ হাসল, প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গের খাদ মিশিয়ে বলল, "আজ্ঞে তা আপনি হতে পারবেন—আজ তাহলে উঠি—"

"উঠছেন?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, অন্য একদিন আসব। আমাদের দয়া করে মনে রাখবেন—"

ত্রিদিববাবু বিগলিত হয়ে গেলেন, "নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই—মাঝে মাঝে আসবেন, মনে রাখবার চেষ্টা করব। হেঁ হেঁ—আসুন—"

মুকুন্দ ও অরিন্দম বাইরে বেরোল।

"এবার?" অরিন্দম প্রশ্ন করল।

মুকুন্দ হাসল, "এবার পুণ্ডরীকবাবুর কাছে। গোলকধাঁধা বলে মনে হচ্ছে, তাই না? পাবে, ধাঁধার উত্তর পাবে।"

এবার চার পাঁচ মিনিটের পথ।

অবশেষে একটা বড় বাগানওয়ালা মস্ত বড় একটি অট্টালিকা। পাঁচতলা। বড় বড় স্তম্ভ, শ্বেতপাথরের মেঝে, মেহগিনীর খাট পালঙ্ক, চেয়ার টেবিল, রূপোর বাসন, ঝলমল জরি বসানো পোষাক-পরা মানুষ, উর্দি পরিহিত চাকরের দল, আগ্নেয়াস্ত্র-বাহী দ্বার রক্ষীরা।

অরিন্দম বলল, "এখানে হয়ত একেবারেই আটকে দেবে"—

মুকুন্দ মুচকি হেসে বলল, "দেখনা কি করি—"

একজন দ্বাররক্ষীর কাছে সে এগিয়ে গেল, প্রশ্ন করল, "হুজুর আছেন ?"

দ্বাররক্ষী গোঁফে চাড়া দিয়ে ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করল "কি চাই ?"

বিনীতভাবে মুকুন্দ বলল, "হুজুরের দর্শন চাই—তাঁকে আমরা ভক্তি জানাতে এসেছি। হুজুরকে গিয়ে খবর দাও যে মুকুন্দ তাঁর পায়ের ধুলো নিতে এসেছে—তা নইলে তার ক্ষতি হবে—"

"না না, দেখা হবে না।"

"দয়া করে খবর দাও রক্ষীঠাকুর—আমি তোমার কেনা গোলাম হয়ে থাকব—"

"হাঁ ? গোলাম হয়ে থাকবে ?"

"হ্যাঁ বাবা।"

দ্বাররক্ষীর গোঁফের আড়ালে বিগলিত হাসির আভা দেখা দিল, সে বলল, "তবে দাঁড়াও, দেখি হুজুরের কি মর্জ্জি হয়।"

এক মিনিট কাটল।

দু'মিনিট। তিন মিনিট।

দ্বার-রক্ষী ফিরে এল, বলল, "যান মশাইরা সোজা বাইরের ঘরে যান—"

যেতে যেতে মুকুন্দ বলল, "আমি যা করি, তুমিও তাই করো বুঝলে ?"

অরিন্দম মাথা নাড়ল, "বুঝেছি।"

মস্ত বড় বাগানের মাঝখান দিয়ে পথ। চারদিকে নানারংয়ের অজস্র পুষ্পসমারোহ। বাতাসে তাদের মদির গন্ধ। বাগানের শেষে প্রশস্ত সিঁড়ির সারি। তারপর ডানদিকের একটা মস্তবড় কক্ষ। সেখানে বৈদ্যুতিক পাখা চক্রাকারে ঘূর্ণ্যমান। দামী কার্পেটে মোড়া মেঝে। দামী পোষাক পরিহিত একজন বছর চল্লিশের লোক। তিনিই পুণ্ডরীকবাবু। দীর্ঘ গৌরবর্ণ, দোহারা গড়ন। মাথার কোঁকড়ানো চুল সযত্নে পাট করা, চোখে সোনার চশমা, শুকপাখীর নাকের মত বাঁকা

নাক আর একজোড়া তীক্ষ্ণ চোখে যেন ছোরার ধার। বসে বসে তিনি যেন কি লিখছেন।

মুকুন্দ গিয়ে পুণ্ডরীকের সামনে হাঁটু গেড়ে প্রণাম করল, তার পায়ের ধূলো নেবার অছিলা করে মাথায় হাত রাখল। অরিন্দমও তাই করল।

পুণ্ডরীক তাদের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি মেলে তাকালেন, তার দুটো ঠোঁঠের কোণে একটু হাসি খেলে গেল। তিনি বললেন, "থাক্ থাক্ অতিভক্তি যে চোরের লক্ষণ মুকুন্দ"—

মুকুন্দ যুক্তকরে বলল, "আজ্ঞে না হুজুর। চোর মাত্রেই অতিভক্ত হয় বটে কিন্তু আমরা তো চোর নই, আমরা গরীব"—

"গরীব! গরীবেরাই তো চোর হয়"—

"আজ্ঞে হয়—সিঁদেল চোর। কিন্তু তারা পুকুর চুরি করতে পারে না।"

"তা যা বলেছ"—পুণ্ডরীক মৃদু হাসলেন, "তোমার বুদ্ধি আছে, কোনদিন হয়ত তোমাকে সরকারের অতিথিশালায় যেতে হবে।"

"আজ্ঞে সেই ভয়ে তো বোকা বনেই থাকি—তবু মাঝে মাঝে"—

পুণ্ডরীক হাসলেন, "তারপর? কি খবর?"

"আপনার পায়ের ধূলো নিতে এলাম।"

"হুঁ"—

"কেমন আছেন হুজুর?"

"ভাল না।"

"কেন? কি হল?"

পুণ্ডরীক ভ্রুকুটি কুটিল মুখে বললেন, "চতুরলালের নাম শুনেছ তো? সেই চতুরলালের সঙ্গে আজ আমার ঝগড়া হয়েছে। বেটার কি দেমাক!"

"তাই নাকি?"

"হ্যাঁ"—দাঁতে দাঁত চেপে পুণ্ডরীক বললেন, "মনটা খারাপ।

ছ' মাসের মধ্যে চতুরলালের চেয়েও যদি বড় না হই তো আমার নাম বদলে ফেলব"—

স্তব্ধতা।

মুকুন্দ উঠে দাঁড়াল, "তাহলে আমি হুজুর।"

পুণ্ডরীক অন্যমনস্কের মত বললেন, "উঁ? আচ্ছা এসো।"

মুকুন্দ ও অরিন্দম বেরিয়ে এল।

বাগানের ফুলের চারাগুলো হাওয়ায় দুলছে। পুণ্ডরীকের পাঁচতলা বাড়ীর প্রতিটি কক্ষে উজ্জ্বল আলোর সারি। কোন এক কামরায় যেন বাজনা বাজছে। কে যেন গাইছে। কে যেন হাসছে। আর আনাচে কানাচে বাইরে ভেতরে ছায়ার মত নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে পুণ্ডরীকের দাসদাসীরা।

রাত কটা? আকাশে ক'টা তারা? মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য কি? অরিন্দম চলতে চলতে হোঁচট খেল।

মুকুন্দ বলল, "আজকের মত আমার গুরুগিরি শেষ হল—আর না, তোমায় এবার ছাড়ব।"

অরিন্দম হাসল, "কিন্তু ব্যাখ্যা?"

মুকুন্দ মাথা নাড়ল, "করছি। কোথায় যেন থেমেছিলাম? হ্যাঁ—বর্ত্তমান সমাজ-ব্যবস্থা কি করে জন্মাল। আগে যা বলেছি তা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ। পৃথিবীর সর্ব্বত্র দুটো শ্রেণীর সৃষ্টি হল ক্রমে—ধনী ও দরিদ্র। আজবনগরে আরো মজার ব্যাপার হল। বৃত্তি অনুযায়ী মানুষকে এক সময়ে কয়েকটি বর্ণে বিভক্ত করা হয়েছিল। বুদ্ধির কাজ যে করত সে নিজের শ্রেষ্ঠত্বকে চিরস্থায়ী করার জন্য অমুক দেবতা এই বলেছেন, সেই বলেছেন বলে সৃষ্টি করল উচ্চনীচ বর্ণভেদ। দিন কাটতে লাগল। মানুষের বংশবৃদ্ধি ঘটতে লাগল, তার বুদ্ধি বাড়তে থাকল, বাড়তে লাগল তার মনের জটিলতা। সেই জটিলতা ক্রমেই সমাজব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে কুটিলতায় রূপান্তরিত হল। যতদিন এই অসাম্য দূর

না হবে, যতদিন রাম ও শ্যামের জৈবিক চাহিদা সমভাবে তৃপ্ত না হবে ততদিন তার মানসিক পরিবর্তন হবে না, তার লোভ, লালসা, ঘৃণা ও হিংসা কমবে না। ততদিন রাস্তার ভিখারী চাইবে তোমার মত হতে, তুমি চাইবে ত্রিদিব হতে, ত্রিদিব চাইবে পুণ্ডরীক হতে, পুণ্ডরীক চাইবে চতুরলাল হতে, চতুরলাল চাইবে—"

অরিন্দম বাধা দিয়ে বলল, "আমি জানি—"

মুকুন্দ তার দিকে তাকাল, "কি ?"

"চতুরলাল চায় বিচিত্রপুর তথা আজবনগরের কর্তা হতে—"

মুকুন্দ উত্তেজিতভাবে বলল, "ঠিক। তারপরে বিচিত্রপুরের কর্তা চাইবে পৃথিবীকে। অথচ বিচিত্রপুরই তো পৃথিবী নয়। রূপনগর, উদ্ভটনগর, বিরাটনগর, নির্বোধনগর—সব জায়গাতেই এমন শত শত ত্রিদিব, পুণ্ডরীক আর চতুরলাল আছে। সবাই চাইছে পৃথিবীকে একা ভোগ করতে। ফলে কি হয় ? নতুন নতুন মারণাস্ত্রের উদ্ভব হয়, আসে যুদ্ধ, মড়ক, দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা, স্বার্থপরতা, নীচতা, শঠতা, অজ্ঞতা, অন্ধতা। তখন জীবন আর পূর্ণ-প্রস্ফুটিত পদ্মের মত তার সমস্ত পাপড়িগুলো মেলে না, তখন মানুষ আর সবাইকে ভালবেসে দেবতা হতে পারে না। কিন্তু আসল কথাটাই তোমাকে বলিনি—"

অরিন্দম অবাক হয়ে গেল, "আরো কথা আছে ?"

"থাকবে না ? পৃথিবীটা কি দু'দিনের ?"

"কি কথা বল।"

"মানুষ কেন এমন করে। মানুষের মাঝে মানুষ যারা থাকে তারা বলে, 'চুরী করো না,' 'হিংসা করো না,' 'লোভ পাপ'—তবু কেন মানুষ ঠিক উলটো কাজ করে, একটুকরো রুটির জন্য কুকুরের মত ঝগড়া করে ?"

"কেন ?"

মুকুন্দ ধীরে ধীরে বলল, "কারণ প্রতিটি মানুষ একা—কারণ প্রতিটি মানুষ জানে যে কোন নিরাপত্তা নেই তার জীবনের। যে সমাজ-ব্যবস্থায়

মানুষ কখনো নিরাপদ হতে পারে না, সেখানে কেউ কারো দিকে তাকায় না। ফলে প্রত্যেকে একা—ভয়ঙ্কর একা। সব সময়েই সে যেন কুয়াসাচ্ছন্ন পাহাড়ের চূড়োয় দাঁড়িয়ে আছে। যে কোন মুহূর্তে পড়ে যেতে পারে সে। অভাব, ব্যাধি, কত বিপদ আছে জীবনে। কে তার জন্ম ভাবছে? তাই আজকের সমস্যা মিটলে কালকের জন্ম ভয় হয়, কালকের ব্যবস্থা থাকলেও পরশুর জন্ম ভয় থাকে। ফলে প্রত্যেকে চেষ্টা করে নির্ভয় হবার জন্ম টাকা পেতে। যে ভাবে হোক। টাকা হলে সে শক্তি অর্জন করে, শক্তির স্বাদ পেয়ে সে মত্ত হয়, মত্ততায় ধ্বংস আসবেই—"

শুনতে শুনতে অরিন্দম উত্তেজিত হয়ে উঠল; বাধা দিয়ে বলল, "সমাজ ব্যবস্থা না বদলানো পর্যন্ত যদি এমনি চলে তাহলে তা বদলানো যাবে কি করে?"

মুকুন্দ যেন প্রতিটি শব্দের ওপর জোর দিয়ে বলল, "উপায় একটিমাত্র। যারা নিষ্পেষিত হয়েও জানোয়ার হয়নি তাদের সম্মিলিত করতে হবে—যারা জানোয়ার তাদের আত্মাকে জাগাতে হবে, যারা জাগবে না তাদের উচ্ছেদ করতে হবে—এই সমাজ-ব্যবস্থাকে ধ্বংস করতে হবে।"

অরিন্দম একটু হতাশার সুরে বলল, "কিন্তু তেমন মানুষ ক'জন? প্রায় সবাই তো একই রকম—"

মুকুন্দ হাসল, "প্রায় সবাই বটে কিন্তু সবাই নয়। অসত্যে পৃথিবী ছেয়ে গেছে কিন্তু সত্যের পতাকা'র নীচেও মানুষ আছে। আজ কি তুমি তা দেখলে না? মণিশঙ্কর, তাপসকুমার, সভার হাজার লোক, তুমি, আমি—এমনি আরো অনেকে। সত্যের, ন্যায়ের জয় হবেই। আমাদের জয় হবেই হবে—কারণ আমরা তা চাই।"

"চাইলেই কি সব কিছু পাওয়া যায়!"

"যায়। ইচ্ছে করলেই সব কিছু পাওয়া যায়, কারণ ইচ্ছে থেকেই সব কিছুর সৃষ্টি।"

ইচ্ছে থেকেই সব কিছু উৎপন্ন হয়! কোথায় যেন শুনেছে সে এই কথা!

অরিন্দম দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল, "তা তো বুঝলাম কিন্তু এতে তো সময় লাগবে—দীর্ঘ কাল—"

মুকুন্দ অসহিষ্ণু হয়ে হাত নাড়ল, বাধা দিয়ে বলল, "কি যায় আসে? ইচ্ছা এবং ইচ্ছানুযায়ী কর্ম্ম করে যাওয়া—এই আমার তোমার কর্তব্য। তাতেই ফল হবে। এর বেশী ভেবে লাভ নেই। ক্ষুদ্র বীজ থেকে বিশাল মহীরুহ জন্মায়—কিন্তু সে কি একদিনে হয়?" হঠাৎ থামল মুকুন্দ, অরিন্দমের দিকে তাকিয়ে বলল, "কিন্তু আর না—তোমার সঙ্গে বক্-বক্ করে আমার মাথা গরম হয়ে গেছে—আমি চল্লাম—"

অরিন্দম হাসবার চেষ্টা করল, "কোথায়?"

"গোল্লায়—সস্তা মদ গিলতে।"

"তা যাও তুমি গোল্লায় কিন্তু বাড়ীতে যে ভাববে?"

"আমার জন্যে? আমার অত্যাচারে সবাই অভ্যস্ত আছে। চল্লাম—"

দ্রুতপদে হঠাৎ বাঁ দিকের একটা গলিতে মুকুন্দ মিলিয়ে গেল।

অরিন্দম তার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল। মুকুন্দ চমৎকার লোক। সাত্যকারের মানুষ। সৈনিক। রাত ক'টা? অনেক। চলা যাক। অরিন্দম পা বাড়াল।

গলি। আঁকা-বাঁকা। শিরা উপশিরার মত জটিল, সংযুক্ত। জীবনের মত। মনের মত। সামনে একটা গ্যাস-লাইট। আলোক-স্তম্ভের দীর্ঘ ছায়া। বিবর্ণ আলো। জরাগ্রস্ত বাড়ীগুলো। মানুষের মন এক বিচিত্র যন্ত্র। বাতাসে কাঁপে, উত্তাপে কাঁপে, শব্দে কাঁপে, দৃশ্যে কাঁপে। কাঁপে আর অদৃশ্য অক্ষরে সমস্ত অনুভূতির ইতিহাস লিখে চলে। কিছুই অগ্রাহ্য করে না। অরিন্দমের মাথা দপ্‌দপ্ করছে। ছোট্ট একটা দানব যেন গর্জাচ্ছে তার ভেতরে। ভাঙ্গা

—ভাঙো—ভাঙো। একটা লৌহদানবের মত। ফ্যাক্টরী। বয়লার, আগুন, গলিত ইস্পাত, বড় বড় লোহার চাকা। ভাঙো। আমাকে ভেঙে, জুড়িয়ে, গলিয়ে নাও। হে আমার সাগ্নিক আত্মা—আমাকে তোমার স্বপ্নের মত রূপ দাও। এখনো যেন হাতুড়ী'র শব্দ শোনা যাচ্ছে। ইন্দ্র। আমরা যন্ত্রের ক্রীতদাস। বাতাসে কি চাবুকের শব্দ? চতুরলাল। মুনাফা বাড়াবে সে। খাটো, মর, মর জানোয়ারেরা, চতুরলালের থুথুকে হাত পেতে গ্রহণ করো। মুনাফা চাই। চাই নারীদেহ। নারীদেহ দেখতে কেমন? কি আছে নারীদেহে? ওষ্ঠ, স্তন, যোনিদেশ, মাংসল উরুযুগল? সব মিলিয়ে সে কী? শুধুই প্রয়োজন? আর মাতৃত্ব? রাস্তাটা উঁচুনীচু। অসমান। অসাম্য। চতুরলালের মদ চাই। মদ খেলে পশুর চক্ষুলজ্জা উড়ে যায়। মদ আর মেয়েমানুষ। মুনাফা চাই। জানোয়ারেরা রক্তবমি করে মরলেই বা কি? রক্তের রং কী লাল! আর সেই শীর্ণ, রোগা লোকটা? জ্বলন্ত অঙ্গারের মত। সত্য মৃত্যু আনল। সত্য কি ভয়ঙ্কর? সত্য কাকে বলে?

"হাঃ হাঃ হাঃ—"

অরিন্দম তাকাল। একটা বুড়ো মাতাল। নর্দ্দমার পাশে, অন্ধকারে, একটা বাড়ীর দে'য়ালে ঠেস্ দিয়ে হাসছে তাঁর দুচোখ মুদ্রিত, কণ্ঠস্বর জড়িত।

"অতৃপ্তিই জীবনের শেষ কথা—একদিন বাঁচলে দু'দিন বাঁচতে চাই—চিরকাল বাঁচতে চাই—"

ইঁদুরেরা যেন কোথায় কিচ্‌কিচ্ করছে। কোথায়, কোন্ নিভৃত সুড়ঙ্গে।

"কিছুই মনে থাকে না। আমার চারদিকে এক দুর্ভেদ্য রহস্য-যবনিকা। অতীতের কথা আজ মনে থাকে না, আগামীকালের কথা ভেবে পাই না। বিস্মৃতির যবনিকা। আমি এক রাজার মত স্বাধীন

হয়ে পৃথিবীতে এসেছিলাম—কিন্তু আজ? হাঃ হাঃ হাঃ—"

সুরার বুদ্বুদ। প্রলাপ। কিন্তু শুধুই কি প্রলাপ? এগিয়ে চল। আর কত দূরে? ললিতা কি এখন ঘুমিয়েছে?

নিজের পায়ের শব্দ। দু'পাশের দে'য়ালে তা ঠোক্কর খেয়ে ফিরে আসে, পেছু নেয়। আর কী অন্ধকার! গ্যাসের আলোটা অনেক দূরে। অন্ধকার। কিন্তু অন্ধকারের মাঝেই আলো আছে। নির্ভীক মানুষ আছে। মনিশঙ্কর, তাপসকুমার, হাজার হাজার লোক। বীজ আছে। পৃথিবী সুন্দর, উর্বর। কোন বীজকে প্রত্যাখ্যান করে না পৃথিবী। সেই বীজ থেকে অঙ্কুর, অঙ্কুর থেকে চারা, চারা থেকে বৃক্ষ, বৃক্ষ থেকে মহীরুহ হবে। ফুল ফুটবে। সত্য, ন্যায়, ভালবাসা। সাম্য। তোমার আমার পৃথিবী—সবার পৃথিবী। অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়। আলো, জল ও বাতাস। কোন কিছুই কারো একচেটিয়া নয়। শুধু 'আমি নয়। 'আমি' বলবে 'আমরা'। 'আমি' তখন প্রভুত্ব করতে চাইবে না, চাইবে কর্মের দ্বারা সবার ভালবাসা পেতে। তখনো কি অসাম্য থাকবে না? রাম আর শ্যাম কি কখনো এক হবে? না, কি বলছ? সে তো সাংঘাতিক কথা! তাতে আবার ধ্বংস হবে। না, তা হবে না। চাঁদ আর সূর্য দুই-ই তো প্রয়োজনীয়। সে অসাম্য তো প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য। কেউ শিল্পী, কেউ বৈজ্ঞানিক, কেউ যন্ত্রবিদ, কেউ কৃষক। তখন প্রতিযোগিতা চলবে আত্মিক উন্নতির জন্য। আজ আত্মা পরাজিত, দেহ বিজয়ী। তখন দেহ পরাজিত হবে আর আত্মা বিজয়ী হবে। আঃ। আকাশের তারাগুলো কাঁপছে। শুনছ—শুনছ নক্ষত্র-দল। তোমরা সুন্দর। জাগো। আজকের দিনটা বিচিত্রভাবে কাটল। ক-ত জ্ঞান লাভ করল সে! কত মানুষ দেখল! আশ্চর্য আশ্চর্য সব মুখ। চতুরলাল, কর্মাধ্যক্ষেরা, ললিতকুমার, নাগবর্দ্ধন, অবলাকান্ত, চিত্রসেন। শশাঙ্ক, নরেশ্বর আর সেই লোকেরা। তারা

সবাই মিলে যেন সভ্যতাকে ব্যাখ্যা করল আজ। বিয়োগান্ত সভ্যতা। ধ্বংসোন্মুখ। বিয়োগান্ত সমাজ-ব্যবস্থা। সেই ব্যবস্থায় আত্মাকে নির্বিচারে সমাধিস্থ করা হয়, ভালোকে পিটিয়ে মন্দ করা হয়, আলোকে নিভিয়ে অন্ধকারে পরিণত করা হয় আর শান্তিকে উড়িয়ে দিয়ে উদ্দাম অশান্তিকে প্রতিষ্ঠা করা হয়। ভাঙ্গো—

"শুনছেন—অ'মশাই—অ'দাদা—"

অরিন্দন থামল, তাকাল। ডানহাতের গলিটার মুখে অন্ধকারে একটি খর্ব্বকায় লোক। বয়স বোঝা গেল না—ত্রিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশও হতে পারে। ছেঁড়া জামা, ময়লা কাপড়, ভাঙ্গা গাল আর বড় বড় ক্ষুধার্ত চোখ।

"দাদা ইয়ে চাই ?—"

অরিন্দম বুঝল না, প্রশ্নকর্তার মুখের দিকে আবার ভালো করে তাকাল।

লোকটা চাপা গলায় বলল, "ষোল বছর বয়েস—মাইরি বলছি। যেমন রং তেমনি গড়ন—আর ইয়েগুলো ঠিক এমনি—" ডান হাতটা তুলে দুটি স্তনের আকৃতি বোঝাল লোকটা, একটু হেসে বলল "বাজারের চিজ্ নয়—আসুন—মাত্তর দু'টাকা—"

অরিন্দম শিউরে উঠল, প্রশ্ন করল, "টাকার দরকার কি ভাই ?"

লোকটা পেছিয়ে গেল এক পা, বলল, "টাকার দরকার কি! আচ্ছা ইয়ার্কি করছেন তো—অভাবের জন্যেই মানুষ টাকা চায়—"

"মেয়েটি আপনার কে ?"

"কেউ না—তুমি চুলোয় যাও—"

লোকটা অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আবার পদধ্বনি।

আঁকাবাঁকা গলি। চায়ের দোকানে ভাঙ্গা যন্ত্রের গান। টিমটিমে আলো আর দড়মার বেড়ার গায়ে ঝোলানো অভিনেত্রীদের ছবি।

গলির একপাশে একটা ঘুমন্ত কুকুর। ধাবমান রিকসা গাড়ীর ঠন্ ঠন্ শব্দ।

টাকা। সবাই টাকা চায়। রক্তের রং কী লাল! জীবন কি। মৃত্যু কি? জীবনের উদ্দেশ্য কি? আর কী আশ্চর্য সেই নারী। যেন তপস্বিনী।

টাকা। টাকার জন্যই মানুষের লোভ, লালসা, পাপ। টাকার জন্যই অসাম্য। কেউ নিরাপদ নয়, কেউ স্বস্তি পায় না, কেউ কারো দিকে তাকায় না, কারো জন্যে কেউ ভাবে না। অরণ্য। গভীর অরণ্য এই আজবনগর। আলোকরশ্মিহীন দুর্ভেদ্য অরণ্য। রক্তলোভী শ্বাপদসঙ্কুল। বাঘ, সাপ, অজগর, নেকড়ে, কুমীর। হত্যা সেখানকার আইন, হিংসা সেখানকার নীতি, লোভ সেখানে স্বভাব, লালসা সেখানে স্বাভাবিক। অরণ্যে পথ হারিয়েছে শান্ত মেষপাল। পথ কোথায়? মুক্তির পথ কোথায়?

কোথায় যেন একটা কুকুর ডেকে উঠল। তার হিংস্র ও আকস্মিক গর্জনে এই প্রায় নিঃশব্দ গলিটার আচ্ছন্নতা যেন খান খান হয়ে গেল।

পথ চাই। পথ বের করতেই হবে। শত্রুশক্তিকে ধ্বংস করতেই হবে। উঠে দাঁড়াও। জাগো। ভাঙো। ইচ্ছে করলেই সব হয়। কে বলেছিল? মুকুন্দ? না, আরো কেউ বলেছিল। মনে পড়ে। বিস্মৃত স্বপ্নের মত একটা রূপালী নদী। গলিত রূপোর পাতের মত। তার পাশে এক প্রাচীন বাড়ী। তার মনিময় কক্ষে এক বিচিত্র জগতের কুয়াশাচ্ছন্ন আকাশ। আনন্দময় পুতুলের দেশ। ঋষির মত একজন লোক তাদের স্রষ্টা। একজন শিল্পী, হ্যাঁ? সে বলেছিল যে ইচ্ছা থেকেই সব কিছু উৎপন্ন হয়। বলেছিল তাকেই। সে তখন প্রহরী ছিল। পাপ, অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য তার হাতে ছিল একটা বাঁকা তলোয়ার। ইচ্ছে করেছিল বলেই সে আজ মানুষ হয়েছে। এখন ক'টা? রাতের কোন প্রহর?

শালবনের অন্ধকার ছায়ায় হয়ত দীর্ঘশৃঙ্গ মৃগযূথেরা এখন স্বপ্ন দেখছে। অনির্বাণ ইন্দ্রকান্ত মনির মত জ্বলছে নক্ষত্রেরা আর ঘূর্ণ্যমান পৃথিবীর আদিধ্বনি শুনছে। মনিমাণিক্যের আলোকে হয়ত সেই রূপবান গায়ক এখন রাগ বসন্তের তান ধরেছে, পাখোয়াজের তালে তালে নাচছে সেই উন্নতস্তনা লাস্যদেহী নর্তকী। আছে, সেই প্রহরী অসিহস্তে এখনো তার অন্তরে আছে। সে যেন ঘোষণা করে বলছে—'জাগো-ও-ও-ও—বিস্মৃতি ও বিভ্রান্তি ঠেলে উঠে দাঁড়াও-ও-ও-ও—'

শ্রীধর লেনের শেষ প্রান্ত।

সেই ভিজে ভিজে গন্ধ। কবরের গন্ধ।

বারান্দার ওপর উঠে দাঁড়াতেই ভেতরের দরজাটা খুলে গেল। লণ্ঠনহাতে ললিতা এসে দাঁড়াল। আশ্চর্য একটি স্বপ্নের মত। অবিশ্বাস্য সুন্দর স্বপ্ন। সেই স্বপ্ন অরিন্দমের সমগ্র চেতনাকে রোমাঞ্চিত পুলকিত ও সুরভিত করে তুলল। স্থির হয়ে সে তাকে দেখতে লাগল।

ললিতার কালিন্দী-কালো চোখে বঙ্কিম কটাক্ষ, তার প্রবাল-ধনুর মত দুটি ঠোঁট যেন শর-নিক্ষেপে উদ্যত।

অরিন্দম উচ্চারণ করল, "ললিতা!"

ললিতা প্রশ্ন করল, "এত দেরী করলেন যে! জানেন না যে আপনারা না এলে আমাদের বসে থাকতে হয়?"

"আপনারা মানে?" অজ্ঞতার ভাণ করল অরিন্দম।

ললিতা বলল, "দাদা আর আপনি।"

অরিন্দম তীক্ষ্ণদৃষ্টি মেলে তাকাল ললিতার দিকে, কপট গাম্ভীর্যের সঙ্গে বলল, "দাদার জন্য বসে থাকার কারণটা বুঝতে পারি, কিন্তু আমি কে? আমার জন্য কেন বসে থাকো বল তো?"

মুহূর্তে ললিতার মুখে যেন আবির ছড়িয়ে পড়ল। লণ্ঠনের ক্ষীণ আলোতেও তার সেই রক্তিম লজ্জাকে টের পাওয়া গেল।

মুহূর্তের জন্য অরিন্দমের মুখের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে মাথা নীচু করে ললিতা বলল, "কেন আবার? অতিথি বলে।"

অরিন্দম মুখ টিপে হাসল, "অতিথি! তার মানে তুমি চাওনা যে আমি এখানে বেশীদিন থাকি?"

ললিতার মুখের আবির এক নিমেষে অন্তর্হিত হল, বিবর্ণমুখ তুলে আহত কণ্ঠে সে বলল, "আমি চাই না! তার মানে?"

"তা নয়তো কি? দু'দিনের জন্য যে থাকে সেই তো অতিথি।"

ললিতা ক্ষণকাল অরিন্দমের মুখের দিকে কটমট করে তাকিয়ে রইল, তারপর হঠাৎ দ্রুতকণ্ঠে বলল, "আমি আর আপনার সঙ্গে তর্ক করতে পারব না আমার ঘাট হয়েছে, দয়া করে এবার খেতে আসুন—"

বলেই দ্রুতপদে সে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল। অরিন্দম তাকে সহাস্যে অনুসরণ করল।

আসন পাতাই ছিল। ললিতা নিঃশব্দে ভাত বাড়তে বসল। অরিন্দম তার দিকে তাকাল। মেয়েরা আশ্চর্য জীব। সেই নারী! রক্তের রং কী অদ্ভুত লাল! ললিতা রাগ করেছে।

"ললিতা"—মৃদু গলায় ডাকল অরিন্দম।

কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

"ললিতা—"

এবারেও জবাব এল না, শুধু একটা ভাতের থালা এসে সামনে হাজির হল।

অরিন্দম হাত গুটিয়ে বলল, "আমি কিন্তু খাবো না ললিতা—"

ললিতা একটা চকিতদৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলল, "কেন? খাবারের ওপর রাগ করছেন কেন?"

"তাহলে তুমি আমার ওপর রাগ করছ কেন?"

ললিতা মাথা নেড়ে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, "রাগ করিনি তো—"

"সত্যি বলছ ?"

"হ্যাঁ।" ললিতার ঠোঁটে একটু হাসি ঝিলিক মারল।

"তাহলে খাচ্ছি।"

অরিন্দম ভাতে হাত দিল।

বড় বড় লাল চালের ভাত, একটা শাক ও ডাল—এই খাবারের তালিকা।

শাক দিয়ে ভাত মাখতে মাখতে অরিন্দম একটু হেসে বলল, "রাগ করো না—এত রাত পর্যন্ত আমাদের জন্য বসে থাকার দরকার কি বল দেখি ? খাবার ঢেকে রাখলেই পারো।"

ললিতা মাথা নাড়ল, "না, পারিনা। ইঁদুর ছুঁচোতে এসে প্রসাদী করে রেখে দেবে তা আমার সহ্য হবে না।" একটু থেমে আবার সে বলল, "আমি কেন ? কোন মেয়েরই তা সহ্য হবে না—মেয়েদের স্বভাবই অমনি।"

অরিন্দম সহাস্যে ভাত মুখে দিল। মোটা লাল চালের ভাত আর শাক আর ডাল। তবু কি আশ্চর্য সুকোমল স্নিগ্ধতা তার ভেতরে! কি ঐন্দ্রজালিক প্রাণরসে রসালো! মুহূর্তে তার মনে পড়ল। এই প্রাণের জন্য কী আকুল কামনা! বেঁচে থাকার জন্য কি নিষ্ঠুর সংগ্রাম! রক্তের রং কী লাল!

"আজ এত দেরী হল যে ?" ললিতা প্রশ্ন করল।

অরিন্দম মুখ তুলে বলল, "মুকুন্দের সঙ্গে জীবনকে দেখেছিলাম—দেখেছিলাম স্বর্গ আর নরককে।"

"তারপর ?"

"অনেক কিছুই শিখলাম।"

"কি শিখলেন ?"

অরিন্দম উত্তেজিত হয়ে উঠল, ললিতার দিকে দুটো জ্বলন্ত চো মেলে সে বলল, "শিখলাম যে 'বীরভোগ্যা বসুন্ধরা'। আর বীর কে সত্যাশ্রয়ী, পরহিত-ব্রতী, ন্যায়পরায়ণ ও প্রেমিকেরা নয়। যে সমাজ ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ফলে মানুষ আজ জঙ্গলের হাজা হাজার জানোয়ারের মত পৃথক পৃথক শ্রেণীতে বিভক্ত—সেই ব্যবস্থা ফলে বীর বলে পরিগণিত হবে সে—যে বাঘের মত হিংস্র হবে সাপের মত ক্রুর হবে, পাথরের মত হৃদয়হীন হবে।"

ললিতা গলা নামিয়ে বলল, "আস্তে—আস্তে—"

"কেন?"

"সত্য আগুনের মত—ছড়িয়ে পড়ে। তাই অসত্যের অসংখ্য চোখ আর কান চারদিকে সদা-জাগ্রত হয়ে আছে—"

অরিন্দমের মুখে তিক্ত হাসি দেখা গেল, "কিন্তু কি করে থামবে ওরা? আগুনকে জল দিয়ে নেভায় মানুষ কিন্তু জলেও তো বাড়-বানল থাকে—"

ললিতা চঞ্চল হয়ে উঠল, বিবর্ণমুখে বলল, "ওসব কথা থাক্, আপনি এখন খান দেখি —"

"হুঁ—খাচ্ছি। অনেক ঘুরেছি আজ—আঁকাবাঁকা কত গলির অন্ধকারে, অত্যুজ্জ্বল ক-ত আলোর সমারোহে। কিন্তু অস্বস্তি বোধ করছিলাম—শেষে বাড়ীতে এসে বাঁচলাম।" অরিন্দম মুখ তুলে নরম হাসি হাসল, "কেন জানো?"

ললিতা অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিস্পৃহকণ্ঠে বিড়বিড় করে বলল, "কেন?"

"তোমার জন্য। তোমাকে দেখে বাঁচলুম।"

আগের মতই মুখ ফিরিয়ে রেখে ললিতা আবার প্রশ্ন করল, "কেন?"

"তোমাকে দেখতে ভালো লাগে।"

আবার সেই প্রশ্ন হল, "কেন ?" কণ্ঠস্বরে একটু চাপা উত্তেজনা, ভীরু কাঁপন-লাগা বীণার তারের মত।

অরিন্দমের দু'চোখে যেন বাষ্প ঘনাল, আবেগের আতিশয্যে চাপা কণ্ঠস্বরটা মাঝে মাঝে কেঁপে উঠতে লাগল, সে বলল, "কেন ? জানিনা। হয়ত তুমি ভালো বলে, সুন্দর বলে। তোমাকে দেখতে ভালো লাগে—তোমাকে দেখার ইচ্ছাটা যেন একটা পিপাসার মত—প্রতি মুহূর্তে প্রতি দিনে, তা শুধু বাড়ছেই, বাড়ছেই। তোমাকে না দেখলে মনে হয় বুঝি দেখলেই পিপাসা মিটবে—কিন্তু তা মেটে না।"

"কি হয় ?" ললিতার যেন ঘুম পেয়েছে। আধো আধো, জড়ানো জড়ানো তার কথা।

"দেখলেও পিপাসা মেটেনা—পিপাসা আরো বেড়ে যায়—আমার সমস্ত কর্ম আর চিন্তার মাঝেও সেই পিপাসার বুদ্বুদ বারংবার উঠতে থাকে—"

ললিতার মুখকে অরিন্দম সম্পূর্ণভাবে দেখতে পায়না—ললিতা মুখটা ঘুরিয়ে নিয়েছে অন্যদিকে। কিন্তু অরিন্দম তাকে না দেখলেই বা কি ? তার মুখে সিঁদুরের মত লাল হয়ে উঠেছে, বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে তার চিবুকে আর নাসাগ্রে, মৃদু হাসির জোয়ারে কাঁপছে তার ঠোঁট দুটো।

হরিণীর মত ঘাড়টা ঈষৎ বেঁকিয়ে কয়েক মুহূর্ত অরিন্দমের দিকে তাকাল ললিতা, তারপর হঠাৎ নড়ে উঠল, বলল, "বক্তৃতা বন্ধ করুন দেখি এবার"—

অরিন্দম অবাক হয়ে গেল, "বক্তৃতা! কি বলছ!"

"বলছি যে খান—আরো ডাল দেব ?"

"হ্যাঁ—না"—

অরিন্দম ললিতার দিকে তাকাল। দু'চোখে তার সঙ্কোচ, শঙ্কা।

ললিতা একটু হাসল, বলল, "আপনি পাগল হয়ে গেলেন—নিন্ তাড়াতাড়ি খান, আমাদের ঘুম নেই বুঝি ?

অরিন্দম আশ্বস্ত হল। না, ললিতা রাগ করেনি। সে তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করতে লাগল।

রান্নাঘরের দরজার আড়াল থেকে, ঠিক সেই সময়েই অমিতা সরে গেল। একটু আগেই সে পা টিপে টিপে রান্নাঘরের দোরগড়ায় এসে দাঁড়িয়েছিল, অগ্নিবর্ষী দৃষ্টি মেলে, দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁট কামড়ে ধরে অরিন্দম ও ললিতার কথা শুনছিল আর উত্তেজনায় অতিক্রুত ওঠানামা করছিল তার বুক।

ললিতার কথা শেষ হতেই অমিতা সরে গেল।

খাওয়া শেষ করে অরিন্দম হাত ধুতে গেল। ললিতা অরিন্দমের ঘরে গিয়ে প্রদীপটা জেলে দিল।

রাত অনেক হয়েছে। বলরাম ও বাচ্চারা ঘুমিয়ে পড়েছে। কাছাকাছি কোন্ একটা বাড়ী থেকে মাঝে মাঝে কান্নার শব্দ ভেসে আসছে। নারীর কান্না। ভারী করুণ।

অরিন্দম ঘরে ঢুকে বলল—"বাতিটা আমিই তো জ্বালিয়ে নিতে পারতাম—তুমি আবার"—

ললিতা মাথা নেড়ে বলল, "তাতে কোনই লোকসান হয়নি আমার। আর কিছু দরকার আছে আপনার?"

"না।"

আবার সেই কান্নার শব্দ ভেসে এল। দমকা হাওয়ার মত। বিষণ্ণ, করুণ, ঠাণ্ডা। কবরের মত। মৃত্যুর মত।

"কে কাঁদছে ললিতা?"

খোলা জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে ললিতা বলল, "আমাদের পাশের বাড়ীর হরেকৃষ্ণবাবু মারা গেছে—তারই বৌ কাঁদছে"—

"ওঃ"—

"বেচারী!" ললিতা সমবেদনার সুরে বলল, "চারটি বাচ্চা ছেলেমেয়ে

নিয়ে বিপদে পড়েছে—তাছাড়া স্বামীকেও ভালবাসত খুব! এবার অকূল পাথারে পড়ল।"

"কেন?"

"বাচ্চাদের খাওয়াবে কি? হরেকৃষ্ণবাবু তো টাকাকড়ি কিছুই রেখে যেতে পারেনি, তাছাড়া কোন কূলেই কেউ নেই।

"হুঁ—"

"আমি যাই।"

"আচ্ছা"—

ললিতা চলে গেল। ললিতার যাওয়ার দিকে তাকিয়ে রইল অরিন্দম। রাজকন্যার মত গর্বিত পদক্ষেপে ললিতা চলে গেল। ঘরটা যেন ফাঁকা হয়ে গেল, বুকটা যেন শূণ্য হয়ে গেল। আর খোলা জানালা দিয়ে ঘরের ভেতর এল বাইরের নর্দমার গন্ধ। এল কান্নার শব্দ। পদশব্দ। কে? অরিন্দম তাকাল। অমিতা। আশ্চর্য্য তার মন বলেছিল এই ভয়ের কথা, সে জানত যে অমিতা নির্ভুলভাবে আসবে। প্রতিদিনকার মত। ললিতা গেলেই অমিতা আসে, ললিতার স্থানকে সে অধিকার করতে চায়। দু'চোখে বাসনার দীপ জ্বালিয়ে সে অর্থহীন কথা বলে বারংবার তাকে উত্তপ্ত, শঙ্কিত, সন্ত্রস্ত করে তোলে।

"জ্বালাতে এলাম—" ঝক্‌ঝকে দাঁত মেলে মৃদু হেসে বলল অমিতা।

দেয়ালের পাশে একটা ছোট্ট টেবিল, তার ধারে একটা নড়বড়ে পুরোন চেয়ার, তারি ওপর বসল অমিতা। টেবিলের ওপর তেলের প্রদীপটা জলছে, মৃদু বাতাসে থরথর করে কাঁপছে তার শিখাটা। সেই প্রদীপের আলোতে অমিতাকে অদ্ভুত দেখাল, অদ্ভুত রূপসী। চঞ্চল কটাক্ষ তার, সারা দেহে মদির যৌবন-তরঙ্গ, মর্মভেদী চোখের দৃষ্টি। আকর্ষণ করে, তবু ভয় হয়। অমিতার চোখে মুখে ক্ষুধা। দেহের আদিম রাক্ষসী ক্ষুধা।

অরিন্দম মৃদু হেসে বলল, "বেশ করলেন, কিন্তু বেশীক্ষণ জ্বালাতে পারবেন না—ঘুম পাচ্ছে।"

অমিতা হাসল, ঘাড় বেঁকিয়ে বলল, "ঘুম তো পাবেই, ঘুমের দোষ কি? তা এত রাত পর্য্যন্ত ঘোরেন কেন?"

"ভালো লাগে।"

"তাহলে একটু কষ্ট করুন এবার, আমার যে আবার গল্প করতে ভালো লাগে।"

"গল্প করার লোকের অভাব কি?" অরিন্দমের কণ্ঠস্বর রসহীন।

অমিতা স্থিরদৃষ্টি মেলে তাকাল অরিন্দমের দিকে, বলল, "অভাব আছে বৈকি। যার তার সঙ্গেই কি কথা বলে আশ মেটে?"

"হুঁ"—

স্তব্ধতা। অজগরের মত দৃষ্টি মেলে কেন দেখছে অমিতা? কি চায় সে? বোঝা যায় তার কামনা। অতৃপ্তি। রক্ত আর মাংসের উন্মত্ততা। তা হয়না। সে এখন ললিতার। কিন্তু কি আশ্চর্য! দেহ বলে, 'না'। দেহ বলে দেহই সত্য। কি আশ্চর্য! মানুষের দুটো মন। একটা স্থূল মন—তা দেহের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। আর একটা সূক্ষ্ম মন তা আত্মার সঙ্গে যুক্ত। একজন অসুর আর একজন দেবতা। চিরকাল তাদের সংগ্রাম চলে আসছে, চিরকাল চলবে। জড় প্রকৃতি আর চেতন প্রানশক্তির শাশ্বত দ্বন্দ্ব। সে কি হার মানবে? না। তার অনেক কাজ। নারী মাংসের নিছক লালসা মানুষের মনে বিস্মৃতি আনে, আনে আলস্য, কাপুরুষতা ও স্বার্থপরতা। প্রহরী—সাবধান—

"আচ্ছা অরিন্দমবাবু"—

"বলুন"—

"দেশে আপনার আর কে কে আছে?"

"কেউনা।"

"কেউনা!" সহানুভূতি-মাখা গলায় অমিতা বলল, "আ-হা! একা মানুষের ভারী দুঃখ।"

হ্যাঁ।"

স্তব্ধতা। থেকে থেকে হরেকৃষ্ণবাবুর বৌ এখনো কাঁদছে। আঁচলটা নিয়ে বারংবার পাকাচ্ছে আর খুলছে অমিতা। বারংবার তার ব্লাউজ আর উন্নত স্তনের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। বারংবার দেহের মধ্যে একটা উত্তাপের ঢেউ ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ছে।

অমিতা হাসল, চাপাগলায় প্রশ্ন করল, "আপনি বিয়ে করেননি অরিন্দমবাবু?"

অরিন্দম শক্ত হয়ে বলল, "না।"

"বিয়ে করবেন না?"

"জানিনা।"

অমিতা দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁঠ একবার কামড়ে বলল, "জানেন না? তাহলে কাউকে ভালবাসেন বোধ হয়?"

অরিন্দম বিরক্ত হয়ে উঠল, বলল, "না।"

"ভালবাসেন না! কিন্তু কাউকে না ভালবেসে কি থাকা যায়? পারা যায়?"

হঠাৎ প্রদীপটা নিভে গেল। ঘরে দমকা হাওয়া আসেনি, তবু নিভে গেল তা।

অরিন্দম বলল, "কি হল? পিদিমটা নিভে গেল যে!"

অন্ধকারে অমিতার অস্বচ্ছ হাসি শোনা গেল, "নিভুক না, কি যায় আসে? অন্ধকারে কি আপনার ভয় লাগে?"

"না।"

"তবে? বলুন না, কাউকে ভাল না বেসে কি বাঁচা যায়? আপনি কি কাউকে ভালবাসবেন না?"

"আমার ঘুম পাচ্ছে অমিতা দেবি—"

"আচ্ছা, আপনি আমাকে 'আপনি' বলেন কেন?"

"আপনাকে আমি শ্রদ্ধা করি?"

"শ্রদ্ধা! কি করব তা নিয়ে? আপনি আমাকে 'তুমিই' বলবেন—আমি তো ললিতার চেয়ে মাত্র দু'বছরেও বড়—"

"আমার সঙ্কোচ হয়!"

"কেন?" তিক্ত হয়ে উঠল অমিতা'র কণ্ঠ, "কেন? আমি ললিতা নই বলে?"

ফস্ করে একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বলে উঠল। অরিন্দম প্রদীপটার দিকে এগিয়ে এসে তা আবার জ্বলিয়ে দিল। সেই আলোতে অরিন্দম দেখল যে অমিতার দু'চোখে ঘৃণা আর হিংস্রতা।

"দিদি—"

দু'জনে চমকে দরজা'র দিকে তাকাল। ললিতা দাঁড়িয়ে আছে। কখন এসেছে সে কেউ তা জানতেও পারেনি।

ললিতা মৃদু হেসে বলল, "ঘুমুতে চল দিদি—মা ডাকছে—"

অমিতা নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াল, বড় বড় পা ফেলে দরজার দিকে এগিয়ে গেল, তারপর হঠাৎ দাঁড়াল। বোনের দিকে তাকাল সে, ললিতাও তাকাল তার দিকে। অমিতা'র চোখে সেই ঘৃণা আর হিংস্রতা, ললিতা'র চোখে প্রশান্তি। মুহূর্তকাল। তারপরেই অমিতা দ্রুতপদে চলে গেল ঘর থেকে।

অরিন্দম ললিতার দিকে তাকাল। ললিতা কয়েক মুহূর্ত তার দিকে নিষ্পলকনেত্রে তাকিয়ে থেকে ভারী মিষ্টি করে হাসল। তারপর নিঃশব্দেই চলে গেল সে।

অরিন্দম এবার নিশ্চিন্তমনে প্রদীপটা নিভিয়ে দিয়ে বিছানায় গিয়ে বসল।

অন্ধকার। অন্ধকারের ঠাণ্ডা ঢেউ এসে দেহে, মনে আঘাত করে। অন্ধকারে ভয় করে না—কিন্তু অমিতা থাকলে গা ছমছম করে। রাত ক'টা? কোন প্রহর? আজ তার অনেক কিছু দেখা হয়েছে, অনেক জ্ঞানলাভ হয়েছে। জ্ঞান দুঃখ আনে। তবু জ্ঞান মহৎ। দুঃখ সম্বন্ধে

সচেতন করে সে। কত মুখ। মানুষের মত দেখতে তারা কিন্তু তাদের মানুষের হৃদয় নেই। তাদের হৃদয়ে পশুর আবাস। তারা খাদ্য সংগ্রহ করে, খায়, ঘুমোয়, বিলাসে মত্ত হয়। আটটি প্রহর তাদের এমনি কাটে। এমনি কাটে দিন রাত মাস বছর। তারা মানুষ হয় কখন, ক'টি মুহূর্ত? কে কাঁদে? কান্নার ঢেউ ভেসে আসছে। সেই বৌটি কাঁদছে। তার স্বামী মারা গেছে, অকূল-সমুদ্রে তার তরী ডুবে গেছে। কেন কাঁদছে বৌটি? ভালবাসার লোক চলে গেল বলে! না। কাঁদছে খাওয়াবে কে সেই কথা ভেবে। টাকা চাই। টাকার জন্যই লোভ, লালসা ও পাপের উদ্ভব। দশজনের ওপর প্রভুত্ব করার প্রতীকই এই টাকা। বৌটি কাঁদছে। কি খাবে, কে খাওয়াবে—সেই ভেবে তার কান্না পাচ্ছে। নিরাপত্তাহীন নিঃসঙ্গতা তার ভালবাসাকে হত্যা করেছে। ভাঙো, ভেঙে চুরমার করো। সত্যের পতাকাতলেও লোক আছে। রক্তের রং কী লাল! সেই নারী। ললিতা যেন রূপসী, অমিতা যেন অগ্নিকুণ্ড। বাতাসে কবরের গন্ধ, সুড়ঙ্গ-প্রবাসী ইঁদুরের শব্দ আর সেই বৌটির কান্না। আজবনগরের লক্ষ্মীর কান্না, আত্মার কান্না। তিলে তিলে ক্ষয়ে যাওয়ার আর্তনাদ। সোহিনীর আলাপ না বেহাগের বিলাপ! প্রহরী সাবধান—ঘুমিয়ো না, ঘুমিয়ো না, দু'চোখে মশাল জেলে তুমি জেগে থাকো, তলোয়ারের ওপরে হাত রাখো—তোমার চারদিকেই শত্রুর শিবির—

কয়েকটা দিন কেটে গেল। প্রতিদিনকার নিয়ম পালন করে জবাকুসুমসঙ্কাশ সূর্য্যদেব উদিত হলেন, অস্তে গেলেন; পীতবর্ণ চন্দ্রদেব রাতের আকাশকে পরিক্রমা করে ক্ষীণকায় হলেন। দিন আর রাতের আলোতে পাখীরা গাইল, বাতাস বইল, ঘাসবনের মৌমাছিরা গুনগুন করে পাখনা নাচাল। আর নগরীর পাড়ায় পাড়ায় নরনারীর জীবনস্রোত

আগের মতই প্রবাহিত হল। উঁচুপাড়ায়—আলো, হাসি, কোলাহল, আর ভোগৈশ্বর্যের উন্মত্ত গতিবেগ। নীচুপাড়ায়—কবরের গন্ধ আর অন্ধকার, মৌন বিষন্নতা আর আর্তনাদ, কান্না আর অভাবের নিষ্ঠুর নখরাঘাত।

কয়েকটা দিন। ললিতার চোখের তারার আশ্চর্য আলোকে আলোকিত দিন। কয়েকটা রাত। অমিতা'র চোখের তারার অন্ধ কামনার মত। তার মাঝে ফ্যাক্টরীর যন্ত্রদানবের গর্জন, ঘাম আর কালি। আগ্নেয়গিরির নিঃশব্দ উত্তাপের মত সহস্রের নিঃশব্দ গুঞ্জন। অরিন্দমের চিন্তায় ঘুম আসে না। আজবনগরের জীবন, মুকুন্দ ও বই পুঁথির জীর্ণ পাতা থেকে জ্ঞানের করুণ ঐশ্বর্যকে বুকের শিলাতে খোদাই করে নেয় সে আর মাঝে মাঝে ফেটে চৌচির হবার একটা প্রচণ্ড তাগিদ অনুভব করে, শয়তানকে কেটে কুচি কুচি করার একটা হিংস্র সংকল্পে কাঁপে, বহু ব্যাধির বীজাণু-ভরা সভ্যতার প্রাচীন ভিত্তিকে ভেঙ্গে চুরমার করে ফেলার একটা প্রাণদাহী পিপাসায় ছটফট করে। কবে? কবে তার হাতের তলোয়ার ঝলসাবে?

কয়েকটা দিনের পর সেদিন—

দুরে ফ্যাক্টরীর বিরাট লোহার ফটকটা দেখা গেল। একটা প্রাগৈতিহাসিক দৈত্যের পঞ্জরের মত তার মোটা মোটা শিকগুলো। দরজার গোড়ায় উদ্যত আগ্নেয়াস্ত্রধারী চারজন দ্বার-রক্ষী। তাদের সামনে জন পঞ্চাশেক লোকের একটা জনতা। ব্যাপার কি?

"বাবা—বাবা গো—"

পেছন ফিরে তাকাল অরিন্দম। একটি জরাগ্রস্ত ভিখারী। শীর্ণ, কঙ্কালসার। দেহের কুঁকড়ে যাওয়া চামড়ার ভাঁজে ভাঁজে বহুদিনের সঞ্চিত ময়লা কালো হয়ে আছে।

"একটা পয়সা দ্যাও গো বাবা—ভগমান তোমাকে রাজা কইরবেন—ঈশ্বর তোমাকে রাজা কইরবেন—"

ভগবান! অরিন্দম জামার পকেটে হাত দিয়ে পয়সা খুঁজতে খুঁজতে প্রশ্ন করল, "তোমাকে একটা পয়সা দিলেই ঈশ্বর আমাকে রাজা করবেন!"

ভিখিরী মাথা নেড়ে কাতরভাবে বলল, "হ্যাঁ বাবা।"

"ঈশ্বরের এত ক্ষমতা!"

"হ্যাঁ বাবা—ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান—"

অরিন্দম হাসল, "হুঁ—তাহলে সেই ঈশ্বর তোমাকে রাজা করেন না কেন?"

ভিখিরী শুক্‌নো গলায় বলল, "মুখ্যু লোক ওর বেশী তো জানি না বাবা—"

"হুঁ—"

অরিন্দম পা বাড়াল। না, তার পকেটে পয়সা নেই। ঈশ্বর। ভগবান। সর্ব্বশক্তিমান! ফ্যাক্টরীর ফটকে দ্বাররক্ষীদের আগ্নেয়াস্ত্র উদ্যত কেন? ঈশ্বর কি? জনতা উত্তেজিত কেন? কি হয়েছে? ঈশ্বর কে?

ফ্যাক্টরীর ফটকের সামনে গিয়ে দাঁড়াল অরিন্দম। জনতা। সবাই ফ্যাক্টরীর শ্রমিক। পরিচিত। সবাই উত্তেজিতভাবে আলোচনা করছে নিজেদের মধ্যে।

জনতার চীৎকার শোনা গেল, "মালিকের সঙ্গে দেখা করব আমরা—দেখা করব—"

দ্বার-রক্ষীরা গর্জে উঠল, "পেছু হটো—ভাগো—"

ইন্দ্র ছিল সেই ভীড়ের মধ্যে, অরিন্দম তাকে টেনে আনল একপাশে।

"কি হয়েছে ভাই?" অরিন্দম প্রশ্ন করল।

ইন্দ্রের মুখ চোখ লাল, সে দাঁতে দাঁত চেপে ফ্যাক্টরীর দিকে তাকিয়ে গালিবর্ষণ করল,—"শালা—শালার বেটা শালা—"

"কি হয়েছে ইন্দ্র—বলনা?"

ইন্দ্র অরিন্দমের দিকে তাকাল, বলল, "ফটকের ওপর নামের তালিকা ঝুলছে—চেয়ে দেখ—"

"কিসের তালিকা? কিসের নাম?"

"পঞ্চাশজন লোকের নাম—তাদের চাকরী গেছে—পঞ্চাশজন লোক বরখাস্ত হয়েছে—"

অরিন্দমের মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল, "চাকরী গেছে! তাহলে তারা খাবে কি?"

বুড়ো আঙুলটাকে তুলে ধরে নাচাল ইন্দ্র, বলল, "কচু—"

"সে আবার কি?"

"ও ছাই—তাও জানো না তুমি?"

"তোমার—তোমারো কি চাকরী গেছে?"

"হ্যাঁ।"

"কিন্তু কেন?"

"মালিকের ইচ্ছে।"

"কি করবে তোমরা?"

"সঙ্ঘ যা স্থির করবে—"

"আমরা কি করব?"

"আপাততঃ ঘানি ঠেলগে—তারপর ডাক আসবে—"

পঞ্চাশজন বেকারের জনতা চীৎকার করে উঠল, "মালিকের দেখা চাই আমরা, বোঝাপড়া করতে চাই—"

দ্বাররক্ষীরা আগ্নেয়াস্ত্র উঁচিয়ে গর্জে উঠল, "পেছুহটো—নইলে গুলি করব—"

জনতা ভয়ঙ্কর হয়ে পাল্টা গর্জন করল, "না—"

পশুর মত নির্দয় দ্বার-রক্ষীরা হঠাৎ আগ্নেয়াস্ত্র থেকে অগ্নিবর্ষণ করল। গুলির প্রচণ্ড শব্দে চারদিক কেঁপে উঠল। দু'জন লোক রক্তাক্ত দেহে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। রক্তের রং কী লাল! জনতা

নিঃশব্দ হল, ভয় পেল, দ্রুতগতিতে চারদিকে ছুটে পালিয়ে গেল তারা।

দ্বার-রক্ষীরা অরিন্দমের দিকে আগ্নেয়াস্ত্র উঁচিয়ে এল।

পেছন থেকে একজন কর্মাধ্যক্ষের গলা শোনা গেল, "ওকে মেরে না—ও বরখাস্ত হয়নি—"

দ্বার-রক্ষীরা থামল। অরিন্দম ভেতরে ঢুকল।

প্রাত্যহিক কাজ। ঘড়ির কাঁটার মত, যন্ত্রের চাকার মত। দানবের মত যন্ত্রগুলো গর্জাতে থাকে। ইস্পাতের সঙ্গে ইস্পাতের সংঘাতের শব্দ, উত্তাপ, বাষ্প। ঘাম, কালি, বেদনাতুর শ্রান্ত পেশী। আর ভারী বাতাসে সাপের মত কুটিল চাবুকের ক্রুদ্ধ গর্জন।

এত শব্দ, তবু যেন কেমন একটা থমথমে ভাব। নিঃশব্দ, নির্বাক, ভ্রূকুটি-কুটিল শ্রমিকেরা। তাদের পঞ্চাশ জনসহকর্মীর চাকরি গেছে। পঞ্চাশজন লোক আজ থেকে দারিদ্র্যের ও মৃত্যুর মুখোমুখী দাঁড়াল। দু'জন লোক মারা গেল। রক্তের রং কী লাল!

একটি যুবক এসে কানে কানে বলে গেল সবার, "আজ রাতে আবার সঙ্ঘে যাবে—জরুরী আলোচনা আছে—"

হ্যাঁ। ভয় নেই। কিন্তু কেন? কেন পঞ্চাশজনের চাকরী গেল?

কেন? হাতুড়ীর আঘাতের মত প্রশ্নটা যেন বারবার কানের মধ্যে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। কেন পঞ্চাশ জনের চাকরী গেল? কেন?

নীচুপাড়ার আঁকাবাঁকা গলি তখন অন্ধকার হয়ে উঠেছে। অন্য-মনস্কভাবে চলতে গিয়ে মাঝে মাঝে হোঁচট খেতে হয়। ঘুঁটে আর কয়লার ধোঁয়ায় গলির বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে, নিঃশ্বাস নিতে রীতিমত কষ্ট হয়। কেন? ঈশ্বর কে?

চলতে চলতে এদিক ওদিক তাকায় অরিন্দম। নীচুপাড়া আজ যেন শব্দ আর কোলাহল বড় কম। কি ব্যাপার?

মানুষদের মুখের দিকে তাকায় অরিন্দম। বড় বিষণ্ণ, বড় চিন্তিত তাদের চোখ মুখ!

হঠাৎ দু'একটা কথাবার্ত্তা তার কানে আসে। সে তা উদগ্রীব হয়ে শোনে।

"কি খবর ভাই?"

"খুব ভালো—আজ আমার চাকরী গেছে।"

"হুঁ—"

"আর তোমার খবর কি?"

"আমিও আজ থেকে বেকার—"

"কোন দোষে?"

"জানিনা।"

"শুধু তুমি আমি নই—সারা আজবনগর জুড়েই নাকি আজ ছাঁটাই হয়েছে—"

"কি হবে?"

"মরব।"

"না খেয়ে?"

"হ্যাঁ—"

"শুধুই মরব?"

"চুপ—"

মানুষদের ক্লান্ত পদক্ষেপ। যুবকদের বুড়ো মনে হয়, বুড়োদের আরো বুড়ো দেখায়। আর বোবা চোখ মেলে জুলজুল করে তাকায় ন্যাংটো ছেলেমেয়েরা। অকারণে হাড়-বের-করা কুকুরেরা দাঁত [illegible] করে গর্জায়, ইঁদুরেরা কিচমিচ করে। জীবনের উদ্দেশ্য কি? মায়া? সবই কি মায়া? বাতাসে থমথমে ভাব, চাপ চাপ উত্তেজনা, ইস্পাত-কঠিন সংকল্প। 'চাকরী গেছে—কি হবে?—মরব।' মৃত্যু কি?

কানা গলির শেষ প্রান্ত। অরিন্দম থামল। সঙ্ঘ। মানব-সঙ্ঘ।

মনিশঙ্করের উজ্জ্বল, ধারালো চোখ।

আবার সেই আমবাগান। আজ শুধু হাজার লোক নয়। হাজার পাঁচেক লোক। সংখ্যা বেড়েছে। সত্যের পতাকার নীচে লোক বেড়েছে। আরো বাড়বে। আরো। অসত্য, অন্যায় আর অত্যাচার যত বাড়ে ততই তাদের প্রতিরোধ ও ধ্বংস করার জন্য শক্তি বাড়ে, লোক বাড়ে।

জ্যোতিষ্মান নক্ষত্র-মণ্ডিত আকাশের নীচে, হ্যারিকেনের স্তিমিত আলোতে অগ্নিমন্ত্র উচ্চারিত হতে থাকে। পিপাসার্ত হৃদয় শোনে তা। অনেক হৃদয়। বীরভোগ্যা বসুন্ধরা। আর বীর কে? সত্যের সেবক যে। জাগো। উচ্চকণ্ঠে প্রতিবাদ করো, চীৎকার করে বলো 'না,' সিংহের মত নির্ভয়ে এগিয়ে যাও। যদি তোমাদের কথায় কেউ কান না দেয়, যদি তোমাদের আলোবাতাস ও অন্ন না জোটে তবে তোমাদের হাড় জিরজিরে বুক মেলে দাও, প্রাণ দাও, বল যে মানুষ না হতে পারলে এ জীবন বৃথা, বৃথা আমাদের বেঁচে থাকা। ওঠো, জাগো, সর্বস্ব পণ করো—

শুনতে শুনতে বুক ফুলে ওঠে, চোখ জলে ওঠে, দেহের পেশী লোহা হয় আর শিরা উপশিরাগুলো ধনুকের ছিলার মত টান টান হয়ে ওঠে—

চায়ের দোকানে বসে চা খাচ্ছিল অরিন্দম। ইন্দ্র খাওয়াচ্ছিল।

বাড়ী ফেরার সময় হয়েছে। ললিতা হয়ত ভাত আগলে বসে আছে। হয়ত ঘুমের জোয়ার তার চোখের আলোকে ভাসিয়ে দেবার চেষ্টা করছে। ললিতা। অমিতা। ক-ত অভিজ্ঞতা ঘটল তার এই ক'দিনের জীবনে! কত বিচিত্র অভিজ্ঞতা! জাগো। ঈশ্বর কে? পঞ্চাশ—একশ—হাজার লোকের চাকরী গেছে। কিন্তু কেন? ঈশ্বর কি?

ইন্দ্র প্রশ্ন করল "কি ভাবছ অরিন্দম?"

অরিন্দম মাথা নাড়ল, "কিছু না।"

"আর এক পাত্র চা খাবে?"

"না ভাই।"

"ওথা না—কাল থেকে তো আর পারব না—"—

ইন্দ্রের মুখে হাসি, কিন্তু তার গলার স্বর ভারী। অরিন্দম হাসতে পারল না, জবাব দিল না, নিঃশব্দে শুধু চায়ের পাত্রে চুমুক দিতে লাগল।

একজন লোক এসে তাদের পাশে বসল, ইন্দ্রের দিকে তাকিয়ে পরিচিতের হাসি হেসে বলল, "কি খবর ভাই?"

"মন্দ না। তোমার খবর কি অমিয়কান্তি?"

"ভাল না ভাই, বুকটা জ্বলে যাচ্ছে"—

"কেন?"

"রামেশ্বরকে চেনো তো? সেই যে তোমাদের ওখানে কেরাণীগিরি করত?"

"হ্যাঁ"—

"সে হঠাৎ চাকরী ছেড়ে ব্যবসাতে নেমেছে—রাতারাতি পাঁচ হাজার টাকা লাভ করেছে"—

"বটে!"

"হ্যাঁ ভাই, বুকটা জ্বলে যাচ্ছে আমার"—

অরিন্দম বিষণ্ণ দৃষ্টি মেলে অমিয়কান্তির দিকে তাকাল। পরশ্রী-কাতরতা আর ঈর্ষায় লোকটার বুক জ্বলে যাচ্ছে। আশ্চর্য।

একজন মোটামত লোক এসে হাজির হল সেখানে, অমিয়কান্তির পাশে বসে বলল, "কি খবর দোস্ত? জরুবেটা সব ভালো তো?"

অমিয়কান্তি তাকে সম্ভাষণ জানিয়ে বলল, "আরে বোস বোস নিশাকর—চা খাও। তারপর রাজনীতির খবর বল?"

নিশাকর ময়লা দাঁত মেলে হাসল, বলল, "খবর আর কি—অষ্টরম্ভা। সব শালারাই দেশটাকে রসাতলে নিয়ে যাচ্ছে।"

"যা বলেছ। কিন্তু অবস্থা যে খারাপ হয়ে এল হে—ছাটাই সুরু হয়েছে।"

"কি করব বল? কপাল।"

একজন রোগা যুবক এসে নিশাকরের সামনে বসল। তাকে দেখে নিশাকরের মুখটা অন্ধকার হয়ে উঠল। যুবকটির পরনে ছেঁড়া জামা-কাপড়।

"নিশাকর"—

"কি?"

"আমার দুটো টাকা ধার দাও ছেলেটার বড় অসুখ অথচ হাতে একটিও পয়সা নেই। আমি বেকার বসে আছি—যে কোন কাজ করতে রাজী আছি অথচ আমি তা পাচ্ছি না।—আমায় দুটো টাকা ধরে দেবে?"

নিশাকর ভ্রূকুঞ্চিত করে মাথা নাড়ল, "আমার কাছেও একটা পয়সা নেই।"

"নিশাকর—"

"নেই।"

"নিশাকর"—

"কি?"

"আমি কোনদিন মিথ্যা বলিনি, চুরি করিনি, লোভ করিনি, কারো কোনদিন অপকার করিনি"—

"হ্যাঁ, তা ঠিক।"

"আমাকে দুটো টাকা ধার দাও। একটা চাকরী পেলেই আবার ধার শোধ করে দেব।"

"নেই।"

"অমিয়কান্তি"—

অমিয়কান্তি ও মাথা নেড়ে বলল, "নেই।"

নিঃশব্দে উঠে টলতে টলতে বেরিয়ে গেল রোগা যুবকটি। নিশাকর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "বাপ বাঁচা গেল—হুঃ—টাকা যেন খোলামকুচি"—

অমিয়কান্তি সায় দিল, "যা বলেছ ভায়া—"

"বাঃ—সবাই যে এখানেই দেখছি"—একজন সুবেশ লোক এসে সেই রোগা যুবটির পরিত্যক্ত আসনে বসে পড়ল। সুদর্শন বুদ্ধিমান যুবক, সর্ব্বাঙ্গে সুরুচির ছাপ।

নিশাকর সোল্লাসে বলল, "আরে দেবেন্দ্র যে! এসো"—

দেবেন্দ্র বসল, বলল, "চা খাওয়াও"—

"নিশ্চয়ই"—

"একটা ধোঁয়া দেখি—আমার ফুরিয়ে গেছে"—

"এই নাও—তারপর, খবর কি?"

"ভালো না ভাই—এমাসে মাত্র হাজার টাকা আয় হয়েছে"—

"দিনকাল বড় খারাপ"—অমিয়কান্তি বলল।

দেবেন্দ্র সিগারেটটা ধরিয়ে বলল, "তা ঠিক, তবে সামনের মাসে আমি ঠিক পুষিয়ে নেব। আর বল কেন? টাকাও কি ছাই হাতে থাকবে? পাঁচশো টাকা ধার দিয়েছি একজনকে, দুশো টাকা দান করেছি একজনকে"—

"ভালোই তো"—নিশাকর সহাস্যে বলল।

চা এল। চা খেতে খেতে দেবেন্দ্র বলল, "কি বল্লে? ভালো? তা হলে আমার চলবে কি করে? এইত এখুনি আমার গোটা একশো টাকা দরকার—পাই কোথায়? কাল ধনাগারে যাব, তবে টাকা তুলব"—

"তা বটে"—

চায়ের পাত্র নিঃশেষ করে দেবেন্দ্র বলল, "আঃ—তারপরে সিগারেটটাকে সজোরে টান দিনে দিতে নিশাকরের দিকে তাকিয়ে সহাস্যে বলল, "ভালই হয়েছে তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে"—

"কেন ?"

"একটি ছাত্র মরমর, তার চিকিৎসার ভার নিয়েছি আমি। আজ রাতেই আবার ডাক্তারকে নিয়ে যেতে হবে আমাকে—বুঝলে না, তার দক্ষিণা, ওষুধের দাম। অথচ কালকের আগে তো টাকা তুলতে পারছি না। একশোটা টাকা দাও তো নিশাকর"—

নিশাকর হাসল, "পরোপকার করে তুমি মারা পড়বে।"

"কেন ? একটু আগেই তো বল্লে—'ভালই তো'।"

দশটা দশটাকার নোট বের করে এগিয়ে দিল নিশাকর।

দেবেন্দ্র তা ছোঁ মেরে পকেটে পুরে বলল, "ধন্যবাদ ভায়া—আজ তাহলে উঠি বুঝলে না, এখুনি ডাক্তারের কাছে যেতে হবে"—

"আচ্ছা"—

দেবেন্দ্র শিষ দিতে দিতে বেরিয়ে গেল দোকান থেকে।

ইন্দ্র উঠে দাঁড়াল, বলল, "অরিন্দম যাবে নাকি ?"

অরিন্দমের চমক ভাঙ্গল, সে বলল, "হ্যাঁ হ্যাঁ—চল"—

অমিয়কান্তি ইন্দ্রকে বলল, "চললে তাহলে ?"

"হ্যাঁ ভাই।"

অরিন্দম আর ইন্দ্র রাস্তায় নামল।

ইন্দ্র বলল, "মজা দেখলে অরিন্দম ?"

"কি মজা ?"

"খানিক আগে রোগামত লোকটা নিশাকরের কাছে দুটো টাকা চেয়েও পেল না, অথচ দেবেন্দ্র পেল এ-ক-শো টাকা—"

"হ্যাঁ—তাতে কি ?"

"রোগা লোকটা সত্যি সৎ—আর দেবেন্দ্র ঠিক তার বিপরীত—সে প্রতারক, জোচ্চোর—"

"তাতে মজাটা আবার কোথায় ?"

"মজাটা এইখানে যে আমাদের সমাজের এইটেই নিয়ম। যে সৎ

সে কারো সাহায্য পায় না আর যে অসৎ তারি সিন্ধুককে ভরে সবাই।"

"তাহলে তুমি নিশাকরকে নিষেধ করলে না কেন?"

"তাতে কি ফল হবে? নিশাকর না দিলে আর কেউ টাকা দেবে দেবেন্দ্রকে। বিষবৃক্ষের শেকড় না ওপড়ালে কিছু হবে না—"

"হুঁ—"

অরিন্দম মাথা নাড়ল। হ্যাঁ, ইন্দ্রের কথাই সত্যি। ব্যক্তিকে চালায় সমাজ, সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করে সমাজপতিরা। আর স্বার্থপর সমাজপতিদের প্রচলিত ব্যবস্থা যখন সমাজকে দুষ্ট করে তোলে তখন ব্যক্তিরা কি করে সাধু থাকবে? ভাঙো—চূরমার করো এই প্রাচীন ও গলিত ব্যবস্থা। ধ্বংস করো। শুকনো পাতার জঞ্জালে আগুন লাগিয়ে দাও।' কিন্তু হৃদয়ের অন্তস্তলে একটা প্রশ্ন—ঈশ্বর কে? ঈশ্বর যদি সর্ব্বশক্তিমান তবে দুঃখ কেন? ঈশ্বর কি?

বারান্দার আবছা অন্ধকারে কে যেন বসে ছিল।

অরিন্দম উঠতে গিয়ে প্রশ্ন করল, "ওখানে কে?"

বলরামের গম্ভীর কণ্ঠ ধ্বনিত হল, "আমি—"

অরিন্দম অবাক হল। আর কোনদিন তো বলরাম এ সময়ে বাইরে বসে থাকে না! ব্যাপার কি? বাড়ীটা নিঝুম—বাচ্চাদের পর্য্যন্ত কোন সাড়াশব্দ নেই।

সে আবার প্রশ্ন করল, "এখানে এমনভাবে বসে আছেন যে?"

অন্ধকারে হাসল বলরাম, তার সে হাসি ভারী অস্বাভাবিক।

"কি বললে? বসে আছি কেন? আমি যে এখনো বসে আছি—সেইটেই আশ্চর্যের কথা—"

"কেন ? কি হয়েছে ?"

"যা আজকে অনেকের ভাগ্যেই ঘটেছে—"

ভয়ে ভয়ে বলল অরিন্দম, "তার মানে ?"

অন্ধকারেই উঠে দাঁড়াল বলরাম, বলল,"চাক্‌রী গেছে—"

অরিন্দমের শরীর যেন পাথর হয়ে গেল। দুটি মাত্র কথা'র ভেতর দিয়ে বলরাম যা বলল তার অর্থ সাংঘাতিক। চুপ করে রইল সে। তার চোখের সামনে দিয়ে হাজার হাজার কর্মচ্যুত লোকদের মুখ মিছিলের মত চলে গেল। আবছা আবছা চেহারা, কুয়াসায় ঢাকা, চিনেও চেনা যায় না তাদের। মানুষের অবয়বধারী প্রেতের মত। আর সেই মুখের মিছিলে আর একটা মুখ বাড়ল। বলরামের মুখ।

বিড়বিড় করে বলে চলল বলরাম, "পঞ্চাশ বছর বয়েস হয়েছে—তবু ভালো দিনের মুখ দেখলাম না—ছেলে আর বাপে যা পাই তা কতটুকু ? কিন্তু তবু তো চলছিল—নূন ভাত খেয়েও তো ন'টি প্রাণী বেঁচে ছিল ! কিন্তু এবার ? এবার ?"

কাকে প্রশ্ন করল বলরাম ? অরিন্দমকে ? না। তবে কি নিজেকে ? না, তাও না। তাহলে ? কাকে ?

অরিন্দম মৃদুকণ্ঠে বলল, "চিন্তা করবেন না—আমরা তো আছি—"

"তোমরা !" বলরাম হাসল, "তোমরাও কি থাকবে ?"

'থাকব—"

বলরাম কটমট করে তাকাল অরিন্দমের দিকে, ক্ষণকাল নিঃশব্দ থেকে বলল, "স্বপ্ন দেখছ, না ? দেখ। আমরাও এককালে দেখেছি তা। ভারী আপশোষ হয়—আজকালও যদি তোমাদের মত স্বপ্ন দেখতে পারতাম—দেখ, স্বপ্ন দেখ—"

বলরাম বেরিয়ে গেল বাড়ী থেকে।

"কোথায় চল্লেন ?" সে পেছন থেকে প্রশ্ন করল। কোন জবাব এল না।

অরিন্দম নিজের ঘরে গেল। ঘরে প্রদীপটা জ্বলছে আর এক কোণে বসে বসে মুকুন্দ বিড়ি টানছে।

অরিন্দমের পায়ের শব্দে ফিরে তাকাল মুকুন্দ, মৃদু হেসে বলল, "বাবা বেকার হয়েছে—"

অরিন্দম বিছানার একপাশে বসে মাথা নাড়ল, "হ্যাঁ, জানি।"

"আজ সঙ্ঘে গিয়েছিলে?"

"হ্যাঁ।"

"আরো অনেকের খাওয়া বন্ধ হল।"

অরিন্দম মাথা নাড়ল, আকুলভাবে প্রশ্ন করল, "কিন্তু কেন মুকুন্দ? কেন?"

বিড়িটাতে শেষ টান দিয়ে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিল মুকুন্দ, বলল, "ধনীর লোভ।"

"তার মানে?"

"বক্তৃতা দিতে ইচ্ছে করছে না অরিন্দম।"

"বল—বল মুকুন্দ—"

মুকুন্দ অরিন্দমের দিকে তাকিয়ে হাসল, বলল, "লোভ। মোটা মুনাফা করব বলে শ্রমিকদের জানোয়ারের মত খাটিয়ে প্রচুর উৎপাদন করেছিল ধনিক প্রভুরা। কিন্তু ঐশ্বর্যবানদের পৃথিবীতে প্রতিযোগিতা বলে একটা বস্তু আছে। তার ফলে এতদিনে প্রভুরা আবিষ্কার করল যে উৎপন্ন দ্রব্যের তুলনায় চাহিদা কম—অতএব উৎপাদন কমাতে হবে। উৎপাদন কম করলে বেশী লোকের দরকার কি? অতএত ছাঁটাই সুরু হল।"

"তাতে চাহিদা বাড়বে কেন?"

"বাজারে কৃত্রিম অভাবের সৃষ্টি করে তারা অল্প অল্প করে মাল ছাড়বে—তাতে শেষ পর্যন্ত তাদের সাংঘাতিক মুনাফা হবে—"

"হুঁ—"

নিঃশব্দতা।

মুকুন্দ বলল, "শুধু তাই একমাত্র কারণ নয়। এবার প্রভুরা এক ঢিলে দু'পাখী মারছে—"

"কি রকম?"

"নীচুপাড়ার লোকদের অসন্তোষ তারা জানতে পেরেছে—তারা টের পেয়েছে যে মরা আগ্নেয়গিরি আবার জেগে উঠছে। তাই অঙ্কুরেই বিপদকে বিনাশ করতে চাইছে তারা। পেটে মেরে—ফাঁসী না দিয়ে অনাহারে মারবার ব্যবস্থা করে—বেছে বেছে তাদের পক্ষে বিপজ্জনক লোকদের ছাঁটাই করে—"

"এবার কি হবে?"

"আরো লোক ছাঁটাই হবে, গ্রেপ্তার করা সুরু হবে, ক্ষুধার্তের সংখ্যা বাড়বে। সঙ্গে সঙ্গে প্রভুদের লোভও আরো বাড়বে—দুর্ভিক্ষ ও নগ্নতা আসবে, আসবে মহামারী, আকাশে, বাতাসে, তোমার চারদিকে তুমি শুধু মৃত্যুর কালো ছায়াকে দেখতে পাবে—"

অরিন্দম উত্তেজিত হয়ে উঠল, "তাই হবে? শুধু তাই হবে? এই মৃত্যুকে কি জয় করতে পারব না আমরা?"

"চেষ্টা তো চলছে—কি হবে কে জানে?"

"আমাদের জয় হবেই।"

"জানিনা কি হবে—তবে এটা ঠিক যে সংগ্রাম করতেই হবে—"

"তুমি আজ দুর্ব্বলের মত কথা বলছ কেন মুকুন্দ?"

মুকুন্দ বিষন্নভাবে হাসল, "কি জানি কেন—মনটা আজ খারাপ লাগছে"—হঠাৎ সে উঠে দাঁড়াল, তিক্তকণ্ঠে বলল, "না, আমি হারব না অরিন্দম, দুর্বল হব না। আমাদের জয় হবেই, জিততেই হবে আমদের—অরিন্দম, আমি যাই, দুঃখরূপী শয়তাণ আমাকে

ভয় দেখাচ্ছে, প্রলুব্ধ করছে, মদের আগুনে তাকে আমি পুড়িয়ে আসিগে যাই—"

"শোন—"

"পেছু ডেকোনা—"

মুকুন্দ গলির অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

লোভ। কুকুরের লোভ, বাঘের লোভ, অজগরের লোভ। লোভ মানে 'দাও, দাও, আরো দাও, হাড় ভেঙ্গে দাও, রক্ত নিংড়ে দাও'। ক্ষুধার্তের মিছিল শুরু হল। ছাঁটাই। 'হ্যাঁ বাবা, ঈশ্বর সর্বশক্তিমান।' ঈশ্বর কে? দু'জন লোক মারা গেল। রক্তের রং কী লাল। অস্তোন্মুখ সূর্যদেবের মত। মাথার ভেতরে হাতুড়ী পিটছে কে? বুকের ভেতরে যেন উত্তপ্ত বয়লার। কি হবে? মরবে সবাই! শুধুই মরবে! না, সিংহের মত কেশর ফুলিয়ে রুখে দাঁড়াও—এই মর্যাদাহীন প্রাণকে বর্জন করো—ওঠো, জাগো, ইস্পাতের মত কঠিন হও, সাবধান হও—অরণ্যের শ্বাপদেরা আজ মনুষ্যের ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাদের ধ্বংস করো, নিশ্চিহ্ন করো—

"উঠুন, খেতে চলুন—"

চমক ভাঙ্গল। ঘরের ভেতর আর একটি প্রদীপ। লজ্জ্বলতর প্রদীপ। না, প্রদীপ নয়, যেন পূর্ণিমার চাঁদ। ললিতা।

অরিন্দম হাসল, তার মুখটা উজ্জল হয়ে উঠল, নিষ্পলকনেত্রে তাকিয়ে রইল সে ললিতার দিকে।

"চলুন—"

"ললিতা—"

"বল—"

"ললিতা—"

"কি?"

"স্থির হয়ে দাঁড়াও—"

"কেন ?"

"আমি তোমাকে দেখি। আপত্তি করো না, হেলো না— আমাকে দেখতে দাও, শান্তি পেতে দাও, শক্তি পেতে দাও। অরণ্যের অন্ধকারে আজবনগর ছেয়ে গেছে ললিতা, রক্তলোভী রাক্ষসেরা পৃথিবীকে জয় করেছে—তাদের সঙ্গে সংগ্রাম করার জন্য আমি শক্তি চাই। ললিতা, আমার দিকে তাকাও,, তোমার চোখের আগুন দিয়ে আমাকে জ্বালিয়ে তোল—"

স্থির হয়ে দাঁড়াল ললিতা, তার পলকহীন চোখের তারায় যেন সত্যি আগুন জ্বলল। উত্তেজনায় থরথর করে কেঁপে উঠল তার দেহলতা। যেন মূর্তিমতী অগ্নিশিখা।

সে বলল, "তাই হোক। তুমি অগ্নিমান হও—জ্বলে ওঠো—পাপের জঞ্জালকে পুড়িয়ে তুমি ছাই করে দাও—"

রক্তে যেন আগুন ধরল, শিরায় উপশিরায় যেন তরল আগুন প্রবাহিত হল আর সেই আগুনের উত্তাপে যেন সমগ্র চেতনা দাবানলের মত জ্বলে উঠল। কান্না। বাতাসে যেন নারীকণ্ঠের বিলাপ। কে কাঁদে ? কেঁদো না। আজবনগরের লক্ষ্মী, তোমার চোখের জলকে আগুন করো—

চার

চলতে চলতে একবার পেছন ফিরে তাকাল অরিন্দম। পশ্চিমের সৌধাবলীর আড়ালে হিরন্ময় সূর্যদেব অদৃশ্য হয়েছেন, সিঁদুর-মেশানো গলিত সোনার প্রলেপ লেগেছে আকাশের নীলের ওপর। আর সেই সব সৌধাবলীর অরণ্যে বনস্পতির মত মাথা তুলে আছে ফ্যাক্টরীর গগনস্পর্শী ধূম্রনলটা। তার পাশ দিয়ে উড়ে যাচ্ছে পারাবতের দল, সারিবদ্ধ বনহংসের মিছিল। ইঁট পাথর আর লোহালক্কড়ের কাঠিন্যের ওপর আকাশের সেই কোমল রং, সূর্যের সেই কোমল আলো আর সেই কোমল-পক্ষ পাখীদের ডানার আঘাতকে ভারী বিচিত্র মনে হয়।

অরিন্দম ভাবে। আরো কয়েকটা দিন কেটেছে। আরো অনেক লোক বেকার হয়েছে। দারিদ্র বেড়েছে। নীচুপাড়ায় আর হাসি শোনা যায় না। সেখানে ক্লান্ত পদক্ষেপ, দীর্ঘশ্বাস, কান্না আর আগ্নেয়গিরির জ্বালা। সঙ্ঘের তরফ থেকে বেকার লোকদের পুনর্নিয়োগ ও কাজের ব্যবস্থা দাবী করা হয়েছে কিন্তু এখনো পর্যন্ত কোন সাড়া দেয়নি মালিক প্রভুরা। আজবনগরের কর্তৃপক্ষও নির্বিকার এবিষয়ে। কি হবে? এরপর কি হবে? সংগ্রাম? কবে—কবে সুরু হবে তা? কবে তার মানুষের জীবন সার্থক হবে?

"বাবা—বাবাগো, একটা পয়সা দাও—"

অরিন্দম তাকাল। একটি ভিখিরীর প্রসারিত হাত। এক ফালি ন্যাকড়া তার নগ্নতাকে দূর করেছে। কালো ময়লা নানা রেখার আকারে জমে আছে তার সারা মুখে ও দেহে। আর কী বীভৎস তার চোখ দুটো! গলে গেছে তা। ব্যাধি। কী সাংঘাতিক!

অরিন্দম বলল, "তুমি অন্ধ!"

ভিখিরী মাথা নাড়ল, "আমি কেন বাবা—পৃথিবীতে সবাই তো অন্ধ—"

"সবাই!—কেন?"

"আমি চোখে দেখতে পাইনা আর তোমরা যে চোখ থাকতেও দেখতে পাওনা—একটা পয়সা দাও না বাবা—"

কি বলল ভিখিরীটা! সত্য! তার অর্থ কি? সত্য কি? পয়সা? পকেটে হাত দিল অরিন্দম। হ্যাঁ, আছে একটা পয়সা।

"এই নাও—"

ভিখিরীর প্রসারিত হাতের ওপর অরিন্দম পয়সাটা দিল। মুহূর্তে কাকের মত, কুকুরের মত অসংখ্য ভিখিরীরা আসতে লাগল তার কাছে।

"ভগবান তোমাকে রাজা করবেন বাবা—রাজা করবেন—"

ভগবান! আবার! কে, ঈশ্বর কে?

"একটা পয়সা দাও বাবা—ও বাবা—"

আর একজন ভিখিরী এগিয়ে এল। তার একটা পা ছোট। নেংচে নেংচে অতিকষ্টে কাছে এল সে, হাত বাড়াল।

"কি হয়েছে তোমার পায়ে?" অরিন্দম প্রশ্ন করল।

"আমি খোঁড়া—"

"তুমি খোঁড়া!"

"শুধু আমি নই—খোঁড়া তো সবাই বাবা—"

"কেন?"

"তা নয়ত কি—পা ঠিক থাকতেও কি কেউ সত্যপথে চলে? একটা পয়সা ছাও বাবা—"

"আঁ—আঁ—আঃ—"

একটা কর্কশ কণ্ঠের আর্তনাদ। অরিন্দম তাকাল। রুক্ষকেশ

একটি যুবক প্রাণপণে হাত নেড়ে ইঙ্গিতে ভিক্ষে চাইছে। তার পাশে একজন অতি-রুগ্ন, ক্ষ্যাজদেহ লোক।

অরিন্দম প্রশ্ন করল, "অমন করছ কেন ভাই? তুমি কি কথা বলতে পারো না?"

রুক্ষকেশ যুবক বলল, "আঁ—আঁ—আঁ—"

রুগ্ন লোকটি বলল, "ও বোবা।"

"বোবা! আহা—"

রুগ্ন লোকটি খেঁকিয়ে উঠল, " 'আহা' কেন মশাই? প্রতি মুহূর্তে মিথ্যা বলার চেয়ে কি বোবা হওয়া ভালো নয়? যাক্ সেকথা—একটা পয়সা দিন না—রোগে ভুগে ভুগে যে মরে গেলাম—"

"তুমি ব্যাধিগ্রস্ত!"

রুগ্ন লোকটি মুখ বিকৃত করল, "হ্যাঁ—আপনাদের মতই।"

"আমাদের মত! কেন?"

"আমার ব্যাধি দেহে—আপনাদের ব্যাধি মনে। একটা পয়সা দেবেন?"

"ও মশাই, একখিলি পান খান না—আমার উপকার হবে—ও দাদা—"

একজন বুড়ো লোক।

"বাবাগো—এ্যাক্টা পাইসা ছাও গো বাবা—আমার এই ছেইলাটা কাইল থিকা না খায়া আছে গো বাবা—ও বাবা—"

একটি প্রেতিনীর মত নারী—তার কোলে একটি দেড় বছরের উলঙ্গ শিশু।

সেই নারীকে সরিয়ে দিয়ে একজন ত্রিশ বছরের লোক এগিয়ে এল কাছে, বলল, "একটা টাকা দিন তো মশাই, কাল দেব—?"

অরিন্দম মাথা নাড়ল, "নেই—"

লোকটি উদ্ধতভাবে বলল, "দিন না—দেখছেন না আমি ভদ্রলোকের ছেলে—দিন্ না—"

লোকটির পেছন থেকে একটি বাইশ বছরের যুবতী এসে সামনে দাঁড়াল! পরণের শতছিন্ন নোংরা সাড়ীর অন্তরাল থেকে জায়গায় জায়গায় তার দেহ দেখা যায়। শ্যামবর্ণ আকৃতি, ডাগর ডাগর চোখের নীচে ক্লান্তি ও দুশ্চিন্তার প্রলেপ। মাথার লম্বা লম্বা চুলের রাশি তেলের অভাবে ফুলে ফেঁপে উঠেছে।

"কিছু পয়সা দিন না—শুনছেন?" যুবতী বলল।

অরিন্দম মাথা নাড়ল, "নেই—নেই আমার কাছে—"

"নেই! ঐ কানা লোকটাকে দিলেন যে!"

"নেই!"

যুবতী ধারালো হেসে হঠাৎ তার ছেঁড়া সাড়ীটাকে টান দিয়ে খুলে ফেলল, নগ্ন হয়ে দাঁড়াল সে। অরিন্দম দেখল। বিশুষ্ক স্তন, শীর্ণ দেহ, হাড় আর নীলচে শিরার ঘোষণা।

যুবতী বলল, "দেখুন, আমার দেহের দিকে তাকিয়ে দেখুন—আপনার কি লোভ হয় না?"

অরিন্দম দু'হাতে মুখ ঢাকল, বলল, "তুমি নির্লজ্জ—"

যুবতী খিলখিল করে হেসে উঠল, "আমি নির্লজ্জ না আপনি!"

"আমি!"

"আপনার মত লোকেরা—আপনারাই তো আমাকে শিখিয়েছেন যে লজ্জাকে বিসর্জন না দিলে বাঁচা যায় না। আপনারাই তো আমাকে চাবুক মেরে মেরে শিখিয়েছেন যে জন্মালেই বাঁচার অধিকার জন্মায় না, বাঁচতে হলে ভিক্ষে চাইতে হয়, লালসার কাছে নিজেকে বিক্রী করতে হয়—"

অরিন্দম শিউরে উঠল, "ছিঃ ছিঃ—দেহের মধ্যে যে আত্মা থাকে, দেহ অপবিত্র হলে যে আত্মাকে বেদনা দেওয়া হয়—"

"আত্মা! সে আবার কি? যে সব প্রভুরা আমার দেহকে কামড়েছে তারা তো কোনদিন বলেনি যে দেহের ভেতরে আরো কিছু আছে—"

"সেই সব প্রভুরা শয়তান—তাদের আমরা ধ্বংস করব—"

যুবতী উত্তেজিত হয়ে উঠল, "সে যখন করবেন তখন দেখা যাবে—এখন আমাকে কিছু পয়সা দিন্। তাকান—চলুন না ঐ গাছতলায়—কেউ নেই ওখানে—"

খিল খিল করে আবার হেসে উঠল সে, একটি হাত বাড়িয়ে বলল, "দিন্ না কিছু পয়সা—আত্মা চুলোয় যাক্—আমাকে বাঁচতে দিন্—"

"দাও—দাও—দাও—"চারদিকের সমবেত ভিখিরীরা ধ্বনি তুলল। বাষ্পীয় আলোতে তাদের রক্তহীন পাণ্ডুর মুখগুলোকে কী ভয়ঙ্কর দেখাল!

"দাও—দাও—দাও—" আরো ভিখিরী ছুটে এল, অরিন্দমের চারদিকে জড় হল।

অরিন্দম তাকাল। সবাই প্রার্থী—হাজার হাজার—লক্ষ কোটি লোক! সবাই ভিখারী। সবাই প্রার্থনা করছে—দাও, দাও, আমাকে বাঁচতে দাও। কিন্তু কেউ সম্মানের সঙ্গে বাঁচতে চাইছে না, কেউ মানুষের মত বাঁচতে চাইছে না, কেউ আত্মাকে বাঁচাতে চাইছে না। মনে পড়ে। ললিতা। তার আশ্চর্য দুটি চোখ, দুটি ঠোঁট—সে, সে ও হয়ত একদিন ভিক্ষে করতে পারে—কে জানে? না, না, তা কখনো হবে না—

"দাও—দাও—দাও—"

"দাও—দাও—দাও—"

"দাও—দাও—দাও—"

নেই, নিরাপত্তা নেই, অবকাশ নেই, সমাহিত আত্মাকে খুঁজে বার করার সময় নেই। জীবনের জৈবিক চাহিদাতে সবাই উন্মত্ত, বুদ্ধিভ্রংশ—ভেঙ্গে ফেলো—

"দাও—দাও—দাও—"

ভেঙ্গে ফেলো—

"দাও—দাও—দাও—"

ভেঙ্গে চুরমার করো—

"দাও—দাও—দাও—"

ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড় দিল অরিন্দম। আর সহ্য হয় না। আর কিছুক্ষণ এভাবে থাকলে সে পাগল হয়ে যাবে। পালাও—পালাও—। কিন্তু কোথায় পালাব? পালাব কেন? না, তা নয়। শুধু মানুষগুলোর নাগালের বাইরে যাব আমি, পালাব না। সেই একই প্রেত। সমাজ-ব্যবস্থা। সেই একই বিষবৃক্ষের শাখা। লোভ ও লালসার জারজ সন্তান। দাও—দাও—দাও। সবাই ভিক্ষুক—সবাই ক্ষুধার্ত ও ক্রূর কুকুর। সত্য? সত্য কি? আত্মা কি? নিবাত-নিষ্কম্প দীপশিখা। টাকা। টাকা না হলে শক্তি নেই। টাকা না হলে জীবন ধারণ করা যায় না। তখন মৃত্যু। মৃত্যু কি? উতরোল রক্তধারা—সমুদ্রের ঢেউয়ের মত এসে আঘাত করছে—আমার মস্তিষ্কে, আমার বুকে, আমার নখের অগ্রভাগে—

"ভগবান্—"

চমকে উঠল অরিন্দম, কাঠ হয়ে দাঁড়াল, আশ্চর্য একটা শিহরণ খেলে গেল তার সমগ্র চেতনায়। এ কী হল! ভগবানকে ডাকল কেন সে? কে ভগবান? চতুরলাল? চতুরলালের মত কেউ? কাকে ডাকল সে? কাকে স্মরণ করল তার বিক্ষুব্ধ আত্মা?

হঠাৎ থমকে দাঁড়াল সে। রাস্তার বিপরীত দিক থেকে একটা মোট মাথায় আসছে দামোদর। তার আগে আগে একজন সুবেশ ভদ্রলোক।

"দামোদর—"

দামোদর তাকাল। সে ভয়ঙ্কর রোগা হয়ে গেছে—তাকে যেন আর চেনাই যায় না।

দামোদর বিশীর্ণ হাসি হাসল। অরিন্দম তার পাশে পাশে চলল।

"তোমার শরীর খুব খারাপ হয়ে গেছে দামোদর—কেন?"

দামোদর হাসিমুখে বলল, "অসুখ হয়েছিল"—

"রিক্সা চালানো ছেড়ে দিয়েছ?"

"হ্যা। শরীরে কুলোয় না বলে আজকাল মোট বই—তাও কষ্ট হয়"—.

"আজকাল আর গান গাও না?"

"গাই—মাঝে মাঝে"—

"কি গাও?"

দামোদর গম্ভীর হয়ে গেল, চলতে চলতে বলল, "আমার শেষ কথা। আমার দিন ফুরিয়ে এসেছে, হে সুদুর্লভে, আর কেন? তোমার মায়াতে আচ্ছন্ন এই পৃথিবী থেকে এবার আমাকে বিদায় নিতে দাও"—

সুবেশ ভদ্রলোকটি হঠাৎ পেছন ফিরে তাকাল, দামোদরকে গল্প করতে দেখে গর্জে উঠল, "শালা শুয়োরের বাচ্চা, মোট বইবি না গল্প করবি রে তুই!"—

দামোদর বিষণ্ন ভাবে হাসল, "চলি ভাই"—

অরিন্দম দাঁড়াল, বলল, "আচ্ছা"—

টলতে টলতে এগিয়ে গেল দামোদর। বেশ বোঝা গেল যে অসুস্থ শরীরে ভারী বোঝা নিয়ে চলতে তার রীতিমত কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু উপায় নেই সভ্য মানুষে-ভরা আজবনগরে তার উপায় নেই। এখানে সভ্যতা মানে একাকীত্ব, সভ্যতা মানে অনিশ্চয়তা, সভ্যতা মানে অরণ্যের আইন। মুষ্টিমেয় লোভীর দর্শন আজ সভ্যতাকে বর্ব্বরযুগের কবরে নিয়ে যাচ্ছে। ভেঙ্গে ফেলো, আগ্নেয়গিরির মত ফেটে পড়ে শোষণের পাহাড়কে চুরমার করো—কাঠুরের মত বনস্পতিদের কেটে কেটে পথ করো—

বারান্দায় উঠেই থমকে দাঁড়াল অরিন্দম। বাড়ীর ভেতরে চেঁচামেচি হচ্ছে। ঝগড়া। ভেতরের ঘরের দরজাটা খোলা ছিল—অরিন্দম তাকাল। সবাই আছে ঘরের ভেতর এবং প্রত্যেকে পরস্পরের সঙ্গে কথা কাটাকাটি করছে। সবচেয়ে বেশী উত্তেজিত হয়েছে মুকুন্দ এবং বলরাম।

মুকুন্দ বলল, "নেই—একটা পয়সাও নেই আমার কাছে"—

বলরাম বলল, "নেই তো ধার করে নিয়ে আয়"—

"ধার দেবার কেউ নেই আমার"—

"তাহলে সংসার চলবে কি করে? মদ খাবার পয়সা জোটাতে পারিস আর সংসার চালাতে পারিস না!"

"আমি জানিনা—যখন চলবে না তখন মরবে সবাই"—

দুর্গাবতী শিউরে বলল, "মুকুন্দ—ছিঃ"—

বলরাম লাফিয়ে উঠল, "মরবে! কেন? লজ্জা লাগে না তোর ও কথা বলতে—বুড়ো মা বাপ আর ভাই বোনদের তুই মরতে বলছিস?

"বলছি। বাঁচবার ক্ষমতা না থাকলে মরবে বৈকি"—

"বড় বড় বুলি আওড়াচ্ছিস হতভাগা! নেতা হয়েছিস!"

"নেতা হতে যাব কোন দুঃখে? সে তো চোর বাটপাড়দের ব্যাপার—যা সত্যি তাই বলছি"—

"আবার বড় বুলি—ব্যাটা বেহায়া কোথাকার"—

"গাল দিও না বাবা"—

"দেব—একশ বার দেব, হাজারবার দেব"—

"দাও তবে—প্রাণভরে দাও"—

হন্‌হন্ করে ঘর থেকে বেরিয়ে এল মুকুন্দ। অরিন্দম একপাশে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়াল, মুকুন্দ গলির অন্ধকারে নেমে গেল।

পিঞ্জরাবদ্ধ বাঘের মত বলরাম গর্জাতে লাগল, "শুনলি? তোরা

সবই শুনলি ! মদ গেলার পয়সা ওর ঠিকই জুটবে শুধু সংসারের বেলাতে তা জোটেনা—হতভাগা নির্লজ্জ বেহায়া”—

চার বছরের ছেলেটা কাতরকণ্ঠে বলে উঠল, “অমন চেঁচাচ্ছ কেন বাবা—ও বাবা ?”

“চো—প্”—

ছেলাটাকে ঠাস্ করে একটা চড় মারল বলরাম। মুহূর্তে তীক্ষ্ণ ও একটানা কান্নার শব্দে গলিটা পর্যন্ত সচকিত ও মুখর হয়ে উঠল।

“চোপ্—ফের কাঁদলে এবার মাথাই ভেঙ্গে ফেলব আমি—চো-প”—

দুর্গাবতী স্বামীকে ভৎর্সনা করে বলল, “ছিঃ—তোমার কী মাথা খারাপ হল নাকি !”

বলরাম থামল। হঠাৎ যেন তার মাথার রক্ত দ্রুত নীচে নেমে গেল, শ্বাসরোধকারী নিষ্ফল ক্রোধের বন্যাটা হঠাৎ অন্তর্হিত হল। বিড় বিড় করে সে বলল, “মাথা—হাঁ, আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে, খারাপ হয়ে যাচ্ছে”—

অরিন্দম সরে গেল সেখান থেকে, নিজের ঘরে গিয়ে বসল। বলরাম, দুর্গাবতী, অমিতা, ললিতা ও মুকুন্দ—সবার মুখেই সে অন্ধকার দেখতে পেয়েছে—সবার চোখেই অসহায় আকুলতা। নীচুপাড়ার গলির মত বাড়ীটাও ক্রমে থমথমে হয়ে উঠছে।

প্রদীটাকে জ্বালাল অরিন্দম, ঘরের অন্ধকার পুড়ে গেল। চুপ করে বসে রইল সে। ক্লান্তি, গভীর ক্লান্তি। প্রদীপটা জ্বলছে, সলতেটা পুড়ছে, একটি একটি করে মুহূর্ত কাটছে। কে যেন পেছনে দাঁড়িয়ে আছে ! অরিন্দম পেছন ফিরে তাকাল।

দরজার গোড়ায় অমিতা। নিষ্পলকনেত্রে তাকে দেখছে। একটি মুহূর্ত। তারপরেই হঠাৎ ক্ষিপ্রপদে চলে গেল সে দুঃখের ঢেউ এসে অরিন্দমের মনের মধ্যে আঘাত করল। কামনার আগুনে পুড়ে যাচ্ছে অমিতা।

পাদপবৃ।

দরজার গোড়ায় ললিতা এসে দাঁড়াল। কালিন্দী-কালো চোখে তার বিমর্ষ অন্ধকার।

"ললিতা"—

"কি?"

"মুকুন্দ রাগ করে চলে গেল?"

"হ্যাঁ"—

"কেন?"

"ঝগড়া—রাগারাগি"—

"ঝগড়া কেন? টাকার জন্য?"

"হ্যাঁ। সংসার অচল হয়ে উঠেছে"—

"হুঁ"—

অরিন্দম চুপ করল। দাও-দাও—কোটি কোটি লোকের প্রার্থনা—আমাকে বাঁচতে দাও। টাকাই প্রাণ। প্রাণই টাকা।

নিজের মনে, আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে ললিতা বলে চলল, "এই তো সবে শুরু, আরো তো কত দিন পড়ে আছে। দারিদ্র এইভাবেই মানুষকে নীচ করে তোলে, কলহ আর ঘৃণার সৃষ্টি করে, সংসারকে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে দেয়"—

"কিন্তু কেন? কলহ আর ঘৃণা কেন?"

"এর জবাব নেই। শুধু এই বলতে পারি যে দারিদ্রের বিষ মানুষের স্নেহ, ভালবাসা, মায়া মমতা, সব কিছুকেই বিষাক্ত করে তোলে। মাবাপের সঙ্গে ছেলেমেয়ের; স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর, বন্ধুর সঙ্গে বন্ধুর মধুর সম্পর্ককেও তা ছিঁড়ে ফেলার উপক্রম করে—দারিদ্র বড় বিয়োগান্ত অবস্থা"—

নিস্তব্ধতা।

প্রদীপের শিখাটা কাঁপছে।

ললিতার মুখে বিষণ্ণ অন্ধকার।

বাইরের গলিটা ভারী নিঃশব্দ।

নিস্তব্ধতা।

"খেতে চল"—ললিতা ডাকল।

অরিন্দম উঠে দাঁড়াল, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল, "চল"—

খাওয়া দাওয়ার পালা চুকল একে একে।

অরিন্দম জেগে রইল মুকুন্দের জন্য। লোকটা কত রাতে ফিরবে কে জানে। কোন শব্দ নেই। বাড়ীর সবাই বোধ হয় শুয়ে পড়েছে। রাত কত? জানালাতে একফালি আকাশের ছবি, তাতে তারার চুমকি বসানো। আকাশে ক'টা তারা?

রাত বাড়ে।

ছোটখাটো কত রকমের শব্দ শোনা যায়। রাতের অস্ফুট সঙ্গীতের মত। মাঝে মাঝে অনেক দূরে একটা কুকুর ডাকে, বেড়ালেরা ঝগড়া করে, ইঁদুরেরা দাঁতে দাঁত ঘষে।

রাত বাড়ে। ঘরের মধ্যে প্রদীপের শিখাটা থরথর করে কাঁপে। রাত। আরো কত রাত কেটেছে, দিন কেটেছে। কোটি কোটি দিনরাত। কাল-পরশু—তার আগে—তারো আগে—অনেক হাজার বছর আগেও মানুষ ছিল। কেমন ছিল তারা? তাদেরও কি এমনি দুঃখ দুর্দশায় দিন কাটত?

অনেক দূরে—হয়ত নগররক্ষীদের কোন আড্ডা থেকে ঘণ্টার আওয়াজ ভেসে এল। প্রহর-ঘোষণা। ক'টা? একটা-দুটো—রূপসী নদীর ধারে, সেই মনিময় কক্ষে কি এখন বেহাগের আলাপ শুরু হয়েছে? ঘুম আসবে। প্রদীপের শিখাটা যেন একটা আলোক-বাষ্পের আকার ধারণ করে তার চেতনা পর্যন্ত আচ্ছন্ন করে দিল। সে যেন ভেসে চলেছে—দূরে—বহুদূরে—কে?

পদশব্দ। ফিস্‌ফিস্ কথাবার্তার আওয়াজ। কে? অরিন্দম চোখ মেলল। প্রদীপের শিখাটা কাঁপছে।

এ কি তার শোনার ভুল? অরিন্দম কান পাতল। না, ভুল নয়। বাইরে কারা যেন কথা বলছে। চাপা কণ্ঠে। কে? চোর? খুনী?

ফুঁ দিয়ে প্রদীপটাকে নিভিয়ে দিল অরিন্দম। অন্ধকার। নিঃসাড় হয়ে বসে রইল সে কয়েকমুহূর্ত। না, চোর নয়, খুনী নয়। আর কেউ। অন্ধকার। উত্তাপের একটা ঢেউ আসছে ঘরের ভেতর। কি ব্যাপার? অরিন্দম পা টিপে টিপে বারান্দায় গেল।

কেউ নেই। কাউকে দেখা যাচ্ছে না।

অথচ সেই ফিস্‌ফিস্ শব্দ এবার সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

অরিন্দম এগোল।

বাইরের ঘরের দেয়ালের ধারে, গলির পাশে দুটি ছায়া। অরিন্দম দাঁড়াল, সতর্ক ভাবে উঁকি মারল। একটি পুরুষমূর্তি, অপরটি নারীমূর্তি।

পুরুষটি নারীর হাত ধরে কি যেন বলল।

নারীমূর্তি মাথা নাড়ল বলল, "না"—হাতটাকে ছাড়িয়ে নিতে চাইল সে।

পুরুষমূর্তি নারীটিকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরল, বুকের দিকে আকর্ষণ করে কম্পিত কণ্ঠে বলল, "আজ—আজ"—

নারীমূর্তি পুরুষটিকে ঠেলবার চেষ্টা করে বলল, "না—না"—

পুরুষমূর্তি নারীমূর্তিটিকে আরো নিবিড়ভাবে বেষ্টন করে বলল, "হ্যাঁ"—

"না—আমি চেঁচাব—ছাড়ো"—

পুরুষমূর্তি ছেড়ে দিল নারীমূর্তিকে।

আলুলায়িতকুন্তলা, অসম্বৃতবসনা সেই নারীমূর্তিকে অরিন্দম চিনল। সে অমিতা। অরিন্দম দ্রুতপদে ঘরে ফিরে গেল। অন্ধকার। স্থির হয়ে দাঁড়াল সে দরজার গোড়ায়। অমিতা ফিরে আসছে। অন্ধকারে গা মিলিয়ে দাঁড়াল অরিন্দম।

অরিন্দমের দরজার গোড়ায় এসে থমকে দাঁড়াল অমিতা, তাকাল

ঘরের দিকে, এগিয়ে এল একপা। উত্তেজনায় তার বুক ফুলে ফুলে উঠছে। ক্ষণকাল সে জ্বলন্ত চোখ মেলে তাকাল ঘরের দিকে, তারপর হঠাৎ স্খলিতপদে ভেতরের দিকে চলে গেল।

ভাঙা দরজাটাকে ভেজিয়ে দিয়ে বিছানায় গিয়ে বসল অরিন্দম। অমিতার অন্ধকার কামনা আর সেই পুরুষটির অধীর আমন্ত্রণ। আদিম জৈবিক চেতনা। ছবিটা চোখের সামনে ভেসে ওঠে, শিউরে ওঠে অরিন্দম। প্রেমহীন কামনা, আত্মাহীন ভালবাসা! নিছক মাংসানুভূতির উত্তাপ। ছিঃ। কিন্তু কী আশ্চর্য! ঘৃণা করলেও পরিত্রাণ নেই, নরনারীর কাম-মূর্তি মনকে উত্তপ্ত করে তোলে। দূরে যাও শয়তান। আমার নারী আছে। ললিতা। পদ্মের মত, কোকিলের ডাকের মত, সূর্যোদয়ের আলোর মত। কিন্তু কেন? অমিতা এমন করে কেন? এও কি সমাজ-ব্যবস্থা? না, ভাবতে পারছিনা। হ্যাঁ। সবাই ক্রীতদাস। দুষ্ট সমাজ-প্রসূত সংস্কারের ক্রীতদাস পুরুষ আর পুরুষের ক্রীতদাসী নারী। কেউ মুক্ত নয়। ভাঙো—। অন্ধকার। নিঃশব্দ অন্ধকার। বাইরে অন্ধকার। অন্ধকার আকাশে তারার চুমকি। কবরের অন্ধকারে ঢাকা নীচুপাড়া। কিন্তু উঁচুপাড়ায় আলো, কোলাহল, উদ্দামতা। ভাঙো। প্রদীপ নিভে গেছে—একটা কালো বাষ্পের কুণ্ডলী তাকে গ্রাস করছে, তার চেতনায় প্রবাহিত হচ্ছে—সে ভেসে চলেছে। রাতের কোন প্রহর? কেন সে ভগবানকে ডেকেছিল তখন? ঈশ্বর কে? ও কার হাত, কাদের হাত! দাও-দাও দাও—সমস্ত পৃথিবী যেন ক্ষুধার্ত, ভীত, ত্রস্ত। তার কোটি কোটি হাত আর একটি প্রার্থনা—দাও দাও, জীবন দাও—। কিন্তু প্রার্থনা কেন? কেন এই ভয়? লোভীর রাজত্ব মানুষকে অমানুষ করছে—ভাঙো—কালো তুলো হাওয়ায় উড়ছে—কোন প্রহর? সেই মনিময় কক্ষে এখন রাগ পঞ্চম না হিণ্ডোলের আলাপ হচ্ছে? কোন তাল? কে নাচে? দ্রিমিকি দ্রিমি দ্রিমি—আপেলের মত গাল, শ্বেত পদ্মের মত স্তনযুগল,

স্ফটিক স্তম্ভের মত যুগল উরু—ড্রিমিকি ড্রিমি—কে! ও ই নগ্ন ভিখারিনী যুবতী! ললিতা! ললিতা ভিক্ষে চাইছে! লোভীর রাজত্ব। তাই ঘৃণা, কলহ, নীচতা! তাই ভালবাসা হয় ঘৃণা, স্নেহ হয় ঈর্ষা, বন্ধুত্ব হয় শত্রুতা—ড্রিমিকি ড্রিমি—কে! অসিধারী প্রহরী! হ্যাঁ—আমি জেগে আছি, আমি ভুলিনি, আমার শপথকে ভুলিনি! ভয় নেই, আমি ঘুমোলেও জেগে থাকি—কারণ আমার অন্তরে তো তুমিই জেগে আছো—ড্রিমিকি ড্রিমি—আমি প্রস্তুত হয়ে আছি প্রহরী-ই-ই, শুধু তোমার আহ্বানের অপেক্ষায় আছি-ই-ই-ই—

দিন সাতেকবাদে একটা কাণ্ড হল। রাতের বেলা।

অরিন্দমের মাথা দিনরাত গরম থাকে। সারাক্ষণই একটিমাত্র চিন্তা তাকে দহন করছে—কি করে সে পৃথিবী থেকে অশুভ শক্তিকে দূর করবে। বই পড়ে আজবনগরের মানুষদের বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করা, যন্ত্রদানবের দাসত্ব করা ও মানুষের অরণ্যে ঘুরে বেড়ানো—এই তার প্রতিদিনকার কর্মসূচী।

সেদিনও রাত করে বাড়ী ফিরল অরিন্দম। খাওয়াদাওয়ার পর বিছনায় শুয়ে ভাবতে লাগল। আজবনগরের অবস্থা ক্রমেই অবনতির দিকে যাচ্ছে। মালিক প্রভুরা সঙ্ঘের আবেদনে এখনো পর্যন্ত কোন সাড়া দেয় নাই। বেকারের সংখ্যাও সমানে বেড়ে চলেছে, অগনন অসহায় মানুষ দাঁতে দাঁত চেপে সঙ্ঘের দিকে তাকিয়ে আছে, প্রতীক্ষা করছে। ব্যাধি অজ্ঞতা অভাব অকালমৃত্যু হিংসা দ্বেষ তাদের মধ্যে বিস্ফোরকের সৃষ্টি করেছে। একদিন, হঠাৎ একদিন ফেটে পড়বে তারা, আজবনগরকে কাঁপিয়ে তুলবে, বলিষ্ঠ ঘোষনায় তারা বাতাসকে চঞ্চল করবে। কবে? ঈশ্বর কে?

রাত হয়েছে। কাজ সেরে সবাই শুয়ে পড়েছে বাড়ী[illegible] অন্ধকার। প্রদীপ নিভে গেছে। মনেও অন্ধকার। অন্ধকারে পথ হারিয়েছে সবাই। ভয় নেই, পথ আছে। পথ এক—সিংহের মত নির্ভয় হও।

রাত কত? আকাশের তারা আজ দেখা যায় না। আকাশে মেঘ জমেছে। নিঃশব্দ ও বিদ্যুৎ-গর্ভ মেঘ। বাইরেও অন্ধকার—তার মাঝে মাঝে বিবর্ণ বাষ্পীয় আলো। ইঁদুরেরা নর্দমার আনাচে কানাচে ঘুরছে, পঙ্কিল গলিত লোভের গান গাইছে, দাঁতে দাঁতে সোল্লাসে শান দিচ্ছে। সবাই কি ঘুমিয়েছে? নীচুপাড়ার চোখে কি ঘুম আসতে পারে? গভীর নিশ্চিন্ত ঘুম?

রাত অনেক। অনেক দূর থেকে গুঞ্জনধ্বনি ভেসে আসছে। উঁচুপাড়ার বিলাসমত্ত নরনারীর হাসি, গান, কোলাহল আর চীৎকার। রক্তমাংসের স্বাদে বিভোর নিশাচর জন্তুদের বহুদূরাগত ডাকের মত। অন্ধকার। একটা ঢেউ, ঢেউয়ের পর ঢেউ, আরো ঢেউ। ঘুম আসছে—

কে?

কে যেন তার পাশে এসে বসেছে! ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ছে তার—প্রখর গ্রীষ্মের মধ্যাহ্ন-কালীন গরম বাতাসের মত সেই উত্তপ্ত নিঃশ্বাস এসে পড়ছে তার মুখের ওপর। কে!

অন্ধকারে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে তাকাল অরিন্দম। তার পাশে একটি নারীমূর্তি!

সে প্রশ্ন করল, "কে!"

সঙ্গে সঙ্গে সেই নারীমূর্তি তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, উন্মত্ত আবেগে জড়িয়ে ধরল তাকে, দুটো উত্তপ্ত ওষ্ঠের ছাপ এঁকে দিতে লাগল তার চোখে, মুখে, কণ্ঠে।

অরিন্দম বুঝতে পারল, বুঝে কঠিন হয়ে বলল সে, "যান—চলে যান শিগ্গীর"—

উত্তেজিত-চাপা কণ্ঠস্বর কান্নার মত ধ্বনিত হল, "না—না"—

"হ্যাঁ—যান"—

"না"—

দুটি কোমল বাহুর নিবিড় নিপীড়ন, দুটি স্তনের আশ্চর্য কোমল স্পর্শ, দুটি ঠোঁটের তৃষ্ণার্ত স্বাদ-গ্রহণ। উত্তপ্ত নিঃশ্বাস, বুকের ওঠা নামা, অসংলগ্ন কামজ ঘোষণা।

"তুমি আমার—তুমি আমার"—

"উঠুন—সরে যান"—

"আমার জীবনকে সার্থক করো তুমি—আমাকে ভালবাসো"—

"আমি দু'জনকে ভালবাসতে পারি না—আপনি যান—"

"আমার পশুকে তুমি তৃপ্ত করো—অন্ধকার রাত, সবাই ঘুমোচ্ছে, কেউ কিছু জানবে না"—

"না।"

"আমি তোমার দাসী হয়ে থাকব।"

"না।"

"না!" আরো কঠিন হয়ে উঠল সেই দুটো বাহুর আলিঙ্গন। যেন ভুজঙ্গ-লতা। আর কী উত্তাপ! দেহ যেন পুড়ে যেতে চাইছে।

"না!" দাঁতে দাঁত চেপে যেন একটি উন্মাদিনী কথা বলল, "কিন্তু আমি ছাড়ব না তোমাকে—ছাড়লে আমি ভেসে যাব—আমার সর্বনাশ হবে"—

অরিন্দম এবার ক্ষেপে গেল। লোহার মত শক্ত দুটো হাত দিয়ে সে ঠেলে দিল সেই উন্মাদিনীকে, কঠিনকণ্ঠে বলল, "যাও বলছি—নইলে আমি সবাইকে ডেকে তুলব"—

"এই তোমার পৌরুষ!" অন্ধকারে কান্না শোনা গেল।

অরিন্দম কেটে কেটে বলল, "যে কোন নারীমাংস নিয়ে মত্ত হওয়াকে পৌরুষ বলে না"—

"বটে!"

"হ্যাঁ"—

"তুমি—তুমি—আমি তোমাকে ঘৃণা করি"—

হিংস্র সর্পিনীর ফোঁস ফোঁসানির মত শোনাল কথাগুলো, উগ্র বিষে-ভরা প্রতিটি কথা। অন্ধকারের মধ্যেও যেন দু'টি অগ্নিময় চোখের তারাকে জ্বলতে দেখা গেল। তারপরেই পদশব্দ শোনা গেল, তা বাইরে মিলিয়ে গেল।

অন্ধকার। আর ঘরটা যেন গরম বাষ্পে ভরপুর। দেহের অন্তরালে রক্তের সমুদ্র যেন দুলে দুলে উঠছে, ললাটে ঘাম দেখা দিয়েছে, সর্বাঙ্গ কাঁপছে। অন্ধকার। অন্ধকার যেন রক্ত, মাংস আর উত্তাপ হয়ে এসেছিল।

অসহ্য এই অন্ধকার।

হাতড়ে হাতড়ে দেশলাইটা বের করল অরিন্দম, প্রদীপটা জ্বালল। আঃ—আলো। অন্ধকারের শত্রু।

কিন্তু তবু সুস্থতা আসে না। অশুচি। ঠোঁট জ্বলছে, বুক জ্বলছে, সারা দেহটা জ্বলছে। তার সর্বাঙ্গে যেন ক্লেদ আর পঙ্ক লেগেছে।

ঘরের কোণে একটা ঘটিতে জল রেখে গেছে ললিতা। সেই জল নিয়ে অরিন্দম মুখ ধুতে বসল। আঃ, কী ঠাণ্ডা জলের স্পর্শ, কী পবিত্র!

কিন্তু তবু গরম লাগে। মনে পড়ে। দুটি বাহু, দুটি ঠোঁট আর দুটি স্তনের স্পর্শ। আশ্চর্য। তার মনের নিভৃতে একটা পশু যেন সেই স্পর্শের স্মৃতিকে লেহন করছে! ছিঃ—

জল দিয়ে সর্বাঙ্গ সিক্ত করল অরিন্দম! পালাও শয়তান, অন্ধকার দূরে যাও। ললিতা আমার নারী। আমার কবিতা। আমার জীবনের মূর্তিমতী ছন্দ। পালাও কাম-কামনা—আমাকে পবিত্র হতে দাও। হে আমার আত্মা—তোমার পাবকশিখাকে তুমি ছড়িয়ে দাও

আমার সমগ্র অস্তিত্বে—আমাকে পুরুষ করো—। অমিতা, তুমি বড় দুঃখিনী, বড় হতভাগী—

সকালবেলা মুকুন্দের ডাকে ঘুম ভেঙ্গে গেল।

"অরিন্দম—অরিন্দম"—

"উঁ?" অরিন্দম উঠে বসল।

মুকুন্দের চোখে মুখে উত্তেজনা আর উদ্বেগের ছায়া, অরিন্দম চোখ মেলতেই সে ব্যাকুলভাবে প্রশ্ন করল, "অমিতাকে দেখেছ অরিন্দম? অমিতাকে?"

"কেন? কি হয়েছে?" অরিন্দম অবাক হয়ে গেল। মুহূর্তে গত রাতের সমস্ত কথা তার মনে পড়ে গেল। কি হয়েছে অমিতার?

"অমিতাকে পাওয়া যাচ্ছে না বাড়ীতে—ছোট্ট একটা টিনের বাক্স আর কিছু কাপড় জামা হয়ত সঙ্গে করে নিয়ে গেছে। তুমি তাকে দেখেছ অরিন্দম?"

"দেখেছিলাম একবার—কাল রাতে—তারপর আর কিছু জানিনা।"

"হুঁ"—

ভেতরের ঘর থেকে দুর্গাবতীর ক্ষীণ কান্না শোনা গেল।

"আমার কপালে এই দুঃখ ছিল—মাগো"—

মুকুন্দ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল ভেতরের দিকে। অরিন্দম তাকে অনুসরণ করল।

ভেতরের ঘরে বলরাম পায়চারী করছিল। দুর্গাবতী মেঝের ওপর বসে একটানা বিড়বিড় করে কাঁদছিল, বাচ্চারা একটা কোণে গিয়ে জড়সড় হয়ে বসে ছিল আর একটা বাক্সের ওপর প্রস্তরমূর্তির মত বসে ছিল ললিতা।

মুকুন্দ বলল, "আমি বাইরে যাচ্ছি—এদিক ওদিক [illegible] দেখে আসি"—

জবাব দিল না কেউ। মুকুন্দ বেরিয়ে গেল।

বলরাম ঘুরে দাঁড়াল। তার দু'চোখে বিভ্রান্ত চাহনি। সে অরিন্দমের দিকে তাকিয়ে হাসল, বলল, "কিছুই হল না। ছোটবেলা থেকে স্বপ্ন দেখেছি—সুখ আর শান্তিতে ভরা ঘর, সংসার, সমাজ আর পৃথিবী। ভেবেছি যে দারিদ্র কিছু নয়—শান্তি আমার নিজের ওপর নির্ভর করে—কিন্তু না, সব মিথ্যে। সব ভেঙ্গে গেল"—

দুর্গাবতীর বিলাপ শোনা গেল, "এই ছিল, হতভাগীর মনে এই ছিল! ভগবান্"—

অরিন্দম শক্ত হয়ে উঠল। ভগবান! কে ভগবান? সে কি চতুরলাল?

নিস্তব্ধতা।

বলরাম বলল, "পাপে আর হিংসায় পৃথিবী ভরে গেছে—এবার ধ্বংস হবে সব কিছু। লোভ আর লালসাকে জয় করতে পারে না যারা—তারা ধ্বংস হবে"—

দুর্গাবতী'র কণ্ঠ, "বিধবা মানুষ, লোকে শুনলে বলবে কি—ছিঃ—লজ্জায় যে মাথা কাটা গেল গো"—

বলরাম লাফিয়ে উঠল, "চুপ করো—চো-প্—। মরে গেছে, মনে করো যে তোমার এক মেয়ে মরে গেছে। ভালোই হয়েছে—একজনের খোরাক কমল"—

বলরামকে ক্ষিপ্ত বলে মনে হল। আর ঘরটার মধ্যে যেন অসুস্থতার ভারী বাতাস। কষ্ট হয়। অরিন্দম বেরোল।

বারান্দায় যেতেই পেছন থেকে ললিতার ডাক শোনা গেল।

"শোন"—

অরিন্দম দাঁড়াল।

"কোথায় যাচ্ছ ?"

"তোমার দিদিকে খুঁজতে"—

"ওঃ"—

অরিন্দম ললিতার দিকে তাকাল। এই তার নারী—তার পৃথিবীর প্রতি ভালবাসা। হ্যাঁ, ললিতাকে সে জানাবে সব কিছু। সব কথা।

"ললিতা"—

"কি ?"

"তোমার দিদি কালরাতে আমার ঘরে এসেছিল"—

ললিতা মুখ নীচু করল, বলল, "তারপর ?"

"সে তখন উন্মাদিনী—কিন্তু তবু তাকে আমি পরাজিত করেছি।"

"তুমি আমার গর্বের বস্তু।

আশ্চর্য প্রশান্তি তার হৃদয়ে ছড়িয়ে পড়ছে, ছড়িয়ে পড়ছে তার বিক্ষুব্ধ প্রহরী-হৃদয়ে।

"পরশু মাঝ রাতেও আমি তাকে দেখেছিলাম ললিতা—একটি পুরুষ এসেছিল বাইরে"—

ললিতা মুখ তুলল। তার দু'চোখে জলের ছায়া। অরিন্দমের দিকে ক্ষণকাল নিঃশব্দে তাকিয়ে থেকে বলল, "তুমি যাও—দিদিকে একবার খুঁজে দেখো। আর শোন"—

"কি ?"

"দিদিকে ঘৃণা করো না—সে বড় দুঃখিনী"—

অরিন্দম একপা কাছে এগিয়ে এল, মৃদুকণ্ঠে বলল, "স্বার্থপরের সমাজে, শোষকের রাজ্যে নারী যে চিরদিনই পুরুষের ক্রীতদাসী এবং তাই বিধবারা বিবাহযোগ্য হলেও তাদের যে কামনার ওপর পাথর চাপাতে হয়, পবিত্রতার নামে অসুস্থতাকে বরণ করতে হয় আমি তা

জানি ললিতা এবং জানি বলেই—বিশ্বাস করো—আমি তোমার দিদিকে ঘৃণা করিনা।"

ললিতার দু'চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ল। নিঃশব্দতা। ললিতা কাঁদছে। সমস্ত অন্তরটা যেন মুচড়ে মুচড়ে উঠতে থাকে।

"ললিতা—"

"হ্যাঁ, তুমি যাও।"

অরিন্দম বেরোল সেখান থেকে। ফ্যাক্টরীতে শরীর অসুস্থ বলে দরখাস্ত পাঠিয়ে দিয়ে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াতে লাগল অরিন্দম। যদি হঠাৎ অমিতার দেখা পাওয়া যায়! কে জানে।

কত পথ, কত রাস্তা, কত গলি দিয়ে হাঁটল অরিন্দম। ক্রমে মাথার ওপর উঠলেন সূর্যদেব। কতবার থামল অরিন্দম, কতবার ফিরোল, কতবার চলল। দিনান্ত হল। রাত এল। অবশেষে নীচুপাড়ার প্রাণহীন গলি দিয়ে সে বাড়ী ফিরে এল।

নিঃশব্দ বাড়ীটা। যেন কারোর মৃত্যুশোকে আচ্ছন্ন।

সবাই বাড়ীতে আছে। মুকুন্দ, বলরাম, ললিতা, দুর্গাবতী, বাচ্চারা। শুধু নেই একজন। সে যেন মরে গেছে। অমিতা।

সবাই তাকাল তার দিকে।

অরিন্দম মাথা নাড়ল, ক্লান্তকণ্ঠে বলল, "না—কোথাও তার ছায়া পর্যন্ত দেখতে পেলাম না।"

নিঃশব্দতা।

অরিন্দম তাকাল মুকুন্দের দিকে, প্রশ্ন করল, "তুমি?"

মুকুন্দ মাথা নাড়ল, "না। তবে একটা খোঁজ পেয়েছি।"

"কি?"

"পাশের মন্দিরের ছোকরা পুরোহিত মাধব রায়ের সঙ্গে পালিয়েছে অমিতা—ভোররাতে একজন লোক তাদের দুজনকে এক ঝলক দেখেছিল।"

হঠাৎ বুলবায় উঠে দাঁড়াল, দু'চোখ বড় করে বলল, "মিথ্যে কথা—কেউ দেখেনি তাকে—কেউ না। আসল কথাটা তোমরা কেউ জানো না কিন্তু আমি জানি। শুনবে তা কি? শোন, কান পেতে শোন—অমিতা মারা গেছে—পাপ করে কেউ বেঁচে থাকে না—"

বাইরে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হচ্ছে। ঘরের ভেতর শুব্ধতা নেমে এল। সুগভীর, থমথমে শুব্ধতা। মৃত্যুর মত।

নীচুপাড়ার শব্দহীন, কলহাস্যহীন ও আঁকাবাঁকা গলির ওপর যখন সূর্যদেবের রাঙা আলো এসে পদার্পণ করল তখন অরিন্দম জাগ্রত। রাতে তার ঘুম ভালো হয়নি। লাল টকটকে চোখ মেলে সে বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখছিল যে নীচুপাড়ার জীবনস্রোত দিনের পর দিন মন্থর হয়ে আসছে, মরে যাচ্ছে। নীল আকাশের স্বর্ণ-তোরণে সূর্যদেব এসে দাঁড়িয়েছেন, রক্তের মত লাল টকটকে তাঁর লাল আলোর জীবনীশক্তিকে অকৃপণভাবে বিতরণ করছেন—তবু নীচুপাড়ার ছেলেমেয়েরা হাসেনা, গায়না, অকারণ চীৎকার করেনা। তারা শঙ্কিত, সন্ত্রস্ত। তাদের গুরুজনেরা—যুবক ও বৃদ্ধেরা—কুব্জের মত নুব্জদেহে চলছে, চিন্তায় জর্জর ও বোবা হয়ে গেছে। শুধু মাঝে মাঝে কান্না শোনা যায়। স্ত্রীলোকের, কোলের শিশুদের, বাচ্চাদের। কিন্তু সে কান্নাও পরিমিত, ভীত, অতি ক্ষীণ।

আর ভাবছিল অরিন্দম। অমিতার কি হল? কি হবে? জীবনের কোন কুটিল স্রোতে ভেসে গেল সে, মানুষের কোন দুর্গম জগতে হারিয়ে গেল?

"কি হল? চান করবে না—সময় যে হয়ে এল?"

ললিতা এসে তাগিদ দিল।

অরিন্দমের চমক ভাঙল, সে বলল, "হ্যাঁ, এই উঠি। আচ্ছা ললিতা—"

"কি—"

"তোমার দিদির বিষয়ে কি করবে?"

ললিতা বিষন্নভাবে হাসল. "কিইবা আর করার আছে? জীবন তারও কাটবে আমাদেরও কাটবে।"

"তাই বটে—"

চুপ করে ভাবতে লাগল অরিন্দম। হ্যাঁ, তবু জীবন চলবে, দিন কাটবে।

"চোখ যে জবাফুলের মত লাল—ঘুমোওনি?"

"ভালো ঘুম আসেনি।

"কেন?"

"ভাবছিলাম—পৃথিবী থেকে পাপকে নিশ্চিহ্ন করার সংগ্রাম কবে আরম্ভ হবে?"

"সংগ্রাম তো করছই—"

"কোথায়?"

"পাপকে স্বীকার না করা মানেই তো এক রকমের সংগ্রাম।"

"মুখে 'পাপকে স্বীকার করি না' বলে নিঃশব্দ ও নিষ্ক্রিয় থাকাকে আমি সংগ্রাম বলি না—পাপের ওপর আঘাত হানাটাই আমার কাছে সংগ্রাম।"

"সে তো একদিনেই হবে না। বীজ থেকে অঙ্কুর বেরোতে কি সময় লাগে না?"

"হুঁ—"

ভোঁ-ও-ও-ও-ও—ফ্যাক্টরীর বাঁশীর শব্দটা দূর থেকে ভেসে এল। কর্কশ, একটানা শব্দ।

"কারখানার বাঁশী বাজছে"—ললিতা বলল।

অরিন্দম হাসল, "বাণী! না। ও হচ্ছে দানবের হুঙ্কার—ওর ভেতর আছে আদেশ—ধনী প্রভুর হুংকার—"

ললিতা হাসল।

চান খাওয়া শেষ করে অরিন্দম বেরোল।

আঁকবাঁকা গলির মধ্যে নিরানন্দ জীবন-প্রবাহ। হ্যাঁ—বীজ থেকে অঙ্কুরোদ্গমে সময় লাগে।

অশরীরী ছায়ার মত মানুষগুলো। নিঃশব্দে সহ্য করছে সব। সব অত্যাচার, নির্যাতন, অসাম্য। অসহ্য। কিন্তু না, সময় লাগবে, সহ্য করতেই হবে। শৃঙ্খলমুক্ত হওয়ার আগে শৃঙ্খলকে ভাঙতে হয়।

আবার সেই ফ্যাক্টরী। যন্ত্রদানবের গর্জন, ইস্পাতের সঙ্গে ইস্পাতের আগ্নেয় সংঘাত রক্তের জলীয় নির্যাস, তেলকালির কলঙ্ক আর ক্লান্ত হাড়ের মর্মর-বেদনা।

সন্ধ্যা এল। সূর্যদেবের রথের চাকা রাঙা ধুলো উড়িয়ে পশ্চিম দিগন্তের রাঙামাটির দেশকে অতিক্রম করল। ক্রমবর্ধমান অন্ধকারে বিলুপ্ত আকাশের গা বেয়ে পাখীর দল এদিকে আর ওদিকে সশব্দে উড়ে গেল। বিজলী বাতির সারি রাতের অন্ধকারকে পরাজিত করে উঁচুপাড়ায় দিবসালোকের সৃষ্টি করল। পরাজিত সেই অন্ধকার এসে নীচুপাড়ায় জমা হল—সেই অন্ধকারকে গাঢ়তর করল মানুষের মনের অন্ধকার; গ্যাস আর প্রদীপের বিবর্ণ আলোতে সেই অন্ধকারে যেন একটা ভৌতিক পরিবেশের সৃষ্টি হল।

নীচুপাড়ার একপ্রান্ত দিয়ে অরিন্দম এগোল। কোথা যাবে সে? বাড়ী? না। দেখা যাক, মানুষদের দেখা যাক!

এগোল সে। তার দু'চোখে অসংখ্যের ছায়া। তার দু'কানে কত কথা, কত কান্না, ক-ত দীর্ঘশ্বাস। তার বুকে পুঞ্জীভূত বেদনা ও জ্বালা। তার মস্তিষ্কে লৌহ-কঠিন শপথ।

কোথায় গেল অমিতা? কি হল তার? তার মনের অনির্বাণ আগুনকে কে নেভাবে?

ক-ত লোক নীচুপাড়ায়! কত লোক আজবনগরে! বেহিসেবী মানুষের কী বেহিসেবী লালসা! সুস্থতা নেই। সবাই অন্ধ, খঞ্জ, বোবা ও ব্যাধিগ্রস্ত। সবাই ভিক্ষুক।

ভাঙো। ভাঙতে গেলে মরতে হয়। রক্তের রং কী লাল! সেই নারীর কান্না। জীবন প্রেমের চেয়ে বড়! অসম্ভব। তার চেয়ে মৃত্যু ভালো। সিংহের মত নির্ভয় হও। কিন্তু মৃত্যু কি?

আজবনগরের শেষপ্রান্তে পৌছল অরিন্দম।

সেখানে অন্ধকার, ভাঙা ভাঙা কুঁড়েঘর আর আবর্জনার পাহাড়। আরো এগিয়ে গেল অরিন্দম।

আকাশে মেঘের নিঃশব্দ জমায়েৎ। অন্ধকার গাঢ়তর। ক্লান্তদেহে বিশ্রামের প্রার্থনা।

একটা বটগাছ। তার তলায় বসল অরিন্দম। আঃ, কী ঠাণ্ডা পূবের বাতাস!

মনে পড়ে। ক'দিনের জীবন তার, অথচ ক-ত জ্ঞানলাভ করেছে সে! দুঃখের জ্ঞান। মনে পড়ে। রূপসী নদীর তীরবর্তী সেই প্রাচীন অট্টালিকার বাসিন্দা এক বুড়োর কথা। সে বলেছিল মানুষদের অবস্থার কথা। তার কথা মিথ্যে নয়।

আজবনগরের বারো আনা মানুষ যেখানে থাকে সেই নীচুপাড়ার মানুষদের কথা মনে পড়ে। সে কী বিয়োগান্ত কথা! অসংখ্য মানুষের গম্ভীর বিষন্ন মুখ তার চোখের সামনে ভাসে। ক-ত মুখ।

"শুনছ—শুনছ—শুনছ—"

অরিন্দম চমকে উঠল। চাপা কণ্ঠস্বর। কে? কে? কে?

"শুনছ—শুনছ—শুনছ"—আবার সেই কণ্ঠস্বর। একজন নয়, দু'জন নয়, অনেক লোকের সম্মিলিত একটি একস্বর। ষড়যন্ত্রকারী মানুষদের মত চাপা তাদের ডাক। প্রতিধ্বনির মত শব্দগুলোর পুনরাবৃত্তি করে বারংবার ডাকে সেই কণ্ঠস্বর।

"কে?"

চারদিকে তাকাল অরিন্দম। কোথায়? কাউকে তো দেখা যাচ্ছে না!

"কে তোমরা? কোথায় তোমরা?" অরিন্দম প্রশ্ন করল।

চাপা কণ্ঠের হাসি শোনা গেল, "আমরা নেই—আমরা শুধু কণ্ঠস্বর"—

"শুধু কণ্ঠস্বর?"

"হ্যাঁ—আমাদের রক্তমাংস আর হাড় মাটিতে মিশে গেছে কিন্তু কণ্ঠস্বর রয়ে গেছে—শোন শোন শোন—"

"কি?"

"আমরা জ্ঞান—আমারা দেখাই—তুমি দেখবে দেখবে দেখবে?"

"কি?"

"মানুষ অমানুষ হলে কি হয়? এসো—আস্তবনগরের অবস্থা কি হয়েছে দেখবে এসো"—

"কোথায় যাব?"

"আমাদের পেছন পেছন এসো—পেছন পেছন পেছন পেছন পেছন পেছন—"

"আস্তবনগরের অবস্থা কি হয়েছে?"

"নরক—নরক—নরক—"

"উঃ—"

"এসো—"

অরিন্দম উঠল, বলল, "চল"—

ফিস্‌ফিস্ ডাক শোনা গেল, "এসো—এসো—এসো—"

চুম্বকে যেমন লোহা টানে, তেমনিভাবে সেই কণ্ঠস্বর টানতে লাগল অরিন্দমকে। কখনো ডাইনে, কখনো বাঁয়ে, কখনো সামনে। অন্ধকার, শুধু অন্ধকার তার চারদিকে। পায়ে হোঁচট লাগে, চলতে ভয় লাগে, তবু এগোয় সে। ডাক শোনা যায়—এসো—এসো—এসো—

পায়ের নীচে যেন কাঁটা বিছানো রয়েছে। পায়ে তা বিঁধতে থাকে, পায়ের তলা ভিজে মনে হয়। বোধহয় ক্ষত দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে।

"পায়ে কাঁটা বিঁধছে আমার—শুনছ?"—অরিন্দম বলল।

কণ্ঠস্বরের ঐকতান শোনা গেল, "শুনছি—শুনছি—বিঁধবেই তো। নরকের মালিকেরা মানুষের চলার পথে কাঁটা বিছিয়ে দিয়েছে—যাতে তোমরা সেই পথের শেষে না পৌঁছোও, তাদের দুর্গকে না ভাঙতে পারো। এসো—এসো—এসো"—

কষ্ট হয়, তবু এগিয়ে চলল অরিন্দম। অন্ধকার, গাঢ় অন্ধকার, দুর্নিরীক্ষ্য প্রাচীরের মত অন্ধকার। সেই অন্ধকারে নিজেকে অশরীরী বলে মনে হয়, মনে হয় অরিন্দমের যেন দেহ নেই, সে-ও যেন শুধু একটা কণ্ঠস্বর।

হঠাৎ পায়ের নীচেকার কণ্টকাকীর্ণ পাথুরে পথটাকে উত্তপ্ত মনে হয়, অন্ধকারের মধ্যে দূরে একটা বাষ্পীয় ক্ষীণ আলোর রেশ দেখা যায়। আর স্তব্ধগতি ভারী বাতাসে ভাসে একটা বিরাট ঢাকের শব্দ ও সহস্র কণ্ঠের মৃদু বিলাপ-সঙ্গীত। যেন কেউ মারা গেছে আর হাজার হাজার লোকেরা চাপা গলায় সুর করে শো[illegible] প্রকাশ করছে।

"এসো—এসো—এসো—" কানের কাছে সেই পথপ্রদর্শক কণ্ঠস্বরের সাদর আমন্ত্রণ, "এবার তুমি দেখতে পাবে—আজবনগরের রূপকে দেখতে পাবে পাবে পাবে—"

আরো এগোল অরিন্দম। সেই বাষ্পীয় আলোক বৃত্তটা ক্রমেই

বড় হল, বড় হল, আরো বড় হল। কিন্তু আলোর শক্তি নেই; তার অস্পষ্ট, আবছা আবছা আলো-আঁধারির মাঝখানে এবার অনেক কিছু দেখা গেল। নিকষ-কালো পাথরের পাহাড় চারদিকে, অস্পষ্ট আকাশের দিকে তা মিলিয়ে গেছে। তার গায়ে লোহার কাঁটাওয়ালা ফণিমনসা গাছ ছাড়া আর কিছু নেই।

হঠাৎ পায়ের নীচেকার পাথরের পথটা এবার আগুণের মত গরম হয়ে উঠল, কালো পাহাড়ের গা থেকে উত্তাপের লকলকে পাৎলা জিহ্বা বেরোতে লাগল। সেই ঢাকের শব্দ এবার কর্ণভেদী হয়ে বুকের স্পন্দনকে চকিত ও দ্রুত করে তুলল। ডুম্—ডুম্—ডুম্ ডুম্ ডুম্—ডুম্—ডুম্—ডুম্ ডুম্ ডুম্—ডুম্—ডুম্—ডুম্ ডুম্ ডুম্। আর শোনা গেল সেই ক্ষীণ শোক-সঙ্গীত—আঁ-আঁ-আহাহা—আঁ-আঁ-আহাহা—আঁ-আঁ-আহাহা। ধোঁয়াটে আকাশের গা থেকে পড়তে লাগল রক্তের বড় বড় ফোঁটা—টিপ্ টপ্—টপ্ টপ্ টপ্—টিপ্ টপ্—টপ্ টপ্ টপ্। উত্তপ্ত পাথরের গায়ে সেই রক্ত পড়তেই তা সশব্দে শুকিয়ে যেতে লাগল—আর পাথরের গায়ে সেই রক্তের শুক্‌নো দাগ লেখা হয়ে ফুটে উঠল—'অন্ন দাও, বস্ত্র দাও, মানুষ হতে দাও—অন্ন দাও, বস্ত্র দাও, মানুষ হতে দাও—'। অট্টহাসি শোনা গেল চারদিকে। অদৃশ্য একদল দৈত্যের অট্টহাসি। হা হা—হাঃ হাঃ হাঃ—হা হা—হাঃ হাঃ হাঃ—। অসংখ্য লোমশ ও নখযুক্ত হাত হঠাৎ আকাশ থেকে বেরিয়ে এল, পাথরের ওপরকার সেই রক্তের লেখা মুছে দিল। হা হা—হাঃ হাঃ হাঃ।

সেই লোমশ ও নখযুক্ত হাতগুলোতে এবার হাড়ের চাবুক দেখা গেল, বাতাস কেটে গর্জে উঠল সেই চাবুকগুলো। আর সেই ভৌতিক পরিবেশের মধ্যে ছায়াছবির মত দেখা গেল একটা মরুভূমির বিস্তীর্ণ অংশ—তার মধ্যে বড় বড় লোহার বাড়ী। সেই বাড়ীগুলোর মাঝখান দিয়ে একসারি নরনারী আসছে একটা বাড়ীর ফটকের সামনে।

ফটকটা বন্ধ। ফটকের ওপিঠে স্তূপীকৃত চাল আর কয়েকজোড়া লোমশ হাত।

অরিন্দম অবাক হয়ে গেল। কি আশ্চর্য! সেই সারিবদ্ধ কঙ্কালসার নরনারীদের হাত পা ও মুখ আছে বটে কিন্তু ওপরের ঠোঁট থেকে মাথা নেই। আর প্রত্যেকের পায়ে আছে শেকলবাঁধা। চাবুকের শব্দ আর ঢাকের তালে তালে, লোমশ হাতের ইসারায় তারা একপা একপা করে এগোচ্ছে সেই বন্ধ ফটকের দিকে।

মৃতের পৃথিবী। একটিও ঘাসের গুচ্ছ নেই পাহাড়ের গায়ে, নেই এতটুকুও শ্যামের আভা। শুধু এখানে ওখানে লোহার কাঁটাওয়ালা ফণিমনসা গাছ।

রুদ্ধগতি ভারী বাতাসে হঠাৎ মৃদু আলোড়ন জাগল আর দুর্গন্ধ ভেসে এল। দুর্গন্ধ নয় যেন বিষবাষ্প। পৃথিবীর সমস্ত পচা জিনিষের দুর্গন্ধ। তাতে অরিন্দমের দম বন্ধ হয়ে এল, প্রচণ্ড একটা বিবমিষায় সমস্ত পাকযন্ত্রটা উলটে বেরিয়ে আসতে চাইল। দুর্গন্ধ। পচা, গলিত মাংসের দুর্গন্ধ।

আর সেই একটানা, অস্বাভাবিক ও ভয়াবহ বাজনা, হাসি, বিলাপ ও শব্দ :

ডুম্—ডুম্—ডুম্ ডুম্ ডুম্—

আঁ-আঁ—আহাহা—

টিপ্ টপ্—টপ্ টপ্ টপ্—

হাহা—হাঃ হাঃ হাঃ—

সেই বন্ধ ফটকের সামনে এসে দাঁড়াল সারিটা। তারপরে আরম্ভ হল ঠেলাঠেলি। কুৎসিৎ চীৎকার আর গালিগালাজ।

"আ মর্—আমি আগে"—

"ওরে শালা—আমি আগে"—

"আমি আগে"—

"আমি"—

"আমি"—

চাবুকের শব্দ। সবাই সভয়ে থামল।

একজোড়া লোমশ হাত একমুঠো চাল দিল একজনকে। সে সরে গেল। আর একজন এগোল। একের পর এক সবাই এক মুঠো করে চাল নিয়ে আবার ফিরে চলল। আর ঠিক সেই সময়েই একটা অজগরের মত লম্বা জিভ তাদের মাথার ওপর বাজের মত পাক খেতে লাগল আর মাঝে মাঝে বিদ্যুৎগতিতে নীচে নেমে এসে এক একজনের হাতের চালকে লেহন করে নিতে লাগল।

আর্তনাদ শোনা গেল—"একি! চাল গেল কোথায়?"

"চাল গেল কোথায়? চাল গেল কোথায়?"

আর্তনাদ।

"একি! চালের বদলে আমাদের পাথর দিয়েছে"—

"আমাদের পাথর দিয়েছে, পাথর দিয়েছে"—

আর্তনাদ।

সেই নিকষ-কালো পাহাড়ের তলা থেকে যেন সহস্রকণ্ঠে ডাক শোনা গেল, "ভগবান—ভগবান"—

হঠাৎ ওপর থেকে গর্জন শোনা গেল, "খবরদার—খবরদার"—

সেই অদৃশ্য ঢাকের ওপর যেন আরো জোরে আঘাত পড়তে লাগল—ডুম্-ডুম্—ডুম্-ডুম্-ডুম্—

তরঙ্গের পর তরঙ্গের মত বিলাপ—আঁ আঁ—আহাহা—আঁ আঁ—আহাহা—

আর সব কিছুকে ছাপিয়ে একদল লোকের তীক্ষ্ণ ও উত্তেজিত শপথ শোনা গেল, "আমরা ধ্বংস করব—এ নরককে আমরা ধ্বংস করব"—

সেই সারিবদ্ধ মস্তকহীন নরনারীর দল স্থির হয়ে দাঁড়াল, পরস্পরকে

জড়িয়ে ধরে তারা সেই শব্দের দিকে দেহ ঘোরাল, তারপর বলে উঠল, "ফিরে দাও, ফিরে দাও, আমাদের মাথা ফিরে দাও"—

"ফিরে দাও, ফিরে দাও"—

"আমাদের মাথা ফিরে দাও"—

"ফিরে দাও, ফিরে দাও"—

আবার আকাশ থেকে সেই গর্জন শোনা গেল, "খবরদার— খবদার"—

পায়ের নীচেকার পাথর আর পাহাড় এবার ফেটে গেল—চড় চড় চড়াং—। আগুনের লকলকে শিখা বেরিয়ে এল সেই সব ফাটল থেকে। বর্শা ও তলোয়ার হাতে অসংখ্য লোমশ হাত সেই সব নরনারীদের দিকে এগিয়ে এল, নির্দয় আঘাতে তাদের হাত পা কাটতে সুরু করল। ঢাকের শব্দ বেড়ে গেল, বিলাপ বেড়ে গেল, দগ্ধ ও গলিত নরমাংসের উৎকট দুর্গন্ধের মাঝে হিহি হাহা হাসির শব্দ শোনা গেল।

"খবরদার—খবরদার"—

"হিহি—হাহা—হিহিহি"—

"খবরদার—খবরদার"—

"হিহি—হাহা—হিহিহি"—

হঠাৎ অরিন্দম দেখল যে অত্যাচারের জ্বালায় সেই সব নরনারীরা নির্জীব হয়ে পড়ল, তারা গিয়ে পাহাড়ের ধারে দাঁড়াল। সেখানে হাড় আর মাংসের তৈরী একটা দুর্গকে দেখা গেল আর সেই দুর্গকে তারা কাঁধে তুলে নিল। বিরাট সেই দুর্গ—তার উচ্চতা নির্ণয় করা গেল না, ধোঁয়াটে ও অন্ধকার আকাশকে ভেদ করে কোথায় গিয়ে যে তা শেষ হয়েছে তা বোঝা যায় না।

পাথুরে পথ আর পাহাড়ের ফাটল থেকে আরো আগুন বেরিয়ে আসতে লাগল—আরো। অসহ্য উত্তাপ। অরিন্দমের চোখের সামনে

থেকে সবকিছুকে অদৃশ্য করে দিয়ে একটা উন্মাদের মত যেন করতালি দিয়ে নাচতে লাগল সেই রসাতলের অগ্নিশিখা।

অরিন্দম আর স্থির থাকতে পারল না, ডাক দিল, "শুনছ—কণ্ঠস্বরেরা ?"

বহু কণ্ঠস্বর মেশানো সেই একটি কণ্ঠস্বর জবার দিল, "শুনছি শুনছি শুনছি"—

"এই অসংখ্য নরনারীর মাথা নেই কেন ? কোথায় গেল তাদের মাথা ?"

"ঐ হাড়ের দুর্গে—হাড়ের দুর্গে—দুর্গে"—

"ঐ দুর্গে ? কারা নিয়েছে ? কারা থাকে ঐ দুর্গে ?"

"ঐ লোমশ হাত, জিভ, চাবুক, বর্শা, তলোয়ার আর ঢাকের মালিকেরা মালিকেরা মালিকেরা—"

"তারা কোথায় ?"

হঠাৎ আগুনের শিখা স্তিমিত হয়ে নিভে গেল। অরিন্দম তাকাল। ভস্ম, চারদিকে শুধু ভস্মের মরুভূমি। আর সেই ভস্মস্তূপের ভেতর দিয়ে অর্দ্ধ-দগ্ধ হয়েও আগেকার সেই সব মস্তকহীন নরনারীর দল এগিয়ে চলেছে। তাদের কাঁধে সেই হাড়ের দুর্গের বোঝা।

অরিন্দম আবার প্রশ্ন করল, "কিন্তু চিরকালই কি এমনি ছিল ? চিরকাল ?"

কণ্ঠস্বর জবাব দিল, "ছিল ছিল ছিল—দেখবে ?"

"হ্যা—"

অরিন্দম এগোতে লাগল। সেই মস্তকহীন শৃঙ্খলাবদ্ধ নরনারীদের পাশ দিয়ে দিয়ে। হঠাৎ দমকা হাওয়া বইতে লাগল, হাওয়ায় সেই বিস্তীর্ণ ভস্মরাশি শোঁ শোঁ শব্দে উড়ে যেতে লাগল। পায়ের নীচেকার পাথরের ফাটল দিয়ে এবার অসংখ্য ঘোড়ার কঙ্কাল বেরিয়ে এল বিদ্যুৎগতিতে। তাদের পিঠে মস্তকহীন কঙ্কাল, সেই সব কঙ্কালের

হাতে বর্শা আর তলোয়ার। পাথরের ফাটল দিয়ে আরো মস্তকহীন কঙ্কাল বেরিয়ে এল, তারা শৃঙ্খলাবদ্ধ। কঙ্কাল অশ্বারোহীরা সেই সব শৃঙ্খলাবদ্ধ কঙ্কালদের তাড়না করে নিয়ে চলল। তাদের অশ্বক্ষুরের শব্দ, অট্টহাসি আর গর্জন শোনা গেল। শোনা গেল আর্তনাদ, বিলাপ আর প্রার্থনা—"অন্ন দাও, বস্ত্র দাও, মানুষ হতে দাও"—। শোনা গেল অসংখ্যের ব্যাকুল ডাক—"ভগবান—ভগবান" অতি ক্ষীণ, অতি অস্পষ্ট সেই সব শব্দ। যেন হাজার হাজার মাইল দূরে আছে তারা। যেন মাটির কোন এক গভীর গর্ভে চাপা পড়ে আছে তারা।

আবার দম্‌কা হাওয়া এল। কঙ্কালেরা মিলিয়ে গেল।

কণ্ঠস্বর শোনা গেল, "দেখলে? অতীতকে দেখলে দেখলে দেখলে?"

অরিন্দম দাঁতে দাঁত চেপে বলল, "দেখলাম।"

"তাহলে এগিয়ে চলো—চলো চলো—এগিয়ে চলো—

"চলো—"

আগেকার সেই সব শৃঙ্খলাবদ্ধ মস্তকহীন নরনারীর মিছিল তখনও চলেছে। অদৃশ্য সেই ঢাকের তালে তালে। শৃঙ্খলে শৃঙ্খলে আঘাত লাগে আর শব্দ ওঠে—ঝন্ ঝন্—ঝন্ ঝন্। বাতাসে দুর্গন্ধ। চারদিকে অন্ধকারের চেয়েও মারাত্মক সেই ভৌতিক আলো, উত্তাপ আর উড়ন্ত ভস্ম।

"এগিয়ে এসো এসো এসো—"

"এগিয়ে চলো চলো চলো—"

হঠাৎ পাথরের বুকে অরণ্য গজিয়ে উঠল। লোহার তৈরী বড় বড় গাছের অরণ্য। সেই সব গাছের ডালপালাগুলো এক একটা জীবন্ত অজগর। তাদের বিদ্যুতের মত জিভ লালসায় লকলক্ করছে। টপ টপ করে উগ্র বিষ চুইয়ে পড়ছে তা থেকে। সেই বিষে সিক্ত পাথরের ওপর দিয়ে নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে চলতে লাগল সেই সব মস্তকহীন

নরনারীর দল। তাদের পায়ের শৃঙ্খলে শৃঙ্খলে আঘাত লাগে আর শব্দ ওঠে—ঝন্ ঝন্—ঝন্ ঝন্—ঝন্ ঝন্—ঝন্ ঝন্।

সেই অজগর-অরণ্যের মাঝখানে হঠাৎ একদল মস্তকহীন নগ্ন নর্তকীর আবির্ভাব ঘটল। অশ্লীল তাদের দেহভঙ্গী, কুৎসিৎ তাদের সৌন্দর্য। অমৃতহীন বিশুষ্ক স্তন, মাতৃত্বহীন যোনিদেশ। তারা সেই অদৃশ্য ঢাকের তালে তালে সেই সব মস্তকহীন নরনারীদের আকর্ষণ করতে লাগল। অরণ্যদেশের অন্ধকার পাতালের দিকে। এসো এসো—অনির্বাণ ইন্দ্রিয়ের অন্ধকার জগতে এসো এসো এসো—

কণ্ঠস্বর শোনা গেল, "এই সভ্যতা—স্বার্থপরের সভ্যতা—"

অরিন্দম সভয়ে মাথা নাড়ল, "না না না"—

সেই সব মস্তকহীন নরনারীর দলও যেন তার কথার প্রতিধ্বনি তুলল, "না—না—না—"

তাদের ক্ষীণ প্রতিবাদের ওপর মাথা চাড়া দিয়ে উঠল সেই একটানা অস্বাভাবিক ও ভয়াবহ বাজনা, হাসি, বিলাপ ও শব্দ :

ডুম্-ডুম্—ডুম্-ডুম্-ডুম্-ডুম্—

ঔঁ-অঁা—আঃহাঃ—

টিপ্ টপ্—টপ্ টপ্ টপ্—

হা হা—হাঃ হাঃ হাঃ—

আর সেই নগ্ন নর্তকীদের উদ্দাম অশ্লীল নৃত্য।

আবার প্রতিবাদ করল মস্তকহীনেরা—"না না না—"

অরণ্যের ওপর থেকে গর্জন শোনা গেল, "খবরদার—খবরদার—"

সেই অদৃশ্য ঢাকের ওপর আরো জোরে আঘাত পড়তে লাগল। লোহার গাছের অজগর-শাখারা বিদ্যুতের মত কুটিল জিভ মেলে গর্জাতে লাগল। সেই সব গাছের অন্তরাল থেকে, অরণ্যের জমাট অন্ধকার থেকে এবার হিংস্র শ্বাপদের গর্জন শোনা গেল। হায়েনা, শেয়াল, নেকড়ে, বাঘ, সিংহ আর কুকুরের ক্রুদ্ধ গর্জন!

বিলাপের মত সেই একটানা শোকসঙ্গীত এবার আরো উঁচু পর্দায় চড়ল, "কেন? কেন আমাদের এই দুঃখ? কি পাপ করেছি আমরা—মানুষ হয়েও মানুষের মত কেন আমরা বাঁচতে পারি না? আঁ—আঁ—আহাহা—"

"খবরদার—খবরদার—"

"না—না—না—"

"খবরদার—খবরদার—"

"ফিরে দাও, ফিরে দাও—আমাদের মাথা ফিরে দাও—"

আর সব কিছুকে ছাপিয়ে একদল লোকের তীক্ষ্ণ ও উত্তেজিত শপথ শোনা গেল, "ধ্বংস করব—আমরা এ নরককে ধ্বংস করব—"

অরণ্যের ওপর থেকে সেই লোমশ ও নখযুক্ত হাতগুলো নেমে এল। দৈত্যের হাতের মত বিরাট সেগুলো। সেইসব হাতে ক্ষুরধার বর্শা ও তলোয়ার। রক্তপিপাসু জানোয়ারের মত সেই হাতগুলো হঠাৎ মস্তকহীনদের আঘাত করতে শুরু করল! বুকফাটা আর্তনাদে হৃদয়ের স্পন্দন বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হল।

অরণ্যের ওপর থেকে গর্জন শোনা গেল, "ওদের সব কিছু কেড়ে নাও—অন্ন বস্ত্র—স-ব—"

সেই নির্দয় হাতগুলো তাই করল, যার কাছে যে কদানা চাল ছিল তা কেড়ে নিল। সেই নির্লজ্জ হাতগুলো তাই করল—প্রত্যেকের বস্ত্র কেড়ে নিল।

মস্তকহীন বন্দীরা আর্তনাদ করে উঠল।

"না না, আমাদের অনাহারে মেরো না—"

"না না, আমাদেরর পশুর মত নগ্ন করো না—"

কোন কথাতেই থামল না সেই হাতগুলো। বর্শা আর তলোয়ারের ঘায়ে অনেকেই ধরাশায়ী হল, রক্ত গড়াল কণ্টকাকীর্ণ পাথুরে মাটির ওপর দিয়ে। অজগরের মত লম্বা কয়েকটা জিভ ওপর থেকে নেমে এল,

সেই রক্তের ধারাকে লেহন করতে লাগল। কিন্তু ক-ত রক্ত—লেহন করতেও কমল না তা।

একটা যুবতী কিছুতেই নগ্ন হবে না। সেই লোমশ হাত তার সাড়ীকে টেনে ছিঁড়ে ফেলল।

নগ্ন নারীদেহ। সুন্দর যৌবন-দৃপ্ত। সেই হাত হঠাৎ যুবতীর স্তনের ওপর নখ বসিয়ে দিল, তাকে পেষণ করতে লাগল।

আর্তনাদ। বিলাপের অন্তহীন তরঙ্গ।

দুর্গন্ধ। হঠাৎ অরণ্যের ওপর থেকে কালো পাথরের পাহাড়ের গা বেয়ে গলিত নরমাংসের ঢল নামল। তার মধ্যে সাদা সাদা সর্প-মুখ কীটেরা। সেই সব কীটেরা এসে মস্তকহীন নগ্ন লোকদের গায়ে বসে রক্ত-শোষণ করতে লাগল।

সেই নিকষ-কালো পাহাড়ের গর্ভ থেকে যেন কাদের ডাক উত্থিত হল, "ভগবান—ভগবান"—

"খবরদার—খবরদার"—

মস্তকহীনেরা গর্জাল,"না না—অন্ন দাও"—

"খবরদার—খবরদার"—

"না না, বস্ত্র দাও"—

মস্তকহীনেরা সেই গলিত মাংসের ঢল থেকে অঞ্জলি ভরে মাংস তুলে নিয়ে খেতে শুরু করল। কেউবা নিজের হাত কচ্‌কচ্‌ করে কামড়ে খেতে লাগল। মরিয়া হয়ে উঠেছে তারা।

এক টুকরো রুটি পড়ল ওপর থেকে। সবাই ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর। কে তা পেল তা বোঝা গেল না, শুধু এক মুহূর্তে তারা নিজেদের মধ্যে মারামারি শুরু করে দিল। নির্দয় হয়ে গেল তারা নিজেদের ওপর। উন্মত্ত হিংসায় তারা শিশুদের পাথরের-ওপর আছড়ে মারল, নগ্ন ও অসহায় নারীদের ধরে বলাৎকার করতে লাগল। দুর্গন্ধে ভারী বাতাস তাদের আর্ত কোলাহলে মুখর হয়ে উঠল।

তাদের মধ্য থেকে একদল পালাতে শুরু করল। পালাতে গিয়ে তারা অরিন্দমের উপস্থিতি অনুভব করে তাকে ঘিরে দাঁড়াল।

একজন অরিন্দমকে স্পর্শ করে চীৎকার করে উঠল, "আমি আবিষ্কার করেছি—মস্তক-যুক্ত লোক আছে আমাদের মধ্যে"—

বিস্মিত কোলাহল উঠল।

"আছে? আছে? আছে?"

একজন মস্তকহীন এসে অরিন্দমের কানে কানে বলল, "আমাকে বাঁচাও—তার পরিবর্তে আমি আমার বৌকে ভেট দেব তোমার কাছে"—

আর একজন এসে বলল, "আমার মেয়েকে চাই? সে পরমা সুন্দরী"—

আর একজন এসে বলল, "আমার দুবছরের ফুটফুটে বাচ্চাটাকে বিক্রি করব—তুমি কিনবে?"

অরিন্দম ভয় পেল।

সেই কণ্ঠস্বর শোনা গেল, "ভয় পেয়েছ? তবে পালাও পালাও পালাও"—

অরিন্দম প্রশ্ন করল, "কিন্তু এদের কি হবে?"

"এরা দাসত্বের পাপ করেছে—তার ফলভোগ করবে করবে করবে"—

"না, আমি হাড়ের দুর্গে যাব—ধ্বংস করব ঐ লোমশ হাতের মালিকদের"—

"তাহলে পাহাড় বেয়ে ওপরে যাও যাও যাও"—

অরিন্দম এগোল, পাহাড়ের ওপরে উঠতে গেল। কিন্তু কী খাড়া পাহাড়, কি দুর্গম! একটা শিলাখণ্ডে পা পিছলে সে হঠাৎ নীচে গড়িয়ে পড়ল। প্রচণ্ড আঘাত লাগল তার। প্রায় অজ্ঞান অবস্থায় সে থামল, চোখ মেলেই দেখল যে আধো অন্ধকারের মধ্যে ঠিক এক হাত সামনেই এক বিরাট নদী। জলের দিকে ভালো করে তাকিয়ে সে শিউরে উঠল। এ যে রক্তের নদী! পাহাড়ের গা বেয়ে বেয়ে মস্তকহীনদের রক্ত এসে

এখোনে একটা বিরাট নদীর সৃষ্টি করেছে। তার প্রখর স্রোতে ভেসে যাচ্ছে অসংখ্য মাংসের স্তূপ, মুণ্ডের সারি আর হাড়ের জঞ্জাল। বিড়ালের মত জোঁক, কুকুরের মত ইঁদুর, তালগাছের মত সাপ, কুমীরের মত বৃশ্চিক আর বট গাছের মত কুমীর তার মধ্যে কিলবিল করছে। সেই গাঢ় কাল রংয়ের রক্ত-নদীর কল্লোল ধ্বনিতে শোনা যাচ্ছে প্রেতলোকের আর্ত বিলাপ। আর আকাশের দিক থেকে অসংখ্য অজগরের মত লকলকে জিভ এসে সেই টকটকে রক্তকে চুবচুক্ শব্দ করে পান করছে।

অরিন্দম উঠে দাঁড়াল। কোথায়? এ কোথায় এসেছে সে? নরকের চেয়েও এ কোন ভয়ঙ্কর নরকে?

অরিন্দম এদিক ওদিক তাকিয়ে অন্ধকারে দিক নির্ণয় করতে পারল না। তবু পা বাড়াল সে। তাকে পালাতেই হবে।

দূর থেকে ভেসে আসছে সেই আর্তনাদ, হুঙ্কার, ঢাকের আওয়াজ, অট্টহাসি, চাবুক আর রক্তবৃষ্টির শব্দ। রক্তনদী থেকে ভেসে আসছে একটা শ্বাসরোধী ও চেতনা-লোপকারী দুর্গন্ধের মৃত্যু-শীতল তরঙ্গ।

অরিন্দম এগিয়ে চলতে চলতে ডাক দিল, "কোথায়? কোন দিকে যাব কণ্ঠস্বর?"

কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

"কোথায়? তুমি কোথায়?"

এবারও কেন সাড়া পাওয়া গেল না। অরিন্দম ঘেমে উঠল। এবার? কি করবে সে? সেই হাড়ের দুর্গাবিকারী শত্রুদের ধ্বংস করে এই নরককে সে কি লোপ করবে না?

হ্যাঁ। তাই। সে ভয় পাবেনা।

অরিন্দম দৃঢ়পদক্ষেপে সামনের দিকে এগিয়ে চলল।

দুনিরীক্ষ্য অন্ধকার। সন্তর্পণে চলতে লাগল সে। কিন্তু হঠাৎ সে থমকে দাঁড়াল। পায়ের নীচে যেন কার দেহ! অন্ধকারেও দু'চোখ

বিস্ফারিত করে সে তাকাল। একি! তার সামনে, চারদিকে, অসংখ্য মৃতদেহ। কি করে এগোবে সে? এগোতে গেলে যে তাকে এই সব শবদেহ পদদলিত করতে হবে।

কিন্তু না, মৃতের জন্য মমতা মিথ্যে, অর্থহীন। অরিন্দম পা বাড়াল, শবদেহের ওপর দিয়েই সন্তর্পণে সে চলতে লাগল।

হঠাৎ মড়-মড-মড়াৎ—একটা শব্দ। পায়ের চাপে একটা শবদেহের পঞ্জর ভেঙ্গে গেল আর তার ভেতর অরিন্দমের ডান পাটা আটকে গেল। একি বিভ্রাট! অরিন্দম পা টেনে বের করতে গেল, পারল না। জোরে টান দিল সে তবু হলন।

"হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ"—

অরিন্দম চমকে তাকাল। ভগ্ন-পঞ্জর শবটা হাসছে! অরিন্দমের শরীর কেঁপে উঠল, মরিয়ার মত সে আরো জোরে টান দিল পা। কিন্তু কোন ফল হল না। সঙ্গে সঙ্গে আশেপাশের সমস্ত শবগুলোই হাসতে শুরু করল। অদ্ভুত, ভয়াবহ সে হাসি। সে হাসির ঢেউ মেরু প্রদেশের ঝড়ের মত। সে হাসি মৃত্যুর হাসি।

"হাঃ হাঃ হাঃ"—

"হিহি-হিহি"—

"হোহো হিহি হাহা"—

সেই ভগ্ন-পঞ্জর শব এবার কথা বলল; "মস্তকহীনের রাজত্বে তুমি মাথা নিয়ে বেড়াতে চাও! বটে! এতদূর আস্পর্দ্ধা তোমার।"

চারদিকের শবেরা উত্তেজিত কণ্ঠে সায় দিয়ে উঠল।

"বটে! বটে!"

"এতদূর আস্পর্দ্ধা!"

"মাথা নিয়ে বেঁচে থাকবে!"

"না না, কখনো না"—

"কাটো—শত্রুর মাথা কাটো"—

সঙ্গে সঙ্গে দু'জোড়া লোমশ হাত এগিয়ে এল অরিন্দমের কণ্ঠের কাছে—সেই হাতে একটা করাত।

অরিন্দম গর্জে উঠল, "না না, আমি মরব না"—

তার উত্তরে অট্টহাসিতে অন্ধকার আবর্তিত হল।

দুটো লোহার মত শক্ত হাত দুদিক থেকে অরিন্দমকে কঠিনভাবে আঁকড়ে ধরল, অপর দুটে হাত করাতটাকে বসাল তার গলার ওপর। তারপর এদিক আর ওদিক, ওদিক আর এদিক—। মাংস কাটল, শিরা কাটল, কুড়কুড় শব্দে হাড় কাটল, গলগল ধারায় রক্ত বেরোল, যন্ত্রণায় চেতনা লুপ্ত হল—

গুম্-গুম্-গুম্-গুম্—

অরিন্দম ধড়মড় করে উঠে বসল। না, সে মরেনি, তার গলাও কাটা হয়নি। সে স্বপ্ন দেখছিল। দুঃস্বপ্ন। কী সাংঘাতিক দুঃস্বপ্ন!

মেঘের ডাক ভেসে আসছে—গুম্-গুম্-গুম্-গুম্। বহুদূর থেকে। বৃষ্টি হবে কি? হোক। পৃথিবী ঠাণ্ডা হোক। কিন্তু তার মরুভূমির মত হৃদয় কবে শীতল হবে?

ভোর হয়ে আসছে। নগর-প্রান্তবর্তী পাহাড়ের আড়ালে রক্তবর্ণ সূর্যদেব তার সপ্তাশ্ব-বাহিত রথে আরোহণ করেছেন। ভোর হয়েছে। জৈবিক জীবনের তাগিদ সুরু হয়েছে। আবার সারাদিন জুড়ে নিরানন্দ কর্মের চাকা ঘুরবে, মানুষ মানুষের ক্রীতদাসত্ব করে প্রাণকে অর্জন করবে। এক ইতিহাস। বদলাতে হবে, বদলাতেই হবে।

কি স্বপ্ন দেখল সে? কি তার অর্থ? কেন সে এমন স্বপ্ন দেখল? সর্বাঙ্গ তার ঘামে ভিজে গেছে। আঃ, কী আশ্চর্য প্রশান্তি চারদিকে! আকাশে, বাতাসে, সূর্যালোকে এবং পাখীদের কাকলিতে যেন ভৈরবরাগের মুগ্ধতা। সেখানেও কি ভোর হয়েছে এখন?

রূপোর পাতের মত সেই রূপসী নদীর তীরে কি এখন কুহকিনী রাতের ইন্দ্রজাল ছিন্নভিন্ন হয়নি? এখনো কি সেই সুদর্শন গায়ক তানপূরোর তারে ঝঙ্কার তোলেনি? কে? অরিন্দম কান পাতল। কে যেন তার অন্তর থেকে ঘোষণা করছে—"ভাই সব—জাগো-ও-ও—কুহকিনী রাত চলে গেছে, ভোর হয়েছে—এ-এ"—। অরিন্দম হাসল। প্রহরী, তার অন্তরের সেই সদা-জাগ্রত অসিধারী প্রহরী তার কর্তব্য-পালন করছে, তাকে ডাকছে।

ভোরের শান্ত, নিঃশব্দ পৃথিবীর চেহারা বদলাতে লাগল। অরিন্দম যতই এগোতে লাগল ততই আজবনগরের কোলাহল আর শব্দ বাড়তে লাগল। খাদ্যের জন্য মানুষের ছুটোছুটি, চীৎকার আর কলহ। ভিক্ষুকদের প্রার্থনা। ক্ষুধার্তের আর্তনাদ। শান্ত, স্থির, জীবন-নদীর বুকে যেন চাঞ্চল্য বাড়তে লাগল, ক্রমেই যেন তার জল উত্তাপের আধিক্যে টগবগ করে ফুটতে লাগল।

কতদূরে এসেছে সে! কালরাতে সে কি উন্মাদ হয়ে গিয়েছিল? এত দূরে কেন এসেছিল সে? জীবন? মানুষের জীবন কেমন তা দেখার জন্য? কিন্তু জীবন তো সর্বত্র একই রকম। ছিল এবং থাকবে। হাসি, কান্না, ঘৃণা আর ভালবাসা। একই থাকবে সব—শুধু রূপ বদলাবে। সমাজও থাকবে কিন্তু তার ব্যবস্থাকে বদলাতে হবে। ব্যবস্থা মানে এক শ্রেণীর মুষ্টিমেয় লোক। সমসূত্রে-গ্রথিত মানুষের ভাগ্য নিয়ে তারা নিয়ন্ত্রণ করছে, ছিনিমিনি খেলছে। মানুষ প্রকৃতির উর্ধ্বে না বলেই তাকে প্রাকৃতিক নিয়মকে মানতে হয় এবং তা মানতে হয় বলেই সে বুঝেও নিঃশব্দ থাকে, অসহ্য হলেও সহ্য করে। ভাঙ্গো—ভেঙ্গে চুরমার করো। আর কতদূরে? কি ভাবছে তার ললিতা? তার নবমল্লিকা ফুল?

অরিন্দম এগিয়ে চলল।

নীচুপাড়ার ঘন বসতির ভেতরে সে তখন পৌছেচে। গলি আর

রাস্তা ক্রমেই মানুষে ভরে উঠছে। ফ্যাক্টরীতে যাবার সময় হল কি? না, আজ ছুটি।

অরিন্দম থমকে দাঁড়াল। রাস্তার একপাশে ভীড় জমেছে। সেই ভীড় দু'জন লোককে কেন্দ্র করে। তারা মারামারি করছে।

"শালা"—

"তোকে মেরেই ফেলব"—

"আমাকে মারবি! বটে! মার দেখি"—

"শালা শুয়ারের বাচ্চা"—

"শালা গুখেগো"—

কিল, চড়, ঘুষি, কেশাকর্ষণ।

"আমার টাকা নিয়ে ফেরৎ দিবি না?"

"আমি তোর টাকা নিইনি"—

"ফের মিছে কথা—শালা"—

"চোপ্"—

প্রচণ্ড মারামারি। চারপাশে কৌতূহলী জনতার উৎসাহ, বিদ্রূপ আর টিটকারী। দু'একজন তাদের প্রতিনিবৃত্ত হতেও বলে কিন্তু ফল হয় না। হিংসা। যুধ্যমান দু'জনের মুখে হিংসার পাশব ছায়া। জলন্ত চোখ, উত্তেজিত দন্ত-ঘর্ষণ, স্ফীত নাক অরিন্দমের শরীর যেন অবশ হয়ে আসতে থাকে। অভাব। অভাব থেকে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ভয়। ভয় থেকে নীচতা, লোভ। তা থেকে হিংসা।

একজন লোক গিয়ে দু'জনকে বাধা দিল। তাদের মধ্যে একজন সেই লোকটিকে ধাক্কা মারল। সেই লোকটি আবার পালটা এক ঘুষি মারল তাকে।

সঙ্গে সঙ্গে ভীড় থেকে একজন এসে সেই লোকটিকে ধাক্কা মেরে বলল, "ওকে মারলে যে? তুমি কি নবাব সায়েব নাকি?"

"আরে যাও যাও"—

আর একটা মারামারি বেঁধে গেল। মুহূর্তে সেখানকার সবাই সেই মারামারিতে জড়িত হয়ে গেল। কেউ কোন পক্ষে না, অথচ প্রত্যেকেই প্রত্যেককে মারছে।

অরিন্দম সরে পড়ল সেখান থেকে। না, আর থাকা উচিত নয়। ওখানে আগুন জলছে। হিংসার আগুন। হিংসায় হিংসা বাড়ে, আগুনের মত তা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। কি করবে অরিন্দম? একা কেউ কিছু করতে পারে না। ব্যক্তিত্ব দিয়ে হিংসার গতিকে চিরকাল রোধ করা যায় না।

আরো অনেকখানি পথ। কখন সে ললিতাকে দেখবে? তাড়াতাড়ি পা চালাও।

জোরে জোরে পা ফেলে চলতে লাগল অরিন্দম। হিংসার চেহারা এক। ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র ও পৃথিবী—সর্বক্ষেত্রেই এক তার অবয়ব। একই প্রতিকৃতির ছোট, একটু বড়, বড়, আরো বড়—নানারকমের আকার। সর্বত্র তা আত্মধ্বংসী।

"বাবু—বাবুগো—একটা পয়সা ছ্যান—"

ভিখিরী। ছিন্নবসন, রুগ্ন, শীর্ণ, প্রেতাকৃতি।

"একটা পয়সা ছ্যান গো বাবু—ও বাবু—"

আরো ভিখিরী ছুটে এল। আরো।

"রাজরাজেশ্বর হও বাবু—একটা পয়সা—"

"দু'দিন খাইনি বাবু—দু'দিন—"

"ভগবান তোমাকে রাজা করবেন বাবু—"

"ভগবান দয়া কর—ভগবান দয়া কর—"

ভগবান! অরিন্দমের শরীর শক্ত হয়ে উঠল। সর্বত্র সেই এক ডাক—'ভগবান!' কে ভগবান? কোথায় থাকে সে? ঈশ্বর সর্বশক্তিমান? তাহলে মানুষের দুঃখ কেন?

অরিন্দম অগ্রসর হল। আরো অনেক দূর। কখন সে ললিতাকে দেখতে পাবে?

নোংরা গলি। আর একটা গলি। আবর্জনা, ভাঙা বাড়ী, উলঙ্গ শিশু, অর্ধ-উলঙ্গ নরনারী আর রোঁয়া-ওঠা কুকুর। ওপরে মহাসমুদ্রের মত নীলবর্ণ মহাকাশ আর তিমিরান্তক সূর্যদেব।

অরিন্দমের পাশ দিয়ে একটি দশ এগারো বছরের ছেলে দৌড়ে গেল, তার পেছন পেছন সমবয়সী আর একটি ছেলে। একজন ফর্সা, একজন কালো।

পশ্চাদ্ধাবনকারী কালো ছেলেটি হঠাৎ ফর্সা ছেলেটিকে ধরে ফেলল, ধরেই কিল মারতে আরম্ভ করল। ফর্সা ছেলেটিও আত্মরক্ষার জন্য মরিয়া হয়ে পালটা আক্রমণ সুরু করল। অরিন্দম আবার থমকে দাঁড়াল।

দুজনের পরণে ছেঁড়া কাপড়, ছেঁড়া জামা। মারামারি করতে করতে তারা কুৎসিৎভাবে পরস্পরকে গালিগালাজ করতে লাগল।

"শালা কালা ভূত —"

"শালা কুষ্ঠরোগী—"

"আমার মার্বেল ফিরিয়ে দে—দে বলছি—"

"দেবনা—দেবনা—"

"শালা—আমি তোর বোনকে—"

"আমি তোর মাকে—"

"তবেরে—"

"খবরদার—"

দু'জনের চোখে মুখে হিংসার কুটিল ও কুৎসিৎ ছাপ। অসহ্য। অরিন্দম এগিয়ে গেল, দুজনকে ছাড়িয়ে দিল।

কঠিনভাবে বলল সে, "খবরদার—আর ঝগড়া করো না—"

"বাঃ—আমার মার্বেল নিয়েছে যে—"

"নিয়েছি মানে, তুই তো হেরিছিস্ আমার কাছে—"

অরিন্দম ধমক দিল, "থাক্, আমি শুনতে চাইনা—যাও, তোমরা দু'জনে যে যার বাড়ী যাও—"

পেছন থেকে গলা শোনা গেল, "কি করছ অরিন্দম ?"

ছেলে দু'টি চলে গেল। অরিন্দম ঘুরে দেখল যে মুকুন্দ তার পেছনে দাঁড়িয়ে। তার চুল উস্কোখুস্কো, রুক্ষ, ললাট চিন্তাকুল। কি ভাবছে সে ? কিসের জ্বালায় জ্বলছে ?

মুকুন্দ হাসল, "ঝগড়া থামাচ্ছিলে ?"

"হ্যাঁ। আচ্ছা মুকুন্দ—"

"বল।"

"এতটুকু ছেলেরা এমন হিংসুক আর কুভাষী হল কি করে ?"

মুকুন্দ বিষণ্ণভাবে হাসল, বলল, "শিক্ষার দোষে। মানুষ যেমন পারিপার্শ্বিকে বাস করে ঠিক তেমনি সে হয়। ওদের বাপ মা দাদা কাকারা যা করে ওরাও তাই অনুকরণ ও অনুসরণ করে।"

"তাহলে ওদের অভিভাবকেরা ওদের শিক্ষা দেয় না কেন ? এতটুকু ছেলে—তাদের মুখে চোখে এ কী নীচতা, এ কী হিংসা !"

"তুমি উত্তেজিত হয়েছ অরিন্দম—তা হয় না। কি শিক্ষা দেবে ওদের অভিভাবকেরা ? তারা নিজেরা যে শিক্ষা পেয়েছে সেই অনুযায়ীই তো আচরণ করবে ?"

"তাহলে কী শিক্ষা পাওয়া উচিত ?"

"এমন শিক্ষা যাতে আত্মা জাগ্রত হয়, যাতে এই জ্ঞান লাভ হয় যে হিংসা পশুত্ব, তা মনুষ্যত্বের বিরোধী, হিংসা থেকে দূরে থাকতে হলে মানুষকে তার জৈবিক বৃত্তিগুলোকে সংযত করতে হবে।"

অরিন্দম মাথা নাড়ল। কথাগুলো তার মনে ধরল, কিন্তু তবু খট্‌কা লাগল।

"তাহলে শিক্ষকেরা এই শিক্ষা দেয় না কেন ?"

মুকুন্দ কাপড়ের খুঁটে মুখ মুছে গম্ভীরভাবে বলল, "অর্থদেবতার রাজত্ব চলছে। এ রাজত্বে অর্থ ই জীবন। তাই শিক্ষক যেমন অর্থের জন্যই শিক্ষা দেয়, ছাত্রছাত্রীরাও তেমনি অর্থের জন্য শিক্ষা নেয়। তারা

শিক্ষা পেয়ে কারিগর হয়, মিস্ত্রী হয়, আইনবিৎ হয়, চিকিৎসক হয়, সব হয় কিন্তু মানুষ হয় না।"

মুকুন্দ আবার আগের মত বিষণ্ণভাবে হাসল, বলল, "তোমার সমস্ত প্রশ্নের একই উত্তর—বিষাক্ত সমাজ-ব্যবস্থা। এই সমাজকে উৎপাটিত না করলে মানুষ মানুষ হবে না। স্বার্থপরতা বিসর্জন না দিলে মানুষ তার জান্তবতার উর্ধ্বে উঠে মানুষ হতে পারে না। এই সমাজে তা সম্ভব নয়, অসাম্য এবং অনিশ্চিত জীবন-সংগ্রাম মানুষকে শুধু স্থূল ও স্বার্থপরই করবে, তাকে উন্নত করবে না। কিন্তু আর না, আমি একটা জরুরী কাজে চল্লাম। সঙ্ঘের ব্যাপারে। ভালো কথা, তুমি কাল রাতে কোথায় ছিলে?"

"ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম—"

"বাড়ী যাও তাহলে—ললিতা আর মা ভেবে মরছে—"

"যাচ্ছি—"

মুকুন্দ চলে গেল। অরিন্দম এগোল। মুকুন্দের কথাগুলো তার মাথায় ঘুরতে লাগল, তার কানে অনুরণিত হতে লাগল। হ্যাঁ, মুকুন্দ ঠিকই বলেছে। মুকুন্দ জ্ঞানী, জীবনকে সে শুধু দেখেই নি, ভেবেছেও। ললিতা ভেবে মরছে। ললিতার দুটো চোখে কোন সুদূর রহস্যলোকের ছায়া?

গলি। রাস্তা। রাস্তা, গলি গলি গলি। ডাইনে, বাঁয়ে, ডাইনে। আঁকাবাঁকা আঁকাবাঁকা। আর কতদূর?

অরিন্দম দাঁড়াল। সামনে একটা চালের দোকান। তার সামনে একশ লোকের একটা সারি। প্রত্যেকের হাতে তাদের পরিচয়-পত্র।

কোলাহল। ঠেলাঠেলি। অন্নগত-প্রাণ মানুষের ছটফটানি।

"আমি আগে—"

"ঠেলো না—"

"খবরদার—"

"সেই শেষ রাত থেকে দাঁড়িয়ে আছি গো—"

"ভগবান, আর কতক্ষণ ?"

অরিন্দমের অন্তর মোচড় দিয়ে উঠল। ভগবান!

সে এগোল।

বাতাসে দুর্গন্ধ। রাতের দুঃস্বপ্নটা কি এখনো তার পশ্চাদ্ধাবন করছে ?

ফুটপাথের ওপর শুয়ে আছে চারপাঁচজন লোক। অনাহারে ওদের বসে থাকার শক্তিও লোপ পেয়েছে। জীবনের লক্ষণ নেই ওদের ভাসা ভাসা চাউনিতে।

তাদের মধ্যে একজন বলল, "একমুঠো খেতে ছ্যান গো—একমুঠো খেতে ছ্যান—"

আর একজন শুধু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল, "ভগবান—"

ভগবান! আবার উদ্ধত প্রেতের মত শব্দটা ঘুরেফিরে অরিন্দমের কানে আসছে। একদিন সেও তো নিজের অজ্ঞাতসারে ডেকেছিল!

এগোল অরিন্দম।

আবার থামল সে। দুচোখ রগড়ে তাকাল সামনে। না, মিথ্যে না। দামোদর শুয়ে আছে পদপথে।

তার কাছে গেল সে।

শুকিয়ে গেছে দামোদর, তার শুকনো মাংসে কুঞ্চিত রেখা দেখা যাচ্ছে, গাল বসে গেছে। এক অমানবিক উজ্জ্বলতা নিয়ে দুটো চোখ কোটর থেকে যেন ঠেলে বেরিয়ে আসছে, বুকের পঞ্জরকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। পেটের চামড়া যেন পিঠে গিয়ে ঠেকেছে। কি হল তার ?

"দামোদর—দামোদর—"

দামোদর মাথাটা হেলাল একপাশে, অরিন্দমকে দেখতে পেয়ে হাসবার চেষ্টা করল।

"কি হয়েছে দামোদর—তোমার কী হয়েছে ?"

দামোদর টেনে টেনে বলল, "আমার দিন ফুরিয়েছে—"

"কি বলছ তুমি!

"ঠিকই বলছি ভাই। কুলিগিরিও আর করতে পারলাম না—দেহ রাজী হল না। ভিক্ষে চেয়েও সুবিধে হয় নি। যখন সবাই মুখ ফেরায় তখন মৃত্যুই শুধু দয়া করে। আমি সেই মহৎ দয়াকে লাভ করেছি।"

"না—তা হতে পারে না দামোদর—"

"বৃথা চেষ্টা ভাই—"

"না—না—" চারদিকে তাকাল অরিন্দম। রাস্তা দিয়ে লোকের যাচ্ছে। ম্লানমুখ, মৌন, প্রস্তরবৎ নির্বিকার।

"শুনছেন—এই লোকটি মারা যাচ্ছে—এঁকে আপনারা সাহায্য করুন—"

কেউ শুনল না, কেউ তাকাল না।

"দামোদর—"

"কি?"

"তোমার এই অবস্থা কি কর্মফল?"

"হ্যাঁ—"

"এজন্মে তো ভাল কর্মই করলে—তবে?"

"পূর্বজন্ম—"

"পূর্বজন্মের ফল হলে তোমার স্মৃতি থাকত।"

"সবই মায়ায় আচ্ছন্ন—তাই মনে থাকে না—"

"মিথ্যে কথা।"

"হয়ত—হয়ত তাই—আমি বুঝতে পারছি না—"

"আর ভগবান?"

"আর সব মিথ্যে হলেও ভগবান সত্যি আছেন—"

"দামোদর—"

„কি ?”

“ভগবান তোমার দুঃখ দূর করছেন না কেন ?”

“নিয়মে বাঁধা আছে বলেই তো এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড টিঁকে আছে—নিয়ম ভাঙ্গলে যে সব ভেঙ্গে পড়বে—তাই ভগবান কিছু করতে পারেন না—”

“মানুষ পারে ?”

“পারে।”

“তাহলে মানুষই ভগবান ?”

“না। মানুষের মধ্যে ভগবান আছেন।”

“তোমার প্রলাপ থামাও দামোদর—ওঠ, আমার কাঁধে ভর দাও—”

দামোদর হাসল। কথা বলতে পারল না।

“ওঠ—কথা বলচ না কেন ? আমার ওখানে চল—”

দামোদর জবাব দিল না, শুধু বিড়বিড় করে সে বলল, “আর না আর না—আঃ, এসেছ ? এসেছ ? হে ছলনাময়ী, হে মায়াময়ী, হে সুদুর্লভে বহুবল্লভা—এতদিনে তুমি এসেছ ? কিন্তু অবগুণ্ঠন কেন ? মুখ খোল—তোমাকে দেখতে দাও—”

“দামোদর—”

গুন্‌গুন্ করে গান গাইছে দামোদর।

“দামোদর—”

দামোদর শুনতে পাচ্ছে না। তার দু'চোখে স্তিমিত ছায়া, তার ঠোঁটের কোণে বিচিত্র, বিশীর্ণ হাসি। এই কি মৃত্যু ! হঠাৎ অরিন্দম দুর্বল বোধ করে। তার দম যেন আটকে আসে, শরীর যেন হালকা হয়ে আসে।

একটা বিরাট-পক্ষ শকুন এসে সামনের বাড়ীর ছাদে বসল, তীক্ষ্ণকণ্ঠে ডাকল।

একটা কুকুর এসে চার হাত দূরে বসে জিভ্ বের করে হাঁপাতে লাগল।

"দামোদর—"

দামোদর স্থির হয়ে গেছে।

"দামোদর—"

দামোদর মরেছে।

"শুনছেন, আপনারা শুনছেন? একজন লোক মারা গেল—"

কেউ কথা বলল না, কেউ তাকাল না। মৃতের পৃথিবী। শরীরটা হালকা মনে হয়। যেন অর্ধেকটা ক্ষয়ে গেছে অরিন্দমের, যেন তারও অর্ধেকটা মরে গেছে।

"শুনছেন—শুনছেন, একজন লোক অনাহারে, অকালে মারা গেল। তার মৃত্যু যে আমার মৃত্যু, আপনার মৃত্যু—"

কোন সাড়া দিল না কেউ।

রাতের দুঃস্বপ্ন কি তাহলে সত্যি। কারা হাঁটছে রাস্তা দিয়ে? ওদের মাথা কোথায়?

অরিন্দম তাকাল। দামোদরের মুখে মৌন প্রশান্তি। মৃত্যু কি নিঃশব্দতা? মৃত্যু কি অগাধ, অতলস্পর্শী আলোড়নহীন সুষুপ্তি?

দাহ করতে হবে। শশ্মানে যেতে হবে। দামোদরকে পিঠে নিয়ে উঠে দাঁড়াল অরিন্দম।

কোনদিকে? কোনপথে? কোথায়-শ্মশান?

মস্তকহীন প্রেতেরা তর্জনী-সংকেতে শহরপ্রান্তের দিকে যেতে বলল।

অরিন্দম এগোল।

দামোদরের শবদেহটা যেন একটা প্রস্তরখণ্ড। ভারী। ভয়ংকর ভারী। ঘামে ভিজে যায় অরিন্দম।

মহাশ্মশানে গিয়ে পৌঁছোল অরিন্দম। গৌরী নদীর ধারে। চারদিকে মৃতদেহ। গলিত দুর্গন্ধ বাতাসে। কয়েকটা শব পুড়ছে।

দগ্ধমাংসের শ্বাসরোধকারী দুর্গন্ধ। গৌরী নদীর টলমল জলে কি সেই স্বপ্নে-দেখা রক্তনদীর ছায়া?

অর্থ-দেবতার রাজত্বে সব কিছুর জন্য দাম দিতে হয়। টাকা না হলে শবদাহ হয় না।

টাকা ছিল। এই সেদিন মাইনে পেয়েছে অরিন্দম—এখনো দশটা টাকা পকেটে আছে।

কাঠের শয্যায় দামোদরকে শোয়ানো হল। তারপর একটা অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ।

ইতঃস্তত: ছড়ানো শবদেহ ঘিরে শকুনের মেলা, কুকুরের ভীড়। তাদের তীক্ষ্ণ, হিংস্র চীৎকার।

দামোদরের দেহ পুড়তে থাকে। চড়-চড়-ফটাস্ শব্দ শোনা যায়, মাংস পুড়ে গলে যায়। বেলা বাড়ে, বেলা বাড়ে, সূর্যদেব মধ্যাহ্নগগণে উঠে অপরাহ্নের আকাশে নেমে যান, বাতাসে মূলতানের বিলম্বিত তান ভাসে। দামোদরের দেহ পুড়ে শেষ হয়ে যায়, অবশিষ্ট থাকে শুধু একরাশি উত্তপ্ত ভস্ম। গৌরী নদীর ঢেউ এসে সেই ভস্মের গায়ে আছড়ে পড়ে। চিতার ধোঁয়া বাতাসে ভেসে যায়। বাতাসের আশ্রয় আকাশ। অঙ্গার মিশায় মাটিতে। দামোদরের মৃত্যু হয়েছে। তার দেহ আকাশে, বাতাসে, জলে, রৌদ্রে ও মাটিতে মিশিয়ে মিলিয়ে গেল। আর তার প্রাণ, তার চৈতন্য? মৃত্যু কি? কেন মরে মানুষ? কেন সে অমর হয় না? মৃত্যুহীন জীবন আর যৌবন সে কেন পায় না? অমৃত কিসে পাওয়া যায়?

"দামোদর"—অরিন্দম ডাকল।

কোন সাড়া পাওয়া গেল না। তার সেই ডাক চারদিকের শূন্যতায় মিশে গেল। কোথায় গেল অরিন্দমের কণ্ঠস্বর? চারদিকের এই পরিব্যাপ্ত মহাশূন্যতা কি সব কিছুকেই শূন্য করে দেয়?

দামোদর মারা গেছে। একজন মানুষ মারা গেছে। তার সঙ্গে অরিন্দমেরও খানিকটা যেন মরে গেল।

অরিন্দমের চেতনা ফিরে এল। ক্ষুধা-রাক্ষসের নখরাঘাত তার জঠরদেশকে চিরে চিরে ফেলছে। আর ললিতা ভেবে মরছে। তার নারী ললিতা। সুন্দরী, তন্বী, পীবরস্তনা। কিন্তু সে-ও কি একদিন এই মহা শূন্যতায় হারিয়ে যাবে? না-না, অরিন্দম অমৃত আহরণ করে আনবে, সমুদ্র মন্থন করে অমৃত তুলবে, পৃথিবীকে অমৃতময় ও জরাহীন করবে।

অরিন্দম এগোল। আর পাচ্ছেনা সে। ক্লান্তি, সুগভীর ক্লান্তি আর ক্ষুধারাক্ষসের নখরাঘাত। আর কতদূর?

আবার রাস্তা। গলি। গলির পর রাস্তা। আবার গলি। আঁকাবাঁকা—আঁকাবাঁকা—আঁকাবাঁকা—

আর মানুষ। নতমস্তক, চিন্তাজর্জর, ক্লান্ত, জ্যোতিহীন, নিঃশব্দ।

আর এখানে ওখানে ফুটপাথের ওপর শায়িত নরনারী। আজ, কিংবা কাল, কিংবা পরশু, শিগগীরই কোন একদিন শূন্যতায় হারিয়ে যাবে তারা? তাদের আশা আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন, ভাবনা, ভালবাসা আর স্নেহ মমতা, তাদের নস্যির ডিবের মায়া আর তামাক বিড়ির নেশা—সব ছেড়ে চলে যাবে, মিলিয়ে যাবে? মৃত্যু কি?

"বাবু—বাবুগো"—

একটি স্ত্রীলোক শুয়ে আছে পদপথে, কাঁদছে। তার পরণে এক ফালি ন্যাকড়া, কোমর থেকে উরুদেশ পর্যন্ত কোনমতে ঢাকা। তার শরীরের বাকী অংশ অনাবৃত। শীর্ণা কিন্তু গৌরাঙ্গী সে। রাজপ্রাসাদের ভগ্নাবশেষের মত তার যৌবন। চোখে তার মৃত্যুর তমসা; কণ্ঠে তার আসন্ন বিস্মৃতির ঢেউ আর তার বুকে একটি দেড় বছরের নগ্ন শিশু। মা। সৃষ্টিমন্ত্রের উদগাতা। এক জীবনের সঙ্গে আরেক জীবনের মালা গাঁথবার মালিনী।

"বাবু—বাবুগো।"—

লোকেরা চলতে চলতে তাকায় তার দিকে। চোখে কৌতূহল। বেচারী মারা যাচ্ছে—তা নইলে ওকে নিয়ে এক রাত কাটানো যেত। হ্যাঁ, মেয়েটার স্তনগুলোর আকার ভালো, উরুদেশের গঠন ভালো—আরো কিছু দেখা যায় কি?

"বাবুগো—আমি মলাম—আমার পোলাডারে বাঁচান"—নিশ্চিন্ত, নির্বিকার শিশুটি। চুক্ চুক্ করে মায়ের দুগ্ধহীন স্তন শোষণ করছে।

"বাবুগো—বাবু"—স্ত্রীলোকটি আর কথা বলতে পারে না। আকাশে শকুনের ছায়া। একটা জিভ-বের করা কুকুর এসে জোরে জোরে বাতাস টানে, মৃত্যুর আঘ্রান খোজে। আর কত দেরী? আর কত—

অরিন্দমের দুর্বল বোধ হয়, দম আটকে আসে। আরো খানিকটা মাংস গেল তার, আরো খানিকটা রক্ত। শোন, মস্তকহীনেরা শোন—তোমাদেরও যে একটু একটু করে মৃত্যু হচ্ছে—সবাইকে বাঁচাও—

অরিন্দম এগোল। বৃথা, সবই বৃথা। হে বীর, তোমার চোখের জল মুছে ফেলো, তুমি নির্মম হও, অনাসক্ত হও, তা নইলে তোমার সিদ্ধি নেই।

পথ জুড়ে দাঁড়ায় এক উন্মাদিনী নারী, তার কোলে একটি তিন বছরের ছেলে। ছেলেটা ধুঁকছে, কাঁদছে। ক্ষুধা-রাক্ষসের ছায়া।

"ও বাবু শোনেন"—

অরিন্দম তাকাল।

"এই ছেলেটারে মুই বিক্রি করমু—দশডা ট্যাহা দ্যান—বাঁচান বাবুগো"—

জবাব নেই।

"পাঁচটা ট্যাহা দ্যান—দ্যাখেন—কী সুন্দর চোখ দুখান বাছার—ও রাজাবাবু"—

জবাব নেই। মহাশূন্যতায় সব কিছুই মিলিয়ে যায়।

"তুইভা ট্যাহা স্থান তবে—বাছার মুখখানা ছাখেন—"

কোথায় যাচ্ছ মেঘের মিছিল? কোথায়?

"একডা ট্যাহা? তাও না? তবে কি বাছা মইরবে!"

এগিয়ে চল। এ মৃতের পৃথিবী। হাড়ের দুর্গে কারা থাকে? কোথায় তারা?

এক ঝাঁক পায়রা উড়ছে আকাশে। উড়ছে তীক্ষ্নদৃষ্টি বাজের দল। উড়ছে শকুনেরা। এগিয়ে চল—

বাতাসে যেন সেই ডুম্ ডুম্ ঢাকের শব্দ। স্বপ্ন সত্যি হল।

নির্জন পথপ্রান্ত। ভাঙ্গা অট্টালিকার সারি।

সাবধানে চলো। অরিন্দম দাঁড়াল। তিনটি শবদেহ পথ জুড়ে। ছুটো কুকুর এসে একটি শবের পেট চিরে অন্ত্রগুলোকে টেনে বের করেছে। পাশ কাটিয়ে চলল সে।

বাতাসে দুর্গন্ধ। তবু সূর্যদেবের আলোতে আছে মালবী রাগিনীর ঝঙ্কার।

ভাঙ্গা অট্টালিকার আড়ালে একটি যুবতী আর একটি কুদর্শন লোককে দেখা গেল। অরিন্দম অন্তরালে দাঁড়াল।

লোকটা বলল, "একসের চাল দেব? বটে! কিন্তু আমার কি দিবি!"

"যা বলবে"—

"তবে আয়"—

সেই ইট আর পাথরের ওপর লোকটা যুবতীটিকে শুইয়ে দিল, তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল যুবতীটি, কান্নায় বুজে আসা গলা থেকে তার একটি মাত্র শব্দ, একটি মাত্র ডাক বেরোল, "ভগবান"—

অরিন্দম শিউরে উঠল, দৌড়ে পালাল, চীৎকার করে বলে উঠল, "ভগবান"—

অনেকদূর দৌড়ে গেল সে। অনেকদূর। তারপর সে থামল। ক্লান্তি। ক্ষুধা। সূর্যদেবের ম্লান আলো। গলি গলি গলি। আঁকাবাঁকা বাঁকাআঁকা আঁকাবাঁকা—ললিত। ললিতা—। কি দেখল সে? কাল রাতের স্বপ্ন। নরক। পৃথিবীতেই আছে। তার চারদিকে মহাশূন্যতা। মায়া। দামোদরের ছলনাময়ী। মানুষই মানুষের দুর্দশার জন্য দায়ী। হাড়ের দুর্গে কে থাকে? কোথায় তারা? বাতাসে কার দীর্ঘশ্বাস? কার কান্না? কাদের পায়ের শব্দ তার পেছনে, তার আগে, তার চারদিকে? মাটি ফাটছে কি? কঙ্কালের সারি চলছে কি? মস্তকহীনের মিছিল? হাড়ের দুর্গে কারা থাকে? আর মাঝে মাঝে কারা যেন ডাকে—'ভগবান-ভগবান'—। কে ভগবান? কোথায় ভগবান? বেলা কত? সূর্যদেবের আলোতে এখনো মালবীর আলাপ। বহুদূরবর্তী সেই রূপসী নদীর ধারে হয়ত প্রজাপতিরা এখন ঝিমোচ্ছে আর তাদের মধুসিক্ত স্তিমিত চেতনা দিয়ে শুনছে তৃণখণ্ডের প্রাণস্পন্দন। জাগো—প্রাণবান হও—বিস্মৃতি ও বিভ্রান্তি ঠেলে উঠে দাঁড়াও—অশুভ আর পাপকে ধ্বংস করো—। কে ডাকে?

চোয়াল দুটো শক্ত হয়ে উঠল তার। এখন তার একটিমাত্র প্রশ্ন। নরকের গর্ভ থেকে ওরা বারংবার কাকে ডাকে? ঈশ্বর কে? কে সে? এখন তার একটিমাত্র শপথ—ঈশ্বরকে পেতে হবে।

"ললিতা"—অরিন্দম উচ্চারণ করল।

ললিতা এসে সামনে দাঁড়াল। তার দু'চোখে তিরস্কার, তার চোখের নীচে বিনিদ্র রাতের ছায়া।

"তুমি!"

"হ্যাঁ—আচ্ছা ললিতা, ঈশ্বর কি আছে?"

"তুমি কাল সারারাত, আজ সারাদিন ধরে কোথায় ছিলে?"

"ঈশ্বর কি আছে ললিতা?"

ললিতার চোখে যেন আগুন জ্বলল, কঠিনকণ্ঠে সে বলল, "ঈশ্বরের বিষয়ে কি এককথায় কিছু বলা যায়? আর আমি কিছুই জানিনা। শুধু এইটুকু জানি আর মানি যে ঈশ্বর আছে। নাও, এখন ওসব কথাবার্তা থাক্—তুমি হাতমুখ ধুয়ে নাও—"

"ললিতা—"

"আর একটিও কথা নয়—আচ্ছা তোমার কি মাথা খারাপ হল?"

ললিতার চোখে আগুনের চেয়েও মারাত্মক বস্তু। জল। অরিন্দম নিজেকে সংযত করল।

হাত মুখ ধুল অরিন্দম। তারপর সে খেতেও বসল। কিন্তু সে শুধু ললিতাকে খুশী করার জন্য, তার চোখের জলকে সম্মান দেখাবার জন্য। তার মস্তিষ্কে শুধু একটিমাত্র প্রশ্ন—ঈশ্বর কে? তার অন্তর জুড়ে এখন শুধু একটিমাত্র তৃষ্ণা—ঈশ্বরকে চাই। খাওয়া শেষ করে অরিন্দম প্রশ্ন করল, "মুকুন্দকে তো এদিকে দেখতে পাচ্ছিনা—সে কোথায়?"

"বাইরে গেছে।"

"ওঃ—"

ললিতা ডাকল, "শোন—"

"উঁ?"

"কোথায় ছিলে কাল রাত থেকে?"

"রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়েছি। কত মৃত্যু দেখলাম ললিতা—ক-ত মৃত্যু!"

ললিতার মুখে চোখে গাম্ভীর্য নেমে এল, সে বলল, "আর অমনভাবে না বলে কয়ে বাইরে থেকো না—"

"কেন ?"

"আমার কি ভাবনা হতে নেই ?"

"ভেবোনা ললিতা—শোন, কি দেখলাম শুনবে ? নরক—"

"আমি জানি।"

"মানুষের লোভ মানুষকে মৃত্যুর পথে নিয়ে যাচ্ছে। প্রাকৃতিক নিয়ম নয়। অনাহারে আর ব্যাধিতে মানুষ মারা যাচ্ছে—সে মৃত্যু যে আমারো মৃত্যু !"

"চুপ করো, শান্ত হও।"

"ললিতা—"

"কি ?"

"ঈশ্বর কি ?"

পদশব্দ শোনা গেল। অরিন্দম তাকাল। মুকুন্দ আসছে।

মুকুন্দকে চিন্তিত মনে হচ্ছে। কোনদিকে না তাকিয়ে সে সোজা বাইরের ঘরে গেল। অরিন্দম তাকে অনুসরণ করল। মুকুন্দের কাছে উত্তর চাইবে সে।

ললিতা পেছন থেকে বলল, "বাজে চিন্তা করে আর মাথা গরম করোনা—বুঝলে ? রাতে একটু ঘুমিয়ো—"

অরিন্দম জবাব দিল না। শুধু ঘুরে একবার ললিতার দিকে তাকাল, একবার হাসল। তারপর সে বাইরের ঘরে গেল।

"মুকুন্দ—"

মুকুন্দ কি যেন ভাবছিল, ডাক শুনে চমকে মুখ তুলল।

"মুকুন্দ—একটা প্রশ্ন আছে ?"

"বল।"

"ঈশ্বর কি ?"

"জানি না।"

"ঈশ্বর কি আছে ?"

"তাও জানি না।"

অরিন্দম রেগে উঠল, "তুমি কি ঠাট্টা করছ মুকুন্দ?"

"না—" মুকুন্দ বিমর্ষভাবে হাসল, "সত্যি কথা বলছি।"

"কিন্তু দুঃখের মুহূর্তে, মৃত্যুর মুহূর্তে বারংবার মানুষ কেন তাকে ডাকে?"

"যখন মানুষ মানুষের দুঃখ দূর করতে পারে না—তখন সে মানুষের চেয়েও শক্তিশালী একটি জীবকে কল্পনা করে—"

"তাহলে ঈশ্বর নেই?"

"আমি জানি যে সূর্য আছে, চন্দ্র আছে, পৃথিবী আছে, মানুষ আছে কিন্তু ঈশ্বর আছে কিনা সে প্রমাণ এখনো পাইনি বলেই বলছি নেই—পেলেই বলব আছে।"

"এই সূর্য, চন্দ্র, পৃথিবী আর মানুষ কে সৃষ্টি করল?"

"প্রকৃতি।"

"প্রকৃতির সৃষ্টি কে করল?"

"জানিনা—খুঁজছি—। ঈশ্বর আছে জানলেও কোন ফল হবেনা কারণ এতদিন ধরে যারা জেনেছে তাদেরও দুঃখ দূর হয়নি। ভাল কাজ করলেই যদি আমার ভালো হত তাহলে জানতাম যে ঈশ্বর আছে। তা হয়নি—মন্দ কাজ করেই বরং ভাল ফল ফলতে দেখছি অথচ ঈশ্বরের প্রশ্ন শিকেয় তুলে রেখে আমরা নিজেরাই নিজেদের দুঃখ দূর করতে পারি—"

অরিন্দম সাগ্রহে প্রশ্ন করল, "কি করে?"

"এই সমাজ-ব্যবস্থা বদলে, স্বার্থপরতা ও লোভকে ধ্বংস করে, ভালো কাজ করলেই নিশ্চিত ভালো ফল পাবার মত অবস্থার সৃষ্টি করে"—

"তাহলে ঈশ্বর কথাটার উৎপত্তি হল কি করে?"

"মানুষের ভয় আর কৌতূহল থেকে। বিরাট প্রকৃতির অনন্ত শক্তির তুলনায় নিজের অসহায়তা উপলব্ধি করে।"

"কিন্তু—" অরিন্দমের মন ভরল না, সে বলতে চাইল আরো কিছু।

মুকুন্দ বাধা দিয়ে বলল, "আমি হয়ত ঠিকভাবে গুছিয়ে বলতে পারছি না আর সে চেষ্টাও আমি করব না। ঈশ্বরকে না মেনেও আমার দিন বেশ কাটছে। আমি নিজের ওপরেই বিশ্বাস রাখি, আমি জানি মানুষই মানুষের সুখ দুঃখের জন্য দায়ী। আর যদি ঈশ্বর থাকে আমি তার প্রমাণ চাই—এমন প্রমাণ যা ষষ্ঠেন্দ্রিয়ের ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়—যা পঞ্চেন্দ্রিয়গ্রাহ্য, সর্বজনগ্রাহ্য।"

মুকুন্দ থামল। ঘরের ভেতর স্তব্ধতা নেমে এল। অরিন্দমও আর প্রশ্ন করল না। তা নিরর্থক। মুকুন্দ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রমাণ চায়। পঞ্চেন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রমাণ। কিন্তু ইন্দ্রিয়ের রাজা মন আর মন্ত্রী বুদ্ধি কি কিছু নয়? তা দিয়ে কি আরো কিছু জানা যায় না? কিন্তু কী সেই জ্ঞান, কী সেই সত্য? ঈশ্বর কি? কোথায়?

হঠাৎ মুকুন্দ উঠে দাঁড়াল, বলল, "তুমি ঘুমোও অরিন্দম, আমি মনিশঙ্করের কাছে যাব।"

"এত রাতে?"

"দরকার আছে।"

কি দরকার? প্রশ্ন করতে গিয়ে থেমে গেল অরিন্দম। নিরর্থক।

মুকুন্দ বেরিয়ে গেল।

মুহূর্ত কাটে। প্রহর কাটে। রাত বাড়ে। অরিন্দম ভাবে। মন আর বুদ্ধি দিয়ে কিছু জানা যায় না? ইন্দ্রিয়ের জ্ঞান থেকে কি নতুন কোন জ্ঞানলাভ হয় না? ঈশ্বর কি? ঈশ্বর কি আছে? কি বলল অরিন্দম? ঈশ্বর নেই? ঈশ্বর তাহলে কল্পনা-সৃষ্ট বস্তু, নিরর্থক, অপ্রয়োজনীয়?

গুম্—গুম্—গুম্—

বহুদূর থেকে মেঘের ডাক ভেসে এল। পড়ুক বৃষ্টি জ্ঞানের বারি-সিঞ্চন হোক মরুভূমির মত হৃদয়ে। ঈশ্বর কি নেই?

ঘুম আসে না। যেন কন্টক শয্যায় শুয়ে আছে সে।

মুহূর্তের পর মুহূর্ত কাটে। প্রহর কাটে। রাত গভীরতার দিকে এগোয়।

ঈশ্বর, তুমি কি আছ?

বাড়ীর সবাই ঘুমিয়েছে। ললিতা কি স্বপ্ন দেখছে? দুঃখ, বেদনা আর মৃত্যুর ভেতর থেকে কেন বারংবার ডাক ওঠে—'ভগবান—ভগবান'?

না, বসে থাকলে চলবে না। তাকে জানতেই হবে। অরিন্দম উঠে দাঁড়াল, ঘর থেকে বেরোল। ঈশ্বরকে খুঁজে না পেলে সে সংগ্রাম আরম্ভ করতে পারবে না।

গলি। নিঃশব্দ। নির্জন।

এখানে ওখানে ঘুমন্ত কুকুর।

এখানে ওখানে আবর্জনা, ইঁদুর আর বিবর্ণ বাষ্পীয় আলোক।

ঈশ্বর নেই?

ঘুমন্ত নীচুপাড়া। ঘুম! না, ঘুমোবার ছল করে ভাবছে লোকেরা। রাত পোহালে খাবে কি তারা? আর যারা ঘুমোচ্ছে তারা দুঃস্বপ্ন দেখছে।

অরিন্দম এগোল। আঁকা বাঁকা অনেক গলি পেরিয়ে। হঠাৎ সে থামল। বাতাসে দুর্গন্ধ। সামনের দিকে ভালো করে তাকাল সে। দুটি মৃতদেহ। মৃতদেহ দুটিকে সন্তর্পণে ডিঙোল অরিন্দম। চারদিকে তাকাল সে। অন্ধকার। দু'পাশে ভাঙা ভাঙা কুঁড়েঘর আর বাড়ী। এই কি সেই স্বপ্নের নরক!

একটা শঙ্খধ্বনি। মধ্যরাত্রির থমথমে নিঃশব্দতায় হঠাৎ চিড় খেয়ে গেল।

একটি বাড়ীর ভেতরে কোলাহল শোনা গেল।

একটি কথা ভেসে এল সেই বাড়ী থেকে—"খোকা—খোকা হয়েছে"—

একটি শিশুর জন্ম হল। জন্ম! একটি নতুন জীবন!

পেছনে ফেলে এসেছে সে দুটি মৃতদেহ। দামোদর মারা গেছে। আরো অসংখ্য মৃতদেহ ছড়ানো আছে আজবনগরের এখানে ওখানে। আবার এখানে শঙ্খও বাজছে! হয়ত আরো কত জায়গায় বাজছে! পাশাপাশি জন্ম ও মৃত্যু!

আঁকাবাঁকা অনেক গলি আর রাস্তা পার হয়ে এগিয়ে চলল অরিন্দম।

এখানে ওখানে মাতালের পদধ্বনি।

এখানে ওখানে গলিত শবদেহ।

এখানে ওখানে কুকুর আর ইঁদুর।

ঈশ্বর নেই?

গুম্ গুম্ গুম্—মেঘের ডাক ভেসে এল। যেন কোন এক উত্তেজিত দৈত্যরাজের একশ' ঘোড়ার রথের চাকা আকাশের বুক দিয়ে গড়িয়ে গেল।

অরিন্দম থামল। কাছেই একটা ছোট মাঠ। সেখানে একটা মস্ত বড় বটগাছ—তার নীচে গিয়ে বসল সে। আকাশের অর্ধেকটা মেঘাবৃত, অপরার্ধে অজস্র নক্ষত্রের দীপমালা। অরিন্দম ভাবতে লাগল।

ঈশ্বর নেই? কে জানে, হয়ত মুকুন্দের কথাই সত্যি—ঈশ্বর নেই।

নেই। ভাবতেই যেন একটা ভোজবাজী ঘটল অরিন্দমের চোখের সামনে। সব কিছু যেন আলোড়িত হতে লাগল, কাঁপতে লাগল, ভাঙতে লাগল, ফাটতে লাগল, রেণু রেণু হয়ে বাতাসে বিলীন ধোঁয়ার মত মিলিয়ে যেতে লাগল। মাথার ওপরকার মহাকাশ যেন ফেটে চৌচির হয়ে গেল, নক্ষত্রের আলো নিভে গেল, পায়ের নীচেকার মাটি সরে গেল, নবমীর চন্দ্রদেব অদৃশ্য হলেন, আজবনগরের আলো আর

অন্ধকার কর্পূরের মত মিলিয়ে গেল। পৃথিবী নেই, মহাব্যোমে বিরাজ-মান গ্রহ উপগ্রহ নেই, সমুদ্র নেই, পর্বত নেই, ললিতা নেই, কেউ নেই, কিছু নেই, এমনকি অরিন্দমও নেই। মহাশূন্যতা। অনন্ত, বিপুল, ভয়াবহ মহা মহা শূন্যতা চারদিকে। আলো নেই, অন্ধকার নেই, শীত নেই, বসন্ত নেই, বাতাস নেই, আগুন নেই, কিছু নেই। আইন নেই, আদর্শ নেই, স্বপ্ন নেই, প্রেম নেই, জীবন নেই, মৃত্যু নেই, কিছু নেই। শুধু শূন্যতা, আদিঅন্তহীন মহা মহা শূন্যতা। নির্জন। নিঃশব্দ।

অরিন্দম ভয় পেল। তা হয় না। তা হতে পারে না। কারণ পায়ের নীচেকার মৃত্তিকা মিথ্যে নয়, আকাশের তারা মিথ্যে নয়, সে আর ললিতা মিথ্যে নয়, আজবনগরের কোটি কোটি লোকেরা মিথ্যে নয়। আর কে এই সব সৃষ্টি করেছে? প্রকৃতি? তবে প্রকৃতিকে কে সৃষ্টি করল? বল, জবাব দাও। সব কিছুর শেষে কে? হ্যাঁ, ঈশ্বর আছে।

আছে। সেই মহা মহা শূণ্যতার গর্ভে এক মহা প্রাণশক্তি ধার আছে। বৈদ্যুতিক শক্তির মত অদৃশ্য অথচ মহা মহা শক্তিশালী তা। চৈতন্যময় প্রাণশক্তি। তার মন আছে, বুদ্ধি আছে। আছে। ভাবতেই সেই মহাশূন্য আলোড়িত হল, পুঞ্জ পুঞ্জ বাষ্পের ভেতর দিয়ে সৃষ্টি আরম্ভ হল। নক্ষত্রদের জন্ম হল, গ্রহ উপগ্রহ জন্মাল; জল ও আগুনের সৃষ্টি হল; গাছপালা, লতাপাতা ও পশুপক্ষীর জন্ম হল, যা কিছু আছে তার উদ্ভব হল; শব্দ, গন্ধ, বর্ণ ও বৈচিত্রে চারদিক পরিব্যাপ্ত হল। আছে। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আছে সেই ঈশ্বর আছে। নতুবা বল, কে তা সৃষ্টি করল?

কিন্তু দেখতে হবে। ঈশ্বর, তুমি কোথায়?

অরিন্দম উঠে দাঁড়াল। কোথায়?

মন্দিরে? দেখা যাক। অরিন্দম এগোল।

রাস্তার পার্শ্ববর্তী একটা গাছের নীচে একটা বেদী মত। সেখানে

একটা তেল সিঁদুর-মাখানো প্রস্তরখণ্ড, তার গায়ে একটি সর্পমূর্তি। বেদীর পাশে একটা লোক বসে আছে। তার ললাটে সিঁদুরের রেখা।

অরিন্দম লোকটিকে প্রশ্ন করল, "ঈশ্বরকে কোথায় দেখা যাবে তুমি জানো?"

লোকটি মাথা নাড়ল, সহাস্যে বলল, "জানি—আমাকে পয়সা দাও, তবে বলব"—

"এই নাও"—

তাকে দুটো পয়সা দিল অরিন্দম।

লোকটি বলল, "এই যে সর্পমূর্তি দেখছ—এই ঈশ্বর—এঁকে প্রনাম কর"—

"ঈশ্বর কি সাপ?"

"মূর্খ, প্রশ্ন করো না।"

"ঈশ্বর কি শুধু পাথর?"

"মূর্খ, তর্ক করো না"—

"তুমি কে?"

"আমি পুরোহিত—আমি ঈশ্বরকে জানি এবং দেখাই বলে আমাকে সবাই সম্মান করে। তুমি আমাকে প্রণাম করো।"

অরিন্দম নিরুত্তরে সেখান থেকে সরে পড়ল, এগোল। পথে আরো মন্দির দেখল সে। বজ্র, আগুন ও ব্যাধি প্রভৃতি দেবতার মন্দির। সেখানেও পুরোহিতেরা পয়সা ও সম্মান দাবী করল।

আবার পথ। ঈশ্বরকে দেখতেই হবে। নিজের মনে হাসল অরিন্দম। আদিম মানুষের ভয়ের প্রতীক ঐ সব দেবতারা এখনো পুজো পাচ্ছে। মানুষের মনে এখনো আদিমতা আছে। তাই ঈশ্বরের নাম করতেই সে ভয় পায়। সেই ভয়ের সন্ধান জেনে একদল লোক তার সুযোগ নিয়ে অর্থোপার্জন ও ক্ষমতা বিস্তারের চেষ্টা করছে।

আর একটা মন্দির। শ্বেতপাথরে তৈরী। ভেতরে সুদর্শন এক মনুষ্য-মূর্তি দেবতা। তার সামনে নানা অর্ঘ্য, অজস্র ফুল ও অসংখ্য আলো।

বিগ্রহের সামনে একজন মেদসমৃদ্ধ প্রৌঢ় উপবিষ্ট। তার ললাটে চন্দনের ছাপ। বারান্দায় জনকয়েক লোক করজোড়ে উপবিষ্ট।

অরিন্দম লোকদের উদ্দেশ্যে বলল, "আমি ঈশ্বরকে দেখতে চাই।"

সেই প্রৌঢ় বলল, "ওই বিগ্রহ দেখ"—

"দেখলাম"—

"দক্ষিণা দাও"—

"কেন?"

"আমি তার পুরোহিত"—

"তাতে কি?"

উপবিষ্ট লোকেরা হেসে উঠল, "মূর্খ, তুমি মূর্খ। ভগবান বলেছেন যে তাঁর পূজারীদের সম্মান করা উচিত, তাদের দক্ষিণা দেওয়া উচিত"—

"কাকে বলেছেন সে কথা ভগবান, আপনাদের?"

"না—ঐ পুরোহিত ঠাকুরকে"—

"আমি বিশ্বাস করি না।"

সেই মেদসমৃদ্ধ প্রৌঢ় লোকটি চোখ রাঙা করে বলল, "তুমি আমাকে বিশ্বাস করো না!"

"না। বিশ্বাস করতে পারি যদি তুমি ঈশ্বরকে দেখাতে পারো"—

"আমি তো তা দেখালাম"—

"কিন্তু ওতো পাথরের মূর্তি"—

"উনিই ঈশ্বর"—

"তাহলে প্রতিটি শিলাখণ্ডই ঈশ্বর!"—

"তুমি নাস্তিক—দূর হও"—

"পুরোহিত, তুমিও ঈশ্বরকে দেখোনি"—

অরিন্দম সেখান থেকে বেরোল। এবার? আরো মন্দিরে ঘুরল সে। সব মন্দিরেই সেই এক ব্যাপার। দেবতার মূর্তি রচনা করে ব্যবসা চলছে। শুধু দেবতার মূর্তি অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানুষের মূর্তি পরিগ্রহ করেছে। মানুষের মন একটা উন্নত স্তরে পৌঁছে নিজেকেই পূজো করেছে। কিন্তু আসল বস্তু কোথায়? ঈশ্বরকে কোথায় দেখা যাবে? ঈশ্বর তো শিলাখণ্ড নয়।

"ভগবান—তুমি কোথায়?"

চলতে চলতে চীৎকার করে ডাকল অরিন্দম, "ভগবান, তুমি কোথায়? তুমি কোথায়? তুমি আমাকে দেখা দাও"—

কোন সাড়া পাওয়া গেল না, কোন উত্তর ধ্বনিত হল না। শুধু মেঘাবৃত আকাশ থেকে ডাক ভেসে এল—গুম্ গুম্ গুম্ গুম্—গুরু গুরু গুম্ গুম্—

মন্দিরে ঘুরে অরিন্দম ইতিহাসকে বুঝল। মানুষ প্রকৃতির মধ্যে এক বিরাট শক্তিকে অনুভব করে তার নাম দিল ঈশ্বর। তারা ভেবে পেল না ঈশ্বর কেমন। কেউ ভাবল বজ্র, কেউ ভাবল সাপ, কেউ ভাবল মানুষের মতই কেউ। নীতি, সমাজ ও রাষ্ট্রকে ঠিক রাখার জন্য দেবতার নাম করে নানা শাস্ত্র রচিত হল, নানা উপকথার সৃষ্টি হল। যারা বুদ্ধিমান তারা তাদের অনুভূতির কথা মানুষকে বলে সম্মান ও অর্থলাভ করে লোভী হয়ে উঠল, তাদের সেই লাভকে কায়েমী করার জন্য তারা নানা শাস্ত্র ও সংস্কারের সৃষ্টি করে মানুষের মনকে সাপ, আগুন, ব্যাধি ও প্রস্তর-দেবতাতেই সীমাবদ্ধ রাখল, মানুষের ঈশ্বরানুসন্ধানের স্বাধীনতাকে খর্ব করে তাদের ক্রীতদাসে পরিণত করল। সেই সব লোভীদের জন্য সত্যকার ঈশ্বর-আবিষ্কারকদের কথা কেউ শুনল না, মানল না, ঈশ্বরকে কেউ দেখতে পেল না। ঈশ্বরহীন হওয়াতে হিংসা বাড়ল, ঘৃণা বাড়ল, লোভ ও স্বার্থপরতায় পৃথিবী আচ্ছন্ন হল। ঈশ্বর, তুমি কোথায়?

মেঘের ডাক ভেসে এল—গুরু গুরু—গুম্ গুম্—

অরিন্দম থামল, ভালো করে তাকাল। নীচুপাড়ার পশ্চিম সীমান্তে গৌরী নদীর ধারে এসে দাঁড়িয়েছে সে। কতক্ষণ ধরে হেঁটেছে, ঘুরেছে সে, সে বিষয়ে তার কোন জ্ঞান ছিল না। সে বুঝল যে রাত প্রায় শেষ হতে চলেছে এখন।

মেঘের ডাকে গৌরী নদীর বুকে যেন আবেগের সঞ্চার হয়েছে। কল্‌কল্ শব্দে তীরের বুকে এসে আছড়ে পড়ছে সে, দুলছে তার বুকের নোঙর-ফেলা নৌকো, জাহাজ আর তাদের আলোগুলি। সঙ্গে সঙ্গে আকাশের নক্ষত্রেরাও যেন সেই গম্ভীর ও উদাত্ত মেঘের ডাকে কেঁপে কেঁপে উঠছে।

অরিন্দম মাটির ওপর বসে পড়ল, বিড় বিড় করে বলল, "ঈশ্বর, তুমি দেখা দাও"—

গৌরী নদীর অশান্ত জলোচ্ছ্বাসের শব্দে তার কথা ভেসে গেল, শূন্যতায় হারিয়ে গেল।

মন আর বুদ্ধি কি তাকে পথ দেখাবে না? অরিন্দম ভাবতে লাগল। কিন্তু না, কোন ফল হবে না, শুধু ভাবলেই কিছু দেখা যায় না। তাহলে? কোথায়?

অতি দ্রুত আকাশের স্পন্দমান নক্ষত্রেরা একার একের পর মেঘাবৃত হল, রাহুর পূর্ণগ্রাসের মত সম্পূর্ণ আকাশটাকেই মেঘরাশি গ্রাস করল। মেঘের কালো ছায়ায় গৌরী নদীর জলও কালো হয়ে উঠল। শুধু উঁচুপাড়ার আলো, নৌকো ও জাহাজের আলো আর সেতুর ওপরকার আলোকস্তম্ভগুলোর উজ্জ্বল আলো নদীর জলের এখানে ওখানে ও সেখানে দীর্ঘায়ত হয়ে প্রতিবিম্বিত হল, দুলতে লাগল, কাঁপতে লাগল, ভাঙতে লাগল। অন্ধকারে সমস্ত চরাচর পরিব্যাপ্ত হল। দুর্ভেদ্য লৌহ প্রাচীরের মত সেই অন্ধকার। আর সেই অন্ধকারেই অরিন্দম বসে বসে রইল।

বাতাস নেই। একটা গুমোট, থমথমে ভাব। প্রকৃতি যেন নাটকের শেষ দৃশ্যের উদ্ঘাটনের জন্য নিরুদ্ধ-নিঃশ্বাসে প্রতীক্ষা করছে। ঈশ্বর, তুমি কোথায়? মন্ত্রের মত অরিন্দম বারবার বিড়বিড় করে—'ঈশ্বর, তুমি কোথায়? হে আমার সাগ্নিক আত্মা, তোমার অগ্নিময় উৎস-স্থলকে আমায় দেখাও, দেখাও।

হঠাৎ যেন অরিন্দমের আকুল প্রার্থনায় চারদিকে সাড়া পড়ে গেল। আকাশের পূব থেকে পশ্চিমে, উত্তর থেকে দক্ষিণে, মেঘের গুরু গুরু ডাক বারংবার গড়িয়ে যেতে লাগল। যেন নাটকের সেই বহু-প্রতীক্ষিত শেষ দৃশ্যের পটোত্তোলনের জন্য সংকেত-শব্দ হিসেবে লক্ষ লক্ষ মৃদঙ্গের ধ্বনি উত্থিত হল। তারপর যবনিকা সরে গেল। নিষ্প্রদীপ রঙ্গমঞ্চের মৃদঙ্গ-নিনাদ গুম্ গুম্ শব্দে পৃথিবীকে কাঁপাতে লাগল। তারপর হঠাৎ অভিনয় সুরু হল।

উত্তর থেকে একটা গোঁ গোঁ শব্দ ভেসে এল। ঝড়। ক্রমে তা কাছে এল। গাছের মাথা ও ডালপালা দুলিয়ে, শুকনো পাতার রাশি উড়িয়ে তা যেন আনন্দের উন্মত্ততায় হা হা করে হাসতে লাগল। মড়্মড়্ শব্দে তীরবর্তী কয়েকটা গাছ ভেঙ্গে পড়ল, উপড়ে গেল আর ভয়-ব্যাকুল জানা অজানা পাখীদের ডাক ভেসে এল। গৌরী নদীর আবেগ এবার মত্ততায় পরিণত হল, তার বড় বড় ঢেউ জ্ঞানশূন্য বন্যহস্তীর মত তীরের গায়ে এসে আছড়ে পড়তে লাগল।

"ঈশ্বর—ভগবান—তুমি দৃশ্যমান হও"—

কড়—কড়—কড়াৎ—আকাশটা যেন এঁকেবেঁকে ফেটে গেল। আর তার ফাটলের আড়াল থেকে যেন এক বহুবিচিত্র জগতের নীলবর্ণ আলোকে দেখা গেল।

অরিন্দম কেঁপে উঠল। ঐ সেই আলো—তার প্রাণদাতা মহাপ্রাণের জ্যোতি!

সঙ্গে সঙ্গে যেন আকাশের আটটি কোণ থেকে কোটি কোটি

অশ্বারোহী বিদ্যুদ্বেগে ছুটে এল। তাদের অশ্বক্ষুরের আঘাতে আকাশের জলের বাঁধ ভেঙ্গে গেল আর বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি নামল।

ঝড়ের হাহা শব্দ, বৃষ্টির শব্দ, বিসর্পিল বিদ্যুতের আলো, বজ্রপাতের ভয়ঙ্কর আওয়াজ আর গুরু গুরু মেঘের ডাক—সব মিলে যেন একটি সত্য—একটি বেদনাময় স্তোত্র—একটি করুণ রাগ।

স্থির হয়ে বসে রইল অরিন্দম। বৃষ্টি, ঝড়, বজ্রপাত—কোনো কিছুতেই টলল না সে, নড়ল না। সর্বাঙ্গ ভিজে গেল তার, তবু তার হৃদয়ের প্রার্থনা স্তব্ধ হল না, তবু সে প্রতীক্ষা করতে লাগল। কে জানে, হয়ত এক মুহূর্তে ইন্দ্রজাল ঘটবে, সেই প্রার্থিত পুরুষকে দর্শন করা যাবে। ঈশ্বর, তুমি দেখা দাও।

অনেকক্ষণ পরে প্রকৃতির এই ভৈরবমূর্তি শান্ত হয়ে এল। কতক্ষণ সে খেয়াল অরিন্দমের ছিল না। শুধু সে দেখল যে ধীরে ধীরে প্রকৃতির রূপান্তর ঘটল। ঝড় থামল, কিন্তু মৃদুমন্দ বাতাস বইতে লাগল; বৃষ্টি থামল কিন্তু বৃষ্টি-স্নাত গাছপালা আর পৃথিবীর সরসতা রইল; রিক্ত মেঘের গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ অন্তর্হিত হল কিন্তু আকাশে ভাসমান হাল্‌কা মেঘের পুঞ্জ রইল। আর পূর্বাচলে যেন গৌরীনদীর গভীর তলদেশ থেকে সূর্যদেবের রক্ত-কুসুম-সদৃশ শ্রীমুখটিকে উঠতে দেখা গেল।

স্থির ও অবিচলিতভাবে তখনও অরিন্দম সেখানে বসে ছিল, এখনও বসেই রইল সে। বৃষ্টির জল তার গায়েই শুকোল, ভিজে কাপড় আবার শুকনো হল, তবু সে ভ্রূক্ষেপ করল না। যে আসনে সে উপবেশন করেছে, ঈশ্বরকে না দেখা পর্যন্ত সেখানেই সে তার হাড় মাংস মিশিয়ে দেবে।

নির্বাক ও নিশ্চল প্রস্তরমূর্তির মত অরিন্দম সামনের দিকে তাকিয়ে রইল। কোথায়? ঈশ্বর, তুমি দেখা দাও।

মুহূর্তে মুহূর্তে প্রকৃতির রূপান্তর ঘটতে লাগল। সোনালী সিঁদুর

মাখা সূর্যালোক ক্রমেই শুধু সোনালী হয়ে উঠল, গৌরী নদীর জলে তার স্পর্শ লাগল, নদীর তরঙ্গশীর্ষে সেই আলো যেন নাচতে লাগল। ঝিরঝিরে ঠাণ্ডা বাতাসের দোলা লেগে নদীতীরবর্তী গাছ-পালারা সব মর্মরধ্বনি করে উঠল। বহুদূরের কোন পদ্মবনের ধারে নিভৃতে বসে খাদ্য আহরণ করার লোভে একদল বনহংস উড়ে গেল আর তাদের পেছনে যেন আকাশের ছিন্ন মেঘের দল ধাওয়া করল। জানা অজানা নানা পাখীর ডাক, দূর থেকে ভেসে-আসা আজবনগরের যানবাহন ও লক্ষ লক্ষ মানুষদের কলগুঞ্জন আর গৌরী নদীর কল্লোল-ধ্বনি—সব মিলে যেন একটি সুর। আশ্চর্য প্রশান্তি চারদিকে। অদৃশ্য কোনো লোক থেকে যেন শান্তিবারি বর্ষিত হচ্ছে পৃথিবীর ওপর। সুন্দরী পৃথিবী। শিশুদের, প্রেমিকদের হাসি যেন শোনা যাচ্ছে। ক্ষেতে, মাঠে, কারখানায় আর দপ্তরখানায় মানুষেরা ছুটছে। আবার মানুষ মরছে, কাঁদছে, তাদের রক্তে মাটি ভিজছে। ফুল ফুটছে এখানে, ওখানে, পৃথিবীময়। নিশীথ রাত্রের ঐন্দ্রজালিক মুহূর্তে, প্রখর দিবসালোকের উজ্জ্বল মুহূর্তে, মাতৃগর্ভের অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসছে নতুন মানবগোষ্ঠী। পাশাপাশি জীবন ও মৃত্যু। বেদনা ও আনন্দ। মহাশূন্যতা ও মহাপরিপূর্ণতা। অনিত্য ও নিত্য। স্থায়ী ও অস্থায়ী। আলো ও অন্ধকার। সৃষ্টি ও ধ্বংস। কিন্তু জীবন বড় সত্য। আনন্দ ও আলো বড় সত্য। মৃত্যু আর অন্ধকার শুধু জীবনের ও আলোর মহত্বকে প্রকাশ করার জন্য, তাকে মধুর ও মূল্যবান করার জন্য। সৃষ্টির আনন্দকে চিরস্থায়ী করার জন্যই আ[illegible] ধ্বংস। পৃথিবী যৌবনবতী, জীবন ও আলো চিরন্তন। মৃত্যু আসে, অন্ধকার আসে কিন্তু সমগ্র মানবজাতি আর গোটা পৃথিবীকে তা গ্রাস করতে পারে না। জীবন ও আলো অবিনশ্বর। একজন জন্মায়, আরেকজন মরে। কিন্তু মানুষ বেঁচে থাকে। মানুষের যৌবন বেঁচে থাকে। একটি ফুল ঝরে গেলেও আর একটি ফুল ফোটে। এক জায়গায় সূর্যাস্ত হলেও তো সারা পৃথিবী

অন্ধকার হয় না। মানুষ হিংসায় পশু হলেও তার মহত্ব লোপ পায় না। চতুরলাল থাকলেও মণিশঙ্কর থাকে।

জীবনই বড় সত্য, জীবনই বড় শক্তি। অরিন্দম সবিস্ময়ে দেখল সেই জীবনকে। মহাসমুদ্রের মত তা চরাচরকে প্লাবিত করেছে, প্রবাহিত হচ্ছে। গম্ভীর, মধুর ও উত্তেজক তার কল্লোলধ্বনি। একটা মহারাগের মত। সেই মহারাগের আত্মা এক নৃত্যচ্ছন্দ। আনন্দ। বাঁচার আনন্দ। মহা আনন্দ। অনাহার, ব্যাধি, দুঃখ, শোক—কোনো কিছুতেই সেই আনন্দ ম্লান হয় না, দুর্বল হয় না। মহাস্রোতের মত বয়ে যাচ্ছে সেই আনন্দধারা। আকাশে, বাতাসে, পর্বতে, অরণ্যে, জলে, স্থলে, অগনণ পশু, পক্ষী, মানুষ আর জীবদেহে সেই আনন্দ প্রবাহিত। সেই আনন্দের উত্তেজনাকে অম্লান রাখার জন্যই আসে মৃত্যু, জরা, ব্যাধি। সেই আনন্দকে স্থূলভাবে পাবার জন্যই মানুষ হয় স্বার্থপর, হিংসাপরায়ণ, সেই আনন্দ অপহৃত হলেই মানুষ সংগ্রাম করে পশুশক্তির বিরুদ্ধে। তাকাও, দেখ, মহান আনন্দধারায় ব্রহ্মাণ্ড পরিপ্লাবিত। শুধু পৃথিবী নয়—চন্দ্র, সূর্য, মঙ্গল, শুক্র—কোটি কোটি গ্রহ উপগ্রহ, অনন্ত কোটি নক্ষত্রপুঞ্জেও সেই আনন্দধারা। আনন্দের প্রাণ অস্থিরতা—তাই মেঘ ওড়ে, পৃথিবী ঘোরে, গ্রহপথে চলে নক্ষত্রদল। তাকাও, দেখ। সেই আনন্দের জন্যই আজ আজবনগরের পশুদের সঙ্গে সংগ্রাম চাই। মহান আনন্দে সৃষ্টি থর থর কাঁপছে। আনন্দই ঈশ্বর। তাকাও, ঈশ্বরকে দেখ।

অরিন্দম দেখল। ঈশ্বর শূণ্যতা ও এক। ঈশ্বর আকার। ঈশ্বর মহাকাল। ঈশ্বরই আধার ও আধেয়। ঈশ্বর থেকে সব কিছু। মানুষও তাই। মানুষ ঈশ্বরের মধ্যেই। আবার মানুষের মধ্যেই ঈশ্বর। তবু সব কিছুর পৃথক স্বত্বা আছে। মানুষেরও তা আছে। শূন্যতা থেকে এক—এক থেকে শূন্যতা। দু'য়ের সম্বন্ধের মাঝে ইন্দ্রজালের যবনিকা। মায়া। প্রতিটি বস্তুর এই পৃথক ও স্বাধীন স্বত্বাকে সুযোগ দেওয়ার জন্যই এই মায়া। কিন্তু মায়ায়

আচ্ছন্ন হলে নিজেকে দেখা যায় না। দেখা যায় না যে ঈশ্বরের মধ্যে সে, তার মধ্যেই ঈশ্বর এবং সব কিছুর মধ্যেই ঈশ্বর। ফলে অহমিকা, অহঙ্কার, ঘৃণা, হিংসা, যুদ্ধ। দেখ, ঈশ্বরকে দেখ, তার মধ্যে তুমি। দেখ, ঈশ্বরকে দেখ, তোমার মধ্যেই ঈশ্বর। দেখ, ঈশ্বরকে দেখ, প্রতিটি মানুষই ঈশ্বর, সব মানুষ মিলেও সেই একই ঈশ্বর। অনন্ত কোটির শূন্য বাদ দিলে থাকে এক। তাই একগোষ্ঠী হয়ে বাস করতে হবে মানুষকে, পরস্পরকে সাহায্য করতে হবে। প্রত্যেক মানুষ সমগ্র মানবজাতির জন্য দায়ী। সমগ্র মানবজাতি আবার প্রতিটি মানুষের জন্য দায়ী। তা না হলে একজনের পাপে কোটি কোটি লোক দুঃখ ভোগ করে কেন? শোন, নিজের মধ্যবর্তী ঈশ্বরকে দেখে নিজেকে সংযত কর, অপরকে সংযত কর, মানুষ হও।

অরিন্দম দেখল। মুক্তিই ঈশ্বর। ঈশ্বর মুক্ত পুরুষ। তাই এ জগতে সব কিছুই স্বাধীন, মুক্ত। ঈশ্বরের মধ্যেই সব তবু সব কিছুর পৃথক স্বত্বা আছে। নক্ষত্রপুঞ্জ ও গ্রহরাজি থেকে সুরু করে কীটপতঙ্গ পর্যন্ত প্রত্যেকেই স্বাধীন। কিন্তু স্বাধীন হয়েও নিয়মের পথ ধরে তাদের চলতে হবে। সেই নিয়ম সংযম। সেই নিয়মই ঈশ্বর। পৃথক স্বত্বা আছে বলেই মানুষ নিয়ম পালন করে ভালো ফল পায়—বলে ঈশ্বর দয়ালু। সেই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটলে যখন মন্দ ফল ঘটে তখন লোকে বলে ঈশ্বর নিষ্ঠুর। কিন্তু ঈশ্বর দায়ী নয়। দায়ী মানুষ। দায়ী মানুষের সৃষ্ট সমাজ-ব্যবস্থা। তবু মানুষ ডাকে—'ভগবান—ভগবান'—। সে ডাক নিরর্থক নয়, সেই ডাকে মানুষের অন্তরবাসী ঈশ্বর সাড়া দেয়। তাইতো মানুষ উত্তেজিত হয়, দল বাঁধে, মানুষের দুঃখ দূর করার জন্য সংগ্রাম করে।

মিথ্যা। কোনো মূর্তি, কোনো বিগ্রহ, কোনো শিলাখণ্ড মানুষের দুঃখ দূর করতে পারেনা। কারণ মানুষের ডাকে ঈশ্বর মানুষের দুঃখহরণ মানুষকে দিয়েই করায়। কোন মানুষ দিয়ে? যে মানুষ তার অন্তরের ঈশ্বরকে দেখতে পেয়েছে। আর কি ভাবে দেখতে পাওয়া যায় তা?

অন্তরের মণিকোঠায় যে ঈশ্বর আছে তাকে কিভাবে দেখা যায়? অরিন্দম ভাবতে লাগল। কি ভাবে? কি ভাবে?

হঠাৎ সর্বাঙ্গে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল তার। সে তাকাল তার চারদিকে। ঈশ্বর থেকেই সব কিছু। ঈশ্বরই সব কিছু। এই সত্য। জীবন বড় সত্য। জীবনকে মহাজীবনে পরিণত করার জন্যই মৃত্যু। পৃথিবীর সব কিছুই জীবন্ত ও আনন্দময়। এই জ্ঞানই সত্য। ভালো কি আর মন্দ কি, প্রতিটি বস্তুর স্বরূপকে জানাই সত্য। সে সত্যকে অরিন্দম জেনেছে। আর সত্য মানেই ঈশ্বর।

গভীর আনন্দে হৃদয় ভরে উঠল অরিন্দমের। আবার সে তাকাল চারদিকে। জীবন কি সুন্দর! আকাশ, মেঘ, গাছ, নদী, পাখী, ফুল আর মানুষ—সব কিছুই সুন্দর। আনন্দ সুন্দর, সত্য সুন্দর—সৌন্দর্য দর্শনে মন পবিত্র হয়। সৌন্দর্যই ঈশ্বর। আনন্দের শিহরণ খেলে গেল অরিন্দমের সর্বাঙ্গে। সুন্দর, এ জীবন সুন্দর, এই পৃথিবী সুন্দর!

সঙ্গে সঙ্গে হৃদয় দুলে উঠল, ভরে উঠল। অনির্বচনীয় অনুভূতিতে দেহমন প্লাবিত হয়ে গেল। ভালবাসতে ইচ্ছে হল তার। আকাশ বাতাস, নদী পর্বত, অরণ্য, মেঘ, ফুল, ফল, জীব জন্তু, প্রতিটি ধূলিকণা —সব কিছুকেই ভালবাসতে ইচ্ছে হল তার। সব কিছুর মধ্যেই ঈশ্বর আছে। আর সবচেয়ে প্রিয়বস্তু মানুষ। প্রতিটি মানুষকে ভালবাসতে ইচ্ছে হল তার, প্রতিটি মানুষকে। কারণ প্রতিটি মানুষের মধ্যে যে ঈশ্বর আছে সেই ঈশ্বরতার মধ্যে ও আছে। অন্য মানুষকে ভালবেসে সে নিজেকেই ভালবাসে। আর ললিতা? ভালবাসা, হ্যাঁ, প্রেমই ঈশ্বর।

ঠিক, সত্য, সৌন্দর্য্য ও প্রেম দিয়েই মানুষ তার অন্তরবাসী ঈশ্বরকে দেখতে পায়। আর পথই ঈশ্বর। সত্য, সৌন্দর্য্য ও প্রেমই ঈশ্বর। যে সেই পথ অবলম্বন করে নিজের অন্তরের দেবতাকে দেখতে পেয়েছে সেই মানুষের মঙ্গল করেছে, তার দুঃখ দূর করেছে, মনুষ্য-সমাজের

শত্রুদের ধ্বংস করে দেবত্ব অর্জন করেছে এবং মানুষেরা তাদের মূর্তি নির্মাণ করে পূজো করেছে।

অরিন্দম উঠে দাঁড়াল, আনন্দ-কম্পিত কণ্ঠে চীৎকার করে বলল, "পেয়েছি—পেয়েছি—আমি সেই আদিত্যবর্ণ ঈশ্বরকে পেয়েছি—সত্য, সৌন্দর্য এবং প্রেমই ঈশ্বর"—

চারদিকে শব্দ, কোলাহল। আকাশে সঞ্চরমাণ চিলের ডাক। ঝিরঝিরে বাতাস, হংস-পক্ষের মত শুভ্র মেঘের মিছিল, গৌরী নদীর জলকল্লোল। অগণন মানুষের পদধ্বনি, চীৎকার, হাসি, কান্না, দীর্ঘশ্বাস। স্রোতসঙ্কুল জীবন্ত জীবন।

"পেয়েছি—পেয়েছি"—

না। আর কোন দেবতা নেই। আমার অন্তরবাসী দেবতাই সমস্ত কিছুর মধ্যে। না, কোন পূজোর দরকার নেই। মানুষের জন্ত বাঁচাই সবচেয়ে বড় পূজো। শোন, মায়াচ্ছন্ন না হওয়াই সবচেয়ে বড় ধর্ম। আরো শোন, শুধু মূর্তি এবং বিগ্রহ পূজোয় চিত্ত সংকীর্ণ হয়, মনে কুসংস্কার জন্মায়। দেখ, ঈশ্বরের সমগ্র মূর্তিকে দর্শন কর।

চারদিকে যেন কার ললিত কণ্ঠের তান! মেঘের গায়ে যেন কোন অপ্সর-দুহিতার নৃত্য! বাতাসে যেন কোন নন্দন-কাননের পুষ্প-গন্ধ! পেয়েছি—আমি সেই আদিত্যবর্ণ মহাজীবনকে আমার অন্তরে দেখতে পেয়েছি। হে আকাশ, হে বায়ু, হে নদী, হে সূর্যদেব—শোন, আমি দেবতা—মানুষমাত্রেই দেবতা। শোন—সত্য, সৌন্দর্য্য এবং প্রেমই ঈশ্বর।

"তুমি!" অরিন্দম অর্দ্ধস্ফুট কণ্ঠে উচ্চারণ করল।

ললিতা মাথা নাড়ল বলল, "হ্যাঁ, আমি। কিন্তু কোথায় ছিলে কাল সারারাত? আর কি আশ্চর্য, তুমি চুপি চুপি পালিয়ে গিয়েছিলে?"

"হ্যাঁ।"

"কিন্তু কেন? কেন?" ললিতার ওষ্ঠাধর কেঁপে উঠল, ভ্রূকুঞ্চিত হল, হরিণীর মত দুটো আয়ত চোখে তার উৎকণ্ঠা ঘনাল, সে বলল, "কাউকে বলে গেলে কি দোষের হত?"

অরিন্দমের মুখে মৃদু হাসি দেখা দিল, সে মৃদুকণ্ঠে বলল, "আমি তোমাকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করেছি—সত্যি, আমি দুঃখিত, আমি লজ্জিত।"

"এত বেলা হয়েছে—কারখানায় যাবে না?"

"না। আজ আমি বড় ক্লান্ত।"

"চান খাওয়া করবে না?"

"হ্যাঁ"—

"কিন্তু কখন? পাগলের মত ঘুরে বেড়ালেই কি মানুষের মঙ্গল হবে?"

অরিন্দম কথা বলল না, নিঃশব্দে সে ললিতার দিকে তাকিয়ে রইল। মাথার চুল আলুলায়িত হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে তার পিঠের ওপর, বুকের ওপর। এক জোড়া ধনুকের মত দুটো বাঁকা ভুঁরুর মাঝখানে রয়েছে রেখায়িত তিরস্কার। আর কী আশ্চর্য তার চোখ দুটো! যেন কোন সুদূর আনন্দলোকের রহস্যময় ছায়া সেখানে ঘন হয়ে উঠেছে।

রক্তপ্রবালের মত ঠোঁট, গর্বিত রাজহংসের মত গ্রীবাদেশ, দাড়িম্বফলের মত যুগল স্তন, সুগঠিত নিতম্বদেশ আর স্ফটিক স্তম্ভের মত দুটি উরু—কী আশ্চর্য সুন্দর ললিতা!

"আর আমি—আমার কথা কি তোমার মনে পড়ে না?" ললিতা প্রশ্ন করল, "আমার যে রাত্রে ঘুম আসে না তুমি বাইরে থাকলে"—

"কেন? আমার জন্য এত ভাবো কেন ললিতা?" মৃদুকণ্ঠে পাল্টা প্রশ্ন করল অরিন্দম।

ললিতা তাকাল অরিন্দমের দিকে, বলল, "জানিনা।"

কিন্তু তাই কি? ললিতার চাহনি, ললিতার সমস্ত দেহের ভঙ্গী, তার 'জানিনা' কথার ভেতরকার আবেগ কি কিছু জানাতে বাকী রাখল?

হাঁটু গেড়ে বসল অরিন্দম তার সামনে, বলল, "ললিতা"—

"কি?"

"তুমি সুন্দর"—

"মিষ্টি কথা বললেও আমি ভুলব না"—ললিতা হাসল।

"আমি তোমাকে ভালবাসি ললিতা"—

"তুমি!" ললিতার ঠোঁট কাঁপতে লাগল, চোখের দৃষ্টি স্তিমিত ও অলস হয়ে উঠল।

"আর শোন ললিতা"—

"কি?"

"আমি ঈশ্বরকে খুঁজে পেয়েছি"—

"কোথায়?" ললিতা'র কণ্ঠে কৌতূহল ধ্বনিত হল।

"আমার মধ্যে, তোমার মধ্যে—পৃথিবীর সর্বত্র। শোন—সত্য, সৌন্দর্য্য এবং প্রেমই ঈশ্বর"—

ললিতা অরিন্দমের হাত ধরল, বলল, "কিন্তু আমার ঈশ্বর তুমি"—

"কে?" ভেতর থেকে বলরাম বেরিয়ে এল। ললিতা অরিন্দমের হাত ছেড়ে সরে দাঁড়াল।

"কে ঈশ্বরের কথা বলছে?"

বলরামের দু'চোখে উদ্‌ভ্রান্ত, উন্মত্ত দৃষ্টি। সে এসে অরিন্দমের দিকে তাকাল, বলল, "ওঃ—তুমি"—

অরিন্দম মাথা নেড়ে বলল, "আজ্ঞে হ্যা, আমি—আমিই ঈশ্বরের কথা বলছিলাম"—

বলরাম হেসে উঠল।

"হাসছেন কেন?"

বলরাম ভুরু কুঁচকে চোখ ছোট করল, বলল, "হাসব না! যা নেই তা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছ তুমি?"

"কি নেই?"

"ঈশ্বর।"

"নেই!"

"না—এককালে ছিল—যখন আমি যুবক ছিলাম, যখন স্বপ্ন দেখাটাই আমার ধর্ম ছিল। দুঃখের সমুদ্রে ডুবতে ডুবতেও তখন ঈশ্বরকে দেখেছি। কিন্তু সে ঈশ্বর মারা গেছে অরিন্দম"—

অরিন্দম মাথা নাড়ল, "না, ঈশ্বরের মৃত্যু নেই।"

"তুমি মূর্খ। সাবধান—তোমার কপালে দুঃখ আছে"—

"বাবা!"

"চুপ্, কথা বলিস্ না। আমি একটু বাইরে যাই—বেড়িয়ে আসি। মড়ার গন্ধে ফুরফুরে বাতাস ভুর ভুর করছে—একটু হাওয়া খেয়ে আসি। আর আকাশ? আঃ—বেদনা-বিষে তা নীল, ঘননীল হয়ে আছে। যাই—আমি যাই"—

দুর্গাবতী দরজার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। স্বামীর গমনপথের দিকে ক্ষণকাল নিঃশব্দে তাকিয়ে থেকে সে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল, "ভগবান—তুমি রক্ষা করো"—

"কি হল মা?" ললিতা এগিয়ে এল কাছে।

"দেখলি না—তোর বাবার মাথা ক্রমে খারাপ হয়ে যাচ্ছে।"

নিঃশব্দতা নেমে এল বারান্দায়। কেউ কথা বলল না, কেউ কথা খুঁজে পেল না।

"মা—মাগো"—

ভেতর থেকে একটি বাচ্চার কান্না ভেসে এলো।

"খিদে পেয়েছে মা—ওমা"—

ক্ষুধার কান্না। অভাব আর অনাহারকে পৃথিবী কি ভাগ করে ভোগ করতে পারে না?

পদশব্দ।

মুকুন্দ এসেছে।

"এই যে অরিন্দম! কাজে যাবে না?"

"না। আর তুমি?"

মুকুন্দ মাথা নাড়ল, "আমার আজ বিকেল থেকে কাজ"—

"ওঃ"—

"খেতে দেতো ললিতা—এখুনি বেরোব"—ব্যস্তভাবে বলল মুকুন্দ, তারপর অরিন্দমের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, "কালরাতে আবার কোথায় উধাও হয়ে গেলে বলত?"

"ঈশ্বরের খোজে।"

মুকুন্দের চোখে কৌতুক ঝিক্‌মিক্ করে উঠল, সে বলল, "বটে! তা সেই ভদ্রলোককে কি খুঁজে পেলে?"

"পেলাম।"

"কোথায়? কোন উন্মাদাগারে?"

অরিন্দম হাসল না, গম্ভীরভাবে বলল, "ঠাট্টা নয়, আমি তাকে দেখেছি। সত্য, সৌন্দর্য এবং প্রেমই ঈশ্বর।"

"পুরোন কথা। ওকথা অনেকেই বলেছে অরিন্দম।"

"অনেকেই বলেছে!"

"হ্যাঁ—কিন্তু কোন ফল হয়নি তাতে।"

"আমি চেষ্টা করে দেখব।"

"ব্যর্থ হবে তোমার চেষ্টা।"

"কেন ?" অরিন্দম উত্তেজিত হয়ে উঠল, "কেন ?"

মুকুন্দ সেই উত্তেজনাকে লক্ষ্য করে হাসল, বলল, "কেন ? তাহলে আমার সঙ্গে এসো"—

ললিতা বাধা দিল, "আবার কোথায় যাচ্ছ তোমরা ?"

মুকুন্দ হাসল, "ঘাবড়াস্ না—আমরা এখুনি আসছি—তুই ভাত বেড়ে তৈরী হ। অরিন্দম"—

"চল"—

দুজনে বেরিয়ে গেল।

দুর্গাবতী বলল, "আবার বেরোল দু'জনে—দিনরাত শুধু পাগলের মত টোঁ টোঁ করে বেড়াচ্ছে ওরা। ভগবান, মানুষের দুঃখের দিন কি আর শেষ হবে না ?"

ললিতা কথা বলল না, মায়ের কথায় ফিরেও তাকাল না, নিঃশব্দে সে বাইরের দিকেই চেয়ে রইল।

পাশাপাশি তিন চারটে মন্দির সেখানে।

মুকুন্দ বলল, "দেখছ ! চারটে মন্দির চার রকমের"—

অরিন্দম মাথা নাড়ল, "হ্যাঁ—চার রকম মত। সবাই ওরা ঈশ্বরকেই খুঁজছে কিন্তু তা পায়নি বলেই চার রকমের মন্দির গড়েছে। কিন্তু মুকুন্দ, ঈশ্বর এক, তাই তার মন্দিরও একই রকমের।"

"তোমার মতই তাহলে একমাত্র সত্য ?"

"হ্যাঁ।"

"ভালো—এখুনি তার সত্যতা দেখা যাবে।"

এগোল তারা। একটা মন্দিরের চত্বরে গিয়ে দাঁড়াল।

সামনে একজন জটাধারী পুরোহিত বসে সুর করে একটা গ্রন্থ পাঠ করছিল, মুকুন্দ তাকে বলল, "পুরোহিত বাবা"—

"বল বেটা"—

"আমার এই বন্ধু ঈশ্বরকে দেখেছে"—

"বটে! কোথায়?" পুরোহিতের কণ্ঠে অবিশ্বাস ধ্বনিত হল।

অরিন্দম এক পা এগিয়ে গেল, বলল, "সত্য, সৌন্দর্য আর প্রেমই ঈশ্বর—মানুষই ঈশ্বর"—

পুরোহিত হেসে উঠল, "বটে! তুমি দেখেছ? মিথ্যে কথা—আমরা ছাড়া তো আর কেউ ঈশ্বরকে দেখতে পারে না।"

"আমি দেখেছি তাকে।"

অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল পুরোহিত।

"হাঃ হাঃ হাঃ"—

তার সে হাসি আর থামতেই চায় না। তার সেই হাসি শুনে চারটি মন্দির থেকে লোকেরা ছুটে এসে রাস্তায় দাঁড়াল।

"কি হয়েছে? কি হয়েছে? কি হয়েছে?" চারদিক থেকে প্রশ্ন উঠল।

একদল দাড়িওয়ালা লোক প্রশ্ন করল, "কি হয়েছে?"

আলখাল্লাধারী একদল প্রশ্ন করল, "কি হয়েছে?"

একদল মুণ্ডিতমস্তক প্রশ্ন করল, "কি হয়েছে?"

জটাধারী অরিন্দমের দিকে নির্দেশ করে চেঁচিয়ে বলল, "এই উন্মাদ বলছে যে মানুষই ঈশ্বর, সত্য, সৌন্দর্য্য আর প্রেমই ঈশ্বর"—

অরিন্দম মাথা নাড়ল, বলল, "হাঁ-আমি বলছি। তোমাদের মন্দির মানুষকে ঈশ্বর দেখাতে পারেনি বলেই আমি ঈশ্বরের পরিচয় জানাচ্ছি তোমাদের"—

দাড়িওয়ালাদের একজন বলল, "কিন্তু ঈশ্বরের কথা শুধু আমরাই জানি ছোকরা—ঈশ্বর নিরাকার—ঈশ্বর পুতুল নয়"—

জটাধারী গর্জে উঠল, "কেন? ঈশ্বর-বোধে পুতুলকেও পূজো করা যায়"—

দাড়িওয়ালা চেঁচিয়ে উঠল, "পৌত্তলিকতা—পৌত্তলিকতা—ছিঃ—"

একজন মুণ্ডিতমস্তক বলল, "কেন এই কলহ? সৎকর্মের দ্বারাই তো দুঃখের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়—তাইকি যথেষ্ট নয়? ঈশ্বর নিয়ে তোমাদের এত কৌতূহল কেন?"

দাড়িওয়ালা আবার চেঁচিয়ে উঠল, "নাস্তিক—নাস্তিক"—

জটাধারী বলল," তুমিও নাস্তিক"—

দাড়িওয়ালা গর্জে উঠল, "যা তা বলো না বিধর্মী—সাবধান"—

"খবরদার"—

"চোখ রাঙিয়ো না নাস্তিক, শোন একমাত্র আমি—আমরা দাড়িওয়ালারাই ঈশ্বরকে দেখেছি"—

"না তুমি তাকে দেখোনি"—

অরিন্দম চীৎকার করে বলল, "সত্য, সৌন্দর্য এবং প্রেমই ঈশ্বর —মানুষই ঈশ্বর—শোন"—

কেউ শুনল না সে কথা।

দাড়িওয়ালা বলল, "আমি ঈশ্বরকে দেখিনি! বটে! কাফের"—

"খবরদার বিধর্মী যবন—চুপ কর"—জটাধারীর চোখে আগুন খেলে গেল।

"আমিই তোকে ঈশ্বর দেখাব সয়তান, কারণ কাফেরকে ঈশ্বর দেখানোই আমার পবিত্র কর্তব্য।"

"তবেরে শালা"—

"তবেরে হারামীর বাচ্চা"—

কুৎসিৎ কোলাহলে চারদিক ভরে উঠল।

আলখাল্লাধারীদের একজন বলল, "ঝগড়া করো না—শোন, আমি

তোমাদের ঈশ্বরপুত্রের কথা বলছি—বলছি সে পরমপিতা পরমেশ্বরেরই কথা”—

কিন্তু ততক্ষণে ঝগড়া মারামারিতে পরিণত হয়েছে। জটাধারী দাড়িওয়ালার দাড়ি ধরেছে আর দাড়িওয়ালা জটাধারীর জটা ধরে টানাটানি করছে।

“খবরদার”—জটাধারীর দল হাঁকল।

“খবরদার”—দাড়িওয়ালারা গর্জাল।

দুইদলে মারামারি বাঁধল। কিল, চড়, ঘুষি, লাঠি, ছোরা। উন্মত্ত হিংস্রতা। রক্ত গড়াল মন্দিরের চত্বরে, রাস্তায়। চারদিকের বাড়ী থেকে আরো লোকেরা ছুটে এল।

“আমাদের ধর্ম বিপন্ন”—একদল বলল।

“আমাদের ধর্ম বিপন্ন”—আরেক দল বলল।

অরিন্দম চীৎকার করে উঠল, “কিন্তু তোমাদের আসল ধর্ম মনুষ্যত্ব —শোন কলহ থামাও—মানুষকে শ্রদ্ধা করাই মনুষ্যত্বের প্রথম পাঠ—”

কেউ শুনল না তার কথা। কেউ না। সবাই ঝাঁপিয়ে পড়ল সেই মারামারিতে। কুৎসিত ও অশ্রাব্য গালিগালাজে বাতাস মুখর হয়ে উঠল, আর্তনাদের তরঙ্গ চারদিকে প্রবাহিত হল।

“থামো—থামো”—অরিন্দম পাগলের মত চীৎকার করে উঠল।

জবাবে তীরের মত একটা ছোরা ছুটে এল তার দিকে। অরিন্দম বিদ্যুৎবেগে একপাশে সরে দাঁড়াল।

“ভাইসব—শোন”—মুকুন্দ বলতে চাইল, কিন্তু সে কথা শেষ করতে পারল না, কে যেন একটা লাঠি ছুঁড়ল তার দিকে। আত্মরক্ষার জন্য সেও একপাশে সরে দাঁড়াল।

আর্তনাদ। ইটপাটকেলের আওয়াজ। লাঠিতে লাঠিতে ঠোকা-ঠুকির শব্দ।

অরিন্দম শিউরে উঠল। পরস্পরকে খুন করছে সবাই।

শুধু হত্যা নয়। লুণ্ঠনও চলছে। রাস্তার পার্শ্ববর্তী দোকানপাট-গুলোকে সবাই লুট করছে।

"মারো, মারো, বিধর্মী নাশ করো"—

"মারো মারো, নাস্তিকদের ধ্বংস করো"—

শুধু লুণ্ঠনই নয়। বাড়ীতে বাড়ীতে আগুনও লাগাচ্ছে ওরা। লেলিহান অগ্নিশিখা আর পুঞ্জ পুঞ্জ উত্তপ্ত, কালো ধোঁয়া আকাশকে অশুচি করে তুলল।

অরিন্দম যেন জ্ঞান হারাল, সে আবার চীৎকার করে বলল, "শোন, মূর্খের দল শোন—মানুষ মানুষ ভাই ভাই"—

কেউ শুনল না তার কথা, কেউ থামল না। যেন মহারণ্যে বসে কাঁদছে সে। অন্ধ, উন্মত্ত মানুষের অরণ্যে।

শুধু আগুনই নয়। ভয়ার্ত নারীদের নিয়ে টানাটানি করতেও লাগল সেই সব জনতা। তাদের মুখে চোখে হিংসা আর কাম লালসার কুৎসিত, বীভৎস ছায়া।

দশজন দাড়িওয়ালা একটি সুন্দরী যুবতীকে টেনে নিয়ে গেল একটা বাড়ীর বারান্দায়। একজন যুবতীর পরিধেয় টান দিয়ে খুলে ফেলল, তারপর সেই নগ্ন, ভয়-বিহ্বলা নারীকে সে পাথরের ওপর ফেলে তার ওপর বলাৎকার শুরু করল। বাকী নয় জন হাসতে হাসতে ঘিরে দাঁড়াল তাদের। আর্তনাদ, অভিশাপ, অশ্রুর ধারা।

জটাধারীর দলের একজন কুদর্শন লোক বিরোধী পক্ষের একটি মেয়েকে দলের মধ্যে টেনে নিয়ে এল। মেয়েটি যৌবন সমৃদ্ধা, আশ্চর্য সুন্দরী। তার দুটি কালো চোখের তারায় আতঙ্ক।

"আয় ভাই, শালার যবন-কন্যাকে নিয়ে একটু মজা করি"—সেই কুদর্শন লোকটা ময়লা দাঁত মেলে হাসল। দলের সবাই, সমস্বরে সায় দিয়ে বলল, "হ্যা হ্যা, মাগীকে ন্যাংটো কর"—

অরিন্দম সামনের দিকে ছুটে গেল, "ভাইসব, শোন—হিংসায় উন্মত্ত

হয়ে তোমরা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করছ—শোন, শান্তিই ঈশ্বর"—

হঠাৎ বসে পড়ল সে। একটা ইট এসে কপালে লেগেছে। হাত দিয়ে ক্ষতমুখ সে চেপে ধরল, আঙুলের ফাঁক দিয়ে রক্ত চুঁয়ে চুঁয়ে পড়তে লাগল। রক্তের রং কী লাল! আর কি হল চারদিকে? মানুষ কি পুরোপুরি পশু হয়ে গেল!

মুকুন্দ তার হাত ধরে টানল, উত্তেজিতকণ্ঠে বলল, "শিগগীর এসো, নইলে মারা পড়বে"—

অরিন্দম মাথা নাড়ল, "না—এদের থামাতে হবে"—

"পাগ্‌লামো করোনা অরিন্দম"—

"আমিই যে এর জন্যে দায়ী"—

"কে বলছে যে তুমি দায়ী? তুমি কথা না তুললেও এই ঝগড়া হত, তোমার অনিচ্ছাকৃত অপরাধ আর কেউ স্বেচ্ছায় করত"—

"কি ভাবে?

"ধর্মের নাম করে"—

"ধর্ম কি?"

"যে নীতি অবলম্বন করে মানুষ ঈশ্বরকে লাভ করতে পারে—অর্থাৎ মানুষ হতে পারে"—

অরিন্দম হাসল, আর যে ধর্মের নাম করে ওরা পরস্পরকে হত্যা করছে তা?"

"তা অধর্ম—ওরা ঈশ্বরকে বাদ দিয়ে ধর্মপালন করে—ওদের কাছে ধর্ম একটা অহমিকা'র ব্যাপার—ব্যক্তিগত, জাতিগত অহমিকা। তাই ওরা ভাল না বেসে হিংসায় উন্মত্ত। ঈশ্বরকে পায়নি বলেই ওরা অত সহজে হত্যা করতে পারে।"

"কতদিন চলবে তা?"

"যতদিন মুষ্টিমেয় স্বার্থপরেরা পৃথিবী শাসন করবে—তারা যখন

নিজেদের আসন সম্বন্ধে সন্দিহান হয় তখনই তারা ধর্মের নাম করে জোট পাকায়। আবার এক ধর্মের লোকেরা শাসন করলে অপর ধর্মাবলম্বীরাও শাসন করতে চাইবে। ফলে অনন্তকালের সংঘাত"—

"তার মানে? এই উন্মত্ততা দূর করার কি আর কোন পথ নেই?" অরিন্দমের কণ্ঠে হতাশা ধ্বনিত হল।

"আছে—একটিমাত্র পথ—"

গুড়ুম্—গুড়ুম্—গুড়ুম্—

দুজনে চমকে উঠল। একদল আগ্নেয়াস্ত্রধারী নগর-রক্ষী এসে হাজির হয়েছে, উচ্ছৃঙ্খল জনতা ও দাঙ্গাকারীদের ওপর তারা অগ্নি-গোলক বর্ষণ করছে।

আর্তনাদ। কোলাহল।

ধর্মের নামে অন্ধ ও উন্মাদেরা এবার সম্বিৎ ফিরে পেয়েছে—চারদিকে পালাচ্ছে।

মুকুন্দ অরিন্দমের হাত ধরে টান দিল, "চল—পালাও—"

দু'জনে দৌড় দিল, থামল গিয়ে নিরাপদ এলাকায়।

মুকুন্দ ললাটের ঘাম মুছে বলল—"উঃ—বাঁচলাম—"

অরিন্দম একবার পেছন দিকে তাকাল। আর্তনাদ ও আগ্নেয়াস্ত্রের গর্জনধ্বনি এখনও ভেসে আসছে।

সে মুকুন্দের দিকে তাকাল, প্রশ্ন করল, "একটিমাত্র পথ—তা কি মুকুন্দ?"

"শিক্ষা। মানুষকে শিক্ষা দেওয়া যে মনুষ্যত্বই একমাত্র ধর্ম—ভগবান তার ব্যক্তিগত ব্যাপার। যে ভাবে ইচ্ছে সে ভগবানকে পেতে পারে, কিন্তু ধর্মের নাম করে সেই পথকে কারো ওপর চাপাবার অধিকার তার নেই। প্রত্যেকেই আমরা স্বাধীন কিন্তু প্রত্যেকের সঙ্গেই প্রত্যেকে জড়িত—প্রতিটি মানুষই মহৎ এবং মানুষই ঈশ্বর—এই শিক্ষাই ধর্মান্ধতাকে দূর করবে।"

"কিন্তু কে দেবে সে শিক্ষা ?"

"স্বার্থপরের সমাজে তা সম্ভব নয়। এখানে স্বার্থের জন্য ধর্মের নামে, মহাপুরুষদের নামে ভেদ সৃষ্টির উপযুক্ত শিক্ষাই দেওয়া হয় কিন্তু মানুষ হওয়ার শিক্ষা দেওয়া হয় না। আর মানুষ মানুষ না হলে সে ঈশ্বরের সন্ধান পাবার যোগ্য হয় না।"

"তবে ?"

"ভাঙো—এই প্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থাকে ধ্বংস করো—স্বার্থপরের, লোভীর শাসনকে দূর করো—মনুষ্যত্বহীন হিংসান্ধদের নিশ্চিহ্ন করো। যতদিন তা না হবে ততদিন মানুষ ঈশ্বরকে পাবে না—ঈশ্বরকে পাবার পথ আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেও সে তা দেখতে পাবে না।"

অরিন্দমের দু'চোখ জ্বলে উঠল, হাতের মুঠো শক্ত হল, দাঁতে দাঁত চেপে সে বলল, "তাহলে ভাঙো মুকুন্দ—ভাঙো ভাঙো—"

মুকুন্দ মাথা নাড়ল, "ভাঙবই তো। শোন, আজ রাতে মনিশঙ্করের ওখানে সঙ্ঘের সভা আছে। তুমিও যেয়ো—"

"যাব।"

বাড়ী ফিরতে ফিরতে অরিন্দম ভাবতে লাগল। হ্যাঁ, মুকুন্দর কথাই ঠিক। মানুষের মনের অন্ধকার দূর না হলে সে ঈশ্বরকে পাবে না। মন অবস্থার দাস। সত্যকে জানতে হলে একটা বিশেষ মানসিক অবস্থার দরকার। লোভ, হিংসা আর অসাম্যের মধ্যে সত্য চাপা পড়ে গেছে। ভাঙো—ভেঙে চুরমার করো—মানুষকে তার স্বরূপ দেখাও—

সন্ধ্যা হতেই অরিন্দম গিয়ে হাজির হয়েছিল মণিশঙ্করের ওখানে। মুকুন্দ আসতে পারেনি, সে কারখানায় গেছে।

একের পর এক নানা আলোচনা হল। দেশে অনাহার আর মৃত্যুর হার ক্রমেই বেড়ে চলেছে, জীবনের অনিশ্চয়তা প্রতিদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। সরকার উদাসীন, লোভী ধনিকের ও কারখানার মালিকেরা অন্ন, বস্ত্রও প্রাণধারণের উপযোগী সব কিছুই গুদামজাত করে কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করছে। ফলে জিনিষপত্রের দাম চড়ছে—ওপরে—আরো ওপরে। মানুষের ক্রয়-ক্ষমতার বাইরে চলে যাচ্ছে সব কিছু, মৃত্যুর রাজ্য প্রসার-লাভ করছে। নীচুপাড়ার লোকদের আবেদন ব্যর্থ হয়েছে। মালিক প্রভুরা তাদের দুঃখদুর্দশাকে চিরস্থায়ীই করতে চায়। সুতরাং আর বসে থাকলে চলবে না। আন্দোলনকে সুদৃঢ় করতে হবে। নীচুপাড়ার লোকদের সংঘবদ্ধ করতে হবে, তাদের বোঝাতে হবে, জাগাতে হবে, তৈরী করতে হবে। তারপর একদিন দল বেঁধে বেরুতে হবে তাদের—বাধা, কারাগার ও মৃত্যুর ভয়, নির্যাতন ও অপমানের শঙ্কা—সব কিছুকে জয় করে তাদের এগোতে হবে, নিজেদের দাবী জানাতে হবে, নিজেদের প্রাপ্য আদায় করতে হবে। রাজী?

নিঃশব্দে হাত তুলে সমর্থন জানাল।

কর্মীদের নামের ফর্দ তৈরী হল।

ইন্দ্র ছিল সেখানে, কাছে এসে অরিন্দমের কানে কানে বলল, "তোমাকেও কর্মী হিসাবে মনোনয়ন করা হয়েছে অরিন্দম—"

"আমাকে!"

"হ্যাঁ—তুমি কি চাওনা?"

"চাই—নিশ্চয়ই চাই ইন্দ্র—"

"বেশ—তবে কাল থেকে লেগে যাও কাজে—"

কাজ শুরু হল।

ঘুম থেকে উঠেই অরিন্দম বেরিয়ে যায়। প্রতিদিন।

নীচুপাড়ার আঁকাবাঁকা গলির মাঝখানে—পুরোন ইটের বাড়ী, আটচালা, টিন আর টালির ছাউনি দেওয়া অসংখ্য বাড়ী। প্রত্যেক বাড়ীতে যায় অরিন্দম। নীচুপাড়ার পূবে, পশ্চিমে, উত্তরে, দক্ষিণে—সর্বত্র।

প্রথম প্রথম মাথা নাড়ে সবাই, বলে, "ওসবের ধার ধারিনা আমরা—শেষে রাজরোষে মারা যাব নাকি?"

কেউ কেউ বলে, "বড় বড় কথা বলোনা ভাই—অদৃষ্টে সুখ নেই তো হবে কি?"

অরিন্দম তাদের বোঝায়, বুঝিয়ে বুঝিয়ে তাদের সচেতন করে, তাদের জয় করে।

ফ্যাক্টরীর ভেঁপু বাতাসে ভাসে। তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরে নাকেমুখে ভাত গুঁজেই সে কারখানার দিকে পা চালায়। যাবার আগে ললিতার দিকে একবার তাকায়। ললিতার দু'চোখে প্রসন্নতা আর ভালবাসা। তার হৃদয় ভরে ওঠে। হাঁ, সে সংগ্রাম সুরু করেছে।

সারাদিনের হাড়-ভাঙ্গা খাটুনীর পরও তার আগ্রহ একতিল কমেনা। কর্মাবসানের বাঁশী বাজলেই সে বাইরে বেরোয়। তখন দিনাবসানের রক্তিম ঘোষণা আকাশের গায়ে মেঘের অক্ষরে লিখিত হয়। সেদিকে তার খেয়াল থাকে না। বড় বড় পা ফেলে সে নীচুপাড়ার সংকীর্ণ গলির বুকে পা দেয়।

অপরিচ্ছন্ন আবহাওয়ার মাঝে সে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। পচা জল, মশা মাছি, ইঁদুর আর আবর্জনায় ভরা নীচুপাড়ার মানুষদের কাছে গিয়ে সে সংগ্রামের ঘোষণা জানায়। জাগো, মুক্তির দিন, মানুষ হবার দিন ঐ সমাগত।

ধীরে ধীরে সাড়া জাগে। মৃত আগ্নেয়গিরির বুকে আগুন জ্বলে, টগবগানি সুরু হয়। কোটরগত চোখের মাঝে আগ্নেয়গিরির জ্বলন্ত মুখকে দেখা যায়। লোভ লালসা, অজ্ঞতা আর কুসংস্কারের মাঝে

মনুষ্যত্বের মহৎ প্রতিজ্ঞা ঘোষিত হয়, পঙ্কের মাঝে পদ্ম জন্মায়। মুষ্টিবদ্ধ হাত তুলে সবাই জানায় যে তারা তৈরী। ভেঙ্গে ফেলো, জীবনের চারদিকে যে লোহার দেয়াল আলো, বাতাস আর আকাশকে আড়াল করেছে তাকে ভেঙ্গে চুরমার করো।

কবে ?

সংগ্রাম-ঘোষণার দিন স্থির করার জন্য সভা আহুত হয়। নীচুপাড়ার চারা দিক থেকে নেতারা ও কর্মীরা আসে, সবার মাঝে মণিশঙ্কর।

দিন স্থির হয়। আর দু'দিন পরে।

কি ভাবে ?

উত্তর পাড়ার নেতা বলল, "উত্তর দিক থেকে অগ্রসর হব আমরা—"

মণিশঙ্কর বলল: "অত ঘুরে যাবার দরকারটা কি ? নীচুপাড়ার মাঝখানে জড় হব আমরা তারপর সোজা রাস্তা ধরে এগোব—"

পূবপাড়ার নেতা অবজ্ঞাসূচক হেসে মাথা নাড়ল, বলল, "উঁহু— আমার মতে তা ঠিক হবে না দাদা—পূবদিকের গিরিপথ দিয়ে এগোনই উচিত—"

দক্ষিণপাড়ার নেতা বলল, "কেন ? দক্ষিণদিক দিয়ে গেলে কি হবে ?"

পশ্চিমপাড়ার নেতা অসহিষ্ণুভাবে চেঁচিয়ে উঠল, "অর্থহীন প্রলাপ বকছ কেন ? পশ্চিম দিক দিয়ে এগোলে কি ক্ষতিটা হবে ?"

মণিশঙ্করের মুখ অন্ধকার হয়ে গেল, "তাহলে কি স্থির করছ তোমরা তাই বল—"

"উত্তরে—"

"দক্ষিণে—"

"পূবে—"

"পশ্চিমে—"

"না—"

"হ্যাঁ—"

"তা হতে পারে না—"

"আলবৎ হবে—"

চারদিকের নেতা ও কর্মীদের মধ্যে ঝগড়া বেঁধে গেল। ছেলেমানুষের মত সবাই চেঁচামেচি সুরু করল।

মণিশঙ্কর উত্তেজিত হয়ে উঠল, "শোন, তোমরা স্বার্থপরের মত আত্ম-প্রাধান্য জাহির করার চেষ্টা করো না। মানুষের মঙ্গল করতে গেলে নিজেদের কথা ভুলতে হয়—"

চারদিকে প্রতিবাদ ধ্বনিত হল।

"এ অন্যায়—"

"আমরা কেউ নিজেদের কথা ভাবিনি—"

"আমিও না—আমাদের মতে উত্তর দিকই নিরাপদ পথ—"

"কেন পূব দিক দিয়ে কি তোমরা যাবে না?"

"না।"

"পশ্চিমে?"

"না?"

"দক্ষিণে?"

"না—"

মনিশঙ্কর বলল, "তাহলে কি করবে তোমরা স্থির করো।"

উত্তর দিক বলল, "আপনার কথা আমরা মানতে রাজী আছি—কিন্তু উত্তর দিক দিয়ে আপনি চলুন"—

দক্ষিণ প্রতিবাদ জানাল।

পূব পশ্চিমের প্রতিবাদও ধ্বনিত হল। উত্তেজনায় সবার চোখ জ্বলতে লাগল।

মনিশঙ্কর হতাশভাবে তাকাল তাদের দিকে, প্রশ্ন করল, "তাহলে ?"

চারদিকের নেতারা বলল, "ব্যাপারটা একটু পেছিয়ে দিন দাদা—আমরা আপনার কথা ভেবে দেখি।"

"কিন্তু বিপ্লবের মাহেন্দ্রক্ষণ কি তোমাদের জন্য বসে থাকবে ?"

কেউ জবাব দিল না। সভা ভঙ্গ হল।

একে একে বিদায় নিল সবাই। শুধু কয়েকজন রইল। যারা মনিশঙ্করের একান্ত অনুগত। অরিন্দমও রইল।

মনিশঙ্কর বিষণ্ণ হেসে বলল, "ওরা ভয় পেয়েছে। অহমিকায় আচ্ছন্ন হয়ে ওরা সত্যিকারের পথকে অগ্রাহ্য করছে"—

অরিন্দম প্রশ্ন করল, "তাহলে কি হবে ?"

"নীচুপাড়ার লোকদের মত জিজ্ঞেস করো—তারা কি আমাদের পথ দিয়ে এগোবে ?"

আবার কাজ শুরু হল। প্রতি ঘরে ঘরে।

কিন্তু না। কেউ সাহস পাচ্ছে না। উত্তর, দক্ষিণ আর পূব পশ্চিমের নেতারা তাদের বিভ্রান্ত করেছে। তারা ভাবছে যে নেতারাই যখন মতদ্বৈধতায় বিব্রত তখন সংগ্রাম করে কি ফল হবে ? উত্তেজনায় বুক তাদের জ্বলে যাচ্ছে, কিন্তু কোন পথ ঠিক তা তারা বুঝতে পারছে না। অদৃষ্ট, দুঃখভোগ করাই তাদের বিধিলিপি।

শুনে মনিশঙ্কর দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়াল, বলল, "লোকেরা এখনো তৈরী হয়নি অরিন্দম। আবার কাজ শুরু করো ভাই, আবার আগুন ছড়াও। যখন ওরা তৈরী হবে তখন উত্তর দক্ষিণ আর পূবপশ্চিম ওদের পথভ্রান্ত করতে পারবে না। তখন ওরা নেতাদের জন্য বসে থাকবে না।"

"তাহলে কি"—

মনিশঙ্কর মাথা নাড়ল, "হ্যাঁ, এখন নয়, প্রত্যক্ষ সংগ্রামের দিন আরো পিছিয়ে গেল। উপায় নেই অরিন্দম—কাকে নিয়ে সংগ্রাম করবে তুমি? একজন সৈনিক কি যুদ্ধ-জয় করতে পারে? হতাশ হয়োনা ভাই, আগুন ছড়িয়ে যাও,—সবাইকে সাহসী করে তোল—আমাদের মনস্কামনা পূর্ণ হবে।"

অরিন্দমের ললাট রেখাম্বিত হয়ে উঠল।

রাত্রে ঘুম এল না অরিন্দমের। মনিশঙ্কর হতাশ না হতে বলেছে, কিন্তু তবু তার মন দমে গেল। সবাইকে সাহসী করতে হবে, সচেতন করতে হবে! কিন্তু কবে, কবে তৈরী হবে সবাই? স্বার্থপরতায় অন্ধ হয়েছে কাঙাল নেতারা তাই মানুষের ভাগ্য নিয়ে আজবনগরের শাসকদের মত তারাও এপথ আর সেপথের নাম করে কলহে মত্ত হয়েছে। তাহলে কি হবে? কবে?

রাত গভীর হয়। নীচুপাড়ার অন্ধকার গলিতে ইঁদুর আর ছুঁচোদের চলাচল সুরু হয়, কুকুরেরা ভয় পেয়ে কাঁদে। অরিন্দম ভাবে। তার প্রতিজ্ঞা কি পূরিত হবে না? পৃথিবী থেকে পাপশক্তিকে সে কি দূর করতে পারবে না?

ভয় হয় তার। ক্ষীণভাবে মনে পড়ে তার। বহুদূরের এক মণিময় কক্ষে সে থাকত। পুতুলদের ক্লান্তিকর আনন্দময় রাজ্যে। হঠাৎ সে মানুষ হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতির কি খেয়াল হবে কে জানে! হঠাৎ একদিন অতর্কিতে সে যদি আবার পুতুল হয়ে যায়? নিশ্চয়তা কোথায়? তাহলে? তার এই মানুষের জীবন কি ব্যর্থ হবে, নিষ্ফল হবে?

না। তা হতে পারে না, সে হার মানবে না, সে অপেক্ষা করবে না। পৃথিবীকে সে পাপমুক্ত করবেই, অমানুষ আর পশুদের সে নিশ্চিহ্ন করবেই করবে।

রাত কেটে গেল। ভোর হল। বাড়ী থেকে বেরোল না

অরিন্দম, অশান্ত হৃদয়ে অনির্দিষ্টভাবে ঘুরে বেড়াল। মৃত্যু, ব্যাধি, অভাব আর অজ্ঞতা চারদিকে। চারদিকে শুধু বিষ।

ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ তার মাথায় বুদ্ধি এল। আজবনগরের শাসকেরা শক্তিমান। শক্তিমান। শক্তিমান বলেই তারা শাসন করে। ইচ্ছে করলে, লোভ ও হিংসাকে বর্জন করলে তারা নিশ্চয়ই মানুষের দুঃখ দূর করতে পারত, কিন্তু তা করেনি। ক্ষমতালোভে তারা অন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু সে যদি ঐ শক্তিমানদের কেউ হত তাহলে সে একবার চেষ্টা করত তাদের অন্তরের পরিবর্তন করতে।

অরিন্দম ভেবে উত্তেজিত হয়ে উঠল। শক্তিমান কি হওয়া যায় না? তাহলে হয়ত অতি দ্রুত ফল ফলত, রাতারাতি মানুষের ভাগ্য বদলে যেত, তাদের দুর্ভাগ্য দূর হত। কিভাবে, কি করে শক্তিমান হওয়া যায়?

ভাবতে ভাবতে মনস্থির করে ফেলল অরিন্দম। তাকে শক্তিমান হতেই হবে। তার আর ধৈর্য নেই, সময় নেই। আর ক'দিন কে কে জানে—তার এই ক্ষণস্থায়ী মানুষের জীবনকে সে সার্থক ও গৌরবান্বিত করে তুলবে, পৃথিবীর সমস্ত পাপকে সে ধ্বংস করবে, মানুষের দুঃখকে সে দূর করবে।

কিন্তু কি করে শক্তিমান হওয়া যায়? কি করে?

ফ্যাক্টরীতে সে সবাইকে জিজ্ঞেস করল, "কি করে শক্তিমান হওয়া যায়, তোমরা জানো।"

মাথা নাড়ল সবাই। কেউ জানে না।

সন্ধ্যেবেলায় বাড়ী ফিরল অরিন্দম।

পায়ের শব্দ পেয়ে ললিতা ছুটে এল ঘরে। তার দু'চোখে ভালবাসার স্নিগ্ধ আলো।

"ইস, মুখ চোখ যে ভারী শুকনো দেখছি"—

"হুঁ"—

"হাতমুখ ধোও"—

"হুঁ"—

"শরীরের দিকে একটু নজর দিও। দেহপাত করলে মানুষের দুঃখ দূর করবে কি করে?"

"ললিতা"—

"কি?"

"শোন"—

"কি?" ললিতা দু'পা কাছে এগিয়ে এল, তার আশ্চর্য চোখের দৃষ্টি মেলে বিচিত্র ভঙ্গীতে তাকাল।

অরিন্দম প্রশ্ন করল, "কি করে শক্তিমান হওয়া যায় তা কি তুমি জানো ললিতা?"

মুহূর্তে ললিতার চোখের দৃষ্টি কঠিন হয়ে উঠল, মুখের প্রসন্নতা তার দূর হয়ে গেল: ভীরুকণ্ঠে সে প্রশ্ন করল, "কেন? তুমি কি শক্তিমান হতে চাও?"

"হ্যাঁ।"

"কেন?"

"আমার আর ধৈর্য নেই ললিতা, আমি আর সহ্য করতে পারছি না"—

"শক্তিমান হলেই কি তুমি মানুষের দুঃখ দূর করতে পারবে?"

"পারব।"

ললিতা বিষন্নভাবে মাথা নাড়ল, "শক্তি মানুষকে অন্ধ করে—তুমি শক্তিমান হতে চেয়োনা!"

"কিন্তু ললিতা"—

"তাছাড়া আমি তো জানিনা কি করে শক্তিমান হতে হয়।"

"জানোনা?"

"না। শোন"—

"কি ?"

"তোমার কথা শুনে আমার ভয় করছে।"

অরিন্দম ললিতার একটা হাত টেনে নিল, মৃদু হেসে বলল, "তোমার ভয় করছে! তাহলে থাক্, আর এসব কথা আমি বলব না।"

"না, বলোনা। তুমি যা করছ তা কি কম? তাতেই আমার বুক ভরে উঠেছে। শক্তিমান হলে মানুষ মানুষের কথা ভুলে যায়—তুমি তা হয়োনা, আমার বুক ভেঙ্গে যাবে। তুমি তা হলে আমি তোমার কাছ থেকে দূরে সরে যাব"—

অরিন্দম কথা বলল না। নিঃশব্দে শুধু হাসল!

কিছুক্ষণ বাদে মুকুন্দ এল।

সহাস্যে সে বলল, "কি ভাবছ হে? ভেবে ভেবেই সমাজ-সেবা করছ নাকি?"

অরিন্দম মাথা নাড়ল, গম্ভীরকণ্ঠে বলল, "আচ্ছা মুকুন্দ"—

"কি ?"

"কি করে শক্তিমান হওয়া যায় তুমি জানো?"

"না। তা শুধু শক্তিমানেরাই জানে।"

"আচ্ছা, শক্তিমান হলে কি মানুষের দুঃখ দূর করা যায় না?"

মুকুন্দ হাসল তার দিকে তাকিয়ে, "বসে বসে এই সব উদ্ভট চিন্তা করছ? শক্তিমান হলেই যদি মানুষের দুঃখ দূর করা যেত তাহলে তো অনেক আগেই সমস্যা মিটে যেত।"

"কেন ?"

"কারণ শক্তিমানেরা তো সংখ্যায় কম নেই পৃথিবীতে।"

"তারা হয়ত পারে না—কিন্তু আমরা শক্তিমান হলে হয়ত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে।"

মুকুন্দ জোর গলায় বলল, "না। তা হয় না। শক্তি মানুষের মনে

বিকার সৃষ্টি করে—সেই বিকার তাকে আত্মকেন্দ্রিক ও স্বার্থপর করে তোলে।"

"কিন্তু"—

"শোন অরিন্দম, মনের মধ্যে ওসব পাপচিন্তার স্থান দিয়ো না, আমি তোমাকে ক্ষমা করব না। তাছাড়া ফাঁকি দিয়ে মানুষের ভালো করা যায় না। মানুষের ভালো করার পথ একটিই আছে আর সবাই এক জোট না হলে কিছুই হবে না—একা কেউ কিছু করতে পারে না।"

"কিন্তু তাতে যে অনেক সময় লাগবে।"

"লাগুক, কিন্তু সেই ধ্রুব পথ। এতদিনের দুঃখদুর্দশা কি এক মুহূর্তেই দূর হবে? প্রকৃতির নিয়ম লক্ষ্য করোনি? ধ্বংস হয় এক মুহূর্তে কিন্তু সৃষ্টি হতে সময় লাগে।"

অরিন্দম আর কথা খুঁজে পেল না। ঘরের মধ্যে নিঃশব্দতা নেমে এল। না, এরা বলবে না। এরা দুঃখবিলাসী, তাই দুঃখ সহ্য করতেই ভালবাসে। সে একা, একা।

"কে? ঘরে কে?"

অরিন্দম চমকে উঠল। ঘরের ভেতর ঢুকল বলরাম। কিন্তু একি চেহারা হয়েছে বলরামের? কাঁচাপাকা চুলগুলো তার ফেঁপে ফুলে উঠেছে, বলিজর্জর ললাট আর মুখে চিন্তা আর ক্লেশের ছাপ, দু'চোখের তারায় উন্মাদের চঞ্চল ও লক্ষ্যহীন দৃষ্টি।

"কে? কে ওখানে?" ভুরু কুঁচকে কাছে এগিয়ে এল বলরাম, ঘাড় কাৎ করে অরিন্দমের দিকে তাকাতে লাগল।

কি হয়েছে বলরামের? মস্তিষ্কের মত তার দৃষ্টিও কি দুর্বল হয়ে পড়েছে?

অরিন্দম অস্বস্তিবোধ করে নড়ে বসল, বলল, "আমি—অরিন্দম"—

যেন অতল জল থেকে ভেসে উঠল বলরাম, যেন তার চেতনা কোন এক আদিম অন্ধকার পৃথিবী থেকে ফিরে এল, মাথা নেড়ে সে বলল,

"ওঃ, তাই বলো"—ঘুরে দাঁড়াল সে, ঘুরতেই মুকুন্দকে দেখে আবার ঘাড় কাৎ করে ছেলের দিকে এগোতে লাগল সে, চাপাগলায় প্রশ্ন করল, "কে? তুমি কে?"

"মুকুন্দ! ওঃ—তাই—তাই বলো"—

মুকুন্দ মুখ ফিরিয়ে জবাব দিল, "আমি—মুকুন্দ"—

বিড়বিড় করতে করতে সে দরজার দিকে দু'পা এগোতেই আবার থামল, মুকুন্দ ও অরিন্দমের দিকে তাকিয়ে ফিস্‌ফিস্ করে প্রশ্ন করল, "আচ্ছা শোন, তোমরা রসাতল চেন—রসাতল?"

অরিন্দম মাথা নাড়ল, "না।"

"চেন না!" স্থবিরের কণ্ঠে উত্তেজনা গম্‌গম্ করে উঠল, "রসাতলের কথা শোননি তোমরা!"

যেন কোন মূল্যবান গোপন কথা বলছে সে এমনি ভঙ্গী করে বলরাম আবার বলল, "দূত এসেছিল—রসাতলে যাবার নেমন্তন্ন জানিয়ে গেছে। যাবে তোমরা?"

নিঃশব্দতা। কি জবাব দেবে তারা?

বলরাম দুজনের দিকে তাকিয়ে কি যেন আওড়াল নিজের মনে, তারপর বলল, "সাবধান, খুব সাবধানে থেকো—স্বপ্ন দেখো না, আশা করো না, বিশ্বাস করো না"—

বলতে বলতে থামল সে, ক্লান্ত, শীর্ণ হাসিতে তার মুখ ভরে গেল, ভাঙ্গা গালের চামড়া কুঁচকে গেল। হাসতে হাসতে মাথার কাঁচাপাকা চুলে হাত বুলোতে বুলোতে সে ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হল।

নিঃশব্দতা।

গভীর নিঃশব্দতা।

হঠাৎ মুকুন্দ উঠে দাঁড়াল, ঘরের মধ্যে অস্থিরভাবে পাদচারণ সুরু করল। কিন্তু দুবার চলাফেরা করেই সে থামল, দুলতে লাগল।

তারপর সে ঘুরে দাঁড়াল। অরিন্দম দেখল যে মুকুন্দের চোখে জলের ছায়া।

মুকুন্দ হাসল, গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে বলল, "বাবা পাগল হয়ে গেছে অরিন্দম"—

অরিন্দম বাধা দিল, "না মুকুন্দ—না"—

মুকুন্দ মাথা নাড়ল, তিক্ত হেসে বলল, "আমি এত দুর্বল হইনি অরিন্দম যে তুমি আমাকে প্রবোধ দেবে। হাঁ, বাবা পাগল হয়ে গেছে। কেনইবা হবে না? সারাজীবন ধরেই কি মানুষ বঞ্চনা সহ্য করতে পারে?"

নিঃশব্দতা।

বাইরে রাতের নদ' গভীর হচ্ছে।

মুকুন্দ মুষ্টিবদ্ধ হাত তুলে শূণ্যের মধ্যেই একটা আঘাত করল, যেন তার মনের দুর্বলতা, তার এই ক্ষনিক আত্মাবিস্মৃকে ঘুষি মেরে সরিয়ে দিল। কি হবে ভেবে? দুচোখ তার জলে উঠল।

"অরিন্দম"—

"কি?"—

"একটা টাকা ধার দেবে?"

"দেব—কি করবে?"

"একটু মদ খেয়ে আসি—বিষ না হলে বিষক্ষয় হবে না।"

পকেট হাৎড়ে একটা টাকা বের করল অরিন্দম। সেটা ছোঁ মেরে নিয়ে মুকুন্দ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ধীরে ধীরে তার জুতোর শব্দ গলির মধ্যে মিলিয়ে গেল।

একা।

রাত বাড়তে থাকে।

কি বলল ললিতা? কি বলল মুকুন্দ? প্রায় একই কথা। শক্তি মানুষকে অন্ধ করে, শক্তি বিকারের সৃষ্টি করে। কিন্তু তাই কি? এখন

রাতের কোন প্রহর? রূপসী নদীর জলে কি তারাদের ছায়া কাঁপছে?

প্রদীপের শিখাটা কাঁপছে। দেয়ালের গায়ে একটা টিকটিকি হাঁটছে। সেই মণিময় হর্ম্যে কি এখন বাহারের আলাপ চলছে? বাতাস বইছে। বাতাসে নর্দমার পচা জলের গন্ধ আর মৃদঙ্গের ধ্বনি। কে নাচে? সেই সুতনু নর্তক না সেই স্বর্ণকেশী নর্তকী? কি বলল ওরা? শক্তি বিকারের সৃষ্টি করে। তার অর্থ বিকার সৃষ্ট না হলে শক্তি দিয়ে কাজ হবে। হ্যাঁ, তাকে শক্তিমান হতে হবে। অভিজ্ঞতার পথ দিয়ে সে যাচাই করবে তাদের কথা, যাচাই করবে নিজেকে। দোষ কোথায়? কেন এই গোঁড়ামী? সোজা পথে না গিয়ে বাঁকা পথে গেলেই বা কি? না, সে আর সহ্য করবে না। প্রকৃতি দুর্জ্ঞেয়, কখন কি অঘটন ঘটবে কে জানে! দুর্লভ মানুষের জীবনকে পেয়ে সে বসে থাকতে পারে না। দুঃখীরা সংঘবদ্ধ হোক্—তাতে সময় লাগবে। কিন্তু তার আগে সে যদি পরিবর্তন ঘটাতে পারে? কিন্তু কি করে, কি করে শক্তিমান হওয়া যায়?

নাঃ, ঘরে দম আটকে আসছে। অরিন্দম উঠল। রাত বেশী হয়নি, এখনো বাইরে যাওয়া যেতে পারে। কি করে শক্তিমান হওয়া যায়? কি করে?

পথ বড় না লক্ষ্যস্থল বড়? সাধনা বড় না সিদ্ধি বড়? চলতে চলতে নিজেকে নিজেই প্রশ্ন করে অরিন্দম। কিন্তু না, আর দ্বিধা নয়, দ্বন্দ্ব নয়, তাকে শক্তিমান হতেই হবে। চিত্ত শান্ত হোক, ইস্পাত-কঠিন হোক তার মন, তার জয় হবেই হবে।

চলতে চলতে ভাবতে লাগল সে। শক্তিমানেরা শাসন করে, দেশকে পরিচালিত করে। আজবনগরের শাসকেরাও শক্তিমান।

কিন্তু কিসে তাদের শক্তি? আন্তরিকতা, আদর্শ-নিষ্ঠা, মহত্ব, আত্মত্যাগ? উঁহু, তা তো নেই তাদের। তবে? নিষ্ঠুরতা, হিংসা, লোভ, লালসা। কিন্তু শক্তি না হলে তা কি করে টিঁকে থাকে? তাহলে কি?

হঠাৎ যেন তার স্তম্ভিত চেতনায় বুদ্ধির বিদ্যুৎ খেলে গেল। সে যেন বুঝতে পারল। আজবনগরের কর্তারা, চতুরলাল, পুণ্ডরীক, ত্রিদিববাবু—কিসের জোরে তারা শক্তিমান? শুধু একটি বস্তুর জন্য। টাকা। যার যত টাকা সে তত বেশী শক্তিমান। হ্যাঁ, ধনবান হলেই শক্তিমান হওয়া যায়। কিন্তু কি মুস্কিল! একটা জট ছাড়াতেই যে আর একটা জট এসে দাঁড়াল সামনে! আর একটা নূতন প্রশ্ন—কি করে ধনবান হওয়া যায়? কি করে?

না, সে ফিরবে না এখন। প্রশ্নের জবাব চাই তার।

অরিন্দম এগিয়ে চলল।

গলি। গলির পর গলি। আবার গলি।

বিবর্ণ বাষ্পলোকের ভৌতিক জ্যোতির পর অন্ধকার। তারপর আবার আলো।

ভিজে ভিজে, ঠাণ্ডা গন্ধ। দুর্গন্ধ।

রাস্তার পাশে, বাড়ীর বারান্দায়, নিরাশ্রয় ভিক্ষুকদের বেপরোয়া ঘুম।

এখানে ওখানে কুকুরের জলন্ত চোখ। বেড়ালের ডাক। টুকরো টুকরো কথা আর হাসি আর কান্না।

ক্লান্ত, নিরানন্দ মানুষদের ছন্দোহীন পদক্ষেপ

নীচুপাড়া আর উঁচুপাড়ার সীমান্তে গিয়ে পৌঁছোল সে। দূর থেকে উঁচুপাড়ার গগনস্পর্শী সৌধাবলীর আলোকিত কক্ষগুলোকে যেন দীপমালার মত মনে হচ্ছে। উঁচুপাড়ার আলো উঁচুপাড়ার আকাশকেও আলোকিত করেছে। ওখানে এখন নাচগান আর হাসির ফোয়ারা।

তোমার পতন হবে, হে মদগর্বী উঁচুপাড়া, তোমার সৌধাবলী একদিন ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়বে—এই ইতিহাসের সত্য।

হঠাৎ অরিন্দম থামল। তার সামনে, রাস্তার মাঝখানে একজন সুবেশ ও সুদর্শন যুবক শুয়ে আছে। সে বুঝল যে যুবকটি আকণ্ঠ মদ্যপান করেছে। কিন্তু কি বিপজ্জনক ভাবে সে রাস্তার মাঝখানে শুয়ে আছে! যে কোন মুহূর্তে সে গাড়ীচাপা পড়তে পারে।

রাস্তায় লোকচলাচল আছে বটে কিন্তু কেউ যুবকটির দিকে ফিরেও তাকাচ্ছে না।

অরিন্দম একজনকে থামিয়ে বলল, "এই ভদ্রলোককে একটু ধরুন না ভাই, রাস্তার একপাশে সরিয়ে দিই—"

লোকটি যুবকটির দিকে তাকিয়ে বলল, "ব্যাটা মদ খেয়েছে—"

"হ্যাঁ—"

"মরুকগে ছাই—তুমিও যেমন—"

হনহন করে লোকটি এগিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে দূরে একটা বাষ্পযানকে সবেগে আসতে দেখা গেল। একাই সরাতে হবে। অরিন্দম যুবকটিকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে একটা বাড়ীর বারান্দায় নামাল।

ঝাঁকুনীর চোটে লোকটার নেশার আমেজ বোধ হয় একটু নাড়া খেল, চোখ দুটো ঈষৎ মেলে সে জড়িতকণ্ঠে বলল, "তুমি কে বাওয়া!"

অরিন্দম বলল, "আমি—আমি আপনাকে রাস্তা থেকে তুলে নিয়ে এলাম—"

যুবকটি একটু জিভ বার করে ঠোঁট দুটো ভিজিয়ে নিয়ে বলল, "কেন বাওয়া?"

"আপনি রাস্তার মাঝখানে শুয়ে ছিলেন—আর একটু হলেই গাড়ীচাপা পড়তেন—"

মাতাল যুবক চোখ দুটো বড় করে কাতরকণ্ঠে বলল, "সত্যি? মাইরি? চাপা পড়িনি তো?"

"না।"

"তুমি আমাকে বাঁচিয়েছ! ধন্যবাদ—তোমার উপকারের কথা আমার চিরকাল মনে থাকবে—"

"না না ও কিছু না—এতো আমার কর্তব্য।"

যুবক ঠোঁট উলটোয়, "ধ্যেৎ—কর্তব্য না হাতী। তুমি আমাকে বাঁচিয়েছ—ইস্, গাড়ীচাপা হলে এতক্ষণ হয়তো অক্কা পেয়েই যেতাম। বল ভাই, কি চাই তোমার? টাকা?"

অরিন্দম মাথা নেড়ে জানাল—না। যুবকটির দিকে সে তাকাল। তার বেশভূষায় ঐশ্বর্যের ছাপ সুপরিস্ফুট।

যুবক বলল, "বাঃ, না কেন? তোমায় নিতেই হবে টাকা। টাকা না নিলে আর কিছু নিতে হবে। কি চাই তোমার, বল?"

অরিন্দম তীক্ষ্ণদৃষ্টি মেলে তাকাল যুবকটির দিকে, বলল, "আমি যা চাইব তাই দেবেন আপনি?"

"আলবৎ—"

"তাহলে টাকার বদলে অন্য কিছু চাই।"

"কি?"

"একটা কথা জানতে চাই—"

"বলে ফেলো ভাই—চটপট—"

"শক্তিমান কি করে হওয়া যায় বলুন তো? ধনবান হলে?"

যুবকটি টলতে টলতে উঠে বসল, ভুঁরু কুঁচকে আসবারুণ চোখ দুটোকে ছোট করে সে বলল, "কেন বাওয়া? এসব তত্ত্বকথা আবার কেন?"

"বলুন না—"

"বলব আবার কি? তুমি ঠিকই ধরেছ।"

অরিন্দম যুবকটির কাছে ঘেঁষে ব্যগ্রকণ্ঠে প্রশ্ন করল, "তাহলে আসল কথাটির জবাব দিন এবার—ধনবান কি করে হওয়া যায়?"

যুবকটি একমুহূর্তে গম্ভীর হয়ে গেল, "ব্যাপার কি বাওয়া, তুমি যে আমার নেশা ভাগিয়ে দিচ্ছ !"

অরিন্দম একটু হাসল, "ইচ্ছে হলে আপনি নাও বলতে পারেন।"

যুবকটি একটু ভাববার চেষ্টা করল, অরিন্দমের দিকে তাকিয়ে কি যেন সে মীমাংসা করে নিল, তারপর বলল, "না, বলব আমি। ব্যাপার কি জানো ? তুমি যা জানতে চাইছ তা গুপ্তকথা—সে কথা একমাত্র ধনবানেরাই জানে এবং ধনবানদেরই তারা সেকথা জানায়। তুমি ধনবান নও কিন্তু আমি তোমার উপকারের ঋণকে শোধ করবই, কারণ ধনবান হলেও আমি একটু ছিটগ্রস্ত। কিন্তু ইয়ে—নেশাটা যে হাল্কা হয়ে যাচ্ছে ছাই—"

"বলুন—"

"বলছিরে দাদা, বলছি। ধনবান হবে ? বেশতো, জালিয়াতী জোচ্চুরী, প্রতারণা কর—"

"রাতারাতি কি করে ধনবান হওয়া যায় ?"

এদিক ওদিক তাকিয়ে গলার স্বর নামিয়ে যুবকটি অরিন্দমের কাছে মুখটা নিয়ে এল, বলল, "সস্স্—আস্তে—তাড়াতাড়ির কথা বলছ ? বেশতো, চুরী, ডাকাতি, খুন আর লুটপাট করো—"

"সেকি !"

"সস্স্—অবাক হয়োনা—আর শোন, এই গুপ্তকথা কিন্তু আর কাউকে বলোনা—"

"না—"

"শপথ কর।"

"শপথ করলাম—কাউকে বলবনা।"

"তুমি ধনবান হতে চাও ?"

"হ্যাঁ।"

"তাহলে যা বললাম তাই কর—টাকা হলে আমার সঙ্গে দেখা

করো—আরো সাহায্য করব তোমাকে। আমার নাম দেবদত্ত—মনে থাকবে? উঁচুপাড়ার সবাই চেনে আমাকে।"

"থাকবে।"

"একটা গাড়ী ডেকে দেবে দাদা? আমি এবার বাড়ী যাব—"

"দিচ্ছি।"

একটা বাষ্পযান থামিয়ে দেবদত্তকে চাপিয়ে দিল অরিন্দম। গাড়ীটা উঁচুপাড়ার দিকে চলে গেল।

অরিন্দম ভাবতে লাগল। এবার? দেবদত্তের কথা কি সত্যি? মাতালের কথা? কিন্তু মিথ্যাই বা কি করে প্রমাণিত হবে? মাতাল ছিল বলেই হয়ত নেশার ঘোরে সে সত্যকে প্রকাশ করে গেছে। পাপ না করলে ধনী হওয়া যায় না—বর্তমান সমাজব্যবস্থার এই তো নিয়ম। শোষণকারীর সৌভাগ্য এবং শোষিতের দুর্ভাগ্যকে সেই সমাজ-ব্যবস্থা ভাগ্যলিপির নামে চিরস্থায়ী করার চেষ্টা করে। না, সে বিচলিত হবে না। দেবদত্তের কথায় সত্যতা আছে। তাহলে? কবে?

কবে?

নিজের ঘরে ফিরে এসে অরিন্দম ভাবতে লাগল। কবে সে শক্তিমান হওয়ার পথে পা দেবে? মুকুন্দ এ পথকে স্বীকার করবে না, ললিতাও তার দাদার মতাবলম্বী। তাহলে? এ বাড়ীতে থাকলে মত আর পথ নিয়ে সংঘর্ষ হবেই। সুতরাং এ বাড়ীকে ত্যাগ করতে হবে। ফ্যাক্টরীর কাজ? তাও ছাড়তে হবে। হ্যাঁ, হৃদয়াবেগকে বর্জন করতে হবে। শক্তিমান না হওয়া পর্যন্ত সে আর ললিতার কাছে ফিরে আসবে না।

প্রদীপের শিখাটা কাঁপছে। তার তেল ফুরিয়ে এসেছে।

বাইরে গলির কিছুটা দেখা যায়। অন্ধকার।

মুকুন্দ এখনো ফেরেনি। হয়ত মদ খাওয়ার পর্বটা তার এখনো সাঙ্গ হয়নি।

ললিতা হয়ত স্বপ্ন দেখছে। মেঘের মত কালো চুলের মাঝে তার চাঁদের মত মুখে হয়ত এখন স্বপ্নের নরম ছায়া। হয়ত তারি স্বপ্ন দেখছে ললিতা। সেই ললিতাকে ত্যাগ করে যেতে হবে! ভোরবেলায় উঠে ললিতা কি ভাববে? তাকে যখন আর খুঁজে পাবেনা তখন ললিতার মুখেচোখে কি বেদনার অন্ধকার নেমে আসবে? বাতাসে নর্দমার দুর্গন্ধ।

রাত কত? রূপসী নদীর জলে কি এখন ক্ষীরোদ সমুদ্র-স্নাত চন্দ্রদেবের প্রতিবিম্ব তরঙ্গাঘাতে কাঁপছে? মায়াময় রাতের রহস্য কি এখন মল্লারের তানে বাণীলাভ করছে? কে ডাকে? তার অন্তরের সেই অসিধারী প্রহরী!—জাগো—জাগো-ও-ও-ও-

না, মায়া নয়, মমতা নয়, মোহ নয়। প্রেম সত্য বলেই তো প্রেমের শত্রুদের ধ্বংস করতে হবে। প্রেম সত্য বলেই তো সংগ্রাম করতে হবে, তার উপযুক্ত পৃথিবী গড়তে হবে। বীজবপন করার আগে যে ধরিত্রীকে কর্ষণ করতে হয়। হ্যাঁ, আমি জেগে আছি প্রহরী—আমি ভুলিনি—প্রেয়সীর বেদনাও আমাকে ভোলাতে পারবে না—আমার অর্ধেক হৃদয়পিণ্ডকে এখানে হারালেও আমি মনুষ্যত্বের মহান আহ্বানকে উপেক্ষা করব না। প্রহরী, শোন—বজ্রপানি দেবতার মত আমি দৃঢ়সংকল্প—

"ঘুমোওনি?"

কে? পূর্ণিমা-রাতের স্বপ্ন কি মূর্তি পরিগ্রহ করে তার সামনে এসে দাঁড়াল?

"এখনো জেগে আছ?"

কে? একি তার আত্মার আত্মা? পৃথিবীর সমস্ত রূপ, রস, গন্ধ ও বর্ণ কি দেহধারণ করেছে? পৃথিবীর সমস্ত সুর কি মুহূর্তে একটি মৃদু কণ্ঠস্বরে পরিণত হয়েছে?

"ঘুম আসছিল না—বারান্দায় বেরিয়ে এদিকে আলো দেখে এলাম"—

প্রদীপের শিখাটা থরথর করে কাঁপছে।

"ললিতা"—

"কি?"

"ললিতা"—

"কি?"

ললিতা অরিন্দমের দিকে তাকাল। অরিন্দম কাছে এল, ললিতা'র দুটো হাতকে নিজের হাতে তুলে নিল। একি বিচিত্র পুলকানুভূতি! সমস্ত দেহ যেন আবেশে অবশ হয়ে আসছে, সমস্ত পৃথিবী যেন এখন একটিমাত্র নারীর মাঝে হারিয়ে গেছে, সমস্ত চৈতন্য যেন দু'চোখের দৃষ্টি আর দশ আঙুলের অগ্রভাগে এসে সঞ্চিত হয়েছে।

"কি হল তোমার? অমন করে কি দেখছ?"

"তোমাকে।"

"কেন?"

"কে জানে? যদি ভোরবেলায় আর না দেখতে পাই তোমায়?"

"কি বাজে কথা বলছ তুমি!"

"বাজে কথা! হবে। তবু তোমাকে দেখি ললিতা—"

"দেখ—দেখ—" ললিতার কণ্ঠস্বর যেন শোনাই গেল না।

প্রদীপের শিখাটা দপ্ দপ্ করছে—এবার নিভবে। হাতের মুঠোয় হাতগুলো কাঁপছে। দুজনের হাতের শিরাগুলো একতালে লাফাচ্ছে। সম্মোহিতের মতো তারা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইল।

ওদিকে রাত বাড়বে। কোথায় যেন হল্লা হচ্ছে। বহুদূরে কে যেন গান গাইছে।

ললিতা বলল, "ছাড়ো—"

"আর একটু দেখি—"

"দাদা এসে পড়বে।"

"আর একটু—"

"মা জেগে উঠবে—"

"না—"

প্রদীপটা নিভে গেল। অকস্মাৎ।

"ছাড়ো—"

"কেন ললিতা?—"

"অন্ধকারেও কি দেখবে নাকি আমায়?"

"দেখব—স্পর্শের ভেতর দিয়ে দেখব তোমাকে।"

"আমার ভয় করছে।"

"কাকে?"

"নিজেকে।"

"কেন?"

"হয়ত তোমাকে দুর্বল করে ফেলব—তোমাকে বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে দেব—"

"ললিতা—"

"কি?"

"আমারও ভয় করছে!"

"তাহলে যাই?"

"যাও।"

অরিন্দম হাত ছেড়ে দিল, কাঁপতে লাগল। সমস্ত দেহে এ কিসের আকুতি? শান্ত হও মন, স্থির হও।

"ললিতা—"

"আমি যাচ্ছি—"

"ললিতা—আমি তোমাকে ভালবাসি—"

দ্বারপ্রান্ত থেকে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ভেসে এল, ভেসে এল, "আমি—আমিও তোমাকে ভালবাসি—"

লঘু পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেল।

অন্ধকার।

হাঁ, মীমাংসা হয়ে গেছে। আজই। এই মুহূর্তে। অপেক্ষা করার সময় নেই। নিজের জন্য অপেক্ষা করা যায় কিন্তু সমগ্র মনুষ্য-সমাজের জন্য দেরী করা যায় না। সে অধিকার তার নেই কারণ সমস্ত মানবগোষ্ঠী তার জন্য সংগ্রাম করছে। তাছাড়া সে যে প্রতিমুহূর্তে মরছে। কত মানুষ মরছে চারিদিকে! তাদের মৃত্যু যে তারও মৃত্যু! না সময় নেই। প্রেমের শত্রুরা পৃথিবীকে ভোগ করছে, তাদের জয় করতেই হবে। অলস অপেক্ষা নয়, বাক্‌বহুল তর্কজাল নয়, রঙীন স্বপ্ন নয়। কর্ম চাই। কর্মের পথ দুরূহ, দুর্গম, ক্ষুরধার। এগোও অরিন্দম, পৃথিবীর শেষ আছে, পথও অনন্ত নয়। জয় কর, বিজয়ী হও, মানুষের জীবন-সমুদ্রে সেই পুতুলদের আনন্দময় জীবনধারাকে এনে মিশিয়ে দাও, মানুষ দেবতা হোক, জাগো-ও-ও-ও—

অরিন্দম পা বাড়াল। ললিতা, আমি যাই। ললিতা, আমি তোমাকে ভালবাসি। ললিতা, আমি আবার আসব—

অন্ধকার গলি।

মাঝে মাঝে বিবর্ণ বাষ্পীয় আলোক।

তখনো লোক চলাচল আছে। চায়ের দোকানে গল্পগুজব চলছে।

গলির পর গলি।

শিশুর কান্না শোনা যায়। ললিতা কি এখন ঘুমিয়েছে?

কলহ।

হাসি।

এখানে ওখানে শবদেহ। ললিতা কি এখন স্বপ্ন দেখছে?

পচা আবর্জনার গন্ধ। কোন প্রহর? বেহাগ না সোহিনী?

কে যেন কাশছে।

ছায়াময় বাড়ীগুলো।

বাতাসে যেন কাদের কণ্ঠস্বর। বাতাসে যেন অনেক হারানো কথা। বাতাসে যেন কত ছড়ানো দীর্ঘশ্বাস।

গলির পর গলি।

হঠাৎ সচকিত হয়ে উঠল অরিন্দম। এ কোন গলিতে এল সে? এ গলিতে এখনো ঘরে ঘরে আলো জ্বলছে। সে চারদিকে তাকাল। কোথায় এল সে?

ঘুঙুর আর তবলার শব্দ ভেসে এল, ভেসে এল মাতালের হাসি আর নারীকণ্ঠের গানের আওয়াজ। দ্বারপ্রান্তে সুসজ্জিতা নারীদের চটুল চোখ তার দিকে কটাক্ষ-বর্ষণ করতে লাগল। উগ্র সুরভি-মাখা জামাকাপড় পরিহিত পুরুষেরা চলতে চলতে থেমে গেল, দ্বারপ্রান্ত-বর্তিনীদের সঙ্গে তারা ফিস্‌ফিস্ করে কি সব বলতে লাগল। দুপাশের মদ, মাংস এবং পানীয়ের দোকান থেকে ক্রেতা এবং বিক্রেতাদের কথাবার্তা ভেসে এল।

অরিন্দম দ্রুতপদে অন্য গলিতে ঢুকল। কিন্তু সে গলিতেও একই ছবি। বড় বড় পা ফেলে সে গলিটা অতিক্রম করতে লাগল

সেই সব নারীদের ডাক তার কানে এল, সে শিউরে উঠল।

"এসো না বাবা"—

"ইস্, সাধুবাবা!"

"ও বাবা, তোমার বৌ যে এখানে"—

"হিহিহি"—

হঠাৎ অরিন্দম গলির বাঁকে থমকে দাঁড়াল। সামনের বাড়ীটার

দোয়গড়ায়, চার পাঁচটি মেয়ের মধ্যে সে যাকে দেখতে পেল, তার কথা সে একমুহূর্ত আগেও ভাবেনি। তাকে যে সে এখানে দেখতে পাবে সে কথা সে স্বপ্নেও চিন্তা করেনি।

থমকে দাঁড়াল অরিন্দম, যেন সে পাথর হয়ে গেল।

"অমিতা দেবী!"

সেই মেয়েটি গম্ভীরমুখে সঙ্গিনীদের কথাবার্তা শুনছিল, অরিন্দমের কথা শুনে সে বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত চমকে উঠে মুখ ফেরাল। অরিন্দমকে দেখে তার দু'চোখের তারায় একটা বিচিত্র দীপ্তি ঝকমক করতে লাগল। নির্নিমেষনেত্রে সে তাকিয়ে রইল অরিন্দমের দিকে।

"অমিতা দেবী"—

অমিতাই বটে। কিন্তু পরিবর্তণ হয়েছে তার। থান ধুতির বদলে এখন রঙীন রেশমী সাড়ী, নিরলঙ্কারা এখন সালঙ্করা হয়েছে। কিন্তু অলঙ্কারগুলো যে গিল্টি-করা তা বুঝতে একটুও দেরী হল না।

অরিন্দম এগোল অমিতার দিকে। তার সঙ্গিনীরা সকৌতুকে তাদের দিকে তাকিয়ে হেসে উঠল।

"মিন্সে বোধ হয় চেনা লোক"—

"হ্যালো—ও তোর কে?"

অমিতা অরিন্দমকে এগোতে দেখল তার দিকে, মুহূর্তকাল অপেক্ষা করে সে বিদ্যুদ্বেগে ঘুরে দাঁড়াল, তারপর প্রায় দৌড়ে ভেতরে চলে গেল।

"অমিতা দেবী—শুনুন"—

অন্যান্য মেয়েরা খিলখিল করে হেসে উঠল

অরিন্দম ভেতরে ঢুকল তাদের ঠেলে, মেয়েরা তার অনুসরণ করল।

"অমিতা দেবী"—

কিন্তু ভেতরে দরজা-বন্ধ অনেকগুলো কামরা—কোনটাতে ঢুকেছে অমিতা তা অরিন্দম ঠাহর করতে পারল না।

মেয়েরা এসে তাকে ঘিরে দাঁড়াল। ওপরতলার সিঁড়ির বাঁকে একটা হিংস্র-দর্শন গোঁফওয়ালা পুরুষ এসে অরিন্দমকে দেখতে লাগল।

একটি মেয়ে বলল, "অমিতা গোসা করেছে—আজ ওর আশা ছেড়ে দাও ভাই"—

"কিন্তু ওর সঙ্গে যে আমার বিশেষ দরকার আছে—ওঁকে একবার ডেকে দিননা আপনারা"—

"হিহিহি"—

"মরেছে"—

"মিন্সে মজেছে"—

"কেন, আমাদের বুঝি পছন্দ হয়না?"

একটি মেয়ে এসে অরিন্দমের গায়ে ঠেস্ দিয়ে দাঁড়াল, বলল, "আজ আমার ওখানেই চলনা— আমার উরুগুলো ভাল—দেখবে?"

অরিন্দম মেয়েটিকে ঠেলে দিল, "না"—

আর একটি মেয়ে এল কাছে, দু'হাত দিয়ে সে অরিন্দমকে জড়িয়ে ধরল, আধো আধো গলায় সহাস্যে বলল, "তাহলে আমার ঘরে চল—আমার হাত দুটো কি সুন্দর বলত? আর আমার ঠোঁটদুটো দেখো—রসে টস্‌টস্ করছে"—

তাকেও ঠেলে দিল অরিন্দম, বলল, "আমি প্রার্থনা করছি—আমাকে আপনারা প্রলুব্ধ করবেন না, শুনুন, অমিতা দেবীকে একবার ডেকে দিন—দোহাই আপনাদের"—

এগিয়ে সে ওপরে উঠতে গেল আর ঠিক সেই সময়ে সেই গোঁফওয়ালা লোকটা এসে দাঁড়াল তার সামনে।

"এ্যাই—শুনছ?" কর্কশকণ্ঠে লোকটা তাকে বলল, "ভালোয় ভালোয় এখান থেকে বেরোও"—

অরিন্দম মাথা নাড়ল "না, আমি একবার"—

চক্ষের পলকে কোমর থেকে একটা ছোরা টেনে বের করল লোকটা,

ঝকঝকে দাঁতে দাঁত ঘষে বলল, "আর একটাও ট্যাঁফোঁ করবি তো শালা তোকে লাশ বানিয়ে ফেলব—বাঃ—ভাগ্"—

অরিন্দমকে একটা ধাক্কা দিল লোকটা।

"ওকে আসতে দাও"—

ওপরের সিঁড়ির মুখে অমিতাকে দেখা গেল।

"ছেড়ে দেব ?" লোকটা বিরক্ত হয়ে প্রশ্ন করল।

"হ্যাঁ"—

"যাও মশাই—যাও"—

অরিন্দম মৃদু হেসে ওপরে উঠে গেল, দাঁড়াল গিয়ে অমিতার সামনে। অমিতার বুক দ্রুত ওঠানামা করছে, দুচোখ জলছে তার। কিন্তু কেন ? উত্তেজনা ? রাগ ?

"ভেতরে আসুন"—

দরজার পরদাটা তুলে ধরল অমিতা—অরিন্দম ভেতরে ঢুকল। দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে অমিতা মেঝেতে একটা আসন পেতে দিল, অরিন্দম বসল।

ঘরের চারদিকে তাকাল অরিন্দম। ছোট্ট একখানা পরিষ্কার ঘর। এককোণে শয্যা বিছানো রয়েছে, দেয়ালের গায়ে বিলাসিনী নারীমূর্তি। কিন্তু এই কি চেয়েছিল অমিতা! এই নোংরা পাড়ায় এমনি একটা ছোট ঘরই কি তার জীবনের স্বপ্ন ছিল ?

"কি চান আপনি ?"

অরিন্দমের চমক ভাঙল, দেখল যে অমিতার ঠোঁটের কোণে কাঠিন্যের বঙ্কিম রেখা।

"আপনি এখানে কেন অমিতা দেবী ?"

"আপনাকে তার কৈফিয়ৎ দিতে হবে নাকি ?"

"না—নিছক কৌতূহল থেকে প্রশ্ন করছি। বাড়ীর সবাই আপনার জন্য চিন্তিত—তাই"—

"তাই ?" অমিতার কণ্ঠে যেন প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ খেলে গেল, "বটে ! তাহলে বলেই ফেলি"—

"কি ?"—

"সম্প্রতি ব্যবসা করছি—ঐ বিছানা দেখছেন—ওখানেই আমার ব্যবসা"—

অরিন্দমের শরীর কেঁপে উঠল, একটা রক্তের উচ্ছ্বাস ঘনাল মুখের ওপর। সে প্রশ্ন করল, "আপনি না একজনের সঙ্গে ঘর বাঁধতে চেয়েছিলেন ?"

অমিতা অস্বাভাবিক ভঙ্গীতে হাসল, "ঘর বাঁধা !—না, একজনের সঙ্গে ঘর ছেড়েছিলাম আমি"—

"তাহলে ঘর করলেন কেন—আপনি তো তাকে ভালবাসতেন ?"

অমিতা খিলখিল করে হেসে উঠল, "ভালবাসা ! কে বলেছে ?"

"ভালবাসতেন না ?"

"না। আর এও জানতাম যে সেও আমাকে ভালবাসে না"—

"তবে ?"

"আমি জানতাম সে কি চায়—আর সে যা চায় আমিও তাই চেয়েছিলাম বলেই একদিন ভেসে পড়লাম"—

"তারপর ?"

"তারপর আবার কি ? রক্তমাংসের উন্মত্ততা একদিন শেষ হয়ে গেল, এখানে এসে বাসা বাঁধলাম"—

"এই জীবন ভাল লাগে আপনার ?"

"বাড়ীতে বসে থাকার জীবনও কি ভালো লাগে ? তার চেয়ে এ ঢের ভাল—আর যাই হোক, আপনাদের স্বার্থপর সমাজের নাগালের বাইরে আমি। তাছাড়া আজকালকার দুর্দিনে বাড়ীর বোঝা হয়ে থাকা কি ভালো ?

"কিন্তু এই কি চেয়েছিলেন আপনি ?"

অমিতা অরিন্দমের দিকে তাকিয়ে দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়াল, তিক্তকণ্ঠে বলল, "চাইলেই কি সব কিছু পাওয়া যায়?"

"যায়।"

"না।"

"কি চেয়েছিলেন আপনি?"

অমিতা জ্বলে উঠল হঠাৎ, "আপনি কি ভেবেছেন বলুন তো? কিসের জোরে আপনি আমাকে এত জেরা করছেন?"

"চলে যাই তবে"—অরিন্দম উঠে দাঁড়াল।

"দাঁড়ান"—

অরিন্দম দাঁড়াল।

অমিতা কাছে এল, তিক্ত হেসে ললাটের ওপর থেকে চুল সরিয়ে বলল, "কি আর চাইব? যা সাধারণে চায়—তাই চেয়েছিলাম। স্বামী, সংসার, শান্তি, ভালবাসা। বিয়ে হল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই স্বামী হারালাম—চাওয়ার পালা ফুরিয়ে গেল। তবু চাওয়া কি থামে? কিন্তু যে সমাজে নারী ভোগ-সম্পত্তি—যে সমাজে নারী মানুষ না, শুধু একটি ভোগ্যবস্তু—সেখানে আমার তো আর দাবী নেই। তাই জ্বলতে লাগলাম, মরিয়া হয়ে উঠলাম"—অমিতা থামল, স্থিরদৃষ্টি মেলে তাকাল অরিন্দমের দিকে, প্রশ্ন করল, "আরো শুনবেন?"

"বলুন।"

"এমন সময়ে এলেন আপনি—মনের মানুষের সন্ধান পেলাম—দেহ আর মন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল"—

অরিন্দম মুখ নত করল। বুকের ভেতরে যেন একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা হচ্ছে তার। কেন? কি হল তার?

"মাথা নীচু করছেন! আমার নির্লজ্জতার লজ্জা হচ্ছে বুঝি?"—

"বলে যান"—

"বলবই তো। কি বলছিলাম—হ্যাঁ—জ্বলে উঠলাম। কাঙ্গালের

মত নানাভাবে আপনার কাছে তুলে ধরলাম নিজেকে। আমি জানতাম যে ললিতাকে ভালবাসেন আপনি, ললিতা আমার বোন, তাকে আমি ভালবাসি, তবু পারলাম না, তবু আপনাকে আঁকড়ে ধরলাম। কিন্তু আপনি দুর্বল নন, আপনার প্রেমকে তাই বিপথগামী করা গেল না। তখন? কি করব আমি? একই ঘরে থাকব, আপনাদের ভালবাসা দেখব আর জ্বলব—তা কি হয়? তাছাড়া দেহ যে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছিল তাই পালালাম, একটা কুকুরকে নিয়ে উধাও হলাম।"

অমিতা থামল, হাসতে শুরু করল। অস্বাভাবিক, প্রাণহীন সে হাসি।

"শুনলেন তো—এবার যান—দয়া করে সরে পড়ুন"—

অরিন্দম অমিতার দিকে তাকাল। সে শীর্ণা হয়েছে, চোখে মুখে তার চিন্তা আর ক্লেশের ছাপ। বুকের ভেতরটা দুরু দুরু কাঁপছে। অমিতা যেন প্রতীক। সমাজব্যবস্থার বিষময় পরিণতি। জীবন যেখানে সহজ পথ পায় না, সেখানে সে আঁকাবাঁকা অন্ধকার পথেই যাত্রা করে। কিন্তু কার দোষ? আমার, তোমার, সবার দোষ। আর কি কাঙাল অমিতা! ভালবাসা চায় সে। সে তার অধিকারকে আদায় করতে চায়। অরিন্দম কি করতে পারে? সে ললিতাকে ভালবাসে। সে আজীবন ললিতার। তার প্রতি রোমকূপে ললিতার ছায়া। তবু এই পিপাসার্ত আত্মার জন্য সে কি করবে? হঠাৎ মনের ভেতরে যেন বিপ্লব ঘটে গেল।

"অমিতা"—

"যান এবার"—

"শোন অমিতা"—

"আপনি আমার নাম ধরে ডাকছেন! না, আপনি বেরোন"—

অরিন্দম এগোল, অমিতার কাছে গিয়ে দৃঢ়কণ্ঠে বলল, "না, আমি যাব না অমিতা।"

"কিন্তু কেন? কেন?"

"তোমার দুঃখের জন্য আমি দায়ী—"

"কি করে?"

"আমি না এলে তো তুমি গৃহত্যাগ করতে না?"

"কে জানে হয়ত তবু করতাম।"

"অমিতা—তুমি ফিরে চল।"

"আমি নির্লজ্জ—কিন্তু এতটা নই যে বাড়ী ফিরে যাব।"

"তুমি নিজেকে ধ্বংস করতে পারো না।"

"কিন্তু বাঁচবার আর পথ নেই আমার।"

অরিন্দমের গলা কেঁপে উঠল, উত্তেজিতভাবে সে প্রতিটি শব্দে জোর দিয়ে বলল, "আছে, পথ আছে—"

অমিতা তাকাল, "কি পথ?"

"আমি।"

অমিতা স্তব্ধ হয়ে গেল, তার দুটো ঠোঁট থরথর করে নড়ে উঠল, সে উচ্চারণ করল, "তুমি!"

অরিন্দম মাথা নাড়ল, ঘরের কোণে সেই শয্যার উপরে বসে বলল, "হ্যাঁ। এই শয্যার ইতিহাস আজ শেষ হোক।"

অমিতার দু' চোখে বিস্ময়, তার অধরদেশ কম্পিত, তার চেতনা মূর্চ্ছাহত।

"তুমি!" সে আবার উচ্চারণ করল।

"হ্যাঁ, আমি। আমার জন্যই তোমার এই পরিণতি। কিন্তু তা হতে পারে না, তোমার অন্তরের ঈশ্বরকে আমি এই গলির অন্ধকারে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিতে পারিনা। অমিতা, আমি তোমার কাছে নিজেকে ছেড়ে দিলাম—তোমার জয় হয়েছে, তুমি নিজেকে সার্থক করো—"

অমিতা মৃদুকণ্ঠে বলল, "আর ললিতা?"

বুকটা যেন ভেঙ্গে যেতে চাইল। যেন সে অসংখ্য মৃত্যুর মাঝে তলিয়ে যাচ্ছে।

তবু অরিন্দম সোজা হয়ে রইল, তবু সে বলল, "ললিতা? হ্যাঁ, ললিতাকে আমি ভালবাসি—সে আমার অর্ধেক জীবন। কিন্তু তাতে কি? তোমাকেও ভালবাসব আমি—তুমি নিশ্চিন্ত হও, তোমার মহত্ত্বকে তুমি প্রকাশ করো।"

অমিতার চোখ বুজে এল, সে বিড়বিড় করে বলল, "তুমি—তুমি আমাকে ভালবাসবে?"

"বাসব বৈকি। এত দুঃখ পেয়েছ তুমি—তোমাকে ভাল না বাসা যে এখন পাপ।"

অরিন্দমের পায়ের কাছে অমিতা বসে পড়ল, অস্ফুটকণ্ঠে বলল, "তুমি আমাকে এই পঙ্ককুণ্ড থেকে তুলে নিলে!"

অরিন্দম মাথা নাড়ল, "নিলাম—তুমি পঙ্কজিনী বলেই তোমাকে তুলে নিলাল—"

দু'হাতে অরিন্দমের পা জড়িয়ে ধরে তার ওপর মাথাটা রাখল অমিতা।

অরিন্দম বিচলিত হয়ে পড়ল, ডাকল, "অমিত."—

"আমাকে ডেকোনা—এতবড় সৌভাগ্য তো আমার জীবনে আর আসেনি—তার স্বাদ পেতে দাও—"

ঘরের ভিতর নিঃশব্দতা নেমে এল। কিন্তু বাইরে থেকে ভেসে এল তবলা আর ঘুঙুরের শব্দ। কেউ নাচছে। না, সেই স্বর্ণকেশীর নৃত্য নয়, কোন এক জ্ঞানহীনার এলোমেলো মত্ত পদক্ষেপ। ভেসে এল হাসি, জড়িতকণ্ঠের গানের শব্দ আর অশ্লীল রসিকতার টুকরো।

অমিতা মুখ তুলল। তাকে যেন আর চেনাই যায় না। অদ্ভুত প্রশান্তি তার মুখে, আশ্চর্য এক জ্যোতি তার চোখে।

সে মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করল, "বাবা কেমন আছেন? মা? দাদা?"

"বাবা ভালো নন, তোমার মা দাদা একরকম আছেন—দিনকাল তো ভাল নয়—"

"কি হয়েছে বাবার? এ্যাঁ?"

"মাথার গোলমাল হয়েছে—"

অমিতার চোখে জল দেখা দিল, ক্রমে তা উপচে গাল বেয়ে নীচে নামল।

"কাঁদছ!"

"কিছুই তো করতে পারিনি তাদের জন্য—কাঁদতেও পারব না?"

অরিন্দম চুপ করে রইল। কি বলবে সে?

"আর ললিতা কেমন আছে?"

"ভালোই।"

"ললিতাকে ভালবেসো কিন্তু—বড় লক্ষ্মী মেয়ে আমার বোনটি—"

অরিন্দম একটু হাসবার চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না।

অমিতা অরিন্দমের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। একদৃষ্টে। কি যেন ভাবছে সে।

বাইরে থেকে সমানে ভেসে আসছে সেই ঘুঙুরের শব্দ।

"কিছু খাবে তুমি?"

অরিন্দম হাসল, "এত রাতে! না। এখন বড় ঘুম পাচ্ছে।"

"ঘুমোও তাহলে"—

"হ্যাঁ, ঘুমোব। কিন্তু কাল সকালে আমার সঙ্গে তোমাকে বাড়ী ফিরে যেতে হবে অমিতা।"

বিচিত্র হেসে অমিতা মাথা নাড়ল, পরে বলল, "তুমি ঘুমোও"—

অরিন্দম বিছানায় শুয়ে পড়ল, প্রশ্ন করল, "তুমি?"

"ঘুমোব—পরে।"

অরিন্দম চোখ বুজল। তাহলে? একটা দিন পেছিয়ে গেল সে! আবার নতুন করে কাল বেরোতে হবে! তা হোক। এও তার কর্তব্য,

সমাজ আর রাষ্ট্র তো ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে নয়। আঃ, কী আশ্চর্য অনুভূতি। অমিতা বদলেছে, তার পুনর্জন্ম হয়েছে। আর ললিতা এখন কি করছে! ললিতা, তুমি নির্ভয়ে থাকো, আমি তোমার। ললিতা, আমায় ক্ষমা করো, আমি আমার কর্তব্য পালন করছি। আঃ—ঘুমের নদী কি গভীর—গভীর—গভীর—

অরিন্দম ঘুমিয়ে পড়ল।

অমিতা তখনো একইভাবে বসে রইলো। তার দৃষ্টি অরিন্দমের দিকে। দেখতে দেখতে তার ঠোঁটের কোণে অদ্ভুত একটা হাসি দেখা দিল। কেন তা সে-ই জানে। আর হাসির সঙ্গে সঙ্গে তার দু'চোখ ছাপিয়ে আবার অশ্রুর ধারা নামল। মুক্তোর মত অশ্রু। বাড়ী ফিরে যাবে অমিতা? কিন্তু বাড়ী ফিরে গেলেই কি তার বিয়োগান্ত জীবনের পরিবর্তন হবে?

শেষরাতে অরিন্দমের ঘুম ভাঙতেই সে উঠে বসল। এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখল যে ঘরে অমিতা নেই। কোথায় গেল সে?

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল সে। না, অমিতার কোন সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না।

"অমিতা—"

কোন জবাব দিল না কেউ।

বারান্দায় বেরোল অরিন্দম।

"অমিতা"—

কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না।

তবু ডাকতে লাগল অরিন্দম। অন্যান্য ঘরের মেয়েরা জেগে-

উঠল, গজ্‌গজ্‌ করতে করতে তারা বাইরে এল। এল সেই গোঁফওয়ালা লোকটা।

সবাই মাথা নাড়ল। না, তারা কেউ অমিতাকে দেখেনি।

তাহলে? কোথায় গেল অমিতা?

অমিতা আবার হারিয়ে গেল।

কিন্তু কেন? কেন? অরিন্দম বারংবার প্রশ্ন করল নিজেকে। হঠাৎ যেন বুঝতে পারল সে। অমিতা বুদ্ধিমতী, তাই সে আবার চলে গেছে। বালির বাঁধ কি টেঁকে? বাড়ী ফিরে গেলেই কি অমিতার ব্যর্থতা সার্থকতায় পরিণত হত? যে সমাজে নারী ভোগের বস্তু সে সমাজে অমিতার ঘটনা কি আজই শেষ হবে? তাছাড়া কি করে অমিতা ফিরে যাবে? ললিতাকে ঈর্ষা করে সে, কিন্তু তার ভালবাসা তো মিথ্যে নয়। আজ তার আত্মা জাগ্রত হয়েছে তাই সে আজ অরিন্দমকে পেয়েও ত্যাগ করে গেল। কিন্তু কোথায় গেল সে? কোথায়?

কেউ বলতে পারল না। কেউ বলতে পারল না যে রাতের অন্ধকারে অমিতার পথ গিয়ে গৌরী নদীর শীতল শয্যায় শেষ হয়েছে।

সারাদিন ঘুরে বেড়াল অরিন্দম। এবার? কি ভাবে সে দেবদত্তের পরামর্শকে রূপ দেবে? অমিতা হারিয়ে গেল। যাক্‌। ললিতাকে ফেলে এসেছে সে, অমিতা তার কাছে তুচ্ছ। প্রহরী, অগ্রসর হও, তোমার পথ সামনে।

সন্ধ্যার পর সে উঁচুপাড়ার একটা হোটেলের পাশে গিয়ে দাঁড়াল, ভেতরের সুবেশ ও ধনী নরনারীদের লক্ষ্য করতে লাগল।

কিছুক্ষণ পর একজন ভদ্রলোক একটি যুবতীকে নিয়ে নিকটবর্তী মাঠের দিকে বেড়াতে চলল। অরিন্দম তাদের অনুসরণ করল।

মাঠের একটা নির্জন অংশে গিয়ে একটা কাষ্ঠাসনে বসল সেই ভদ্রলোক ও যুবতী। অরিন্দম দূরে বসল। ভদ্রলোকটিকে ধনী মনে হচ্ছে।

কি করবে সে? ঝাঁপিয়ে পড়বে ওদের ওপর? খুন করবে?

খুন! অরিন্দমের সর্বাঙ্গ ঘেমে উঠল। একজন মানুষ আর একজন মানুষকে হত্যা করবে! বাঘের মত, শ্বাপদের মত! আত্মাকে বিসর্জন দেবে? তাহলে কিসের জোরে সংগ্রাম করবে সে?

খুন!

না। না। অরিন্দম উঠল, ফিরে গেল।

আলোকিত রাজপথ দিয়ে সে হেঁটে চলল। তার চারদিকে আলোক সমারোহে, সুবেশ নরনারীর জনতা, ঝকঝকে গাড়ী আর উদ্দাম জীবন স্রোত! উঁচুপাড়ার মানুষদের জীবন যেন একটা উৎসব।

হাসি।

গান।

চটুল চোখের চাহনি।

রঙীন ঠোঁট, কাজল-আঁকা চোখ, উন্নত স্তনের আহ্বান আর অনাবৃত বাহুর লাস্য। শিকার-অনুসরণকারী শ্বাপদের চোখের মত পুরুষের চঞ্চল চাহনি।

কিন্তু একটা কিছু করতেই হবে।

কোলাহল। তার চারদিকে বিলাসী নরনারীর মিছিল। অরণ্যের শ্বাপদের মত তারাও নিশাচর।

না, এই ভীড়ে নয়। এখানে সম্ভব নয়।

নির্জন পাড়ায় খোঁজে এগোল অরিন্দম। শেষে খুঁজতে খুঁজতে তার একটা পাড়া পছন্দ হল। চওড়া মাঠের পাশে দশ বারোটি মস্ত বড় বড় বাড়ী। তার মধ্যে একটা বাড়ীকে সে তার লক্ষ্যস্থল করল। বাড়ীটার চারদিকে বড় বড় নারকেল আর আমগাছ। মস্ত বড় বাড়ী সে তুলনায় লোকজনের সংখ্যা কম বলে মনে হল। নীচের তলা অন্ধকার, শুধু ওপরের দুটো ঘরে আলো জ্বলছে। কোন শব্দ নেই। বেশী লোকজন থাকলে বাড়ীটা নিশ্চয়ই এতটা নিঃশব্দ হত না। আর থাকলেও তারা হয়ত ঘুমিয়ে পড়েছে। এই বাড়ীই ভালো, তার পেছনকার লৌহনল বেয়ে সে ওপরে উঠবে।

অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করল সে, বাড়ীটার চারদিক লক্ষ্য করল। কোন দিক দিয়ে পালাবে তাও সে মনে মনে স্থির করে রাখল। সব ঠিক, রাত আরো গভীর হোক, ওপরের ঘরের আলো দুটো একবার নিভুক।

কিন্তু কেমন যেন অস্বস্তিবোধ হতে থাকে। বুকের ভেতরে কে যেন করাঘাত করছে। কে? যেই হও, বিশ্বাস করো আমাকে। আমি মানুষের মঙ্গলের জন্য সব কিছুই করতে পারি। সব কিছু—এমনকি পাপও। পাপের জন্য শাস্তি পেতে হবে। আমি রাজী আছি। মানুষের জন্য আমি নরকগামী হতেও দ্বিধাবোধ করব না। রাতের কোন প্রহর?

আকাশের স্পন্দমান নক্ষত্রপুঞ্জ কি তাকেই লক্ষ্য করছে? করুক। সে জয়ী হবে।

মাঠের ওপারে অন্ধকার। অনেক দূর থেকে একটা কুকুরের ডাক ভেসে এল। রাতের নিঃশব্দতাকে চিরে দিয়ে সেই ডাক মহাশূন্যতায় মিশিয়ে গেল। সব কিছুই শূন্যতায় বিলীন হয়। তবু এই অস্তিত্ব মিথ্যা নয় আর মিথ্যা নয় বলেই তার জন্য সংগ্রাম করতে হবে। অগ্রসর হও। বিশ্বাসই বড় কথা, নিষ্ঠাই বড় কথা।

অরিন্দম লৌহনল বেয়ে ওপরে উঠতে লাগল।

মুহূর্তের পর মুহূর্ত কাটে।

আরো সময় কাটে।

হঠাৎ দ্রুতবেগে নল বেয়ে নামতে থাকে অরিন্দম।

ওপরের ঘর থেকে চীৎকার ওঠে, "চোর-চোর-চোর"—

বাড়ীর ভেতর সাড়া জাগে, আলো জ্বলে, কোলাহল ওঠে।

চীৎকার চলতে থাকে, "চোর-চোর-চোর"—

এবাড়ীর চীৎকারে পাশের বাড়ী জাগে, তারপর অন্যগুলো।

এদিক এদিক উত্তেজিতভাবে দৌড়োদৌড়ি করতে থাকে বাড়ীর মালিকেরা, তাদের ভৃত্যরা। তারপর একসময়ে নগর-রক্ষীরা এসে জেরা সুরু করে।

অরিন্দম তখন নীচুপাড়ার নিকটবর্তী নির্জন একটা গলিতে। বাষ্পীয় আলোকের সামনে দাঁড়িয়ে সে পকেট থেকে সব কিছু বের করল। প্রায় দু'হাজার টাকা নগদ আর দু'তিন হাজার টাকার অলঙ্কার। খুব বেগ পেতে হয়নি তাকে। একটা ঘরে ঢুকে একটি প্রৌঢ় দম্পতিকে ঘুমন্ত দেখতে পায় সে। কাপড় দিয়ে দুজনকেই জাগ্রত হবার আগে বিছানার সঙ্গে বেঁধে ফেলেছিল সে, তারপর ভয় দেখাতেই চাবি পেয়েছিল।

মন্দ হয়নি। এই তো সবে শুরু। আরো চুরী করবে সে। তারপর সে দেবদত্তের কাছে যাবে। দেবদত্ত না চিনলেও ক্ষতি হবে না তার। সে এখন বুঝতে পেরেছে তাকে কি করতে হবে। উচুপাড়ায় ভালো ঘর নিয়ে থাকতে আরম্ভ করবে সে, প্রতারণা করবে, দল তৈরী করে ডাকাতি করবে। তারপর সে যখন বুঝবে যে তার যথেষ্ট টাকা হয়েছে

তখন সে সংবাদপত্রের দপ্তরখানায় গিয়ে হাজার হাজার টাকা বিছিয়ে দেবে। তারপর থেকে প্রতিদিন কাগজে তার ছবি বেরোবে, প্রতিদিন তার প্রশংসা বেরোবে। টাকার জোরে সে বড় বড় ব্যবসা ফাঁদবে। টাকার জোরে সে শাসন-পরিষদের সদস্য হবে, মন্ত্রী হবে এবং অবশেষে আজবনগরের শাসনকর্তা হবে। তখন? তাঁর ইচ্ছাই সত্য হবে। এক একটা আঘাতে সে অন্যায়, পাপ, বৈষম্য, দারিদ্র আর হিংসা লোভকে নিশ্চিহ্ন করবে, মানুষের জীবনে পুতুলের আনন্দময় জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করবে। হ্যাঁ, ইচ্ছা থেকেই সব কিছু উৎপন্ন হয়। কে? কে বলেছিল সে কথা?

দুর্গন্ধ ভেসে আসছে। কিসের? অরিন্দম তাকাল। আরো কয়েকহাত দূরে একটি নারীর মৃতদেহ। নগ্ন, গলিত। কুকুরেরা তার অন্ত্রদেশ টেনে বের করে ফেলেছে।

না, ভয় নেই। গলিত শবের দুর্গন্ধের সঙ্গে বাতাসে নবজাতকের চীৎকারও ভাসছে। জীবনই বড় সত্য।

নিঃশব্দতা।

সমাধিক্ষেত্রের মত নিঃশব্দ নীচুপাড়া।

হঠাৎ পদশব্দ শোনা গেল। অরিন্দম চমকে তাকাল। দু'জন লোক! তাদের ক্লান্ত দেহ, ঘুম-জড়ানো চোখ। তাদের কাঁধে শবের বোঝা।

ক্লান্ত পদক্ষেপে শববাহীরা অন্ধকারে অদৃশ্য হল। ধীরে ধীরে তাদের পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেল। আবার নিঃশব্দতা।

মৃত্যু। পদে পদে মৃত্যু বাধা দিচ্ছে। তবু জীবন অপরাজেয়, অফুরন্ত। অরিন্দম, স্থির হও। তোমার কয়েকদিনের জীবনে কত বিচিত্র ঘটনাই না ঘটল?

রাত কত? কোন প্রহর? কুহকিনী রাতের গান শুনে কি রূপসী নদী এখন আবেগে ফুলে ফুলে উঠছে? শালবনের অন্ধকারে মৃগযূথেরা

এখন কোন স্বপ্নে বিভোর? সেই স্বর্ণকেশী নর্তকীর নৃত্যের তালেই বুঝি নক্ষত্রেরা কাঁপছে? কে ডাকে? জাগো-ও ও-ও, বিস্মৃতি ও বিভ্রান্তি ঠেলে উঠে দাঁড়াও-ও-ও-। কে? অসিধারী প্রহরী! আমি—আমি জেগে আছি-ই-ই-ই—

কিন্তু তবু কি যেন হল। বুকের ভেতর কে যেন করাঘাত করে কেঁদে উঠল। নীচুপাড়ার দিক থেকে একটা কুকুরের কান্না ভেসে এল। রাতের নিঃশব্দতাকে চিরে চিরে যেন নীচুপাড়ার আর্তনাদ পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়তে চাইল। অরিন্দম যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত করল। শক্তিমান হওয়ার পথ সহজ নয়। সেই পথে তিলে তিলে আত্মাকেও বিসর্জন দিতে হয়। কিন্তু অরিন্দমও কি তাই করবে? না, না। হে আকাশ, হে, পৃথিবী, হে নক্ষত্রপুঞ্জ, শোন—আমি ব্রতচ্যুত হব না।

কিন্তু তবু থামল না সেই যন্ত্রণাদায়ক অনুভূতি। তবু থামল না সেই বুকের ভেতরকার করাঘাত। একটা বাড়ীর দেওয়ালের গায়ে ঠেস দিয়ে অরিন্দম বসে পড়ল, দু'চোখ বুজল। সে সম্পূর্ণ একা।

অন্ধকারে নিমজ্জিত নীচুপাড়ার দিকে তাকিয়ে, সে বিড়বিড় করে বলল, "কবে? আবার কবে তোমাকে পাব ললিতা?"

পাঁচ

অরিন্দম ভাবছিল।

প্রথম চুরির পর কতদিন কাটল? মনে মনে হিসেব করল সে। আট মাস কেটে গেছে। গ্রীষ্মের খরতপ্ত দিন অতিক্রান্ত হয়েছে। তার সঙ্গে উড়ে গেছে পশ্চিমের ধূলো-ওড়ানো ঝড়ো বাতাস। তারপর এসেছে বর্ষা। নিবিড় কৃষ্ণ মেঘের গুরু গুরু ডাক, বিদ্যুতের শিহরিত দীপ্তি আর আকাশ ভাঙ্গা বর্ষণের শেষে এসেছে সোনালী রৌদ্রালোকে উজ্জ্বল শরতের নির্মেঘ দিন। এসেছে হেমন্ত। বাতাসে আসন্ন শীতের ঘোষণার সাথে রাতের আকাশ থেকে রাশি রাশি গলিত মুক্তো পড়েছে পৃথিবীর ওপর। তাও বিগত হয়ে শীত এসেছে, কুয়াশা আর উত্তরের হিমবায়ুকে বহন করে। সেই শীতও শেষ হতে চলেছে এখন। আট মাস কেটে গেছে। কত দিন আর কত রাত্রিভরা আটটি মাস!

এই আট মাসের ইতিহাস? অতি ঘৃণা, অতি কদর্য, অতি ভয়ঙ্কর তা। মানুষের মধ্যে শান্তি এবং প্রেমকে প্রতিষ্ঠিত করতে গেলে যে সব নীতিবাক্য পালন করতে হয় তাই সে প্রতিপদে অমান্য করেছে। চুরি, প্রতারণা, জোচ্চুরি, জালিয়াতি, ডাকাতি, আরো কত কী! দেবদত্তকে খুঁজে বের করেছিল সে। দেবদত্ত তাকে কয়েকটা ব্যবসায় নামিয়েছিল। এক টাকার জিনিষ দশ টাকায় বিক্রী করে সে মোটা মুনাফা করেছে। সবই অসৎ উপায়। কিন্তু আশ্চর্য! দেবদত্তের কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়েছে। আজ তার হাতে নগদ পাঁচ লক্ষ টাকা। টাকার জোরে সংবাদপত্রগুলো তার হাতের মুঠোয় এসে গেছে। প্রতিদিন তার বিষয়ে কিছু না কিছু স্তুতিবাদ কাগজে থাকে, প্রতিদিন কোন না কোন কাগজে তার ছবি বেরোয়। উঁচুপাড়ার রাস্তায় বেরোলে সবাই অঙ্গুলি নির্দেশে দেখায় তাকে, কানাকানি করে বলে,

'কে এই লোকটা? কোথেকে এল? রাতারাতি এত বড় হল কী করে? লোকটার শক্তি আছে।' শক্তি মানে টাকা। পৃথিবীময় যে শক্তি পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে তা উঁচুপাড়ার লোকদের কাছে টাকার আকার ধারণ করে সাকার হয়েছে। টাকা হওয়াতেই তার শক্তি সম্বন্ধে বিশ্বাস জন্মেছে এ পাড়ার লোকদের। তার সেই শক্তির কথা লোক মারফৎ, সংবাদপত্র মারফৎ গিয়ে পৌঁছোল আজবনগরের শাসনকর্তা আর মন্ত্রীদের কানে। তাঁরা তার ওপর নজর রাখলেন। টাকার জোরে সংবাদপত্রগুলো তার শাসনপরিষদের সদস্য হওয়ার মত যোগ্যতার কথা ফলাও করে ঘোষণা করল। অবশেষে একটি কেন্দ্র থেকে সে বিনাবাধায় সদস্য নির্বাচিত হয়ে শাসনপরিষদে গেল। সেখানে গিয়েও সে প্রাধান্য লাভ করল তার ব্যক্তিত্বের জোরে। আর উঁচুপাড়ায় ব্যক্তিত্ব মানে আকৃতি, বেশভূষা ও বাকচাতুর্য। সংবাদপত্রগুলোকে আর এক দফা ঘুষ দিতে হল। তারা তাকে মন্ত্রী করার জন্য সরকারের উদ্দেশ্যে আবেদন জানাতে লাগল। আজবনগরের কর্তাদের চিত্ত চঞ্চল হল তারা অভিভূত হল তার শক্তি দেখে, তারা তাকে একটি মন্ত্রিপদে নিযুক্ত করল। আজই তার যোগ দেওয়ার দিন। তাই একটু বাদেই দেবদত্ত এসে তাকে শাসনকর্তার প্রাসাদে নিয়ে যাবে। দেবদত্ত আজকাল তাকে বন্ধু বলে মনে করে, টাকার জোরে সে অবশ্য তার কিছুদিন আগেই মন্ত্রী হয়েছে। তার আগমন প্রত্যাশাতেই অরিন্দম এখন সাজগোজ করে বসে আছে।

অরিন্দম তাকাল চারদিকে। মস্ত বড় বাড়ী ভাড়া নিয়েছে সে। মার্বেল পাথরে মোড়া মেঝে, কারুকার্য করা দেয়াল আর দামী দামী আসবাবপত্রে সাজানো প্রতিটি কক্ষ। গোটা ছয়েক দাস-দাসী সর্বদাই তার আদেশ পালনের জন্য করযোড়ে দণ্ডায়মান। তার অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। নীচুপাড়ার গলির সেই ভাঙ্গাচোরা পুরোন ঘরের জীবন এসে এই আলোকিত হর্ম্যে থেমেছে।

শক্তি অর্জন করেছে সে। এতদিনে তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে। এইবার সে তার শক্তিকে প্রয়োগ করবে। কিন্তু হৃদয়ের অন্তস্তলে কি গভীর ক্ষতই না সৃষ্ট হয়েছে! আট মাসের ইতিহাস। কত সোনালী দিন আর রূপালী রাতে-ভরা আটটি মাস! হৃদয়ের অন্তরালে কে যেন আহতকণ্ঠে আর্তনাদ করেছে, তিল তিল করে যেন তার রক্ত মাংস ক্ষয় হয়েছে, ধিক্কারে ও ঘৃণায় নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসবার উপক্রম হয়েছে, তবু সে সহ্য করেছে। এই পথ বড় নয়, পথের শেষে পৌঁছে সে পথকে ধ্বংস করবে। কোটি কোটি মানুষের জীবনকে পদ্মের মত সুন্দর ও পবিত্র করার জন্য সে এই দুঃখবরণ করতে পশ্চাৎপদ নয়।

আট মাস কেটে গেছে। কিন্তু অবস্থার কোনই উন্নতি হয়নি। নীচুপাড়ার অলিতে গলিতে মানুষ মরছে। অনাহারে, ব্যাধিতে, দুঃখে। অতিরিক্ত উৎপাদন হেতু অল্প উৎপাদন করায় ব্যস্ত মালিকদের বেশী লোকের দরকার নেই, তাছাড়া শ্রমিকদের শাস্তি দেবার জন্যও তাদের বরখাস্ত করা হচ্ছে। বেকারের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। এখনো পর্যন্ত নীচুপাড়ার লোকেরা সংঘবদ্ধ হতে পারেনি, পথ সম্বন্ধে মতিস্থির করতে পারেনি। মাঝে মাঝে মনিশঙ্করের দল মিছিল করে বেরোয়। উঁচু পাড়া থেকে রক্ষীরা গিয়ে অগ্নিগোলক বর্ষণ করে তাদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়, বাড়ী বাড়ী গিয়ে সন্দেহজনক লোকদের ধরে এনে কারাগারের অন্ধকারে নিক্ষেপ করে। আর্ত মনুষ্যত্ব মুক্তির পথ পাচ্ছে না।

আটটি মাস কেটে গেছে। জ্বরগ্রস্তের মত, ভূতগ্রস্তের মত। এই আটটি মাস ধরে সে ললিতাকে দেখেনি। মুকুন্দেরও কোন সংবাদ জানে না সে। দেখা করারও উপায় ছিল না। ললিতা বলেছিল সে দূরে সরে যাবে, মুকুন্দ বলেছিল সে তাকে ক্ষমা করবে না। তাছাড়া দেখা করলে হয়ত সে তাদের প্রভাব এড়াতে পারত না। অথচ কিই-বা করতে পারল তারা? নীচু পাড়ার ইতিহাস একটুও বদলায়নি,

এবং তা ক্রমশই ঘোরতর অবনতির দিকে এগিয়ে গেছে। আট মাস ধরে সে নিজেকে লৌহ-কঠিন শাসনে শাসিত করেছে, নিজের আত্মার আত্মাকে দর্শন করেনি। আট মাস ধরে প্রতিদিন ললিতার কথা স্মরণ করেছে আর মৃত্যু-যন্ত্রণা ভোগ করেছে। কারণ শক্তিমানদের মধ্যে স্থান না পাওয়া পর্যন্ত সে কি করে ললিতাকে বোঝাবে তার কথার সত্যতা? আজ—আজ সে দেখা করবে ললিতার সঙ্গে—আজ সে আবার নতুন করে বাঁচবে। শক্তিমানদের অন্যতম হয়ে আজবনগরের মানুষদের মানুষ হবার ব্যবস্থা করার আগে তার নতুন করে শক্তির দরকার। সেই শক্তি টাকা নয়, প্রেম। আর ললিতার মধ্যেই গচ্ছিত আছে সেই শক্তি।

"হুজুর"—

একটি চাকর এসে ঢুকল ঘরে। তার হাতে একগাদা সংবাদপত্র।

"আজকের ডাক, হুজুর।"

"রেখে যাও"—গম্ভীরভাবে বলল অরিন্দম।

বড় লোকের মত মেজাজী অরিন্দমের কণ্ঠস্বর। নিজের মনে বিষণ্ণ হাসি হাসল সে। উপায় নেই। সংগ্রাম চলছে, কিন্তু আঘাত সে এখনো করেনি। সেই মুহূর্ত না আসা পর্যন্ত তাকে এমনি মুখোস পরেই থাকতে হবে, এইসব আবরণ টেনে নিজেকে গোপন করতে হবে।

কাগজগুলো খুলল অরিন্দম। প্রতিটি কাগজেই তার ছবি বেরিয়েছে। সে আজ মন্ত্রীত্বপদে অভিষিক্ত হচ্ছে তারই সংবাদ বড় বড় অক্ষরে ছাপা হয়েছে আজ। অরিন্দম তুমি কি খুসী? বিষণ্ণভাবে সে হাসল। নিজের ছবি দেখে মানুষ খুশী হয় বটে কিন্তু সে খুশী হতে পারছে না। শক্তি তাকে আচ্ছন্ন করতে পারবে না।

"অরিন্দম"—

দেবদত্তের কণ্ঠস্বর শোনা গেল। পরমুহূর্তেই সে ভেতরে ঢুকল।

অরিন্দম উঠে দাঁড়াল, সহাস্যে বলল, "এসো মন্ত্রীবর"—

দেবদত্ত রেশমী রুমাল দিয়ে মুখ মুছে হাসল, বলল, "মন্ত্রী তো তুমিও আজ থেকে।"

অরিন্দম মাথা নাড়ল, "সত্যি। ভারী আশ্চর্য মনে হয় কিন্তু"—

দেবদত্ত বাধা দিল, "আশ্চর্যের কি আছে এতে?"

"তা নয়ত কি? এত অল্পদিনেই কেউ মন্ত্রী হয়?"

"দিনটা তো বড় কথা নয়। বড় কথা হচ্ছে শক্তি। তুমি যে এত তাড়াতাড়ি শক্তিমান হবে তা আমিও আশা করিনি। অথচ সেটা কি করে সম্ভব হল জানো?"

"কি করে?"

"তোমার বুদ্ধি আছে বলে।"

"হবে।"

"এবং সেই বুদ্ধি একটা সাংঘাতিক অস্ত্র। তাই দিয়ে আজবনগরের শাসনকর্তা, প্রধান মন্ত্রী এবং আমরা দেশ শাসন করি। তোমার বুদ্ধি আছে, অল্প দিনেই তুমি এত বড় লোক হয়েছ—এতে কর্তারা সবাই চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন।"

অরিন্দম অবাক হল, "চিন্তিত হয়েছিলেন! সে কি!"

"হবেন না?" দেবদত্ত হাসল, "বল কি বন্ধু? অখ্যাত, অজ্ঞাত, সাধারণ ও কৃষ্ণাঙ্গ মানুষ হয়েও তুমি রাতারাতি বড় হলে যে আমাদের বিপদ হে। শক্তিমানদের চক্রের বাইরে থেকেও কেউ শক্তিমান হবে একথা যে অসহ্য—তাইতো তোমাকে তাড়াতাড়ি মন্ত্রী করে নেওয়া হল।"

"বটে!"

"হ্যাঁ, আমাদের তাই নিয়ম। যে বুদ্ধিমান, যে শক্তিমান, তাকেই আমরা ভালো চাকরী দিয়ে জয় করে নিই, চক্রের মধ্যে এনে ফেলি, তাকে অধঃপতিত করি।"

"কিন্তু কেন? বাইরে থাকলে ভয়টা কোথায়?"

"ভয় আছে—বাইরে থাকলে, তার মনুষ্যত্ব জাগ্রত হয়ে উঠতে পারে, শাসকদের বিরোধী হতে পারে সে।"

অরিন্দম হাসল, "ওঃ বুঝেছি। খুব যুক্তিসঙ্গত নিয়ম।"

দেবদত্ত মাথা নাড়ল, হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে সে প্রশ্ন করল, "তুমি তৈরী আছ অরিন্দম?"

"হ্যাঁ।"

"তবে চল।"

"চল। কিন্তু একটা কথা আছে দেবদত্ত—"

"কি?"

"তোমাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি"—

"কেন?" দেবদত্ত হেসে উঠল, "হঠাৎ তোমার এই দাক্ষিণ্য কেন?"

"আজ তোমার নির্দেশ অনুযায়ী চলেই আমি মন্ত্রী পর্যন্ত হতে চলেছি।"

"থাক্ ওসব কথা—তুমি আমার বন্ধু। এবার চল, সময় হয়ে এল, আর শোন, আদবকায়দা যা শিখিয়ে দিয়েছি তা ভুলোনা।"

"না।"

বন্ধু! মেষ ও বাঘের বন্ধুত্ব! অস্বাভাবিক তবু যেন সম্ভব বলেও মনে হয়। দেবদত্ত ধনবানদেরই একজন, তবু তার মধ্যে কোথায় যেন একটা কিছু আছে যার জন্য তাকে ঘৃণা করতে পারা যায় না। তার মধ্যে মনুষ্যত্ব বোধ হয় পুরোপুরি লুপ্ত হয়নি। তা নইলে সে সমস্ত গুপ্তকথা প্রকাশ করে কি করে? আচ্ছা, দেখা যাবে, এখন যাক।

আজবনগরের শাসনকর্তার প্রাসাদের ভেতর প্রবেশ করল দুজনে। দ্বাররক্ষী ও অন্যান্য রক্ষীরা সসম্ভ্রমে অভিবাদন করল। শাসনকর্তার

দপ্তরের একজন একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল একটা হলঘরে।

অরিন্দম অবাক হয়ে গেল। স্ফটিক-স্বচ্ছ মেঝের চারদিকে বহুমূল্য আসন, আসবাবপত্র ও আলোকবর্তিকা। অন্যান্য মন্ত্রীরাও সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তাছাড়া সরকারী বড় বড় কর্মচারীরা, দাসদাসীরা।

দেবদত্ত মন্ত্রীদের সঙ্গে অরিন্দমের আলাপ করিয়ে দিল।

প্রসেনজিৎ, মহানন্দ, অঘোরনাথ ও বিনায়ক। সকলেই স্মিতহাস্যে সম্বর্দ্ধনা জানালেন অরিন্দমকে।

প্রধান মন্ত্রী প্রসেনজিৎ বললেন, "আমরা আপনাকে আমাদের সহযোগী রূপে পেয়ে গৌরবান্বিত—অল্প বয়সে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই আপনি জীবনে যে সাফল্য অর্জন করেছেন তা বিস্ময়কর।"

অরিন্দম বিনীতকণ্ঠে বলল, "আমিও গৌরবান্বিত বোধ করছি—আপনাদের মত বিশেষ ব্যক্তিদের সহযোগী হওয়ার সৌভাগ্য আমার স্বপ্নাতীত ছিল। আপনাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি, প্রার্থনা করছি যে আপনারাই আমাকে বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত করবেন"—

মন্ত্রীরা খুশী হয়ে উঠলেন অরিন্দমের বিনয়-বাক্যে, বললেন, "সাধু—সাধু—"

ঘোষকের কণ্ঠস্বর শোনা গেল, "আপনারা মনোযোগী হোন—মহামান্য শাসনকর্তা আগমন করছেন—"

কে ঘোষণা করে? জাগো—ও-ও-ও—। এই কি সেই মণিময় কক্ষ? কিন্তু কোথায় সেই নৃত্য, সঙ্গীত, বীণাযন্ত্রের মর্মস্পর্শী আলাপ? অরিন্দম নড়ে উঠল। একি দিবাস্বপ্ন দেখছে সে? কেন সে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছে? প্রহরীর ডাক? না, সে ভোলেনি। সে জাগ্রত।

সবাই যুক্ত করে মাথা হেঁট করে প্রণাম জানাল। অরিন্দম দেখল যে আজবনগরের শাসনকর্তা ধনরাজ হলঘরে প্রবেশ করছেন। তার দুই পাশে দুজন অস্ত্রধারী দেহরক্ষী।

প্রৌঢ়, মেদ-সমৃদ্ধ ও দীর্ঘকায় ধনরাজের কণ্ঠে হীরক-হার ঝকঝক করছে, চকচক করছে তাঁর ছুটো শ্যেন চক্ষু। বাঁকা নাক, দৃঢ়সংবদ্ধ ওষ্ঠ আর পদক্ষেপে তাঁর আত্ম-প্রত্যয় ও চাতুর্য সূচিত হচ্ছে। তিনি এসে হলঘরের মধ্যস্থলে দাঁড়ালেন।

প্রসেনজিৎ অরিন্দমকে নিয়ে গিয়ে ধনরাজের সামনে দাঁড় করালেন।

"মহামান্যবর। ইনিই অরিন্দম—"

অরিন্দম যুক্তকরে মস্তক অবনত করল।

ধনরাজ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে তাকালেন, ক্ষণকাল নিঃশব্দ থেকে গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, "অরিন্দম বাবু, আপনি যে শক্তিমান তার পরিচয় পেয়ে আমরা মুগ্ধ হয়েছি এবং তাই আজ আপনাকে আমার অন্যতম মন্ত্রীপদে অভিষিক্ত করছি। আজ থেকে আপনি প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ অনুযায়ী আমার তথা আজবনগরের স্বার্থ এবং আপনাদের মন্ত্রীসভার স্বার্থ রক্ষা করবেন এই শপথ করুন—"

"আমি শপথ করছি—"

"মন্ত্রিবর—আপনি আমার অভিনন্দন গ্রহণ করুন।"

অন্যান্য মন্ত্রী এবং কর্মচারীরা সহর্ষ করতালি দিয়ে অভিনন্দন জ্ঞাপন করল। অরিন্দম ধনরাজকে আবার নতমস্তকে প্রণাম জানাল।

ধনরাজ ঘুরে দাঁড়ালেন, ধীর ও বলিষ্ঠ পদক্ষেপে আবার ভেতরের দিকে চলে গেলেন।

প্রসেনজিৎ এসে অরিন্দমকে বললেন, "আমার বাড়ীতে একবার চলুন অরিন্দমবাবু—আপনার সম্মানার্থে আমি একটু চায়ের ব্যবস্থা করেছি। তাছাড়া সেখানেই আপনার কর্তব্য সম্পর্কে কয়েকটা নির্দেশ দেব আমি। আপত্তি আছে কি?"

অরিন্দম মাথা নাড়ল, "না আপত্তি কিসের?"

মহানন্দ বললেন, "এত অল্পবয়স্ক মন্ত্রী আর পৃথিবীর কোথাও বোধ হয় নেই প্রসেনজিৎ—সত্যি ভারী বিচিত্র ব্যাপার—"

অঘোরনাথ প্রসেনজিৎকে বললেন, "অরিন্দমবাবুকে আগামী কাল যে সভা আছে তার কথা বলে দাও।"

প্রসেনজিৎ মাথা নাড়লেন "যথার্থ। অরিন্দমবাবু অবশ্যই আসবেন—দপ্তরখানাতে।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

বিনায়ক অরিন্দমের কাছে এগিয়ে এলেন, ক্ষণকাল তাকিয়ে থেকে বললেন, "বয়স এত অল্প যে আপনাকে 'আপনি' বলতে কষ্ট হবে মশাই—"

অরিন্দম হাসল, "বেশতো—তুমি-ই বলবেন—"

প্রসেনজিৎ হেসে উঠলেন, "বাঁচা গেল, আমিও তাই বলব ভাই—"

অঘোরনাথ ও মহানন্দ সমস্বরে বললেন, "আমরাও একই দলের ভায়া।"

সবাই হেসে উঠল।

প্রসেনজিৎ অরিন্দমকে হাত ধরে টানলেন, "চল অরিন্দম—আর কেন? অনুষ্ঠানপর্ব তো শেষ হল, এবার কাজের পালা। দেবদত্ত, তুমিও চল।"

দেবদত্ত বলল, "চলুন।"

সবাই অগ্রসর হল। অরিন্দম মনে মনে হাসল। 'এবার কাজের পালা'! কাজ! হ্যাঁ, কাজই বটে। নতুন পরিবেশে কাজ শুরু করল সে। কিন্তু তার কাজ মন্ত্রীত্ব নয়; তার কাজ অন্যায়, পাপ, হিংসা ও লোভের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা।

এগোতে এগোতে হঠাৎ থামল অরিন্দম। দেওয়ালের গায়ে সোনার কাঠামোতে বসানো একটি জ্যোতির্ময় বুদ্ধের প্রতিকৃতি। তাঁর মুখে শিশুসুলভ পবিত্র হাসি, চোখে মুখে প্রেমের জ্যোতি।

সে প্রশ্ন করল, "এটি কার ছবি?"

প্রসেনজিৎ বললেন, "সাধু মোহনদাসের।"

"উনি সাধু?"

"চলতি কথায় সাধু বলতে যা বোঝায় উনি তা ছিলেন না তবে চিন্তায়, কর্মে, বাক্যে উনি সাধু-সদৃশ ছিলেন বলে আজবনগরের লোকেরা ওঁকে সাধু আখ্যা দিয়েছিল।"

"উনি কি বলতেন?"

প্রসেনজিৎ হাসলেন, "কি বলতেন? এই যেমন—'হিংসা পাপ', 'মানুষকে ভালোবাস', 'সত্যই ভগবান', 'মানুষ হও'—ইত্যাদি—"

অরিন্দমের সর্বাঙ্গে শিহরণ খেলে গেল, "উনি বলতেন!"

"হ্যাঁ।"

"সবাই কি ওঁর কথা শোনে?"

"শুনতে চাইলেও তা কি সম্ভব?"

"আপনারা ওঁকে শ্রদ্ধা করেন?"

"করি না! নিশ্চয়ই করি—দেবতুল্য লোক যে!"

"ওঁর কথা শোনেন?"

প্রসেনজিৎ হাসলেন, "তুমি অল্পবয়স্ক বলেই এমন প্রশ্ন করছ। এইসব সাধুদের কথা কাজে পরিণত করা দুষ্কর। তবে হ্যাঁ, আমরা আর সবাইকে বলি ওঁর কথা মানতে আর নিজেরা গভীর শ্রদ্ধা করি—শ্রদ্ধা করি বলেই তো এমনভাবে সোনা দিয়ে মুড়িয়ে রেখেছি ওঁর প্রতিকৃতি।"

অরিন্দমের ঠোঁটের কোনে তিক্ত হাসি খেলে গেল, সে বলল, "তাহলে আমারও শ্রদ্ধা করা উচিত?"

"নিশ্চয়ই—"

অরিন্দম যুক্তকরে প্রণাম জানাল সেই বৃদ্ধের উদ্দেশ্যে। মনে মনে বলল, "তোমায় চিনি না, দেখিও নাই কিন্তু তুমি আমার আগে

এসেছ—তোমার কথা আমারো কথা—স্বর্ণ শৃঙ্খলে বন্দী করে ওরা তোমাকে সম্মানের নামে অপমান করে—সেই অপমান থেকে আমি তোমাকে মুক্ত করব সাধু মোহনদাস। তুমি আমাকে আশীর্বাদ কর।"

সে ঘুরে দাঁড়িয়ে পা বাড়াল, বলল, "চলুন—"

প্রসেনজিৎ অবাক হয়ে বললেন, "তোমার চোখে জল নাকি অরিন্দম ?"

অরিন্দম মাথা নাড়ল, "না—ও ধুলো—ওই প্রতিকৃতির গায়ে জমা ধুলো—"

প্রসেনজিতের বাড়ীও একটা ছোটখাট প্রাসাদ বললে চলে। তাঁর বৈঠকখানায় ঢুকে অরিন্দম অবাক হয়ে গেল। চারদিকে অগাধ ঐশ্বর্যের ছাপ।

ঘরের মধ্যে চার পাঁচজন লোক বসেছিল, প্রসেনজিৎকে দেখে তারা সসম্ভ্রমে উঠে অভিবাদন জানাল।

প্রসেনজিৎ তাদের দিকে তাকিয়ে হাসলেন, বললেন, "আপনারা একটু বসুন—আমি আসছি"—

দেবদত্ত ও অরিন্দমকে নিয়ে তিনি পার্শ্ববর্তী কক্ষে প্রবেশ করলেন। সেই কক্ষটি আরো সুসজ্জিত।

"বোস"—তিনি বললেন, তারপর দ্বারপ্রান্তের দিকে তাকিয়ে হাঁক দিলেন, "কে আছিস্ রে ?"

একটি ভৃত্য প্রবেশ করল।

প্রসেনজিৎ বললেন, "যা, দিদিমণিকে খবর দে—বল্ যে নতুন মন্ত্রী-মশাই এসেছেন"—

ভৃত্য চলে গেল।

প্রসেনজিৎ ঘুরে দাঁড়ালেন, "শোন অরিন্দম—তোমাকে কয়েকটা কথা বলার আছে"—

"বলুন"—

'আশ্চর্য ক্ষমতা তোমার—বনেদী বড় লোক না হয়েও এত অল্প বয়সে তুমি মন্ত্রী হয়েছ। কিন্তু একটা কথা—আমার নির্দেশ তোমাকে মানতে হবে"—

"নিশ্চয়ই।"

"মন্ত্রী হলে পর কতকগুলো কথা সব সময়ে মনে রাখবে—তা হচ্ছে : এক, সর্বদা নিজের আত্মীয় বা অন্যান্য মন্ত্রী এবং সরকারী কর্মচারীদের আত্মীয় বৃন্দদের সাহায্য করবে। দুই, ধরাকে সরা জ্ঞান করবে। তিন, বিনয়ের অবতার হবে কিন্তু মুখে যা বলবে কার্যতঃ তার বিপরীত করবে। চার, নিজের শক্তি বৃদ্ধি করার জন্য মোটা টাকা নিয়ে ব্যবসায়ীদের কার্য-ভার দেবে যা নিজেই বেনামীতে সরকারী কাজ করবে। পাঁচ, নীচু পাড়ার লোকদের অজ্ঞ করে রাখবে এবং নির্মমভাবে তাদের সংঘবদ্ধতাকে দমন করবে। আর এই পাঁচটি কাজ কেন করবে জানো?"

"না।"

"আমাদের শক্তি এবং প্রভুত্বকে চিরস্থায়ী করতে হবে।"

অরিন্দম মাথা নাড়ল, "বুঝেছি। আপনার নির্দেশ আমি পালন করব।"

"বেশ।"

মনে মনে হাসল অরিন্দম মনিশঙ্করের কথা, মুকুন্দের কথা তা হলে ঠিক। হাড়ের দুর্গে কে থাকে? এখনো কি তা জানা যায়নি?

প্রসেনজিৎ বললেন, "বেশ। তাহলে কাল থেকে তোমার দপ্তরে যাওয়া সুরু করবে, কেমন? কালকের সভার কথা ভোলনি তো?"

"না।"

দেবদত্ত প্রশ্ন করল, "কিন্তু কালকের সভার বিষয়বস্তুটা কি প্রধান মন্ত্রী ?"

প্রসেনজিৎ একগাল হেসে জবাব দিলেন, "নতুন কর বসানো হবে কিনা তাই স্থির হবে।"

দেবদত্ত মুখ বিকৃত করল, "আবার নতুন কর ! সেটা অন্যায় হবে।"

প্রসেনজিৎ ভ্রূকুঞ্চিত করলেন, "অন্যায় ! কেন ?"

"আর কর বসালে লোকেরা মারা পড়বে।"

প্রসেনজিতের চোখে আগুন ঝলসাল, "দেবদত্ত !"

"কি ?"

"তোমার অসুখ এখনো কমেনি দেখছি।"

দেবদত্ত মাথা নাড়ল, "চিকিৎসক তো কমই বলল।"

অরিন্দম বুঝতে পারল না। ব্যাপার কি ? কি হয়েছে দেবদত্তের ?

"কি রোগ দেবদত্ত ?"

প্রসেনজিৎ বললেন, "দেবদত্তের হৃদয় খুব দুর্বল হয়ে পড়েছে, না দেবদত্ত, ভালো কথা না, অবিলম্বে অস্ত্রোপচারের ব্যবস্থা কর।"

দেবদত্ত গম্ভীর হয়ে বলল, "আচ্ছা।"

প্রসেনজিৎ বললেন, "নতুন ব্যবসা কি করছ অরিন্দম ?"

"চালের ব্যবসা।"

"ভালো ব্যবসা। আমারো আছে। তবে কাপড়, ওষুধপত্তর আর অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিষের ব্যবসাও শুরু করো।"

"মানে ?"—

"মানে কালোবাজার আর কি ?"

"কালোবাজারটা কি ?"

প্রসেনজিৎ হো হো করে হেসে উঠলেন, দেবদত্তও সেই হাসিতে যোগ দিল। অরিন্দম বোকার মত চেয়ে রইল।

প্রসেনজিৎ হাসি থামিয়ে বললেন, "কালোবাজার হচ্ছে সেই বাজার

যা বাইরের প্রকাশ্য বাজারে অভাব সৃষ্টি করে লোকচক্ষুর অন্তরালে সমস্ত জমা করে চড়া দামে জিনিষ বিক্রী করে।"

"কথাটা এখনো বুঝলাম না।"

"বলছি। ধর, তুমি কাপড়ের কলগুলো থেকে সব কাপড় নিয়ে নিজের গুদামে জমা করলে। ফলে বাজারের সাধারণ দোকানে কাপড়ের অভাব সৃষ্টি হল। কিন্তু লোকের চাহিদা থামবে কেন? তারা ন্যাংটো থাকতে পারে না। সুতরাং তারা দর চড়াতে লাগল—যত দাম হোক, লজ্জানিবারণ করার মত একটি কাপড় চাইবেই তারা। ঠিক তখুনি তুমি কাপড় ছাড়তে লাগলে বাজারে। এবার মুনাফার কথা ভেবে দেখো—"

অরিন্দম দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল, "বটে! তাহলে তো কালো-বাজারের ব্যবসা করতেই হবে।"

"হ্যাঁ কর! বেশী করবার সময় পাবে না—মন্ত্রীত্বও সামলাতে হবে তো। বড় বড় ব্যবসাদার আরো আছে। তারা আসবে তোমার কাছে প্রণামী নিয়ে--ব্যবসা না করেও লাভ হবে।"

"কেন?"

দেবদত্ত হাসল, "বাঃ, তুমি মন্ত্রী, প্রণামী না দিলে তাদের ধরিয়ে দিতে পারো যে।"

অরিন্দম শিউরে উঠল, "কিন্তু এই কালোবাজার তো চিরকাল চলতে পারে না—"

প্রসেনজিৎ হাত নেড়ে বললেন, "আমরা চালাব। দুর্ভিক্ষ—অমনি কালোবাজার। বন্যা, ভূমিকম্প—অমনি কালোবাজার। পৃথিবীর বহুদূরে যুদ্ধ বাধল—কালোবাজার। এমন কি অমাবস্যা, পূর্ণিমা আর টিকটিকি হাঁচলেও কালোবাজার। সুতরাং বুঝে নাও। আর মজা কি জানো? সারা পৃথিবী জুড়ে এই বাজার চলছে আর এইটেই আসল বাজার। মিলের মালিক দাম চড়িয়ে বিক্রি করল, বড় ব্যবসাদার আর এক দফা

দাম চড়াল, ছোট ব্যবসাদার আর এক দফা দাম চড়াবে। এক টাকার জিনিসের দাম হবে পাঁচ টাকা।"

অরিন্দমের মুখে কথা ফুটল না। চোখের সামনে তার প্রসেনজিতের মুখ। তার আড়ালে সংখ্যাতীত মৃতের মুখ। হাড়ের দুর্গে কে থাকে?

অরিন্দম মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করল, "আপনার কি কি ব্যবসা আছে?"

"চাল, কাপড় আর ওষুধ। প্রতিপদে মানুষের যা দরকার।"

"কিন্তু কালোবাজার যারা করে তাদের কি ধরা উচিত নয়?"

"উচিত বৈকি। যারা প্রণামী দেবেনা—তাদের। প্রণামী দিয়ে যারা রাজভক্তির পরিচয় দেবে তারা তো সবচেয়ে উৎকৃষ্ট প্রজা। আর আমরা? আমরা আইনের উর্ধে।"

অরিন্দম হাসল।

প্রসেনজিৎ বললেন, "ওঘরে কারা বসে আছে—এবার তা বুঝলে?"

"বুঝলাম।"

"বাবা—"

সবাই পেছন দিকে ফিরে তাকাল।

দ্বারপ্রান্তে একটি কুড়ি বাইশ বছরের যুবতী।

প্রসেনজিৎ স্নেহসিক্ত কণ্ঠে বললেন, "এই যে মা, আয়। অরিন্দম, এই আমার মেয়ে মীনাক্ষী—আজবনগরের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাহিত্য-ভারতী উপাধি পেয়েছে এইবার। বুঝলি মা, ইনিই সেই নতুন মন্ত্রী—"

মীনাক্ষী স্মিতহাস্যে মুখ উদ্ভাসিত করে, যুক্তকরে বলল, "নমস্কার—নমস্কার দেবদত্তবাবু—"

"নমস্কার"—অরিন্দম শুষ্ক কণ্ঠে বলল।

মীনাক্ষীর দিকে তাকাল সে। পূর্ণযৌবনা যুবতী। সোনার কাজ-করা বহুমূল্য শাড়ী তার পরণে; হাতে, গলায়, আঙুলে ও কাণে হিরক-খচিত অলঙ্কার। সুর্মা-লাগানো চোখের চঞ্চল নির্লজ্জ কটাক্ষ, কবরী ঘিরে ফুলের মালা, বাঁকা ভুরু, দুটি পুরু ঠোঁটে রক্তবর্ণ-প্রলেপ।

ক্ষীণ কটি, তন্বী। গুরুভারে স্তনযুগলকে বিশেষভাবে দৃষ্টিগোচর করানোর জন্য শাড়ীকে আঁটসাঁট করে পরেছে সে। সর্বাঙ্গে মদির লাস্য, দেহভঙ্গীতে যেন মত্ততার নিমন্ত্রণ।

"আপনি!" সে বলল, "আপনার ছবি কত দেখেছি—কত নাম শুনেছি আপনার—"

অরিন্দম বিনীতভাবে হাসল শুধু, কথা বলল না। মেয়েটির রূপ আছে কিন্তু তার চোখে মুখে কেমন যেন একটা রাক্ষসী ক্ষুধার ছাপ। কেন? অরিন্দম অস্বস্তি বোধ করে।

মিনাক্ষী বলল, "কাল আপনাদের কাছে নিমন্ত্রণ পত্র যাবে বটে—কিন্তু আজই আপনাদের বলে রাখছি আমি। আমাদের 'মধুকর-সঙ্ঘে' কাল রাতে উৎসব অনুষ্ঠান আছে—সেখানে আসতে হবে আপনাদের।"

"কিসের উৎসব?" অরিন্দম প্রশ্ন না করে পারল না।

দেবদত্ত হেসে উঠল, "কিসের আবার? আনন্দোৎসব।"

"ওঃ—আচ্ছা নিশ্চয়ই যাব মিনাক্ষী দেবী।"

মিনাক্ষী এগিয়ে এসে হঠাৎ অরিন্দমের হাত ধরল, বিচিত্র হেসে বলল, "ধন্যবাদ—এবার চলুন—একটু জলযোগ করতে হবে।"

মিনাক্ষীর হাতের সুকোমল উষ্ণতায় অরিন্দম কেঁপে উঠল। কিন্তু না, সে বিভ্রান্ত হবে না, কটাক্ষ-শরে সে পরাজিত হবে না। ললিতা, আমি তোমার। ললিতা, আমি আসছি।

আটমাস পরে আবার সে নীচুপাড়ার পথে পা দিল। সেই পরিচিত পথ। ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাড়ীর ভীড়, আর সেই অন্ধকার গলি, খোলা নালি। আবর্জনা, দুর্গন্ধ, কাঁচা কয়লার ধোঁয়া, লোমহীন কুকুর, ছোট ছোট দোকানপাট, নগ্ন ছেলেমেয়ে। আর এখানে ওখানে,

রাস্তার এ বাঁকে সে বাঁকে—শবদেহ। বাতাস দুর্গন্ধে মন্থর। মৃত্যু।
মানুষ এখনো একইভাবে অনাহারে ও ব্যাধিতে অকালে মরছে।
হাড়ের দুর্গে কে থাকে? বহুদিন আগেকার সেই চোর, সেই খুনী আর
দামোদরের কথায় তাহলে সত্য ছিল! কিন্তু আর দেরী নেই, সে
মানুষের দুঃখকে দূর করবে। কোন প্রহর? দিনমণি সূর্যদেব অস্তে
গেছেন, আকাশের গায়ে তাঁর রক্তলিপি। রূপসী নদীর জলের ধারে
হয়ত শালবন থেকে হরিণের পাল নেমে এসেছে। সেই মণিময় কক্ষে
হয়ত সেই বুড়ো বেহালা-বাদক তন্ময় হয়ে বাজনা বাজাচ্ছে। হৃদয়
দুলছে, পায়ের নীচেকার মাটি কাঁপছে। সেই স্বর্ণকেশী নর্তকী হয়ত
নৃত্য সুরু করেছে। ললিতা, তুমি আমার।

আঁকাবাঁকা গলি। গলির পর গলি।

বিবর্ণ বাষ্পীয় আলোক-স্তম্ভ।

নগ্ন ছেলেমেয়েদের উদাস চাহনি।

চিন্তাক্লিষ্ট পিতামাতার চোখে স্নেহ।

দরিদ্র যুবক যুবতীর ভালবাসা।

জীবনকে শ্বাসরোধ করার চক্রান্ত চারদিকে। তবু জীবন মহাজীবন
হচ্ছে। মৃত্যুকে অগ্রাহ্য করে। ব্যাধিকে ভোগ করে, অভাবকে সহ্য
করেও জীবন তপস্যা করছে। দুঃখের হোমানলে তার দুঃখজয়ের সাধনা।
ললিতা, আমি আসছি।

অরিন্দম এগিয়ে চলল। বড় বড় পা ফেলে। প্রায় দৌড়ে।

আর তাকে দেখে কানাকানি করল কয়েকজন। তারা তাকে
অনুসরণ করল। চলতে চলতে তারা অন্যান্য পথচারীদের কি যেন
বলল। সবাই তাকাল অরিন্দমের দিকে। হ্যাঁ, তাকে চিনেছে তারা।
প্রতিদিন সংবাদপত্রে তার ছবি তারা দেখেছে। আজবনগরের অন্যতম
মন্ত্রী তাদের পাড়াতে প্রবেশ করেছে।

অরিন্দম চলতে চলতে তাকাল চারদিকে। সব সেই আগের মতই

আছে। শুধু আরো শ্রীহীন, আরো নিঃশব্দ, আরো বিষণ্ণ। ভাইসব, সময় হয়েছে, আর ভয় করো না। ললিতা কি ভাবছে? তার কথা? কেমন আছে সে?

নিঃশব্দে তাকে অনুসরণ করল তারা। প্রতি মুহূর্তে তারা সংখ্যায় বাড়তে লাগল। দেখ, উঁচুপাড়ার একজন দেবতা তাদের জগতে এসেছে।

কেমন আছে মুকুন্দ? বলরাম কি আরো পাগল হয়েছে? অভাব কি আরো বেড়েছে? কিছু যায় আসে না, কোন চিন্তা নেই। অরিন্দম থাকতে তাদের দুঃখ হবে না। তাদের সাহায্য করার জন্য পাঁচহাজার টাকা এনেছে সে সঙ্গে করে। তাদের সে নিজের বাড়ীতে নিয়ে যাবে। তারপর আর কটা দিন মাত্র। ললিতা, মানুষের মুক্তির দিন সমাগত।

তারা সমানে অনুসরণ করে চলল তাকে। তাদের চোখে তীক্ষ্ণতা, তাদের পেশীতে কাঠিন্য। তাদের দৃষ্টি অরিন্দমের ওপর।

অবশেষে।

অরিন্দম স্থির হয়ে দাঁড়াল। এই কি সেই বাড়ী?

তারাও এবার গলির বাঁকে স্থির হয়ে দাঁড়াল, অপেক্ষা করতে লাগল।

অরিন্দম বাড়ীর বারান্দায় পা দিল। না, কাউকে দেখা যাচ্ছে না।

বাড়ীটা নিঃশব্দ। বাড়ীতে যেন মৃত্যুর আবহাওয়া। তবু হৃদয়টা দুলছে, কাঁপছে, দুলছে—

পা টিপে টিপে ভেতরের দিকে এগোল অরিন্দম।

সামনেই একটা ঘর।

অরিন্দম দেখল যে মুকুন্দ বসে আছে। হাতে চায়ের পাত্র, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি গোঁফ।

আর ঘরের এক কোণে ললিতা একটা বাক্স খুলে কি যেন হাৎড়াচ্ছে। অরিন্দমের মুখে ডাক এল—ললিতা ললিতা ললিতা।

কিন্তু নিজেকে সংযত করল অরিন্দম, ডাকল, "মুকুন্দ"—

মুকুন্দ চমকে ঘুরে বসল, ললিতা চমকে পেছন ফিরে তাকিয়ে উঠে দাঁড়াল। তাদের হু'চোখে বিস্ময়।

স্তব্ধতা।

সুগভীর স্তব্ধতা। যেন নিঃশ্বাসের শব্দও শুনতে পাওয়া যাবে।

অরিন্দম একপা এগোল, হাসল, বলল, "আমি—আমি মুকুন্দ, চিনতে পারছ না?"

মুকুন্দ শুষ্ক হেসে বলল, "তুমি! না, চেনা যায় না।"

অরিন্দম ললিতার দিকে তাকাল। ললিতা তার দিকে তাকিয়ে আছে। একটু রোগা হয়েছে সে, চোখের নীচে ক্লান্তির ছায়া ঘনিয়েছে, তবু সেই ললিতা। সেই বিক্ষুব্ধ কালো সমুদ্রের মত তরঙ্গায়িত কেশপাশ, সেই অর্ধ-চন্দ্রের মত ললাটদেশ, সেই আশ্চর্য রূপ। কিন্তু মুখে হাসি নেই তার, নেই উল্লাসের জ্যোতি চোখে। কেন? এতদিন পর তাকে দেখে ললিতার এ কী হোল? তার কালিন্দী-কালো চোখের তারায় কেন বেদনার গাঢ়তা?

অরিন্দম ফিরে তাকাল মুকুন্দের দিকে, প্রশ্ন করল, "আমাকে চেনা যায় না—আমার কি এতই পরিবর্তন হয়েছে মুকুন্দ?"

মুকুন্দ নড়ল না. স্থিরভাবে বলল, "হয়েছে বৈকি। লোহার কারখানার মজুর আজ মন্ত্রী হয়েছে। কিন্তু মন্ত্রীবর, তুমি এখানে কেন?"

মুকুন্দের কণ্ঠস্বরে যেন প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ। অরিন্দম বিবর্ণ হয়ে গেল, শরীরের রক্ত যেন একমুহূর্তে জল হয়ে গেল। এ কোন্ মুকুন্দ কথা বলছে! তার বন্ধু! কী হল মুকুন্দের?

ললিতার দিকে তাকাল সে। ললিতা দৃষ্টি নত করল, ধীরে ধীরে সে তার পাশ দিয়ে চলে গেল প্রায় টলতে টলতে। তার দেহসুরভি এসে অরিন্দমের চেতনাকে প্লাবিত করল। কিন্তু কথা বলল না ললিতা! একটা সম্ভাষণও না! ললিতা—ললিতা!

মুকুন্দের কঠিনকণ্ঠ তাকে সচকিত করে তুলল।

"মন্ত্রীবর, এখানে তোমার কি দরকার ?"

বেদনায় ম্লান হয়ে অরিন্দম বলল, "মন্ত্রী হওয়া কি খারাপ মুকুন্দ ?"

"হ্যাঁ, খারাপ।"

"কেন ?"

"কারণ ঐশ্বর্য না হলে তুমি মন্ত্রী হতে পারতে না। আর কিভাবে ঐশ্বর্য আহরণ করেছ তুমি ? পাপ করে, অন্যায় করে, মানুষকে বঞ্চনা ও শোষণ করে।"

"কিন্তু আমার উদ্দেশ্য তো জান তুমি।"

"জানলেও বিশ্বাস করি না তোমাকে, কারণ তুমি আদর্শচ্যুত।"

"কি করে ? তোমার আদর্শ তো আমারো আদর্শ।"

"না। আমার আদর্শ মানুষের মঙ্গল করা এবং তা অন্যায় করে করা যায় না। অন্যায়ের দ্বারা অন্যায়ই বাড়ে। ঐশ্বর্য অহঙ্কার বাড়ায়, আত্মাকে ধ্বংস করে।"

"আমার আত্মা জাগ্রত মুকুন্দ।"

"তর্ক করতে রাজী নই আমি। শোন অরিন্দম, বাঘের পালে মেষশাবক কি করবে ?"

"আমি তাদের অন্তরের পরিবর্তন করব।"

"করো—তাই দেখার প্রত্যাশায় রইলাম।"

"তোমার বিশ্বাস হয় না ?"

"না। যারা তোমাকে মন্ত্রী করেছে তারা জানে একজন তাদের চক্রকে ধ্বংস করতে পারবে না।"

"মুকুন্দ—"

"সত্যের পথ সোজা। অরিন্দম, সত্যের সঙ্গে পাপের সন্ধি হয় না। পাপ করে পুণ্যলাভ হয় না।"

"মুকুন্দ—"

"তোমার অন্তরে পচন ধরেছে অরিন্দম—"

"মুকুন্দ—"

আরো সোজা হয়ে দাঁড়াল মুকুন্দ, বজ্রকণ্ঠে বলল, "তুমি এবার যাও অরিন্দম—"

অরিন্দম টলতে লাগল, বলল, "একটা কথা মুকুন্দ—"

"বল।"

"কেমন আছ?"

মুকুন্দ অরিন্দমের দিকে তাকিয়ে ম্লান হাসল, বলল, "ভালো না, আমারো চাকরী গেছে।"

'বাবা কেমন আছেন?"

"উন্মাদ।"

'আর খবর কি?"

"বাচ্চা ভাই দুটো মারা গেছে—অল্পাহার-জনিত রোগে ভুগে ভুগে—"

অরিন্দম চোখ বুজে দরজায় হাত দিয়ে বিকৃতকণ্ঠে বলল, "মুকুন্দ!"

মুকুন্দ তিক্ত হেসে বলল, "হ্যাঁ মন্ত্রীমশাই। তা কি করা যাবে? নীচুপাড়ায় অমন কত শিশুরা মারা যাচ্ছে—পৃথিবীময় অমন কত প্রাণ অর্থহীনভাবে শেষ হচ্ছে। কি যায় আসে? শুধু মা বুঝতে চায় না—"

অরিন্দম চোখ মেলে তাকাল মুকুন্দের দিকে। মুকুন্দের চোখে শ্বাপদের ক্রোধ, অথচ তার ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা। তার প্রতিটি কথা যেন অগ্নিশলাকার মত তার কানে এসে বিঁধতে থাকে, বিষের মত ছড়িয়ে পড়ে তার বুকে, মৃত্যুর মত আঘাত করে তার চেতনায়।

"বুঝলে মন্ত্রী, শুধু মা রাক্ষসীই বুঝতে চায় না—তার মতে অমন দুটি বাচ্চা নাকি পৃথিবীতে আর একটিও ছিল না। হাঃ হাঃ হাঃ—"

হা হা করে হাসতে লাগল মুকুন্দ। পাগলের মত।

অরিন্দম আর্তকণ্ঠে বলল, "থামো মুকুন্দ—থামো—"

মুকুন্দ থামল, "আহাহা, কষ্ট হচ্ছে বুঝি? আমি সত্যি ভারী দুঃখিত মন্ত্রীবর—"

অরিন্দম কর্ণপাত করল না, প্রশ্ন করল, "আর সঙ্ঘের খবর কি?"

মুকুন্দ চোখ ছোট করল, "তুমি সরকারের লোক—তোমাকে বলব কেন? শুধু এইটুকু শুনে রাখো যে আমাদের জয় হবেই। কিন্তু আর কেন? এবার তুমি এসো—"

"যাচ্ছি।" অরিন্দম বিষণ্ণভাবে হাসল, একটু ইতস্ততঃ করে বলল, "আমি আজ এসেছিলাম অন্য উদ্দেশ্যে—"

"কি?"

"তোমরা আমার ওখানে গিয়ে থাকবে চলো।"

"কি বললে?

"হ্যাঁ। অভাবের দিন চলছে—তাই—"

"অরিন্দম!"

"বুঝেছি। তোমরা যাবে না। কিন্তু একটি অনুরোধ করছি—সেটা রাখলে আমি কৃতজ্ঞ থাকব।"

"বল।"

"কিছু টাকা এনেছি সঙ্গে—নাও—"

পকেট থেকে কাগজের মুদ্রাগুলোকে বের করল অরিন্দম।

মুকুন্দের দু'চোখ জ্বলে উঠল, দাড়ি গোঁফে ঢাকা মুখে তার ঘৃণা কুঞ্চিত হয়ে উঠল, সে বলল, "তোমার স্পর্ধা তো কম নয় অরিন্দম!"

অসহায় ভঙ্গীতে অরিন্দম বলল, "আমি তোমার বন্ধু মুকুন্দ—"

"বন্ধু!" মুকুন্দ ঘৃণায় ঠোঁট ওলটাল, তারপর স্থির দৃষ্টি মেলে বলল, "মন্ত্রী হয়েছ বটে, কিন্তু বুদ্ধি তোমার পুরো খোলেনি। শোন, তুমি আমার বন্ধু নও, আমার শত্রু—"

"শত্রু!" যেন একটা প্রচণ্ড ধাক্কা খেল অরিন্দম, দু'চোখ তার জলে

ভরে এল, প্রতিবাদ করতে গিয়েও সে আর কথা খুঁজে পেল না, টাকা গুলো তার হাত থেকে মেঝের ওপর খসে পড়ল।

"কে? এখানে কে?"

অরিন্দম ফিরে তাকাল। বলরাম ঘরে ঢুকছে।

সেই বহুদিন আগেকার মতই দু'চোখ ছোট করে, এক হাতের তালু চোখের ওপর রেখে সে বলল, "কে? তুমি কে?"

অরিন্দম মৃদু কণ্ঠে বলল, "আমি অরিন্দম।"

দু' পা পিছিয়ে গেল বলরাম, চোখের তারা বড় করে বলল, "তুমি! হি হি হি—বটে! তা দিব্যি আছ দেখছি।" হঠাৎ মেঝের ওপর নজর পড়ল তার, চোখের তারায় স্বপ্ন ঘনাল, গলার সুর নামিয়ে সে মুকুন্দকে প্রশ্ন করল, "ওগুলো কি সত্যি টাকা?"

মুকুন্দ মাথা নাড়ল, "হ্যাঁ।"

"কার?"

"অরিন্দমের"—

দু' পা পেছিয়ে গেল বলরাম, "কেন এনেছে ওই টাকা?"

"আমাদের দিতে।"

"তুমি নেবে?"

"না। আপনার চাই নাকি?"

বলরাম গর্জে উঠল, "খবরদার—আমাকে প্রলুব্ধ করো না শয়তান"—

মুকুন্দ টাকাগুলো কুড়োতে লাগল।

বলরাম যেন ভয় পেল, ঘরের কোণে গিয়ে কুঁকড়ে দাঁড়াল, চাপা গলায় বলল, "ছুঁস্‌নি মুকুন্দ, ছুঁসনি— ওগুলো বিষাক্ত—শুনছিস্?"

মুকুন্দ টাকাগুলো অরিন্দমের দিকে তুলে ধরল, বলল, "শুনলে তো—এবার যাও। তুমি এককালে বন্ধু ছিলে বলেই আজ ক্ষমা করলাম।"

অরিন্দম নিঃশব্দে নিল সেই টাকা। কথা বলতে চেয়েও পারল না

সে, তার জিভ্‌ যেন পাথর হয়ে গেছে, নড়তে চেয়েও পারল না সে, তার শরীর যেন অবশ হয়ে গেছে।

বলরাম হাত নেড়ে দূরে যাবার ভঙ্গী করতে লাগল, "হ্যাঁ—চলে যাও, চলে যাও তুমি অরিন্দম। কি ভেবেছ তুমি? টাকা দিয়ে সাহায্যের নামে দয়া করতে এসেছ?" বলরাম হাসল, "সেই ছোটবেলা থেকে কষ্ট সয়ে আসছি, আধপেটা খেয়ে আসছি—মাথার চুলে পাক ধরেছে, এবার মরতেও চলেছি—কিন্তু আমার ইতিহাস কি?—বলরাম দাস গরীব কিন্তু মানুষ।"

"শুনুন"—অর্ধস্ফুট কণ্ঠে বলতে চাইল অরিন্দম।

পাগল উত্তেজিত হয়ে উঠল, "না, শুনব না, আমি বধির। খবর শুনেছ? আমার বাচ্চা ছেলেমেয়ে দুটো ভবনদী পার হয়েছে—বুঝলে না? মরেছে। মানে চুলোয় গেছে। খেতে পাই না, খাওয়াতে পারি না—লজ্জায় আত্মরক্ষা করতে ইচ্ছে করে তবু ভিক্ষা নয়, দানগ্রহণ নয়, শয়তানের প্রলোভনের কাছে মাথা নীচু করা নয়। মরে যাব—মরে মানুষের বিস্মৃতিতে তলিয়ে যাব—তবু আমার ইতিহাস কি?—গরীব কিন্তু মানুষ—হি হি হি"—

বলরাম একটানা হেসে চলল।

মুকুন্দ বলল, "অরিন্দম"—

টলতে টলতে বাইরে বেরোল অরিন্দম। না, ওরা বুঝবে না, কিছুতেই বুঝবে না তাকে। কর্মের দ্বারা প্রমাণ না দিলে ওদের জয় করতে পারবে না সে। কিন্তু ললিতা? সেও কি তার আগের মতই পোষণ করছে? না, ললিতা যে তাকে ভালবাসে। কিন্তু তা'হলে সে অমনভাবে চলে গেল কেন? কেন? দু'চোখ ছাপিয়ে তার জল বেরিয়ে আসতে চাইল। কিন্তু না, সৈনিকেরা কাঁদে না।

বারান্দায় পা দিল অরিন্দম, এদিক ওদিক তাকাল। না, কেউ কোথাও নেই।

কয়েক মুহূর্ত দাঁড়াল সে, অপেক্ষা করল। যদি ললিতাকে দেখা যায়? কিন্তু না, ললিতার ছায়াও দেখা গেল না।

মৃদুকণ্ঠে একবার ডাকল সে, "ললিতা"—

সাড়া পাওয়া গেল না।

টলতে টলতে এগোল অরিন্দম। প্রতি পদক্ষেপেই সে যেন শিকড়-শুদ্ধ একটা বিরাট গাছকে টেনে তুলছে, তার পা সরতে চাইছে না। কিন্তু যেতেই হবে। ললিতাও মুখ ফিরিয়ে চলে গেল!

গলিতে পা দিয়ে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল সে। আবার তার কানে সেই বেহালাবাদকের বাজনা ভেসে এল। সেই বাজনার মধ্যে যেন নাইটিংগেলের ডাক, পপলার গাছের মর্মর ধ্বনি, অলস মধ্যাহ্নের সূর্যালোক আর প্রেমিকদের থরথর আবেগ। সেই স্বপ্নের মত অস্পষ্ট নর্তকীর চেয়ে হাজারগুণ রূপসী এক নারীকে সে গলির মুখে দেখতে পেল। একটা দেওয়ালের গায়ে ঠেস্ দিয়ে দু'টি বিষণ্ণ চোখ মেলে তার দিকে তাকিয়ে আছে।

"ললিতা"— অরিন্দম যেন নতুন করে প্রাণ পেল।

ললিতা সেই বিষণ্ণ দৃষ্টি তুলে ধরল, বলল, "কি?"

অরিন্দমের গলা কেঁপে উঠল, "আমার সঙ্গে চল তুমি।"

"কোথায়?"

"উঁচুপাড়ায়। কিছুদিনের মধ্যেই শক্তিমানদের মত বদলাব আমি। কিন্তু একা, বড় একা মনে হয়—তুমি চল আমার সঙ্গে।"

ললিতা ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে বলল, "না।"

"না!" অরিন্দমের হৃদস্পন্দন যেন থেমে গেল, "কিন্তু কেন ললিতা? তোমার দাদা আর বাবার মতই কি তোমার মত?"

"হ্যাঁ। তুমি পাপের সঙ্গে সন্ধি করেছ। চুরী করে শক্তিমান হয়েছ তুমি, চোর কি চোরদের হৃদয় পরিবর্তন করতে পারে? না, অন্যায় করে অশুভকে দূর করা যায় না।"

থেমে গেল। সেই বেহালার বাজনা বন্ধ হয়ে গেছে, নাইটিংগেলরা উড়ে গেল। স্বর্ণকেশীর নৃত্য স্তব্ধ হয়ে গেল।

অরিন্দম অনুনয়ের সুরে বলল, "কিন্তু আমাকে বিশ্বাস করো ললিতা—আমি মানুষের দুঃখ তাড়াতাড়ি দূর করার জন্যই এমন করেছি।"

"বিষ খেয়ে ব্যাধি দূর করলেও বিষই যে আবার প্রাণ হরণ করে।"

"ললিতা"—

"কি?"

ললিতার দু'টি হাত চেপে ধরল অরিন্দম, বলল, "তোমার দাদা আর বাবা আমাকে ভুল বুঝলেও বিশেষ ক্ষতি হবে না। কিন্তু তুমি ভুল বুঝলে যে আমার সমস্ত শক্তি লুপ্ত হয়ে যাবে। আমার সংগ্রাম করার শক্তি যে তুমি।"

সেই বিষণ্ণ দৃষ্টিকে নত করে ললিতা প্রশ্ন করল, "আমি কি তোমার কাছে এতই দামী?"

অরিন্দমের কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে এল, "তুমি! তুমি আমার আত্মার আত্মা।"

ললিতা কেঁপে উঠল একটু, বলল, "তাহলে আমার কথা শোন"—

"বল—বল"—

"সমস্ত ঐশ্বর্য ফেলে এসো, নীচুপাড়ায় এসে দুঃখীদের পাশে দাঁড়িয়ে সংগ্রাম কর।"

অরিন্দমের মুখ অন্ধকার হয়ে উঠল। একি পরীক্ষা! আদর্শ না প্রেম? মনুষ্যত্ব না ভালবাসা? আর মনুষ্যত্ব গেলে কি থাকবে? না, ভুল করেনি, আজ না বুঝলেও ললিতা ভবিষ্যতে বুঝবে তার কথা। সাময়িকভাবে তার অদৃষ্টে দুঃখ আছে। তবু বুক ভেঙ্গে যেতে চায়।

"ললিতা, তুমি কি আমাকে ভালোবাসো না?"

"আমার কথার জবাব তো দিলে না?"

"তার আগে বল।"

অরিন্দমের হাতের মুঠো থেকে নিজের হাত দুটো ছাড়িয়ে নিল ললিতা, কান্না-মেশানো হাসি ফুটে উঠল মুখে। দুটি চোখের সেই আশ্চর্য ও বিষণ্ণ দৃষ্টি মেলে সে বলল, "ভালবাসি বৈকি—ভালো না বাসলে কি লোকলজ্জার মাথা খেয়ে গলিতে এসে দাঁড়াতাম একটু দেখার জন্য?"

"তবে? তবে?"

"তোমাকে ভালবাসি, কিন্তু কোন্ তোমাকে? যে তুমি অনাহারকে উপেক্ষা করেও মর্যাদাকে বাঁচিয়ে রেখেছিলে, যে তুমি প্রথম দর্শনেই আমার হৃদয় জয় করেছিলে। কিন্তু আজকের তুমি আমার অপরিচিত"—

"ললিতা"—

"হ্যাঁ, আবার যেদিন তোমার সেই পুরোন সত্তা জেগে উঠবে সেদিন তুমি ইশারা করলেই তোমার পাশে গিয়ে দাঁড়াব।"

"ললিতা, আমাকে ভুল বুঝো না।"

ললিতা হাসল, 'যাকে ভালবাসি, তাকে ভুল বুঝি না আমি। কিন্তু যে মানুষ অন্যায় করে বড় হয় তাকে আমি চিনি না, তাকে আমি বুঝতে চাই না।"

অরিন্দম ভগ্নকণ্ঠে বলল, "না চিনলে, না বুঝলে। কিন্তু বিশ্বাস করো ললিতা, আমি অসাধ্য সাধন করব, আমি যে আদর্শভ্রষ্ট হইনি তার প্রমাণ দেব, শিগ্‌গীরই দেব। আত্মাকে ক্ষতবিক্ষত করে যেখানে পৌঁছেচি সেখানে শেষ পর্যন্ত লড়াই করে আমি নিশ্চয়ই জয়ী হব। ললিতা, শোন, আমার কোন পরিবর্তন হয়নি।"

ললিতার ডাগর ডাগর চোখে জল দেখা দিল, মাথা নেড়ে সে বলল, "তুমি বুঝতে পারছ না—ভালো করে তাকিয়ে দেখো নিজের দিকে। তোমার চোখে মুখে পরিবর্তনের সুস্পষ্ট ছাপ—ঐশ্বর্যের কালো ছায়া।"

"ললিতা"

"তুমি এবার যাও—"

"ললিতা !"

আর কথা বলল না ললিতা, ধীরে ধীরে সে ঘুরে দাঁড়াল। ক্ষণকাল অপেক্ষা করল অরিন্দম, ভাবল, তারপর পা বাড়াল।

"যাই ললিতা—"

"যাও।" নির্মম একটি কথা। নির্মম আদেশ।

টলতে টলতে এগিয়ে গেল অরিন্দম। পায়ের নীচে মাটি কাঁপছে, দু'পাশের ভাঙ্গাচোরা বাড়ীগুলো দুলছে। শব্দ নেই, সুর নেই, চেতনা নেই। ললিতাও তাকে পরিত্যাগ করল। তার কেউ নেই পৃথিবীতে, কেউ না। সে একা। পশুর রাজ্যে সে একা সংগ্রাম করবে। বেশ, তাই হবে। কোটি কোটি মানুষের জন্য সে আজ ললিতার অশ্রুকেও উপেক্ষা করেছে, একাই সে মানুষের ভাগ্য বদলে দেবে। না হতাশ হয়োনা. বুক চেপে ধর, পেশীর কাঠিন্যে শপথকে ঘোষণা করো। এগোও—

গলিতে অন্ধকার রাতের ছায়া। বহুদূরে একটি আলোকস্তম্ভ।

ছায়ামূর্তির মত মানুষের মিছিল।

গলিটা বাঁক ফিরল। পা টেনে টেনে এগিয়ে চলল অরিন্দম।

তারাও তাকে অনুসরণ করল আবার। অসংখ্য লোক। অরিন্দমের সেদিকে লক্ষ্য নেই।

সে কি পেছন ফিরে তাকাবে? ললিতাকে কি দেখা যায়? না, আর দেরী নয়, এবার তাকে যুদ্ধ-ঘোষণা করতেই হবে। এর বেশী শক্তিমান হওয়া কি সম্ভব? আজবনগরের শাসক হওয়া? হয়ত সম্ভব, কিন্তু তা দীর্ঘ সময়-সাপেক্ষ। দেরীই যদি হয়, তাহলে মুকুন্দদের পথ কি দোষ করল? না এখুনি সে যুদ্ধ-ঘোষণা করবে—আর ক'দিন পর। তারপর ললিতা, তারপর?

গলিটা গিয়ে একটা রাস্তায় পড়ল। তার পাশে একটা ছোট মাঠ। আবর্জনায় তার অর্ধেকটা ভরাট।

"বিশ্বাসঘাতক—"

অরিন্দম চমকে উঠল। একসঙ্গে অনেকে তার পেছনে চেঁচাল। কারা? ঘুরে দাঁড়াল সে, দেখল যে অসংখ্য লোক—প্রায় দু'তিনশ।

"বিশ্বাসঘাতক—"লোকগুলো একসঙ্গে গর্জে উঠল।

কাকে বলছে তারা? কেন? অরিন্দম অবাক হয়ে দাঁড়াল।

লোকগুলো কাছে এল, আরো কাছে। বৃত্তাকারে তারা তাকে ঘিরে দাঁড়াল। অরিন্দম দেখল যে তাদের পরিধানে ছিন্নবস্ত্র, তাদের মুখে অনশনের শুষ্কতা, তাদের চোখে ঘৃণা।

"কাকে বিশ্বাসঘাতক বলছ তোমরা—কি চাই ভাইসব?" অরিন্দম প্রশ্ন করল।

ভীড়ের ভেতর থেকে একজন লোক এগিয়ে এল। অরিন্দম তাকে চিনল—সে ইন্দ্র।

"ইন্দ্র! তুমি!"

ইন্দ্র ভ্রূক্ষেপ করল না তার কথায়, হিংস্র ভঙ্গীতে সে বলল, "তোমাকে বলছি আজবনগরের মন্ত্রী—তুমি বিশ্বাসঘাতক।"

"কিন্তু কেন?"

ইন্দ্র জনতার দিকে ঘুরে দাঁড়াল, চীৎকার করে দাঁড়াল, "এই লোক, এই ঘৃণ্য জীব এককালে তোমাদের দুঃখের জন্য সংগ্রাম করছিল—কিন্তু সেই মহৎ ব্রতকে সে পালন করেনি। উঁচুপাড়ার পাশব জীবন তাকে প্রলুব্ধ করেছে—তোমাদের পরিত্যাগ করে সে পশুবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্য পাপ করে বড় হয়েছে। যে একদিন তোমাদের বন্ধু ছিল সে আজ তোমাদের শত্রু হয়েছে—ভাইসব, একে ক্ষমা করো না—"

"বিশ্বাসঘাতক—শত্রু"—একসঙ্গে গর্জে উঠল সবাই।

"ভাইসব"—মরিয়ার মত অরিন্দম বলতে গেল।

ইন্দ্র গর্জে উঠল, "ভাইসব—ওকে শিক্ষা দাও"—

হঠাৎ একটা ইঁট এসে অরিন্দমের গায়ে লাগল। কে একজন চেঁচাল, "মারো—শত্রুকে মারো"—মুহূর্তে যেন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল সবাই।

"মারো—মারো—"

ইঁটের পর ইঁট এসে অরিন্দমের গায়ে পড়তে লাগল।

"ভাইসব—শোন—"

কেউ শুনল না। ঘৃণার একটা তরঙ্গ হিংসায় ভেঙ্গে পড়ছে তার ওপর। দু'হাতে মুখ ঢেকে অরিন্দম বসে পড়ল, মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। কপাল ফেটে তার রক্ত পড়ছে।

হঠাৎ কার কোমল স্পর্শে অরিন্দম মুখ থেকে হাত সরাল, দেখল যে ললিতা এসে আড়াল করে দাঁড়িয়েছে তাকে।

"ললিতা—সরে যাও"—অরিন্দম ভীতকণ্ঠে বলল।

ললিতা জনতার দিকে তাকাল, বলল, "একজনের ওপর প্রতিশোধ নিলেই কি আমাদের দুঃখ দূর হবে?"

ইন্দ্র বলল, "দুঃখ না মিটুক, জ্বালা মিটবে।"

দৃঢ়কণ্ঠে ললিতা বলল, "তাহলে আমাকে মারো।"

স্তব্ধতা।

জনতা রুদ্ধ আক্রোশে কানাকানি করতে লাগল, অপেক্ষা করল কিছুক্ষণ, তারপর একে একে চলে যেতে লাগল।

শেষে এক সময়ে রাস্তাটা ফাঁকা হয়ে গেল।

"ললিতা"—অবসন্ন কৃতজ্ঞতায় অরিন্দম ডাকল।

শাড়ীর আঁচল ছিঁড়ে অরিন্দমের ললাটের রক্ত মুছে দিল ললিতা, ক্ষত বেঁধে দিল, তারপর বলল, "বাড়ী যেতে পারবে?"

"পারব। ললিতা, তুমি না দেখলে আজ কি হত?"

ললিতা সে কথার জবাব দিল না, বলল, "তাহলে আমি যাই।"

অরিন্দম ব্যাকুলভাবে বলল, "আমার বিষয়ে তোমার মত কি কিছুতেই বদলাবে না ?"

ললিতা উঠে দাঁড়াল, মুখ ফিরিয়ে বলল, "না।"

"আবার কবে দেখা হবে ললিতা ?"

"যেদিন তুমি নীচুপাড়ার মানুষের পাশে এসে দাঁড়াবে।"

অরিন্দম আর কথা বলল না, শুধু অসহায় দৃষ্টি মেলে দেখল যে গভীর একটা মর্মস্পর্শী চাহনি নিক্ষেপ করে দ্রুতপদে চলে গেল ললিতা, অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

বেদনা জর্জর দেহ, ক্ষতের জ্বালা, অবসন্ন চেতনা। সে বিশ্বাসঘাতক। তার চেয়ে মৃত্যু ভালো। রাত কত ? কোন প্রহর ? সেই গুণবান গায়কের মধুকণ্ঠ তো শোনা যায় না ? ললিতা চলে গেল। তার কাছে যে প্রশ্ন, ললিতার কাছেও সেই একই প্রশ্ন। প্রেম বড় না আদর্শ বড়। তার এবার অগ্নিপরীক্ষা। অরিন্দম, তুমি পাহাড়ের চূড়োয় এসে দাঁড়িয়েছ। এবার লাফ দেও, প্রমাণ করো তুমি বিশ্বাসঘাতক নও। আর দেরী করো না, মানুষেরা মরছে, তুমিও তিলে তিলে মরছ। ওরা ইঁট দিয়ে মেরেছে তোমাকে। ললিতা না এলে হয়ত আরো মারত। মারুক, তবু ভয় পেয়ো না, সিদ্ধিলাভ করলেই তুমি অমৃতলাভ করবে।

একা। সে একা। আকাশের তারারা কি নিভে গেছে ? কে ডাকে ? জাগো-ও-ও—বিস্মৃতি ও বিভ্রান্তি ঠেলে উঠে দাঁড়াও—ও-ও-ও-ও—। একা! না, সে একা নয়। তার সঙ্গী আছে, সহযোদ্ধা আছে। অসিধারী সেই প্রহরী তার অন্তরেই আছে। আনন্দে ভরে উঠল তার হৃদয়, তার মুখে হাসি ছড়াল। না, ভয় নেই। ললিতা, তোমাকে আমি পাবই পাব।

মহাকাব্যের আহত বীরের মত অন্ধকারেই পড়ে রইল অরিন্দম।

পরের দিন।

ঠিক নির্দিষ্ট সময়ে দপ্তরে গিয়ে হাজির হল মান্যবর শ্রীযুক্ত অরিন্দম।

দ্বারপথে আগ্নেয়াস্ত্রধারী রক্ষী ও তকমাধারী ভৃত্যেরা সসম্মানে অভিবাদন জানাল তাকে। সম্পূর্ণ নতুন পরিবেশ বলে অরিন্দম অস্বস্তিবোধ করতে লাগল।

তার দপ্তরখানায় গিয়ে বসল সে। ছোটখাটো ঘর, মার্বেল পাথরে মোড়া মেঝে, চকচকে চেয়ার টেবিল, ঝকঝকে পর্দা ও আলো, আইন ও রাজনীতির বই-ভর্তি আলমারী। আজবনগর ও পৃথিবীর মানচিত্র, কাগজপত্র, খাতা, কলম, তারবাহী নাদযন্ত্র, বেতার যন্ত্র, বিজলী পাখা, কার্পেট এবং আরো অনেক খুঁটিনাটি জিনিষ।

পাখাটা চালিয়ে দিল সে। দেহে তার প্রচণ্ড বেদনা, কাল অনেক রাতে বাড়ী ফিরেছিল সে, ভাল ঘুমও হয়নি। তাই কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল সে, বসে বসে ভাবতে লাগল।

মুকুন্দর উত্তেজনা এবং জনতার ঘৃণার কারণ যেন সে উপলব্ধি করল। হাঁ, তাদের যুক্তি আছে। কিন্তু ললিতা? ভালবাসাতেও কি মানুষের ওপর বিশ্বাস রাখার মত ক্ষমতা জন্মায় না? কিন্তু না, ললিতা ভালই করেছে। আদর্শ গেলে মানুষের থাকে কি? সেই আদর্শকে ললিতা বড় বলে স্বীকার করেছে। অরিন্দমেরও একই আদর্শ কিন্তু পথ ভিন্ন বলেই এই বিরোধ। কিছু যায় আসে না, মানুষের মঙ্গল দিয়েই কথা।

ঢং—ঢং—

সময় যন্ত্রের ঘণ্টা বাজল। বেলা ১টা।

অরিমন্দ উঠল, কক্ষ থেকে বেরোল। দ্বার-রক্ষক সন্ত্রস্তভাবে সোজা হয়ে দাঁড়াল তাকে দেখে। অরিন্দমের অহমিকা প্রশ্ন করল—কাকে সম্মান দেখাল ঐ রক্ষী? আমাকে? অরিন্দম আত্মতৃপ্তিতে মৃদু হাসল কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই চমকে উঠে দাঁতে দাঁত ঘষল। এক দিনেই সে ভুলে যেতে বসেছে যে ঐ সম্মান কোন ব্যক্তিকে নয়—কোটি কোটি লোকের শুভাশুভের দায়িত্ব যে পদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সেই পদকে। শক্তি মানুষের মনে বিকারের সৃষ্টি করে—কথাটা কি তবে সত্য?

একটি লম্বা অলিন্দ। অলিন্দ শেষে একটি বড় কামরা। সেইটি মন্ত্রীদের মন্ত্রণা-কক্ষ।

সবাই উপস্থিত ছিল। প্রসেনজিৎ অঘোরনাথ, দেবদত্ত, মহানন্দ ও বিনায়ক। অরিন্দমের উপস্থিতিতে মন্ত্রণাসভা পূর্ণাঙ্গ হল।

প্রসেনজিৎ বললেন, "এসো ভায়া—এসো"—

মহানন্দ সহাস্যে বললেন, "তোমার কি হল ভাই? হেঁ হেঁ—কপালটা কেটে গেছে দেখছি"—

বিনায়ক সহানুভূতিসূচক শব্দ করে বললেন, 'যথার্থ, অনেকখানি কেটে গেছে যে—ইস্'—

অঘোরনাথ প্রশ্ন করলেন, "কোন চুলোয় গিয়েছিলে ভাই—খুব নেশা হয়েছিল বুঝি?"

প্রসেনজিৎ মাথা নেড়ে বললেন, "নেশা করলে তো ভালই হত—ভায়ার আমাদের সে সব গুণ নেই—তিনি গিয়েছিলেন নীচুপাড়ায়"—

অরিন্দম অবাক হয়ে গেল, "আপনি কি করে জানলেন?"

"জানোনা যে দেয়ালের ভেতরেও আমাদের কান আছে?"

মহানন্দ খুক্ খুক্ করে হেসে বললেন, "নীচুপাড়ায় কেন প্রধানমন্ত্রী?"

"কেন আবার—সেখানে ওর একটি ইয়ে আছে"—

প্রসেনজিতের ইঙ্গিতপূর্ণ কথায় সবাই হেসে উঠলেন।

হঠাৎ গম্ভীর হয়ে প্রসেনজিৎ বললেন, "কিন্তু অরিন্দম, তোমার আর নীচুপাড়ায় যাওয়া চলবে না। একা গেলে অমনিভাবেই সেখানকার জানোয়ারেরা তোমাকে মারবে—তাছাড়া তুমি একজন মন্ত্রী। তার সঙ্গে মেলামেশা তোমার নিষেধ। এখন থেকে কোথাও গেলে তোমার জন্য নির্দিষ্ট যে বাষ্পযান রয়েছে তাতে চড়ে দেহরক্ষী নিয়ে যাবে।"

প্রতিবাদ করবে কি? অরিন্দম একবার ভাবল, তারপর মুখের কথা গিলে ফেলে বিনীতভাবে বলল, "আজ্ঞে হ্যাঁ, এখন থেকে আপনার নির্দেশই পালন করব।"

"বেশ", প্রসেনজিৎ বললেন, "এবার তাহলে আজকের আলোচনা সুরু হোক। তোমরা জানো যে একটি নতুন করের বিষয়েই আজকের আলোচনা। এখন বল দেখি কিসের ওপর কর ধার্য করা যায়?"

সবাই ভাবতে সুরু করল।

কিছুক্ষণ বাদে দেবদত্ত বলল, "কিন্তু আর তো কোন নতুন করের সুযোগ দেখছি না আমি। নুন, তেল, কাপড় থেকে আরম্ভ করে প্রতিটি গ্রাসের জন্যই মানুষেরা কর দেয়—আর কি নতুন কর হতে পারে?"

প্রসেনজিৎ হাসলেন, "ভেবে দেখো—ভেবে দেখো—"

অরিন্দম একটু অবাক হয়ে প্রশ্ন করল, "আচ্ছা আর নতুন কর বসাবার দরকার কি?"

অঘোরনাথ বললেন, "দরকার নানাবিধ। খরচে কুলোচ্ছে না সরকারের—"

"কি খরচ করতে হয় সরকারকে?"

"প্রথম দেশরক্ষা। তার জন্যে সৈন্যদলকে পুষতে হয়, না পুষলে

আমাদের শক্তি ক'দিন টিঁকবে? নীচুপাড়ার লোক আর বিদেশী রাষ্ট্ররা যাতে আমাদের বিপন্ন না করে তার জন্য তা মারাত্মকভাবে দরকার। দ্বিতীয়, বিদেশী রাজদূতদের খাওয়াতে হয়, তাছাড়া ভোজ-উৎসব আছে, সরকারী দপ্তর থেকে সেতু আর যানবাহন নির্মাণ করতে হয়--কত কি আছে।"

প্রসেনজিৎ বললেন, 'ভাবো—ভেবে দেখো—"

স্তব্ধতা।

'কি হল?"

বিনায়ক মাথা নাড়লেন "উঁহু—ভেবে পাচ্ছি না—"

প্রসেনজিৎ বললেন, "তাহলে শোন। আমরা শাসন করি বলেই দেশে শান্তি বজায় আছে, মানুষেরা বেঁচে আছে। অথচ এই যে বেঁচে থাকা ব্যাপারটা—এর জন্য মানুষ কি কিছু খাজনা দেয়?"

অঘোরনাথ বললেন, "না তো।"

"তাহলে তাই করতে হবে—বেঁচে থাকার জন্য শতকরা দশটাকা কর দেবে সবাই।"

দেবদত্ত ও অরিন্দম ছাড়া সবাই বলল 'চমৎকার প্রস্তাব প্রধানমন্ত্রী—চমৎকার—"

প্রসেনজিৎ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে তাকালেন দেবদত্তের দিকে, প্রশ্ন, করলেন "আর তোমরা কি বল?"

দেবদত্ত গম্ভীরভাবে তাকাল প্রসেনজিতের দিকে, তারপর বলল, "আমি আপনার প্রস্তাবকে সমর্থন করি না।"

মন্ত্রণা-কক্ষে যেন বাজ পড়ল।

চারদিকে প্রশ্ন উঠল, "কেন? কেন? কেন?"

দেবদত্ত বলল, "এই কর মনুষ্যত্বের বিরোধী।"

বিনায়ক প্রশ্ন করলেন, 'মনুষ্যত্ব—সে আবার কি?"

প্রসেনজিৎ তীক্ষ্ণদৃষ্টি মেলে দেবদত্তের দিকে চেয়েছিলেন, হঠাৎ

গম্ভীরকণ্ঠে বললেন, "এসব আলোচনা নিরর্থক, তোমরা ভালো করে তাকিয়ে দেখ—দেবদত্ত ভয়ংকর অসুস্থ—"

সবাই মনোযোগ সহকারে দেবদত্তকে লক্ষ্য করতে লাগল।

অরিন্দম অবাক হয়ে গেল। কি শুনছে সে? এরা কারা?

দেবদত্ত আবার বলল, "না—এই করকে আমি সমর্থন করি না—"

প্রসেনজিৎ বললেন, "শুনছ? তোমরা এখুনি চিকিৎসালয়ে চল—দেবদত্ত অসুস্থ—দেরী হলে হয়ত বিপদ হয়ে যাবে—"

মহানন্দ সায় দিলেন, "যথার্থ, এখুনি চল—"

দু'পা পেছিয়ে দেবদত্ত বলল, "এই কর ধার্য হলে নীচুপাড়া ক্ষেপে যাবে—"

প্রসেনজিৎ কর্কশকণ্ঠে বললেন, "তুমি চিন্তা করো না—ডাণ্ডা দিয়ে তাদের ক্ষেপামী আমরা দূর করব—"

দেবদত্ত উত্তেজিত হয়ে উঠল, দৃঢ়কণ্ঠে বলল, "না, তা করবেন না—তাতে ফল মোটেই ভাল হবে না—"

প্রসেনজিৎ বাধা দিয়ে গর্জে উঠলেন, "অঘোরনাথ আর সময় নষ্ট করো না, ওকে হাসপাতালে নিয়ে চল—"

দেবদত্ত মাথা নেড়ে বলল, "না—না—সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল সে, পেছিয়ে যাবার চেষ্টা করল, কিন্তু তার আগেই সবাই তাকে ধরে ফেলল।

দেবদত্ত চীৎকার করে উঠল, "আমাকে ছেড়ে দিন—ছেড়ে দিন—"

কিন্তু কেউ শুনল না, দেবদত্তকে টেনে তারা বাইরে নিয়ে গেল।

'গাড়ী—শিগ্‌গীর একটা গাড়ী আনো—" রক্ষীদের হুকুম করলেন প্রসেনজিৎ।

রক্ষীরা ছুটে গেল।

গাড়ী এল।

"ওকে গাড়ীতে ওঠাও—"

দেবদত্তকে গাড়ীতে ওঠানো হল। সবাই চড়ল গাড়ীতে। বিস্ময়ে হতবাক অরিন্দমও উঠল, ভাবল, দেখাই যাক্ না কি হয়?

দেবদত্ত চীৎকার করে বলতে লাগল, "না, আমি সমর্থন করি না—না—"

প্রসেনজিৎ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, "দেখেছ, দেবদত্তের রোগ কতটা বেড়েছে? আহা-হা—"

চিকিৎসালয়ের বহির্কক্ষে সবাই অপেক্ষা করতে লাগল।

অরিন্দম ভাবতে লাগল। চুপ করে থাকাটাই এখন বুদ্ধিমানের কাজ, দু'একদিন এদের সব কিছুই দেখে নেবে সে? কিন্তু দেবদত্তের ব্যাপারটা সে কিছুতেই বুঝতে পারছে না। মাতাল লোক হলেও তার কতকগুলি গুণ আছে, যা উঁচুপাড়ায় আর কারো নেই। তাছাড়া আজ করের বিষয়ে সে যা বলল তা তো মিথ্যে নয়, তার প্রত্যেকটি কথাই সত্যি। তবে? তবু কেন মন্ত্রীরা তাকে অসুস্থ বলে সাব্যস্ত করছে! রহস্যময় ব্যাপার। চিকিৎসক সযত্নে পরীক্ষা করে সোজা ভেতরে নিয়ে গেল তাকে, বলল যে তৎক্ষণাৎ অস্ত্রোপচার না করলে রোগীর মাথা এবং বুক দুই-ই খারাপ হয়ে যাবে। কিন্তু ব্যাধিটা কি? আর কত দেরী হবে? দু'ঘণ্টা সময় তো কেটে গেল।

স্তব্ধতা।

সবাই নিঃশব্দে অপেক্ষা করছে। কি হল? আর কত দেরী? অস্ত্রোপচারে কি ভালো হল না?

আরো কিছুক্ষণ পরে শব্দ শোনা গেল।

খট্—খট্—খট্—

জুতোর শব্দ। সবাই উৎকর্ণ হয়ে তাকাল।

পর্দা সরিয়ে চিকিৎসক ভেতরে ঢুকল, রুমাল দিয়ে মুখের ঘাম মুছতে মুছতে একটা চেয়ারে বসল।

ব্যগ্রকণ্ঠে প্রসেনজিৎ প্রশ্ন করলেন, "কি খবর, এ্যাঁ?"

চিকিৎসক হেসে বলল, "কোন ভয় নেই, রোগী নিরাপদ অবস্থায় আছেন।"

"কি পেলেন অস্ত্রোপচার করে?"

চিকিৎসক সহাস্যে বলল, "একটা মাংসপিণ্ড—হৃদয়ের ঠিক নীচের দিকে। তা থেকে পাংলামত দুটি মাংসের শাখা মস্তিষ্কের দিকে মাথা তুলেছিল—আমরা তা কেটে বাদ দিয়ে দিলাম। মাংসপিণ্ডটির একটি বিশেষ নাম আছে—আপনারা তা নিশ্চয়ই জানেন?"

"তবু শুনি।"

"বিবেক।"

অরিন্দম দাঁতে দাঁতে চেপে ধরল। এরা কারা? হাড়ের দুর্গে কি তাহলে এরাই থাকে? আর দেবদত্তের কি হবে? সুস্থ হওয়ার পর বোধ হয় সে আর সত্যি কথাই বলবে না। একি সাংঘাতিক কথা! বেলা কত? কোন প্রহর? এ কোন পাপরাজ্যে সে এসেছে? এখানে বিবেক একটা ব্যাধি, নীতি এক প্রকারের দুর্নীতি, মনুষ্যত্ব একটা অজ্ঞাত, অকিঞ্চিৎকর বস্তু! প্রহরী, সাবধান, শত্রুদের চক্রব্যূহে তুমি সম্পূর্ণ একা। প্রহরী, তুমি তোমার অসি নিষ্কাষিত করো, প্রস্তুত থাকো, পৃথিবী থেকে পশুত্বকে নিশ্চিহ্ন করতে হবে—

অরিন্দম বাড়ী ফিরে চুপ করে বসেছিল তার বহির্কক্ষে। সন্ধ্যে হয়েছে কিন্তু ঘরের আলো তখনো সে জ্বালেনি। অন্ধকারই ভালো লাগছে তার। সামনের খোলা জানালা দিয়ে উঁচুপাড়ার সৌধ-শীর্ষগুলোকে দেখা যায়। পাহাড়ের সারির মত চারদিকে বিস্তৃত হয়ে গেছে তা, নীচুপাড়ার কোটি কোটি মানুষের নগ্নতা, দারিদ্র্য আর দুর্বলতাকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। দেখা যায় আলোকিত কামরার টুকরো বাড়ীগুলোর জানালা দিয়ে। দেখা যায় বিদ্যুৎবাহী তারের সারি, অন্ধকার আকাশের গায়ে ঝিকিমিকি অজস্র তারার মেলা।

রাত হয়ে এল। নেমন্তন্ন আছে আজ মধুকর-সঙ্ঘে। অরিন্দম ঠিক করেছিল যে দেবদত্তের সঙ্গে সে যাবে। কিন্তু দেবদত্ত আজ অসুস্থ, চিকিৎসালয়ে তাকে অন্ততঃ চার পাঁচদিন থাকতে হবে। তাহলে? একা, অপরিচিত পরিবেশে যাওয়ার মত হাল্কা মন আর তার নেই। ঘুরে ফিরে ললিতার মুখটা মনে পড়ছে। কানের কাছে সমুদ্রের অক্লান্ত ঢেউয়ের মত ললিতার কথা, মুকুন্দের কথা আর জনতার বজ্রনির্ঘোষ বারংবার ভেসে আসছে। একা, সে বড় একা।

ক্লিক্ করে একটা শব্দ হল আর মুহূর্তে ঘরের ভেতরকার শক্তিশালী বৈদ্যুতিক আলো জ্বলে উঠল। অরিন্দম চম্‌কে উঠল।

"কে?"

অনুচ্চকণ্ঠের হাসি শোনা গেল, অরিন্দম ঘুরে দাঁড়াল।

দরজার সূক্ষ্ম পরদার সঙ্গে গা লাগিয়ে মিনাক্ষী দাঁড়িয়ে আছে। ভুবনমোহিনী ইন্দ্রাণীর মত পোষাক পরেছে সে। অতি সূক্ষ্ম নীলাভ কার্পাসবস্ত্রের ওপর সোনালী জরির তারা বসানো। আঁটসাট ব্লাউজের বাধাকে ভেদ করে তার স্তনের উপরার্ধ যেন বেরিয়ে আসতে চাইছে।

তাদের মধ্যবর্তী অনাবৃত উপত্যকা প্রদেশের ওপর দুলছে একছড়া মুক্তোর হার, দুই কানে দুটি রক্তপ্রবালের ফুল, হাতে স্বর্ণবলয়, আঙুলে হীরকাঙ্গুরীয়। সুরভি-চূর্ণ দিয়ে সযত্ন-রঞ্জিত মুখ, রক্ত-রঞ্জিত ওষ্ঠাধর, টানাটানা ভুরুর নীচে কাজল-আঁকা দুটি মদির চোখ—কামনা যেন মূর্তিমতী হয়ে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

মিনাক্ষী হাসল, লঘুকণ্ঠে বলল, "আমি। এসে দেখলাম যে অন্ধকারে বসে আছেন—একটু সঙ্কোচ হল ডাকতে—তাই"—

অরিন্দম হাসবার চেষ্টা করে বলল, "তা বেশ করেছেন—আসুন, বসুন"—

মিনাক্ষী আগের মতই হাসল, "বাব্বাঃ, আপনি যে কায়দা-দুরস্ত ভদ্রতা দেখাবার জন্য রীতিমত ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছেন। আচ্ছা, কি ভাবছিলেন বলুন তো? কারো মুখ?" গলার স্বরটা একটু নামিয়ে সে একটা চোখের ভুরু তুলে প্রশ্ন করল, "কোন মিষ্টি মুখ? কোন মেয়ের মুখ?"

অরিন্দম মনে মনে অস্বস্তিবোধ করতে লাগল, তবু সে শুষ্ককণ্ঠে বলল, "হ্যা, হয়ত কোন মেয়েরই মুখ"—

"সে কে?"

ভদ্রভাবে হাসল অরিন্দম, বলল, "সে কথা আপাততঃ আমার গুপ্তকথা হয়েই থাক্ মিনাক্ষী দেবী"—

মিনাক্ষী'র ঝক্‌ঝকে দাঁতগুলো ঝিকমিকিয়ে উঠল, সে বলল, "বেশ, তাই থাক্। এবার উঠুন দেখি"—

"কোথায়?"

"বাঃ, আজ যে আপনার নেমন্তন্ন। দেবদত্তবাবু অসুস্থ শুনে আমিই এলাম, আপনি তো আর চেনেন না।"

"ধন্যবাদ—আমিও তাই ভাবছিলাম যে যাই কি করে।"

"তবে চলুন।"

যাওয়াই যাক্। দেখতে হবে এরা কি করে, এত ঐশ্বর্য কিভাবে ব্যয় করে। মনে পড়ে—দেবদত্ত একদিন বলেছিল যে নিরাপত্তার জন্যই এরা এত ঐশ্বর্য চায়। কিন্তু কিসের জন্য নিরাপত্তা? তাদের ভোগ-বিলাস যাতে নিরবিচ্ছিন্ন থাকতে পারে তার জন্যই নিরাপত্তা চাই। বেশ, দেখতে হবে এদের কাণ্ডকারখানা।

অরিন্দম বলল, "চলুন মিনাক্ষী দেবী"—

বাইরে বেরিয়ে বাড়ীটার ভেতর দিকে মিনাক্ষী একবার দৃষ্টি সঞ্চালন করে বলল, "এত বড় বাড়ী—অথচ চাকর বাকর ছাড়া আর কাউকেই তো দেখছি না অরিন্দমবাবু"—

অরিন্দম হাসল, "আমার আর কেউ নেই।"

মিনাক্ষী চোখ বড় করে কৃত্রিম খেদের সঙ্গে বলল, "আহা, কথাটা তো ভাল নয়—তাড়াতাড়ি বিয়ে করুন তাহলে।"

এই প্রগল্‌ভা নারীকে কি উত্তর দেবে অরিন্দম, নিঃশব্দে সে শুধু আর একবার হাসল, জবাব দিল না।

মিনাক্ষী'র গাড়ী অপেক্ষা করছিল, তাতেই চড়ল দু'জনে। চালক গাড়ী ছেড়ে দিল।

গাড়ীর ভেতরে মিনাক্ষী অরিন্দমের কাছে সরে এল, গা ঘেঁষে বসল। অরিন্দম মিনাক্ষীর হাত আর উরুর পার্শ্বদেশের কোমল স্পর্শে কেঁপে উঠল, সরে যেতে গিয়ে দেখল যে আর সরবার জায়গা নেই। মিনাক্ষীর দেহনিঃসৃত উত্তেজক সুরভি তার চেতনাকে ক্রমেই আচ্ছন্ন করে তুলল।

মিনাক্ষী কপট রোষের সঙ্গে বলল, "আপনি ভারী নিষ্ঠুর অরিন্দমবাবু।"

"কেন?" অরিন্দম কথাটার কোন হেতু খুঁজে পেল না।

"কেন?" মিনাক্ষী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে হাসল, "তা নয়ত কি? আমার বেশভূষা দেখে আজ সবাই কত প্রশংসা করেছে—কিন্তু কৈ, আপনি তো

কিছু বললেন না? সেই মিষ্টি মুখের স্বপ্নে কি এখনো বিভোর হয়ে আছেন?"

অরিন্দম একবার তাকাল মিনাক্ষীর দিকে, মৃদু হেসে বলল, "তা আছি, সব সময়েই থাকি—কিন্তু আপনার মুখটিও কম মিষ্টি নয় মিনাক্ষী দেবী। সত্যি, আপনার বেশভূষা এবং রূপকে আমার প্রশংসা করা উচিত"—

"কেন? আমি বল্লাম বলে?"

"না, আপনি রূপসী বলে, আপনার রুচি আছে বলে।"

"দেখবেন, আমার ভক্তদের স্তুতিবাদকে আপনি ছাপিয়ে না যান।"

"আপনার ভক্তদের সংখ্যা কত?"

"তারা অসংখ্য।"

"তাঁরা কি বলেন?"

"বলেন অনেক কিছু। আমি নাকি চাঁদ, তারা ফুল, ঝরণা—সে একগাদা বিশেষণ। মিনাক্ষীকে দেখে তারা মীনকেতনের শায়কে বিদ্ধ হয়, তার পায়ের কাছে হাঁটু গেড়ে বসে তারা আমরণ ক্রীতদাসত্ব ঘোষণা করে, তাকে বিয়ে করতে চায়।"

"বিয়ে করবেন না আপনি?"

"মনের মত পুরুষ না পেলে শেকল পরে লাভ কি?"

"তা পান নি?"

মিনাক্ষী হাসল, একটু ঝুঁকে বলল, "মনে হচ্ছে পেয়েছি—হয়ত এবার আমার ভক্তদের মত আমিই হাঁটু গেড়ে বসব তার কাছে।"

অরিন্দম মুখটা একটু পেছনে সরিয়ে নিল, বলল, "তিনি কে?"

মিনাক্ষী গলার স্বরটাকে ইঙ্গিতপূর্ণ করে স্থিরদৃষ্টি মেলে সহাস্যে বলল, "সে কথা আপাততঃ আমার গুপ্তকথা হয়েই থাক অরিন্দমবাবু—সময় হলেই বলব।"

অরিন্দমও হাসল, কিন্তু নিদারুণ অস্বস্তিতে তার সর্বদেহ সঙ্কুচিত

হয়ে উঠতে লাগল। ব্যাপার কি, কি বলল মিনাক্ষী? তার নির্লজ্জ কথার অর্থ খুব দুর্বোধ্য নয়—তাই কি? অরিন্দম, সাবধান। ললিতা, তোমার প্রেমই আমার রক্ষা-কবচ।

গাড়ীটা থামল।

মিনাক্ষী বলল, "আমরা পৌঁছে গেছি।"

গাড়ী থেকে নামল তারা। অরিন্দম দেখল যে একটা প্রশস্ত উদ্যানের মধ্যে তারা প্রবেশ করেছে। উদ্যানের চারদিকে উঁচু প্রাচীর। ভেতরে একটা মস্ত বড় তেতলা অট্টালিকা। বড় বড় থাম, সুচিত্রিত মসৃণ প্রস্তরফলকে ঢাকা মেঝে আর চোখ-ধাঁধানো আলো। সুবেশ নরনারীর দল উদ্যানের ভেতর, অট্টালিকার কামরাগুলোত গল্পগুজব করছে। হাসি, কোলাহল, বাজনার শব্দ।

অট্টালিকার বারান্দায় উঠল তারা আর সঙ্গে সঙ্গে ভেতর থেকে গুরুগম্ভীর ঘণ্টাধ্বনি ভেসে এল। ঢং ঢং—ঢং ঢং—ঢং ঢং—

অরিন্দম প্রশ্ন করল, "ও কিসের শব্দ?"

"মন্দির থেকে ঘণ্টার শব্দ ভেসে আসছে।"

"ভেতরে মন্দির আছে নাকি? কোন্ দেবতার মন্দির?"

"উঁচুপাড়ার উপাস্য দেবতা—অর্থদেব।"

"ও:"—

"চলুন দেখবেন।"

মিনাক্ষীকে অনুসরণ করে ভেতরে ঢুকল অরিন্দম। ভেতরে একটা ফাঁকা, নিরাবরণ জায়গার মাঝখানে একটা স্বর্ণচূড়া-শোভিত মন্দির। মন্দিরের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠল তারা। বহু ভক্ত নরনারীর সমাগম হয়েছে সেখানে—সবাই মধুকর-সঙ্ঘের সভ্য বা নিমন্ত্রিত। মন্দিরের

ভেতরে অসংখ্য শক্তিশালী বিজলী বাতি জ্বলছে। বিগ্রহের সামনে নানা ভোগ ও অর্ঘ্যের সমারোহ।

অরিন্দম বিগ্রহ দর্শন করল। স্বর্ণ-নির্মিত বিরাটকায় নগ্নদেহ মূর্তি—কিন্তু তা না পশু, না মানুষের মত। ছোট্ট একটা মাথা তার, অক্ষিগোলক-হীন চোখের অন্ধ দৃষ্টি মেলে ভক্তবৃন্দের দিকে তাকিয়ে আছে। কিন্তু মাথার অনুপাতে তার উদর ও লিঙ্গটি বহুগুণ বড়। তার হাত ও পা'গুলিও ক্ষুদ্রাকার কিন্তু নখগুলি দীর্ঘ ও তীক্ষ্ণধার।

ভক্তবৃন্দের দিকে তাকাল সে। বহু লোককে সে চিনতে পারল। উঁচুপাড়ার সেরা লম্পট, প্রতারক, শোষণকারী ব্যবসায়ী, কর্মচারী ও গণিকার দল সেখানে গদগদকণ্ঠে প্রার্থনা করছে, প্রণাম করছে, স্বর্ণমুদ্রা বর্ষণ করছে দেবদক্ষিণা হিসেবে। অর্ধনগ্ন এক মোটা পুরোহিত একটা বড় ধুনুচিতে আগুন জ্বালিয়ে তার আরতি করছে আর অপর একজন পুরোহিত মস্ত বড় একটা কাঁসার ঘণ্টা বাজাচ্ছে—ঢংঢং—ঢংঢং—ঢং ঢং

মিনাক্ষী ভক্তিনম্রকণ্ঠে বলল, "উনিই দেবতাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ"—

জানু পেতে প্রণাম করল মিনাক্ষী। অরিন্দম এদিক ওদিক তাকিয়ে পরম ঘৃণাভরে একবার দু'হাত যুক্ত করল, মনে মনে বলল, হাঁ, তোমার বীভৎস শক্তিকে আমি স্বীকার করছি হে অর্থদেব কিন্তু প্রতিজ্ঞাও করছি যে তোমাকে আমি ধ্বংস করব, কল্যানের দরিদ্র দেবতাকে এনে প্রতিষ্ঠিত করব তোমার আসনে। উঁচুপাড়ার অন্ধ দেবতা—সাবধান।

মিনাক্ষী উঠে দাঁড়াল, "এবার হলঘরে চলুন।"

দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হল তারা মন্দির থেকে বেরিয়ে। একটা চওড়া অলিন্দপথ। দু'পাশে ঘরের সারি।

অরিন্দম প্রশ্ন করল, "এই ঘরগুলো কিসের?"

মিনাক্ষী কটাক্ষ বর্ষণ করে বলল, "প্রেমিক যুগলদের গুঞ্জন-কক্ষ, ওপরেও অমনি ঘর আছে।"

অরিন্দম অর্থদেবের রূপের ব্যাখ্যা যেন এতক্ষণে খুঁজে পেল।

হলঘরের দরজায় গিয়ে অলিন্দটা দ্বিমুখী হয়ে আবার ডাইনে বাঁয়ে চলে গেছে। হলঘরের ভেতরে ঢুকল দুজনে।

মস্ত বড় হলঘরটার ছাদ বড় বিচিত্র ধরনের। একপ্রান্তে তা নীচু, বড় জোর হাত বারো, ক্রমে তা উঁচু হয়ে অর্ধচন্দ্রাকারে অপর প্রান্তে গিয়ে শেষ হয়েছে। হলঘরের সমস্ত আলো ছাদের ভেতরে গ্রথিত, আকাশের গায়ে লাগানো চাঁদ আর নক্ষত্রদের মত। যে প্রান্তদেশ নীচু—সেখানে একটা দু'হাত উঁচু গোলাকার বেদীর ওপর একদল বাদ্য যন্ত্রবিদ। বেহালা, পিয়ানো, বাঁশী, সেতার, বীণা, তব্‌লা, মৃদঙ্গ প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র সেখানে বাজাচ্ছে যন্ত্রীরা। তাদের প্রত্যেকের পোষাক একই রকমের—শ্বেতবর্ণ ও বহুমূল্য। ঘরের মেঝে কালো পাথরে মোড়া—তা এত মসৃণ যে দেখে কৃষ্ণবর্ণ দর্পণের কথা মনে পড়ে। বিপরীত প্রান্তে অর্ধচন্দ্রাকারে একটি টেবিলের দু'পাশে চেয়ার। অন্ততঃ দুশোজন লোক সেখানে বসতে পারে। টেবিলের ওপর সুদৃশ্য কাপড় বিছানো, তার ওপর আপেল, কমলা, কলা, নানারকমের ফল ও সারিবদ্ধ-ভাবে পাত্র সাজানো আছে। ঘরের অপর দুই অর্ধচন্দ্রাকার প্রান্ত জুড়ে এক সারি করে চেয়ার ও ছোট ছোট টেবিল। সেখানে সুসজ্জিত নর-নারীরা বসে হাসছে, শাড়ী গয়না পোষাক, নাটক ও চলচ্চিত্র, কেচ্ছা ও কুৎসার গল্প করছে, চা এবং সরবৎ পান করছে, কেউ কেউ মদ্যপানও করছে। চারদিকে অসংখ্য জানালার বাইরে থেকে কাঞ্চনলতার শাখা-প্রশাখা প্রস্ফুটিত পুষ্পগুচ্ছসমেত ঘরের ভেতরটা উঁকি মেরে দেখার চেষ্টা করছে। হলঘরের দে'য়ালের গায়ে একস... কঙ্কালের নৃত্য, নরনারীর রতিক্রিয়ার বিভিন্ন ভঙ্গী ও বিভিন্ন ভাবে মানুষকে হত্যা করার বীভৎস ছবিগুলো অঙ্কিত আছে। দেখে অরিন্দমের পালিয়ে যেতে ইচ্ছে হল। পশুদের ভীড়ে কেন এসেছে সে? কেন?

তবু রইল সে, সহ্য করল, নিঃশব্দে সব কিছু দেখতে লাগল।

মিনাক্ষী মুচকি হেসে বলল, "প্রাচীরগাত্রের ছবিগুলো দেখছেন? আজবনগরের সেরা শিল্পী উৎপল কুমারের আঁকা। ভালো না?"

অরিন্দম মাথা নেড়ে সংক্ষিপ্তভাবে বলল, "এমন ছবি আর দেখিনি।"

হলঘরের লোকদের দিকে তাকাল অরিন্দম। সেখানে সে অন্যান্য ভীড়ের মধ্যে আঘোরনাথ প্রসেনজিৎ ও বিনায়ককে দেখতে পেল। একদল যুবতীর মধ্যে তারা হাসাহাসি করছিলেন।

মিনাক্ষী চারদিকে একবার তাকিয়ে অরিন্দমের হাত ধরল। তাকে গোলাকার বেদীটার কাছে টেনে নিয়ে গিয়ে হাত তুলে বাজনা থামিয়ে দিল।

গলা চড়িয়ে সে ঘোষণা করল, "শুনুন, আজ আমাদের সঙ্গে একজন মাননীয় অতিথি পদার্পন করেছেন—ইনি—শ্রীযুক্ত অরিন্দম, আজবনগরের নতুন মাননীয় মন্ত্রীই সেই অতিথি। আপনারা জানেন যে কত অল্প সময়ের মধ্যে কত অল্প বয়সে তিনি এই সম্মানের অধিকারী হলেন—এমন একজন যোগ্য অতিথিকে আমরা আমাদের মধ্যে পেয়ে আজ নিজেদের ধন্য মনে করছি।"

সহর্ষ করতালি ধ্বনিতে হলঘর মুখর হয়ে উঠল।

প্রসেনজিৎ এগিয়ে এসে অরিন্দমকে একপাশে টেনে নিয়ে সহাস্যে বললেন, "নাও, এবার জীবনটাকে উপভোগ কর—শক্তির স্বাদ পাও"—

অরিন্দম হাসল। কিন্তু প্রসেনজিতের কথার অর্থ কি?

মিনাক্ষী ঘোষণা করল, "এবার সবাই খাবারের টেবিলে চলুন—আমাদের মাননীয় অতিথির সম্মানার্থে এবার প্রীতি-ভোজ হবে"—

সবাই গিয়ে খাবারের টেবিলে বসল। অরিন্দমকে মাঝখানে বসিয়ে তার পাশে বসল মিনাক্ষী।

নেপথ্যে একটা ঘণ্টা বাজল, সঙ্গে সঙ্গে সারিবদ্ধ সুসজ্জিত ভৃত্যেরা খাবার বয়ে আনতে লাগল।

কতরকমের খাবার। পোলাও, কালিয়া, চপ, কাটলেট, সিদ্ধ মাংস

মাংসের ঝোল, ঝল্সানো মাংস, কাবাব, মাছ, রসগোল্লা, সন্দেশ, পান্তুয়া ক্ষীরের সন্দেশ, রাবড়ি, সর, দই, পায়েস। আরো কত নাম-না-জানা খাবার। আর সশব্দে খেতে লাগল সবাই, চিবোতে লাগল, গিলতে লাগল, আবেশে চোখ তাদের বুজে এল, ঠোঁটের কোনে পরিতৃপ্তির রেখা হাস্যময় হয়ে উঠল। আর ওদিকে যন্ত্রীরা আবার বাজাতে সুরু করল। উত্তেজক সুর ও তাল।

অরিন্দম বিষম খেল। নীচুপাড়ার কোটি কোটি মানুষের রক্ত আর মাংস যেন খাচ্ছে সবাই, খাচ্ছে সে।

"কি হল, কি হল ?"

"আহাহা—কি হল ?"

মিনাক্ষী গায়ের উপর ঢলে পড়ে প্রশ্ন করল, "কি হল আপনার ? এখনো সেই মিষ্টি মুখের কথা ভাবছেন ?"

অরিন্দম হাসল, বলল, "না। এখন দুটি মিষ্টি মুখের কথা ভাবতে গিয়ে ধাক্কা খেলাম।"

মিনাক্ষী ঝক্‌ঝকে দাঁত মেলে বলল, "ইস্, আপনি যে দুষ্টও দেখতে পাচ্ছি"—

আবার চলল সেই গোগ্রাসে খাওয়ার পালা, কলহাস্য আর কলগুঞ্জন। চলল সেই উদ্দাম, উত্তেজক বাজনা। আর অরিন্দম ভাবতে লাগল। অর্থদেবের মূর্তির রূপটা যেন চেনা যাচ্ছে। কিন্তু এ কোথায় এসেছে সে ? এই কি সেই হাড়ের দুর্গ ? রাত কত ? কোন প্রহর ? এতো সেই মনিময় কক্ষ নয়। সেই বীণকারের বীণার তারে তো এখানে নটমল্লার মুখর হয়ে ওঠেনি। তবে ? তবে ?

মস্তবড় কয়েকটা রূপোর আসবাধার নিয়ে এল ভৃত্যেরা, প্রত্যেকের পানপাত্রে তারা একপ্রকার তরল পদার্থ ঢেলে দিয়ে গেল। সবাই তা পিপাসার্তের মত সাগ্রহে পান করল। অরিন্দম স্পর্শ করল না।

মিনাক্ষী প্রশ্ন করল, "আপনি খেলেন না ?"

অরিন্দম মাথা নাড়ল, "না। এটা কি বলুন তো ?"

"কাঞ্চন-মদিরা—সোনা থেকে যে রস নির্গত হয় তা দিয়ে তৈরী—বহুমূল্য জিনিষ আর শক্তিবর্দ্ধক। খান"—

"না"—

সকলে তাকাল অরিন্দমের দিকে। মুহূর্তে চীৎকার সুরু করল সবাই।

"খান"—

"খান"—

"মন্ত্রীবর, পান করুন"—

"পান করুন"—

মিনাক্ষী দ্রুতকণ্ঠে বলল, "শিগ্‌গীর খেয়ে ফেলুন, কাঞ্চন-মদিরা পান না করলে অপমানিত হবেন সবাই, শিগ্‌গীর, সবাই উত্তেজিত হয়ে পড়েছে"—

"নেশা হবে যে। আমি তো নেশা করি না।"

"কে বললে নেশা হবে ? মধুর চেয়েও মিষ্টি জিনিষ—অমৃতের মত।"

অরিন্দম তাকাল চারদিকে। সবাই তার দিকে কুটিল দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছে। তারা যেন তাকে সন্দেহ করছে। পান না করলে হয়ত এখনি একটা গণ্ডগোল সুরু হয়ে যাবে। না, তা উচিত হবে না। অরিন্দম পাত্রটা তুলে মুখে লাগাল। তরল, রক্তবর্ণ পানীয়, সত্যি ভারী সুস্বাদু। সমস্তটা পান করল সে।

মিনাক্ষী তার হাতের উপর হাত রেখে মৃদুকণ্ঠে বলল, "আপনি লক্ষ্মী ছেলে অরিন্দমবাবু"—

অরিন্দম জবাব দিল না। রক্তবর্ণ এই তরল পানীয়ের সঙ্গে কি কারো রক্ত মেশানো আছে ?

অঘোরনাথ উঠে দাঁড়ালেন, গলা চড়িয়ে বললেন, "আমাদের নূতন মন্ত্রী দীর্ঘজীবি হোন"—

সবাই প্রতিধ্বনি তুলল, "নতুন মন্ত্রী দীর্ঘজীবি হোন্"—

অঘোরনাথ বললেন, "তাহলে এবার নাচগান আর ফুর্তি আরম্ভ হোক"—

সবাই প্রতিধ্বনি তুলল, "ফুর্তি হোক"—

বাজনার সুর বদলে গেল, তাল দ্রুত হয়ে উঠল, হলঘরের আলোর রং অদৃশ্য কোন হাতের স্পর্শে নীলাভ হয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের মাঝখান থেকে একটি ষোল সতেরো বছরের সুন্দরী যুবতী দৌড়ে হল-ঘরের মসৃণ মেঝের ওপর গেল আর তাকে অনুসরণ করল একটি কুড়ি বাইশ বছরের সুদর্শন যুবক। যুবতীকে ধরতে গেল সে, যুবতী লীলাচ্ছলে সরে গেল, ছুটে পালাল আর একদিকে। বাজনার দ্রুততালের সঙ্গে তাল মিলিয়ে যুবকটি আবার ছুটে গেল যুবতীর দিকে। এঁকেবেঁকে, বৃত্তাকারে পালাতে লাগল যুবতী কিন্তু হঠাৎ যুবকটি একবার গতিবেগ বাড়িয়ে যুবতীকে ধরে ফেলল। যুবতী হাত ও চোখের ভঙ্গী দিয়ে যুবককে সদয় হতে অনুরোধ জানাল। যুবক শুনল না, সে তার শাড়ী ও ব্লাউজ ধরে টান দিল। শাড়ী ও ব্লাউজ মেঝেতে পড়ে গেল। যুবতীর দেহে শুধু অন্তর্বাস ও বক্ষবাস। সুগঠিত শুভ্র দেহকান্তি দেখে হলঘরের পুরুষেরা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করল। যুবতী ক্ষণকালের জন্য মাথা নীচু করল, যুবক তার চারদিকে বৃত্তাকারে একবার ঘুরে এসে তার সামনে দাঁড়ালো। হঠাৎ যুবতী ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল, সেও এবার যুবকের পোষাক ধরে টান দিল। শুধু অন্তর্বাস-পরিহিত যুবকের পেশল দেহ-সৌন্দর্য দেখে হলঘরের মেয়েরা দু'হাতে মুখ ঢাকার ভান করে আঙুলের ফাঁক দিয়ে আবার তাকে দেখতে লাগল। বাজনা আরো উদ্দাম হয়ে উঠল, মৃদঙ্গ ধ্বনিত হল। কামোদ্দীপক নৃত্য সুরু করল যুবক যুবতী।

মিনাক্ষী অরিন্দমের গায়ের সঙ্গে ঘন হয়ে বলল, "চমৎকার—তাই না?" তার গলাটা যেন জড়িত, কম্পিত মনে হল অরিন্দমের।

মাথা নেড়ে অরিন্দম কিছু বলতে গিয়ে কথা বলতে পারল না।

সবিস্ময়ে সে অনুভব করল যে তার জিভটা যেন ভারী হয়ে উঠছে, ক্রমশঃ তার মাথাটা ঝিম্‌ঝিম্ করছে, তার সমস্ত স্নায়ুতে যেন একটা অদৃশ্য কম্পন খেলে যাচ্ছে। কি হল তার? সোজা হয়ে বসবার চেষ্টা করল সে, কিন্তু পারল না। তার সমগ্র চেতনাতে যেন একটা ঝিল্লীরব শুরু হয়ে গেল, তার দেহটা যেন একটা বিরাট শূন্যতার মাঝখান দিয়ে সবেগে নীচে নেমে যাচ্ছে। একি হল তার? নেশা? মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে সে এই অবস্থান্তরকে যেন ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করল কিন্তু কমল না, ক্রমেই তার নেশা বাড়তে লাগল। তার চোখের সামনে যেন মাঝে মাঝে একটা সূক্ষ্ম, স্বচ্ছ যবনিকা দুলতে লাগল। ক্রমেই তার চেতনা যেন একটা অস্পষ্ট কুয়াশার মধ্যে হারিয়ে যেতে লাগল।

মিনাক্ষীর গলা শোনা গেল কানের পাশে, "অরিন্দম বাবু, আপনার কেমন লাগছে?"

"উঁ?"

"ঝিমিয়ে পড়লেন যে?" মিনাক্ষীর দু'চোখে কৌতুক।

মাথা নেড়ে নেড়ে হাসল অরিন্দম, বলল, "উঁহু"—

স্তিমিত, আচ্ছন্ন দৃষ্টি মেলে সে সামনের দিকে তাকাল। যন্ত্রীরা পাগলের মত বাজাচ্ছে, মৃদঙ্গনিনাদে সারা ঘরটা যেন থরথর করে কাঁপছে। সেই নৃত্যরত যুবক যুবতীর দেহলাস্য, চোখের চাহনি, তাদের আলিঙ্গনের ভঙ্গী আরো উদ্দাম ও অশ্লীল হয়ে উঠেছে। আর কি আশ্চর্য ঐ যুবতী নর্তকীর দেহকান্তি! অতি ক্ষীণভাবে মনে পড়ল তার। কিন্তু কোথায়? কোথায় সেই মনিদীপ্তি? নটমল্লারের তান নয়, বাহারের আলাপ নয়, দেবী ভেনাসের মত মত সুন্দরী সেই নীলনয়না নর্তকী নয়, সেই সুদর্শন নর্তক নয়, সেই আনন্দময় পুতুলেরা নয়। এরা কারা, কারা? বহুদূর থেকে কে যেন ডাকছে! কে? কি বলছে? না, আর শোনা যাচ্ছে না, আর মনে পড়ছে না। কে তার হাত ধরল? তার হাতটা যেন কার উত্তপ্ত স্পর্শে পুড়ে যাচ্ছে! পাশের দিকে তাকাল

সে। মিনাক্ষী তার দিকে তাকিয়ে হাসল। মিনাক্ষীর ঠোঁট দুটো কী লাল ?

হঠাৎ সেই নীল আলো যেন ম্লান হয়ে এল। যেন অমাবস্যার পরবর্তী প্রতিপদের চন্দ্রালোক। ক্ষীণ, রহস্যময়। ঘরের সবাই এবার নাচতে সুরু করল। প্রত্যেকের পদক্ষেপ অসংযত, প্রত্যেকের পরিধেয় শিথিল হয়ে পড়েছে, মেঝেতে লুটোচ্ছে। নৃত্যের গতিবেগ বাড়াল। পুরুষেরা সঙ্গিনীদের অদলবদল করল। প্রত্যেকেই পরস্ত্রীর, পরের বোনের সঙ্গে নাচতে সুরু করল। অরিন্দম চমকে উঠল, সর্পনির্মোকের মত মসৃণ অথচ উত্তপ্ত দুটি হাত দিয়ে তাকে বেষ্টন করে আকর্ষণ করছে মিনাক্ষী।

"নাচুন অরিন্দমবাবু"—

"আমি—জা--নি—না"—

"না জানলেও এখানে নাচতে পারবেন"—

অরিন্দম হাসল, মিনাক্ষীর আকর্ষণে পা বাড়াল। আর ঠিক সেই সময়েই ঘরটা একেবারে অন্ধকার হয়ে গেল।

"একি হোল ?" অরিন্দম জড়িতকণ্ঠে বলল, "দেখতে পাচ্ছিনা যে ?"

মিনাক্ষী তার কানে কানে বলল, "ওটা সাময়িক। একটু বাদেই আবার আলো জ্বলবে, আবার নিভবে। প্রত্যেকবারে অন্ধকারে সঙ্গী সঙ্গিনীদের বদলে নিয়ে এই নাচের খেলা চলবে। কিন্তু অরিন্দম—"

"উঁ ?"

মিনাক্ষী অরিন্দমের গায়ের সঙ্গে গা মিশিয়ে ..ল, বলল, "আমি বদলাতে চাইনা তোমাকে—"

"কেন ?" মিনাক্ষীর দেহ কি কোমল! তার দেহের উত্তাপ যেন অরিন্দমের দেহেও সঞ্চারিত হচ্ছে।

"শুনবে ?"

"শুনব।" নারীদেহের স্পর্শ আর গন্ধ কি বিচিত্র! কে? কার মুখটা ভেসে গেল? না, চিনি না, জানি না।

"তবে ওপরের একটা ঘরে চল।"

"চল।"

ঘর থেকে বেরোবার জন্য সন্তর্পণে এগোল দুজনে। ঘরের মধ্যে তখন খিলখিল হাসি আর নানারকমের শব্দ ও পদক্ষেপ। আর আশ্চর্য এই বাজনা, নারীদেহের মতই উত্তেজক।

সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠল দুজনে। সামনেই একটা ঘর—তার দরজাটা কারাগৃহের লোহার শিকওয়ালা দরজার মত। সেই দরজা দিয়ে প্রায় তিরিশ জন সুন্দরী যুবতীকে দেখা গেল। তাদের বেশভূষা ছিন্ন, মলিন।

"এরা কারা?"

মিনাক্ষী হাসল, "নতুনত্বের স্বাদ পাবার জন্য অনেকে ফুসলে, টাকা দিয়ে কিনে, জোর করে ধরে, টাকার প্রলোভন দেখিয়ে এদের নিয়ে আসে। শেষ রাতে এরা ঐ সব কামরাগুলোতে অনেকেরই শয্যাসঙ্গিনী হবে। এই যে আমাদের ঘর—"

ঘরের ভেতর প্রবেশ করল তারা।

মিনাক্ষী বলল, "অরিন্দম, দরজা বন্ধ করে দিলাম"—

অরিন্দমের চেতনা লোপ পেয়ে গেছে, জড়িতকণ্ঠে সে হেসে বলল, "দাও—দাও"—

দরজা বন্ধ করে অরিন্দমের পাশে এসে দাঁড়াল মিনাক্ষী।

অরিন্দম টলতে টলতে চারদিকে তাকাল। মেঝে থেকে বারো চোদ্দ হাত উঁচুতে ছাদটা পঁচিশ গজ সমান্তরাল ভাবে গিয়ে হঠাৎ অর্ধচন্দ্রাকারে ওপরের দিকে উঠে গেছে আর ঠিক সেইখানের মেঝে থেকে দশধাপ সিঁড়ি ওপরে উঠে একটা মঞ্চাকার জায়গায় থেমেছে। সেই মঞ্চের দুপাশে কারুকার্যখচিত প্রস্তরস্তম্ভ, পেছনদিকে

লতামণ্ডিত দেয়াল ও জানালা আর মাঝখানে একটি পালঙ্ক। দুগ্ধ-ফেননিভ শয্যার পাশে একটা ছোট্ট টেবিলে রাখা আছে একগুচ্ছ রক্তপদ্ম। ঘরের মাঝখানে কয়েকটা দামী আসবাবপত্র আর দে'য়ালের গায়ে সেই হলঘরের মতই ছবি আঁকা।

"অরিন্দম—"

"উঁ?" নিজের কণ্ঠস্বর নিজের কানে অদ্ভুত লাগে। ওকি? মিনাক্ষীর চোখ দুটোতে ও কিসের নিমন্ত্রণ? আমি কোথায়?

"শুনবে?" মিনাক্ষীর কণ্ঠস্বর যেন তার নরম হাতের ছোঁয়াচের মত।

"বল—বল—" বেশ লাগছে, মাথার ভেতর যেন ফুরফুর করছে! আর মিনাক্ষীর হাসি কি সুন্দর!

মিনাক্ষী এগোতে লাগলো সেই মঞ্চটার দিকে, যেতে যেতে তার শাড়ীর আঁচলটা লুটিয়ে পড়ল সিঁড়ির ওপর। ওপরে উঠে সেই পালঙ্কের উপর সে ললিত ভঙ্গীতে বসে মৃদুমন্দ হাসতে লাগল।

"বল—বল—" সমস্ত দেহময় এ কিসের আকুতি, কণ্ঠে তার এ কোন পিপাসা?

মিনাক্ষী বলল, "তুমিই আমার মনের মানুষ অরিন্দম—উঃ, বড় গরম—" বলেই সে তার জামার বোতাম খুলতে শুরু করল।

অরিন্দমের শরীরটা যেন শূন্যতার ভেতর দিয়ে পড়ছে, পড়ছে, পড়ছে। মিনাক্ষীর বক্ষদেশ কি শুভ্র!

"মীনাক্ষী—"

"এসো"—

"তুমি সুন্দর"—

"এসো"—

পা টলে, তবু এগোল অরিন্দম। চোখের সামনে সব কিছু যেন ঝাপসা, চেতনা যেন কোন অতল সমুদ্রে ডুবে যাচ্ছে। শুধু একটিমাত্র অনুভূতি—সে পুরুষ। শুধু একটি মাত্র কামনা—মিনাক্ষীকে সে বুকে

নিয়ে পিষে ফেলবে। দু'চোখ জ্বলতে থাকে তার, ঠোঁটটা শুকিয়ে আসে, একটা উত্তাল তরঙ্গ দেহময় গড়াতে থাকে।

সিঁড়ির ওপর পা দিল সে।

"মিনাক্ষী"—

"এসো"—

"তোমার ঠোঁট দুটো কি প্রবালের ?"

"এসো"—

হঠাৎ টাল সামলাতে পারল না অরিন্দম, ওপরের ধাপ থেকে সে পা পিছলে নীচে গড়িয়ে পড়ল।

"অরিন্দম !"

অরিন্দম জ্ঞান হারাল। কয়েক মুহূর্তের জন্য। জ্ঞান ফিরে আসতেই উঠে বসল সে। সারা দেহে তার অসহ্য বেদনা। জিভে একটা লবণাক্ত স্বাদ পেয়ে সে ললাটে হাত দিল। কেটে গেছে সেখানটা, রক্ত বেরোচ্ছে। এ কোথায় এসেছে ? কোথায় ? মনে পড়ল। সব কিছু মনে পড়ল। সে ঘুরে বসল। সামনে মিনাক্ষী।

"খুব লেগেছে অরিন্দম ?

অরিন্দম জবাব দিল না। মিনাক্ষীর অর্ধ নগ্ন দেহ।

"চল, বিছানায় শুয়ে একটু জিরোও"—মিনাক্ষীর হাতটা সাপের মত অরিন্দমের কণ্ঠবেষ্টন করল।

"না"—মিনাক্ষীর হাতটা সজোরে ছাড়িয়ে দিল অরিন্দম।

মনে পড়েছে। কুয়াশা ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে, পায়ের তলায় শক্ত পৃথিবী ফিরে এসেছে। কে ডাকছে ? বুঝেছি। শুনেছি প্রহরী, আমি জেগে আছি। ললিতা, আমি তোমার।

দরজার দিকে পা বাড়াল অরিন্দম। এখনো নেশার রেশ আছে। ধন্যবাদ হে সিঁড়ি, তুমি আমার চৈতন্য ফিরিয়ে দিয়েছ।

"অরিন্দম—কোথায় যাচ্ছ ?"

"বাড়ী।"

"কেন ?"

"আমার ভাল লাগছে না, আমার শরীর খারাপ, আমার খুশী।"

"না"—

ছুটে দরজার গোড়ায় গিয়ে দাঁড়াল মিনাক্ষী, নিজের দেহকে অনাবৃত করে দিয়ে বলল, "না, তুমি যেতে পারবে না"—

অরিন্দম তাকে টেনে সরিয়ে দিল একপাশে।

তার চোখের অস্বাভাবিক দীপ্তি দেখে মিনাক্ষী দু'হাতে মুখ ঢেকে ঘুরে দাঁড়াল। ঘৃণা, অরিন্দমের চোখে ঘৃণা।

দরজাটা খুলল অরিন্দম। তাড়াতাড়ি। তারপর সে ছুটে পালাল সিঁড়ি বেয়ে। কোনদিকে তাকাল না সে, ঊর্ধশ্বাসে বাইরে বেরোল, ফটক পেরিয়ে রাস্তায় পা দিল। আঃ, বাঁচা গেল।

রাস্তা থেকে একটা গাড়ী ভাড়া করে সে সোজা বাড়ী গেল। কি যেন মনে পড়ল তার। সোজা ঘরে গিয়ে সে আলো জ্বালল, দর্পণের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। হ্যাঁ, ললিতার কথা ঠিক। তার চোখে কালো ছায়া। শক্তি আর ঐশ্বর্যের হিংস্রতা তার মুখকে অন্ধকার করে তুলেছে। রাহুগ্রস্ত চাঁদের মত অন্ধকার হয়ে গেছে তার আত্মার মুখ। সে ভয় পেল, বাতি নিভিয়ে দিল। ঘরের মধ্যে অন্ধকারেই সে বসে রইল। রাত গভীর হল, তবু তার ঘুম এল না, কাঞ্চন মদিরার পীড়াদায়ক প্রতিক্রিয়াটা তখনো তার দেহে, মস্তিষ্কে ঝিম্‌ঝিম্ করতে লাগল। উঁচুপাড়ার ঘরে ঘরে তখনো মত্ততার আলো জ্বলছে। বহুদূর থেকে বিচিত্রপুরের অন্য কোন সহরগামী একটা লৌহশকটের তীক্ষ্ণ বংশীধ্বনি ভেসে এল। একা। ললিতা পরিত্যাগ করেছে। মুকুন্দ তাকে ঘৃণা করে, নীচুপাড়ার জনতা তাকে শত্রু বলে মনে করে। হ্যাঁ, তাদের কথায় সত্যতা আছে। শক্তি মানুষকে রক্ত মাংসের দাস করে, শক্তি মানুষের মনে বিকারের সৃষ্টি করে। না, আর দেরী করা যায় না, আর

দেরী করলে সে হয়ত আজকের চেয়েও মারাত্মক বিপদে পড়বে। আজ সে দৈবক্রমে জ্ঞান ফিরে পেয়েছে, কিন্তু অন্যদিন? ললিতা তুমি কোথায়? সমস্ত ইন্দ্রিয়ের একটি আকুল প্রার্থনা,-তার আত্মার একটি তৃষ্ণা—ললিতা। সে একা, তার আত্মা বিপন্ন—কালই সে তার আত্মার আত্মার কাছে যাবে। কিছু বলবে না সে, কিছু চাইবে না, শুধু দূর থেকে দেখবে একবার। দেখতেই হবে তাকে, পাহাড়ের চুড়ো থেকে তাকে যে এবার লাফ দিতেই হবে। প্রহরী, তোমার ডাক যেন না থামে।

রাতটা যেন আর শেষ হয় না।

সারারাত বসে বসে কাটাল অরিন্দম। সারারাত ধরে অপেক্ষা করল ভোরের জন্য। ভোর হোক, ভোর হোক, সে আর সহ্য করতে পারছে না। মানুষের জীবনে এ কী অদ্ভুত ব্যাপার এই ভালবাসা! একটি নারীর মুখ কিভাবে দুর্বল করে পুরুষকে, কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করে তার সমস্ত কর্ম! না, সে তার উর্ধে। তবু সে যে মানুষ, রক্ত আর মাংসের ভেতর তার আত্মার পিপাসা। ললিতা, তুমি প্রসন্ন হও।

ভোর হল। রাতের কুহকজাল রক্তবর্ণ সূর্যদেবের রথের চাকায় ধুলোর মত উড়ে গেল। আজবনগরের জীবনযাত্রা নতুন করে সুরু হল।

ললিতাকে দেখতে হবে একবার।

কিন্তু নীচুপাড়ার জনতা যদি আজও তাকে চিনতে পারে!

অত্যন্ত সাধারণ পোষাক পরে অরিন্দম বেরোল। সন্তর্পণে, এদিক ওদিক তাকিয়ে। প্রসেনজিতের কথা মনে পড়ল তার। মন্ত্রীদের নীচুপাড়ায় যাওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। সুতরাং তাকে সাবধানে যেতে হবে। গুপ্তচর এবং নীচুপাড়ার জনতা—সবার দৃষ্টিকে এড়িয়ে।

নির্জন অলিগলি দিয়ে চলতে সুরু করল সে।

মাথার ওপরে সূর্যদেবের আলো। শীত শেষ হয়েছে, আজ থেকে

বসন্ত সুরু হল, তবু বাতাসে শীতের আমেজ আছে। আলোর মধ্যে আছে উত্তেজক উত্তাপ। আর আকাশ কি ঘন-নীল!

একটা গলি শেষ হল একটা বড় রাস্তায়। সেটা অতিক্রম করে অন্য একটা গলিতে তাড়াতাড়ি ঢুকতে হবে। তা নইলে কেউ চিনে ফেলতে পারে।

কিন্তু পা বাড়াতে গিয়ে গলির মুখে থমকে দাঁড়াল সে। বড় রাস্তার ডানদিক থেকে একটা মিছিল এগিয়ে আসছে। অন্ততঃ পাঁচ হাজার লোকের একটা বিরাট জনতা।

জনতার ঘোষণা ভেসে এল তার কানে, "আমাদের মুক্তি দাও, মানুষ হতে দাও"—

"আমাদের মানুষ হতে দাও"—

"মানুষ হতে দাও"—

সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠল অরিন্দমের। আনন্দে, উল্লাসে। মানুষ জাগছে, সংঘবদ্ধ হচ্ছে! তার স্বপ্ন তাহলে সার্থক হবে?

মিছিল কাছে এগিয়ে এল। রাস্তার দু'পাশে কৌতূহলী মানুষেরা জড় হল, বাতায়ন-পথে নারীদের মুখ দেখা গেল। অরিন্দম মুখ ঢাকল, তাকে কেউ না দেখতে পায়। জনতার দৃপ্ত পদক্ষেপ আর ঘোষণা তার বুকে এক উদ্দাম আবেগের সৃষ্টি করল, মনে মনে সে বলল, তোমরা আমার স্বপ্ন, তোমাদের এই রূপটিই তো পৃথিবীময় পরিব্যাপ্ত করতে চাই আমি। ভাই সব, তোমরা একদিন বুঝবে যে আমিও তোমাদের দলের দলী।

শ্রদ্ধায় তার মাথা হঠাৎ অবনত হয়ে এল। জনতার পুরোভাগে সে যাকে দেখতে পেল সে আর কেউ নয়, মনিশঙ্কর। অনেক পরিবর্তন হয়েছে তার—শরীরটা রোগা হয়ে গেছে আরো। সারা দেহে চিন্তা, ক্লান্তির সুস্পষ্ট ছাপ। কিন্তু তাছাড়াও আরো কিছু ছিল তার মুখে চোখে। এক অন্তর্দাহী জ্বালা আর আগুন ধিক্ ধিক্ করে জ্বলছে তার মধ্যে।

"আমাদের মানুষ হতে দাও"—

"অন্ন দাও"—

"বস্ত্র দাও"—

"জীবনকে সুন্দর করতে দাও"—

"স্বপ্নকে সত্য করতে দাও"—

"মানুষ হতে দাও"—

হ্যাঁ, হ্যাঁ, মানুষকে মানুষ হতে দাও ভাই মানুষ, জীবনকে সূর্যের মত বহ্নিমান, পদ্মের মত পবিত্র করতে দাও। ওঠো—জাগো—বিস্মৃতি ও বিভ্রান্তি ঠেলে উঠে দাঁড়াও—ও—ও—

ওকি!

জনতা হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠল, তাদের দৃষ্টি সামনের দিকে তাকিয়ে ঘৃণায় জলে উঠল। অরিন্দম তাকাল সেদিকে। বাষ্পীয় শকটে চড়ে অন্ততঃ দুশো আগ্নেয়াস্ত্রধারী রক্ষী আসছে মিছিলের দিকে।

এসে পড়ল রক্ষীরা। তারা লাফিয়ে পড়ল রাস্তায়। দু'পাশের দর্শকেরা গলির মাঝে দৌড়ে আত্মগোপন করল, বাতায়ন থেকে শিশু ও নারীদের শঙ্কিত ভয়ার্ত মুখ অদৃশ্য হল।

একজন উচ্চপদস্থ রক্ষী-প্রধান চীৎকার করে উঠল, "ফিরে যাও, বাড়ী যাও, সরকারের প্রতি হিংসা করো না"—

মনিশঙ্কর একপা এগিয়ে নির্ভীক কণ্ঠে উত্তর দিল, "আমরা হিংসাকে ঘৃণা করি তাই সরকারের হিংসাকেও ঘৃণা করি। আমাদের মানুষ হওয়ার দাবীকে সরকার মেনে নিক, আমরা সানন্দে বাড়ী ফিরে যাব"—

রক্ষী-প্রধান কর্কশকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল, "যাবে না?"

"না—আমাদের মানুষ হতে দাও"—

"যাবে না?"

"না"—

"তাহলে আক্রমণ কর রক্ষীরা"—

একদল রক্ষীরা ঝাঁপিয়ে পড়ল মনিশঙ্করের ওপর। তাকে তারা টেনে নিয়ে গেল একপাশে।

মনিশঙ্কর বজ্রকণ্ঠে বলল, "ভাইসব, পেছু হটো না—ওদের হিংসার সামনে অটলভাবে মাথা তুলে দাঁড়াও। মানুষের মধ্যে যে মহত্ত্ব আছে তার প্রমাণ দাও"—

"চোপরও শালা"—

ভারী জুতোর লাথিতে মনিশঙ্কর মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ল।

জনতার বজ্রনির্ঘোষ ধ্বনিত হল, "আমরা নড়ব না, পেছোব না"—

"আমরা অনেক সহ্য করেছি"—

"মানুষ হয়ে পশুর মত থাকব না আমরা"—

"কোটি কোটি মানুষের ঘোষণা শোন"—

"আমাদের মানুষ হতে দাও"—

রক্ষী-প্রধান উন্মাদের মত গর্জে উঠল হঠাৎ, "আগুনের গোলা ছাড়ো—মারো—মেরে বারুদের লাশ করে দাও"—

মুহূর্তে যেন ভোজবাজীর মত নিমেষে ঘটল সব। বীভৎস দৃশ্য। আগ্নেয়াস্ত্র গর্জে উঠল। বারুদের ধোঁয়া আর গন্ধে বাতাস মন্থর হয়ে উঠল। আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়ল অনেকে—অনেক ইন্দ্র, মুকুন্দ আর মনিশঙ্কর। লাঠির আঘাতে মাথা ফাটল, রক্ত গড়াল জলের ধারার মত কালো পথ বেয়ে। আর্তনাদ, গর্জন, অগ্নিবর্ষণ। আর্তনাদ, গর্জন, অগ্নিবর্ষণ। উন্মত্ত মনিশঙ্করের চীৎকার আর রক্ষীপ্রধানের পদাঘাত। রক্ষীদের বীভৎস, হিংস্র, নিষ্ঠুর মুখ, আগ্নেয়াস্ত্রের ঝক্‌ঝকে নল আর আগুন। ওদিকে রুদ্ধদ্বার ভাঙা ভাঙা বাড়ীতে আর্তনাদ আর সভয় চীৎকার।

অরিন্দম চোখ বুজল। চেতনা তার লুপ্ত হবার উপক্রম হল। কি করছে সে? এই গলিতে দাঁড়িয়ে তার মনুষ্যত্ব কি শুধু দর্শকের ভূমিকাতেই তৃপ্ত ও শান্ত থাকবে?

চোখ মেলল সে। রাস্তা ফাঁকা হয়ে এসেছে। মিছিল ভেঙে গেছে, লোকেরা পালিয়েছে। শুধু নিহত ও আহতেরা পড়ে আছে।

রক্ষীদের গাড়ী ফিরে চলতে আরম্ভ করেছে। বহু লোককে গ্রেপ্তার করেছে তারা। মনিশঙ্কর কোথায়? অরিন্দম তাকে দেখতে পেল না। শুধু তার কণ্ঠস্বর ভেসে এল তার কানে।

মনিশঙ্করের কণ্ঠস্বরে যেন অভিশাপ, "হিংসা, হিংসার সামনে মানুষের পশুত্ব হার মানল, কিন্তু আজই তো শেষ কথা নয়, আজই তো ইতিহাস শেষ হল না। আজ পালাল, মরল, কিন্তু অন্যদিন? অন্যদিন তারা ভয় পাবে না, মরবে না, পালাবে না, হিংসাকে ঠেলে এগোবে তারা—শোন, শোন"—

গাড়ীগুলো এসে গেল।

ধূলো উড়ল।

ধূলো সরে গেল।

রক্ত আর মৃত মানুষেরা।

আহতদের আর্তনাদ।

অরিন্দমের শরীর অবশ হয়ে এল। কি করছে সে? কি করল সে? কি করবে সে? ওরে ক্লীব, ওরে ভীরু, ওরে পলাতক কাপুরুষ, আর কত দেরী? কত দেরী? নিজের অহমিকার দুর্গে আত্মগোপন করে তুই কবে বীরত্ব দেখাবি, কবে তোর মনুষ্যত্বের প্রমাণ দিবি?

এদিক ওদিককার গলি থেকে ভয়ে ভয়ে বেরিয়ে আসছে নারীরা, পুরুষেরা। আহতদের তারা কাঁদতে কাঁদতে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

আর মৃতেরা? ওপরের মুক্ত আকাশের দিকে তাকিয়ে তারা সূর্যদেবের দানকে গ্রহণ করছে। কাঞ্চন-মদিরা নয়। সুবর্ণ মদিরার মত উত্তেজক আলো। মৃত্যু দিয়ে তারা জীবনের জয়গান করে গেল। মহাজীবনের প্রতিষ্ঠা করে গেল।

আর না, আর এখানে নয়, আর মুহূর্তমাত্র বিলম্ব নয়।

অরিন্দম পা বাড়াল।

দ্রুতপদে, চোরের মত, তস্করের মত সে এগিয়ে চলল।

গলির অন্তহীনতা অবশেষে শেষ হল।

উত্তেজিত ভগ্নকণ্ঠে সে ডাকল, "ললিতা"—

বাড়ীটা নিঝুম।

এখানেও বারুদের গন্ধ।

মৃত্যুর মত ঠাণ্ডা হাওয়া।

"ললিতা"—

বাড়ীর ভেতরে একটা চাপা কান্না শোনা গেল এবার। কে যেন চাপা কণ্ঠে ডুকরে ডুকরে কাঁদছে। কে? কে কাঁদে? কেন? মুকুন্দও কি ছিল ঐ মিছিলে? মুকুন্দ কি?—

"ললিতা"—

কোন শব্দ নেই, সাড়া নেই। শুধু সেই কান্না। একটানা। মেরুপ্রদেশের হাড়-কাঁপানো ঝিরঝিরে ঠাণ্ডা বাতাসের মত। কে কাঁদে? নীচুপাড়ার লক্ষ্মী?

"ললিতা"—

মৃদু পদশব্দ।

ললিতা।

"তুমি! আবার এসেছ!"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ ললিতা"—

কিন্তু এ কোন ললিতা! দু'দিনেই একি চেহারা হয়েছে তার? রুক্ষ কেশপাশ, ভাঙ্গা গাল, নিষ্প্রভ চোখ, ক্ষীণ কণ্ঠ, বিয়োগান্ত মর্মর-মূর্তির মত প্রাণহীন! কেন?

"কেন এসেছ তুমি? কি চাও?"

"তোমাকে দেখতে চাই।"

"কি হবে দেখে?"

"পাহাড়ের চূড়ো থেকে লাফ দেবার আগে একবার শক্তি চাই।

"কিন্তু আমার কোন শক্তি নেই। ক্ষুধায় আমার ভাই বোন মারা গেছে—আমার শক্তি গেছে—যা ছিল তাও গেছে আজ"—

"কি বলছ তুমি ললিতা?"

"মন্ত্রীবর, তুমি দেখবে?"

"কি?"

"যা বলছি"—

"কি?"—

"এসো"—

নিঃশব্দে ললিতাকে অনুসরণ করল অরিন্দম। কি বলছে ললিতা? কি দেখাবে সে? কেনই বা বাড়ীটা আজ নিঝুম? আর কে কাঁদছে?

ভেতরের একটা ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল ললিতা। ঘরের দরজাটা ভেজানো।

সে বলল, "দাঁড়াও"—

দরজাটাকে সন্তর্পণে ঠেলে খুলে দিল ললিতা, বলল, "দেখো"—

কি দেখল অরিন্দম? যা দেখল তা কি সত্যি? দু'চোখ রগড়ে দেখল অরিন্দম। না, মিথ্যে নয়। ঘরের মাঝখানে, ছাদের বাঁশ থেকে একটা দড়ি ঝুলছে আর সেই দড়িতে ঝুলছে বলরাম। গলায় দড়ি দিয়েছে সে। মুখের, গলার শিরগুলো তার কালো হয়ে ফুলে আছে। বিস্ফারিত চোখের কোণে, হাঁ-করা মুখের কসে রক্ত জমে আছে। আর জিভটা বেরিয়ে এসেছে তার, প্রায় আধ হাত। বীভৎস দৃশ্য।

ঘুরে দাঁড়াল অরিন্দম। সে আর সহ্য করতে পারছে না।

ললিতার কথা শোনা গেল, "দেখছ? আমার আর শক্তি নেই। কি শক্তি দেব তোমায়? আমার ওপর নির্ভর করো না। কি করে থাকে শক্তি? ক্ষুধার জ্বালায় বাপকে পাগল হয়ে যেতে দেখেছি, পাগল হয়ে আত্মহত্যা করতেও দেখলাম। এত দেখাতে শক্তি কি ফুরোবে না?"—

"ললিতা—থামো"—

"থামছি। তারপর? আর কি চাই তোমার? আমাকে আলিঙ্গন করবে"—

"ললিত'—তুমি নিষ্ঠুর হয়োনা"—

"না না, আমি নিষ্ঠুর হব না। নিষ্ঠুর হবে আজবনগরের শাসকেরা—তুমি—তুমিও তো তাদের একজন। এখানে বসে বসে আমি বারুদের গন্ধ পেয়েছি। আমি জানি যে আজ অসংখ্যের মৃতদেহের ওপর তোমাদের বিজয়পতাকা উড়ছে"—

"ললিতা, আমি যাই"—

"যাবে? এখুনি? আমার আজ শক্তি নেই—কিন্তু তুমি আমার প্রিয়তম বলে আমায় আজ বুকে নিতে পারো, চুমু খেতে পারো—আমাকে তোমার বিলাস-শয্যায় নিষ্পেষিত করতে পারো"—

"ললিতা, আমি যাই"—

"যাবে কেন, বোস—গল্প কর—কি ভাবছ? ঐ কান্না? মা বুড়ী কাঁদছে। উহুঁ, ভালবাসা নয়। কে খাওয়াবে বল? দাদা তো হতচ্ছাড়া। বাপ বেকার ছিল, তবু কাজ পেতেও তো পারত।"

"না, আর সহ্য করতে পারছি না আমি"—

"শোন। আমার গয়না পরার সখ ছিল বরাবর, তুমি তো মন্ত্রী হয়েছ—দাওনা কয়েকটা গয়না এবার? বাবা মরেছে বলছ? মরুকগে ছাই—পৃথিবীতে বেঁচে থাকে কে?"

বিকৃতকণ্ঠে গর্জে উঠল অরিন্দম, "ললিতা—সাবধান"—

ললিতা থামল, হাসতে গেল, হাসতে গিয়ে কেঁদে ফেলল, মাটিতে বসে পড়ল। দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে সে কান্নাকে চাপতে লাগল।

অরিন্দম কথা খুঁজে পেল না। কি বলবে সে? সব কথা এখন নিরর্থক। ঘরের মধ্যে বলরাম ইহসংসারের ওপর জিভ বের করে দুলছে; বাইরে মাটির ওপর অসংখ্য বীরেরা শোণিত-শয্যায় সমাপ্তি-হীন

স্বপ্ন দেখছে—বাড়ীর ভেতরে পতিহীনা নারী কাঁদছে, পায়ের কাছে কাঁদছে তার সুন্দরী নারী।

জ্বলে যাচ্ছে বুক, কণ্ঠ, চোখের দৃষ্টি, মস্তিষ্ক, সর্বাঙ্গ। ক্রোধ আর ঘৃণার তরঙ্গ তাকে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে। ওরে ক্লীব, মানুষ হ, পুরুষ হ।

"ললিতা"—

নিঃস্তব্ধতা।

"আমি আবার ফিরে আসব"—

স্তব্ধতা।

"আমার জন্য অপেক্ষা করো"—

সাড়া নেই।

"তোমার অরিন্দম আবার ফিরে আসবে ললিতা।"

লোহার মত কঠিন পদক্ষেপে এগিয়ে গেল অরিন্দম।

ললিতা নড়ল না, তাকাল না, কথা বলল না।

গলিতে নেমে মনে মনে বলল অরিন্দম। আজই। এখনই। কিন্তু তার আগে একবার মনিশঙ্করের খোঁজ নিতে হবে।

বসন্ত এসেছে কিন্তু বাতাসে আজ ফুলের সৌরভ নেই, তাকে হরণ করেছে বারুদ আর চাপ চাপ রক্তের গন্ধ। রক্তের রং কী লাল! হিংসা, হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবী। হিংসায় সৃষ্টি বিপন্ন। এই হিংসার স্রোতে সেই মনিময় কক্ষে হয়ত আশাবরীর আলাপ থেমে গেছে, বীণকারের বীণা ছিন্নতার হয়ে স্তব্ধ হয়েছে, নেই নর্তকীর অঙ্গ-চঞ্চলতা রুদ্ধ হয়েছে। প্রহরী তুমি কি করছ? তুমি কি ভীত, কর্তব্যচ্যুত? প্রহরী, তুমি আমাকে ডাকো, আমাকে জাগ্রত করো, আমাকে অগ্নিময় চেতনায় উদ্বুদ্ধ করো—ও-ও-ও—

উঁচুপাড়ায় গিয়ে রক্ষীদের দপ্তরে গিয়ে সে হাজির হল।

সবাই তাকে চিনতে পারল, তাকে দেখে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল।

"আসুন মান্যবর"—

"বসুন"—

"আমরা আপনার কি সেবা করতে পারি হুজুর"—

অরিন্দম বসল, বলল, "আজ নীচুপাড়ায় গোলমাল হয়েছিল ?"

একজন রক্ষী বলল, "আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর"—

"যে রক্ষী-প্রধান নীচুপাড়ায় দমন-কার্য পরিচালনা করেছিলেন তাঁকে ডাকো"—

"আজ্ঞে।"

একমিনিটের মধ্যে সেই রক্ষী-প্রধান এসে হাজির হল সামনে, যুক্তকরে প্রণাম জানিয়ে বলল, "কি আদেশ হুজুর, আপনার পদলেহন করব ?"

"না।"

"তবে ?"

"নীচুপাড়ার নেতা মণিশঙ্করকে আমি দেখতে চাই।"

"এইদিকে আসুন হুজুর"—

রক্ষী-প্রধান অরিন্দমকে নিয়ে একটা লৌহ-কামরার সামনে গেল। তার দরজার সামনে বারো জন সশস্ত্র রক্ষী।

লৌহদ্বার খুলে দিল একজন রক্ষী।

অরিন্দম মনিশঙ্করকে ভেতরে শায়িত অবস্থায় দেখল। কঠিন, অনাবৃত প্রস্তর-মেঝের ওপর। তার সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত, রক্তাক্ত। মাথা, মুখ আর আঙুলের ডগায় রক্ত। নিরাবরণ দেহের সর্বত্র চাবুকের কালো ও লালচে দাগ, দু'চোখ মুদ্রিত।

অরিন্দম কঠিনকণ্ঠে বলল, "আসামী নড়ছে না কেন ?"

রক্ষী-প্রধান ঠোঁট লেহন করে তৃপ্ত ভঙ্গীতে বলল, "মূর্চ্ছো গেছে হুজুর"—

"কেন ?"

রক্ষী-প্রধান একগাল হেসে বলল, "শালাকে খুব মেরেছি হুজুর।"

"কি ভাবে মেরেছ?"

"চাবকেছি, তাপর কম্বল মুড়ে ডাণ্ডা দিয়ে ঠেঙ্গিয়েছি, ব্যাটার অণ্ডকোষে লাথি মেরেছি, আগুনের ছ্যাকা দিয়েছি পাছায়, আলপিন ফুটিয়ে দিয়েছি ওর হাত আর পায়ের আঙুলে—তাছাড়া কিল, চড়, ঘুষি তো ছিলই"—

"কিন্তু কেন? কেন মারলে?"

"আজ্ঞে?" রক্ষী-প্রধানের কণ্ঠে বিস্ময় ধ্বনিত হল, "আজ্ঞে হুজুর?"

"কেন মারলে?"

"কিছুতেই বলল না যে ব্যাটা"—

"কি বলল না?

"দলের অন্যান্য লোকের নাম ঠিকানা।"

"ওঃ"—অরিন্দম তাকাল রক্ষী-প্রধানের দিকে, একটু ভাবল, তারপরে বলল, "তোমাকে কাজ করতে হবে"—

রক্ষী-প্রধান সসম্ভ্রমে বলল, "বলুন হুজুর"—

"ওকে আমার হেফাজতে ছেড়ে দাও"—

"আজ্ঞে?"

"শোনোনি আমার কথা?"

রক্ষী-প্রধান গম্ভীর হয়ে উঠল, বলল, "আজ্ঞে শুনেছি।"

"তবে?"

"তা তো পারব না হুজুর।"

অরিন্দম বিরক্ত হল, "কেন?"

রক্ষী-প্রধান হাসল, "হুকুম নেই।"

অরিন্দম উত্তেজিতকণ্ঠে বলল. "কিসের হুকুম? তুমি জান যে আমি একজন মন্ত্রী?"

"আজ্ঞে জানি।"

"আমি হুকুম করছি।"

"কিন্তু আপনার ওপরে প্রধান মন্ত্রী—তাঁর হুকুম না হলে তো হবে না হুজুর"—

অরিন্দম গর্জে উঠল, আমি তোমাকে শাস্তি দেব"—

রক্ষী-প্রধান হাসল, "তাতেও প্রধান মন্ত্রীর সম্মতি লাগবে"—

"বটে!" দাঁতে দাঁত ঘষল অরিন্দম, মুহূর্ত্তকাল স্তব্ধ হয়ে থেকে সে দ্রুতপদে বেরিয়ে গেল বাইরে।

এবার?

এবার?

প্রধানমন্ত্রী! বটে! তাহলে তার শক্তি নিতান্তই সীমাবদ্ধ। কিন্তু প্রধান মন্ত্রী হওয়ার জন্য অপেক্ষা করারও তো সময় নেই আর। আর দেরী না। সংগ্রাম আরম্ভ হয়ে গেছে তার। আর প্রতীক্ষা নয়, অপেক্ষা নয়, কৌশল নয়। এবার সম্মুখ-সংগ্রাম।

শাসন-দপ্তরে যাওয়ার সময় হয়ে গিয়েছিল। অরিন্দম ভাবল একবার। প্রসেনজিৎ হয়ত দপ্তরেই এসেছেন, সুতরাং তাঁর বাড়ীতে যাওয়ার দরকার নেই। তাছাড়া সেই বিকৃত-মস্তিষ্কা নারী, সেই মিনাক্ষীকে সে আর দেখতে চায়না। ঠিক, সে শাসন-দপ্তরেই যাবে।

আধঘণ্টার মধ্যে সে তৈরী হয়ে দপ্তরে পৌছোল।

সোজা গিয়ে সে প্রসেনজিতের ঘরের দরজায় করাঘাত করল।

"ভেতরে এসো"—প্রসেনজিতের গলা শোনা গেল।

ভেতরে ঢুকল অরিন্দম।

"এসো, এসো"—একগাল হেসে প্রসেনজিৎ আহবান করলেন,

তারপরে চোখ দুটো ছোট করে কৃত্রিম তিরস্কারের ভঙ্গীতে বললেন, "তুমি ভারী ছেলেমানুষ অরিন্দম"—

"কেন ?"

"তা নইলে কালকে অমন পালিয়ে গেলে কেন ? জীবনকে ভোগ করতে ভয় পাও ?"

"আজ্ঞে না—লুন্ঠন করে ভোগ করতে ভয় পাচ্ছি, উচ্ছৃঙ্খলতাকে ভয় পাচ্ছি"—

"কি বললে !" প্রসেনজিৎ অবাক হয়ে তাকালেন অরিন্দমের দিকে, কি বলছ হে ?"

অরিন্দম ধীরকণ্ঠে বলল,"আপনার সঙ্গে আমার কথা আছে প্রধান মন্ত্রী, জরুরী কথা"—

"বল।"

"আজ নীচুপাড়ায় একদল লোক মিছিল করে আসছিল—তাদের অনেককে হত্যা করা হয়েছে, গ্রেপ্তার করা হয়েছে—এর আগেও হয়েছে তা"—

প্রসেনজিৎ সোজা হয়ে বসলেন, "বেশতো—তাতে হয়েছে কি ?"

অরিন্দম তীক্ষ্ণদৃষ্টি মেলে বলল, "আমরা অন্যায় করছি না তো ?"

"অন্যায় ! বিদ্রোহ দমন করা কি অন্যায় ?"

"না। কিন্তু বিদ্রোহ কেন, তা ভেবেছি কি আমরা ?"

"ভেবেছি বৈকি। অর্থহীন সে কারণ। আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করছি সবাইকে সুখী করতে কিন্তু ব্যাপার কি জানো, মানুষ নিজের কৃতকর্মের ফলভোগ করে, পূর্বজন্মের কর্ম তার এজন্মকে নিয়ন্ত্রন করে"—

"কিন্তু"—

"জানি তুমি কি বলবে ? মৃত্যু। মানুষ মরছে—এইতো ? কিন্তু কি করবে ? ওরা জানোয়ারের মত শুধু মেয়েদের গর্ভসঞ্চার করবে আর"—

"অর্থাৎ জনসংখ্যা বেড়ে গেছে বলেই দুঃখ ?"

"তাই।"

"ধরলাম তাই। কিন্তু আঙ্গবনগরের ঐশ্বর্য, শস্য আর সম্পদ সবাইকে সমভাবে বণ্টন করে দিলে কি দোষের হয়?"

প্রসেনজিৎ উঠে দাঁড়ালেন কঠিনকণ্ঠে বললেন, "ব্যাপার কি অরিন্দম, তোমারও কি দেবদত্তের মত মাথা খারাপ হয়েছে?"

অরিন্দম প্রসেনজিতের প্রশ্নের জবাব দিল না, বলল, "আর ওদের হত্যা করারই বা দরকার কি?"

"তাহলে কি করব?"

"বুঝিয়ে বললে হয় না?"

"না। ওরা হিংসার আশ্রয় নিয়েছে, তাই ওদের শাস্তি দেওয়াই উচিত।"

"ওদের তাহলে কি করা উচিত?"

"অহিংসভাবে দাবী করা উচিত।"

"নিরস্ত্র লোকের মিছিল তো হিংসা ঘোষণা করে না।"

"কিন্তু রাষ্ট্রকে যে তারা বদ্‌লাতে চায়।"

"তা কি হিংসা?"

"হ্যাঁ।"

"হিংসাকে তাহলে হিংসা দিয়ে রোধ করতে হয়?"

"নিশ্চয়ই।"

"কিছু মনে করবেন না প্রধান মন্ত্রী—আমি আপনাদের মধ্যে নতুন, আপনার কাছে আমাকে শিক্ষা নিতে হবে বলেই এত প্রশ্ন করছি।"

প্রসেনজিৎ যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন, "তাই বলো, আমি তো তোমার বিষয়ে রীতিমত চিন্তিত হয়ে পড়েছিলাম।"

অরিন্দম হাসল।

প্রসেনজিৎ উৎসাহিত হয়ে বললেন, "ব্যাপার কি জানো? সব মানুষের দুঃখ কোন দিনই দূর হতে পারে না।"

অরিন্দম মাথা নাড়ল, "যথার্থ। কিন্তু হিংসায় যে হিংসা বাড়ে"—

"নিশ্চয়ই।"

"পৃথিবীতে শান্তিকে চিরস্থায়ী করতে হলে মানুষকে হিংসা বর্জন করতে হবে, পরস্পরকে ভালবাসতে হবে।"

"ঠিক বলেছ।"

"তাহলে ওদের বলপ্রয়োগে দমন করাও তো হিংসা?"

"খানিকটা।"

"তার দরকার কি?"

"রাষ্ট্রকে বজায় রাখার জন্য—নিজেদের শক্তি বজায় রাখার জন্য।"

"ওরা নিজেরাই যদি নিজেদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রন করতে চায়?"

প্রসেনজিৎ হাসলেন, "হাঃ হাঃ হাঃ—হাসালে তুমি। ওরা তা পারবে কেন? মূর্খ, অশিক্ষিত—ওদের বুদ্ধি কোথায়?"

অরিন্দম হাসল, "আর ধরুন ওরা যদি শিক্ষিত এবং বুদ্ধিমান হয়?"

প্রসেনজিৎ মাথা নেড়ে হাসলেন, আবার বললেন, "তাহলেও না।"

"কেন?"

"শক্তিকে হারাতে বলছ? তুমি পাগল"—

"আমি কিছুই বলছি না প্রধান মন্ত্রী—আমি জানতে চাইছি।"

"ঠিক। তাহলে শোন। শক্তি মানে ভোগ—সমস্ত পৃথিবীকে হাতের মুঠোয় পাওয়া, সমস্ত মানুষের ভয় ও সম্মান পাওয়া। তা কেউ হারাতে চায় না—আমরাও না।"

"কিন্তু একা ভোগ করা কি স্বার্থপরতা নয়?"

"পৃথিবীর সবাই স্বার্থপর।"

"সে তো পশুর ধর্ম।"

"হবে—তাছাড়া আমাদের ভাগ্য—আমরা ভাগ্যবান।"

অরিন্দম থামল। আর কথা নয়, তা নিরর্থক। একই কথা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলবেন প্রসেনজিৎ। যন্ত্রের গানের মত। হৃদয় না থাকলে, অনুভূতি না থাকলে কেউ সমগ্র মানুষের কথা ভাবতে পারে না, বুঝতে পারে না।

স্তব্ধতা।

প্রসেনজিৎ বললেন, "এখন বুঝলে তো?"

অরিন্দম বিনীতকণ্ঠে বলল, "আজ্ঞে হ্যাঁ। কিন্তু আর একটা কথা আছে।"

"কি?"

"নীচুপাড়ার নেতা মনিশঙ্করের কথা বলছি। তাকে একবার আমার হাতে ছেড়ে দিন—তাকে বুঝিয়ে আমি তার মন বদলাতে চাই।"

প্রসেনজিৎ কাছে এসে অরিন্দমের পিঠে সস্নেহ চাপড় মেরে বললেন, "তুমি দেখছি আমাদের সাধু মোহনদাসের চেলা—আরে, ওদের বদলানো যায় না। আমরা বহুবার ওদের কাছে অহিংসা আর প্রেমের কথা বলেছি।"

"তবু"—

"উহুঁ—হয় না। তাছাড়া ওসব লোককে এত মিষ্টি কথা বলে বোঝাবার দরকার নেই। ওদের স্বভাব সাপের মত—যত তোয়াজই করো না কেন—দংশন করবে।"

অরিন্দমের চোখে আগুনের আভা খেলে গেল, সায় দেবার ভাণ করে সে বলল, "আপনি কথাটা ঠিক বলেছেন। তাহলে মনিশঙ্করকে ছাড়বেন না আমার হাতে?"

"না।"

"তাই ভাল।"

স্তব্ধতা নেমে এল।

এবার? মনিশঙ্কর আর মুক্তি পাবে না। একেবারে নিশ্চিত। শক্তিমানদের একজন জবানবন্দী দিল। তারপর?

পদশব্দ শোনা গেল।

ঘরের মধ্যে একে একে অঘোরনাথ, মহানন্দ ও বিনায়ক প্রবেশ করলেন।

অরিন্দম নিজের ঘরে যাবার জন্য পা বাড়াল।

প্রসেনজিৎ ডাক দিলেন, "এখন যেয়ো না অরিন্দম। এতক্ষণ অন্য কথার চাপে ভুলেই গিয়েছিলাম। বোস, আমাদের একটা জরুরী পরামর্শ আছে।"

অরিন্দম বসল।

অঘোরনাথ কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে ফিস্ ফিস্ করে বললেন, "কাল কি হয়েছিল হে ভায়া?"

অরিন্দম দাঁতে দাঁত চেপে বলল, "একটু ঘাবড়ে গিয়েছিলাম।"

অঘোরনাথ শ্লেষ্মাজড়িত হাসি হেসে বললেন, "ভবিষ্যতে আর ঘাবড়ো না কিন্তু"—

"না।"

সবাই বসলেন।

প্রসেনজিৎ একটা মানচিত্র খুলে রাখলেন টেবিলের ওপর, বললেন, "কাল থেকে যে আমাদের শাসনপরিষদের অধিবেশন স্বরু হবে তা বোধ হয় জানতে না তোমরা?"

অঘোরনাথ মাথা নাড়লেন, "না তো—কেন?"

প্রসেনজিৎ বললেন, "জরুরী দরকার পড়েছে।"

"কি দরকার?"

"বলছি।" প্রসেনজিৎ অরিন্দমের দিকে তাকালেন, "আমরা যে আমাদের দেশের লোকদের জন্য চিন্তা করি তারই প্রমাণ পাবে এবার।"

মানচিত্রের ওপর আঙ্গুল রেখে একটা জায়গা দেখিয়ে তিনি প্রশ্ন করলেন, "এই দেশটার নাম কি জানো তোমরা?"

মহানন্দ মাথা নাড়লেন, "জানি। ওটা রূপনগর।"

"হ্যাঁ, রূপনগর। আকৃতিতে এবং জনসংখ্যায় আমাদের বিচিত্রপুরের একচতুর্থাংশ। কিন্তু রূপনগর তা সত্ত্বেও বেশ সম্পদশালী দেশ, কেন জানো?"

বিনায়ক বললেন, "জানি—ওখানে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় তেলের খনি আছে বলে।"

প্রসেনজিৎ রুমাল বের করে মুখ মুছলেন, সহাস্যে বললেন, "যথার্থ।"

অরিন্দমের মুখে এতক্ষণে কথা ফুটল, সে প্রশ্ন করল, "কিন্তু তেলের খনির সঙ্গে শাসন-পরিষদের অধিবেশনের যোগটা কোথায় ?"

প্রসেনজিৎ প্রশান্ত হেসে হাত তুলে বললেন, "বলছি। কাল শাসন-পরিষদের অধিবেশনে আমাদের রূপনগরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা করতে হবে।"

"কিন্তু কেন ? রূপনগর কি বিচিত্রপুরকে আক্রমণ করেছে ?"

"না।"

"তাহলে ?"

প্রসেনজিৎ অঘোরনাথদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আক্রমণ এইজন্য যে রূপনগরের তেলের খনি আমাদের ঐশ্বর্য বৃদ্ধি করবে। আমাদের দেশে ও জাতীয় খনি বেশী নেই। রূপনগর থেকে বহু অর্থব্যয়ে আমাদের বাকী প্রয়োজন মেটে—তাই রূপনগরকে জয় করলে আমাদের সেই অভাব দূর হবে। তাছাড়া পৃথিবীর অন্যান্য দেশ তেলের জন্য আমাদের মুখাপেক্ষী হবে—একচেটিয়া ব্যবসা করে আমরা মোটা মুনাফা করব। ফলে আমাদের দেশের লোকদেরও অবস্থা বদলাবে—রূপনগরে ভালো চাকরী করবে তারা, ব্যবসা করবে—বিজিত দেশে বিজয়ীরাই তো অগ্রগণ্য। তাছাড়া রূপনগরের জনবল আমাদের পরে উদ্ভটনগরকে জয় করতে সাহায্য করবে। তারপর—গোটা পৃথি... আমাদের।"

মহানন্দ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন, "চমৎকার—আপনার প্রস্তাবের তুলনা নেই প্রধান মন্ত্রী।"

অরিন্দমের সর্বাঙ্গে যেন অগ্নিপ্রবাহ ছড়িয়ে পড়ল, সে প্রশ্ন করল, "কিন্তু শাসন পরিষদের অন্যান্য সদস্যরা যদি এ প্রস্তাবকে সমর্থন না করে ?"

প্রসেনজিৎ দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, "করবে, কারণ তাদের সত্য কথা বলা হবে না।"

"কি বলবেন তবে?"

"বলব যে তারা বিচিত্রপুর আক্রমণ করেছে।"

"পৃথিবীর অন্যান্য রাষ্ট্র যদি বিরোধিতা করে?"

"তুমি পাগল। প্রচারের যুগ এটা। শিল্প যেমন কল্পনাকে সত্য বলে প্রতিষ্ঠিত করে প্রচার-শিল্প তেমনি মিথ্যাকে সত্য বলে প্রতিষ্ঠা করে। প্রচারবলে আমরা পৃথিবীর সমর্থন লাভ করব। তাছাড়া ছোটকে বড় গ্রাস করে, এইতো প্রকৃতির নিয়ম।"

বিনায়ক উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, "সাধু—সাধু—সাধু—"

প্রসেনজিৎ বললেন, "আমাদের দেশের কিছু লোকেরা অযোগ্যতা বশতঃ সব কিছু ভোগ করতে পারে না—ফলে তারা বিপ্লবের সোনালী স্বপ্ন দেখছে। রূপনগর আমাদের সেদিক থেকেও নিশ্চিন্ত করবে।"

অরিন্দম কৌতূহলী হয়ে উঠল, "তা কি করে সম্ভব হবে?"

"এইভাবে। রূপনগর থেকে খাজনা এবং ব্যবসায় বাবদ আমরা যে মুনাফা করব তা দেশের লোককে একটু বেশী খাওয়াপরার ব্যাপারে সহায়তা করবে। আমার দেশবাসীকে তো আমি জানি—অল্পতে তুষ্ট হতে তাদের মত কেউ পারে না।"

অঘোরনাথ উৎসাহভাবে সায় দিলেন, "ঠিক বলেছ প্রধান মন্ত্রী—ঠিক"—

অরিন্দম তিক্ত হেসে বলল, "সব বুঝলাম—আপনার যুক্তি সত্যি চমৎকার কিন্তু পরিষদের সদস্যরা যদি সত্য কথা জানতে পারে?"

অঘোরনাথ বললেন, "আমাদের গুপ্তকথা বাইরের লোকেরা কি করে জানবে?"

"ধরুন কোনমতে জানল"—

অঘোরনাথের কালো মুখে সাদা দাঁত ঝক্‌ঝক্ করে উঠল, "নিশ্চিন্ত

থাকো ভাই। সত্য কথা জানলেও তাদের মত বদলাবার ক্ষমতা আছে আমাদের—তাছাড়া তারা বিরোধিতা করবে না এই কারণে যে যুদ্ধ হলে তাদের মোটা লাভ হয়।"

"কি করে?"

"ঠিকেদারি ব্যবসা আর চোরাবাজার।"

"হুঁ"—অরিন্দম প্রসেনজিতের দিকে তাকাল, "কিন্তু যুদ্ধ করা কি হিংসা হবে না?"

"দেশের স্বার্থের জন্য হিংসা অন্যায় নয়।"

"কিন্তু অনেকে বলে যে হিংসা সর্বাবস্থাতেই নিন্দনীয়।"

"মিথ্যে কথা।"

"আমাদের দেশের লোকের ভাল হলেও রূপনগরের মানুষদের তো দুঃখ বাড়বে"—

প্রসেনজিৎ হোহো করে হেসে উঠলেন, "তুমি আজ শুধু হাসাচ্ছ অরিন্দম। আমাদের কাছে আমাদের স্বার্থ এবং দেশের স্বার্থ বড়—তারপর আর কোন কিছুই বড় নয়। যাক্ ওসব কথা—এবিষয়ে তাহলে তোমাদের সবার মত আছে?"

অঘোরনাথ, মহানন্দ ও বিনায়ক সমস্বরে মাথা নেড়ে বললেন, "নিশ্চয়—আমরা তোমার সঙ্গে একমত।"

সবাই সায় দিল, শুধু অরিন্দম একবার মাথা নেড়েই নির্বাক হয়ে রইল। তার কাছে সব জলের মত পরিষ্কার হয়ে গেছে। আজ আর তার কোন কিছু বলার নেই। মন্ত্রীদের মত সে জানল আর মন্ত্রীদের মতই ধনরাজের মত। বাকী শুধু সদস্যদের মতামত। আচ্ছা, কাল দেখা যাবে। কাল—মাঝখানে শুধু কয়েকটা প্রহরের ব্যবধান। অরিন্দম, প্রস্তুত থাকো।

আজও তার চোখে ঘুম এল না।

বসে বসে ভাবতে লাগল অরিন্দম। আজকের দিন তার মনে থাকবে।

বিকেলে পরিষদ থেকে ফিরবার সময় সে আবার রক্ষীদের দপ্তরে মনিশঙ্করের খোঁজে গিয়েছিল। সেই রক্ষী-প্রধান তাকে সম্মান প্রদর্শন করেছিল বটে কিন্তু তাতে উত্তাপ ছিল না। অরিন্দম স্পষ্ট বুঝেছিল যে সে অন্যান্য প্রভুদের মত কথা না বলায় রক্ষী তাকে ঠিক বিশ্বাস করতে পারছে না। মনিশঙ্করকে একটু সদয়ভাবে দেখাশোনা করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিল সে। কিন্তু উত্তরে সেই মনুষ্যরূপী পশু সহাস্যে তাকে জানিয়েছিল যে দুপুরে মনিশঙ্করকে আর একদফা মার দেওয়া হয়েছিল—সেই মার হজম করতে পারেনি সে। মনিশঙ্কর মারা গেছে। শুনে অরিন্দম স্তব্ধ হয়ে বেরিয়ে এসেছিল। ঘৃণায়, ক্রোধে, উত্তেজনায় তার চোখ দিয়ে রক্তমিশ্রিত জল বেরিয়ে এসেছিল।

এখনো সেই কথা ভাবছে অরিন্দম। মনিশঙ্কর মারা গেছে। নীচুপাড়ার লোকেরা একজন মহাবীরকে হারাল। এবার? অহমিকায় অন্ধ অন্যান্য নেতারা—দক্ষিণ, উত্তর, পূব আর পশ্চিমের মিলন কি হবে? কে ঘটাবে এই মিলন? মৃত্যু। দামোদর মারা গেছে। বলরাম মারা গেছে। মনিশঙ্করও গেল। মৃত্যু। মহাশূন্যতা। তারপর? তারপর কি হবে?

ক'দিনের জীবন তার কিন্তু এরি মধ্যে কত কাণ্ডই না ঘটল! সেই তস্করের কথা, সেই হত্যাকারীর কথা মনে পড়ল। দামোদরের কথা, ইন্দ্রের কথা—সবার কথা মনে পড়ল। সেই বারবনিতারা। আর অমিতা। কোথায় গেল সে? আশ্চর্য কত স্বপ্ন বুকে নিয়ে কোথায় হারিয়ে গেল সে? আর ললিতা যা বলেছিল? হ্যাঁ, তাদের কথাই সত্য। পথ এক। সংগ্রাম। শক্তিমানদের একজন হয়েও কিছু করা যায় না ওদের চক্রান্তজাল এমনি অদ্ভুত যে ওদের ভেতরে গিয়েও কোন ফল হয় না।

সেই অনেকদিন আগেকার স্বপ্ন মিথ্যে নয়। সেই নরক। কঙ্কাল,

মস্তকহীন মানুষ, লোমশ হাত, রক্তের নদী আর হাড়ের দুর্গ। কারা থাকে সেই হাড়ের দুর্গে? অরিন্দম তাদের চিনেছে এখন, আর সংশয় নেই তার, আর ভ্রান্ত বিশ্বাস নেই। পথ এক।

রাত অনেক। কত? কোন প্রহর? বাইরে উঁচুপাড়ার আলো অম্লান। আকাশ পর্যন্ত সেই আলোকে আলোকিত। মত্ততার উৎসব চলেছে উঁচুপাড়া জুড়ে। তার ওপর নক্ষত্র-খচিত মহাকাশ। আশ্চর্য মানুষের জীবন। কর্মে ও ধর্মে অপরূপ, চিন্তায় ও স্বপ্নে বিচিত্র, প্রেমে ও ত্যাগে মহৎ।

কে? অরিন্দম কান পাতল। কারা যেন চাপাগলায় কথা বলছে তার চারদিকে। কে? কি বলছ? আবার কান পাতল সে, শুনল অসংখ্য লোকেরা ডাকছে—'ভগবান—ভগবান—ভগবান'—। অসংখ্য লোকেরা তাকে ডাকছে। কে যেন কাঁদে? সেই বহুদিন আগেকার স্বামীহীনা নারী! আবার কে কাঁদে? দুর্গাবতী! নিরাপত্তা নেই। মানুষ হবার সুযোগ নেই। কান্না, চারদিকে শুধু দীর্ঘশ্বাস। কোন প্রহর? রূপসী নদীর দুপাশে, শালবনে আর প্রান্তরে কি নিঃশব্দতা নোঙর ফেলেছে? কি গান গাইছে সেই সুকণ্ঠ গায়ক? বেহাগের বিলাপ কি মনিময় কক্ষের বুকে স্পন্দন তুলেছে? কে! কে ডাকে! জাগো ও-ও-ও—বিস্মৃতি ও বিভ্রান্তি ঠেলে উঠে দাঁড়াও-ও-ও-ও। ডাকো প্রহরী, ডাকো—ডেকে ডেকে আমার বুকে এক মহান অগ্নিকে প্রজ্জ্বলিত করো-ও-ও-ও—

হ্যাঁ, সেই কয়েক ঘণ্টার ব্যবধান দূর হয়ে গেল এক সময়ে। সময়-যন্ত্রের কাঁটাটা অধিবেশন সুরু হওয়ার প্রহর-চিহ্নে এসে থামল। বাইরে ঘণ্টা বেজে উঠল—ঢং—ঢং—ঢনননন—। সবাই জানল যে

সময় হয়েছে। এখানে ওখানে যে সব সদস্যেরা গল্প করছিল তারা সভাগৃহে প্রবেশ করল, নিজের নিজের নির্দিষ্ট আসনে গিয়ে উপবেশন করল। অরিন্দমও গিয়ে মন্ত্রীদের আসনে বসল।

সভাগৃহটি মস্ত বড় ও গোলাকার। প্রবেশ-দ্বারের বিপরীত দিকে একটি গোলাকার বেদীর ওপর সিঁড়ি দিয়ে উঠতে হয়। সেখানে শাসনকর্তা ও মন্ত্রীদের জন্য দামী চেয়ার ও টেবিল। প্রবেশ-পথ থেকে বেদী পর্যন্ত কার্পেট বিছানো চলাচলের পথ, তার দুপাশে, বেদীর কুড়ি হাত দূর থেকে চারটি বড় বড় ধাপ উঠে গেছে। সেই সব ধাপের ওপর সদস্যদের আসন। সর্ব-সমেত একশ জন সদস্য। সভাগৃহ বিশেষ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে নির্মিত, ফলে প্রত্যেকেই প্রত্যেকের বক্তৃতা শুনতে পাবে।

বেদীর ওপর মন্ত্রীরা আসীন হলেন।

ঘোষক ঘোষণা করল, "মহামান্যবর শ্রীযুক্ত ধনরাজ, বিচিত্রপুরের সুযোগ্য শাসনকর্তা পদার্পন করছেন"—

সভাগৃহের সকলে সম্মান প্রদর্শনের জন্য দণ্ডায়মান হল।

রক্ষী-পরিবৃত ধনরাজ সভাগৃহে প্রবেশ করলেন, মৃদুমন্দ হাসতে হাসতে চারদিকে তাকিয়ে, মাথা নেড়ে প্রত্যভিবাদন জানিয়ে, তিনি বেদীর উপর গিয়ে পরিষদের সভাপতির আসন গ্রহণ করলেন। তাঁর সঙ্গে অপরিচিত আরো কয়েকজন ছিল তারাও বেদীতে এসে বসল। অরিন্দম তাদের চিনল না। স্তব্ধতা।

ধনরাজ বললেন, "সভা আরম্ভ হোক।"

প্রসেনজিৎ উঠে দাঁড়ালেন, বললেন, "সভাপতি মহাশয় এবং বন্ধুগণ, আজকের সভার গুরুতর প্রস্তাবটির আগে একটা ছোট প্রস্তাব আমি পেশ করছি। প্রস্তাবটি নূতন কর ধার্যের বিষয়ে। আপনারা জানেন সম্প্রতি আমাদের খরচ বেড়ে গেছে। যে রাজস্ব আদায় হয় তাতে সব প্রয়োজন আমাদের মিটছে না। নূন, জল, আলো, বাতাস, অন্ন, বস্ত্র, বই, ওষুধ এবং অন্যান্য সমস্ত জিনিষের ওপরই আমরা কর ধার্য করেছি,

কিন্তু তাতেও সমস্যার সমাধান হচ্ছে না। অতএব আমার প্রস্তাব এই যে একটি কর বসানো হোক—মানুষের বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব যখন সরকারের তখন তার জন্য শতকরা দশ টাকা কর দিতে বাধ্য করা হোক প্রত্যেক ব্যক্তিকে।"

অঘোরনাথ উঠে দাঁড়ালেন, বললেন, "প্রধান মন্ত্রীর এই প্রস্তাবকে আমি সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করছি।"

প্রসেনজিৎ বললেন, "এবার আপনারা তাহলে রায় দিন।"

অরিন্দম নড়ে বসল। এখনি প্রতিবাদ করবে কি সে? না, এখন নয়। গুরুতর প্রস্তাবের জন্যই অপেক্ষা করবে সে। সেই প্রস্তাবকে বানচাল করে তবে অন্য কাজ। কারণ যুদ্ধ দাবানলের মত—পৃথিবীময় বিস্তৃত হয়ে মানুষকে রাতারাতি পশুত্বের স্তরে নামাবে। আশু বিপদের হাত থেকে মানুষকে উদ্ধার করে তবে অন্যকাজ।

সভাগৃহে গুঞ্জনধ্বনি শোনা গেল। সদস্যেরা কানাকানি করে পরামর্শ করতে লাগল।

প্রসেনজিৎ প্রশ্ন করলেন, "এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে কারো কি প্রতিবাদ করার আছে?"

সদস্যদের মধ্য থেকে একজন উঠে বলল, "দশটাকার জায়গায় আট টাকা ধার্য হোক—দশ টাকা একটু বেশী"—

বহু সদস্য প্রতিধ্বনি তুলল, "হ্যাঁ হ্যাঁ—দশটাকা বেশী"—

প্রসেনজিৎ বললেন, "আপনাদের কথা মানলাম। তাহলে এই প্রস্তাব গৃহীত হল?"

সমর্থন ধ্বনিত হল, "হ্যাঁ, এই প্রস্তাব গৃহীত হল।"

প্রসেনজিৎ আত্মতৃপ্তিতে হাসলেন, বললেন, "ধন্যবাদ। এবার আসল প্রস্তাব। কিন্তু তার আগে কয়েকটা সংবাদ জানতে হবে আপনাদের। তা এতদিন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়নি—এইজন্যে হয়নি যে তাতে হয়ত ফল খারাপ হত। খবর কি জানেন? রূপনগর

আমাদের দেশ এবং জাতির সম্মানকে বিপন্ন করে তুলেছে। ক্ষুদ্র দেশ রূপনগরের মরণ-পাখা গজিয়েছে, অহমিকায় আচ্ছন্ন হয়ে তারা ধরাকে সরা জ্ঞান করছে।"

সভাগৃহে যেন বিদ্যুৎগতিতে উত্তেজনা ছড়িয়ে গেল।

চারদিক থেকে একই সঙ্গে প্রশ্ন করতে লাগল সবাই, "কি করেছে, কি করেছে রূপনগর?"

প্রসেনজিৎ দু'হাত তুলে সহাস্যে সবাইকে থামতে ইঙ্গিত করলেন, বললেন, "গত ছ'মাস ধরে রূপনগরের সৈন্যরা প্রায়ই আমাদের সীমান্ত অতিক্রম করে মানুষজন মেরেছে, ডাকাতি করেছে"—

সভাগৃহ গুঞ্জনধ্বনি তুলল।

"অনেক সময় তারা আমাদের সৈনিকদের ওপরেও অগ্নিবর্ষণ করেছে।"

সভাগৃহ উত্তেজিত হয়ে উঠল।

"শুধু তাই নয়, নারীদের ওপরেও অত্যাচার করেছে তারা, হরণ করেছে তাদের"—

সদস্যেরা গর্জে উঠল, "আমরা তার প্রতিকার চাই—প্রতিকার চাই"—

প্রসেনজিৎ মুখেচোখে করুণ একটা ভাব ফুটিয়ে আনলেন, বললেন, "প্রতিকার—ঠিক কথা। আপনাদের মতই আমি উত্তেজিত হয়েছিলাম প্রথমে। কিন্তু দায়িত্ব আছে তো? তাই আমি রূপনগরকে সাবধান হবার জন্য দূত পাঠিয়েছিলাম"—

সভাগৃহ প্রশ্ন করল, "তারপর? তারপর?"

হতাশার ভঙ্গী করে প্রসেনজিৎ বললেন, "কোন জবাব দেয়নি তারা, তারপর থেকে আজ পর্যন্ত আমাদের সীমান্ত এলাকায় দেড়শজন সৈন্য এবং তিনশ জন সাধারণ লোক নিহত হয়েছে, পাঁচশ' লুট ও ডাকাতি হয়েছে, নারীধর্ষণ একশ'টি, নারীহরণ পঞ্চাশটি"—

সভাগৃহে যেন বাজ পড়ল।

একশ'জন সদস্য গর্জন করে বলল, "আমরা এর শোধ নেব"—

"প্রতিশোধ চাই"—

"এতদূর আস্পর্ধা!"

"এ অপমান আমরা সহ্য করব না"—

প্রসেনজিৎ হাত তুলে আবার থামবার ইঙ্গিত করলেন সবাইকে, আবেগকম্পিত কণ্ঠে বললেন, "হ্যাঁ, আমরা সহ্য করব না, আমরা শোধ নেব। সেইজন্যই আমি প্রস্তাব করছি যে আমাদের মহান দেশের স্বাধীনতা এবং সম্মানকে বজায় রাখার জন্য আমরা আজ রূপনগরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করব। জানি, যুদ্ধ ভালো নয়, তা আমাদের আদর্শবিরোধী। কিন্তু উপায় কি? বন্ধুগণ, আপনারা বিবেচনা করে মতামত ব্যক্ত করুন"—

সদস্যেরা গর্জে উঠল, "যুদ্ধ—আমরা যুদ্ধ চাই"—

অরিন্দম কেঁপে উঠল। আর দেরী নয়।

প্রসেনজিৎ বললেন, "ভেবে দেখুন আপনারা, আবেগ যেন আপনাদের আচ্ছন্ন না করে"—

"যুদ্ধ—যুদ্ধ চাই"—

"রূপনগরকে ধ্বংস করতে হবে"—

"শোধ নিতে হবে"—

"যুদ্ধ চাই"—

একজন সদস্য উঠে দাঁড়াল, বলল, "কিন্তু একটা প্রশ্ন প্রধান মন্ত্রী"—

প্রসেনজিৎ বললেন, "আমি উত্তর দেব।"

"যুদ্ধ-ঘোষণা করার মত সৈন্যবল কি আমাদের আছে?"

"আছে।"

"অস্ত্রবল? রূপনগর ছোট হলেও নানা বৈজ্ঞানিক অস্ত্র আবিষ্কার করেছে ওরা"—

প্রসেনজিৎ হাসলেন, তার তীক্ষ্ণ চোখে কৌতুক ঝিলিক মারল, তিনি বললেন, "এবিষয়ে আমি জবাব দেব না—আমাদের বন্ধু, আজবনগরের সেরা বৈজ্ঞানিক সত্যকামবাবুই বলবেন এ বিষয়ে"—

অরিন্দম দেখল যে বেদীর পেছনে উপবিষ্ট অপরিচিত লোকদের মধ্য থেকে একজন প্রাচীন লোক উঠে এল সামনে। অরিন্দম বুঝল যে তাঁরা সবাই বৈজ্ঞানিক এবং ঐ বৃদ্ধই সত্যকাম। সৌম্য, শান্ত মূর্তি তাঁর।

সত্যকাম সামনে এলেন, মৃদু হেসে বললেন, "সভাপতি মহাশয় ও বন্ধুগণ, যুদ্ধের বিষয়ে আজ আলোচনা হবে জেনেই আমি এবং আরো কয়েকজন সহকর্মী এখানে এসেছি। যুদ্ধ করতেই হবে তা আমি বলি না। তবে একথা জোর গলায় বলব যে আপনারা যদি যুদ্ধ করেন তাহলে অস্ত্রবলের বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন।"

প্রশ্ন এল চারদিক থেকে, "কেন? কেন?"

"কেন? তাহলে শুনুন। রূপনগর কল্পনাতেও ভাবতে পারবে না যে না আমরা কি আবিষ্কার করেছি। ব্যাধির বীজাণু ছড়িয়ে আমরা তাদের মধ্যে মড়ক সৃষ্টি করতে পারি। এখানে বসে একটা বোমা দু'শো মাইল দূরবর্তী জায়গায় ফেলতে পারি। সেই বোমার ঘায়ে এক একটা শহর আর একলাখ করে শত্রু ধ্বংস হবে"—

সদস্যেরা করতালি দিয়ে উল্লাস জানাল, "সাধু সত্যকাম সাধু"—

বেদনায় অরিন্দমের মুখ একবার ম্লান হয়ে উঠল। এই কি বৈজ্ঞানিকের সাধনা? গ্রহ তারকা, নক্ষত্র, দেহ, জড়জগতের রহস্যজালকে ছিন্নভিন্ন করে মানুষকে শক্তিশালী করার সাধনা যার [illegible] আজ এ কী করছেন! শুধু আত্মধ্বংসী অস্ত্রনির্মাণেই কি তাঁর প্রতিভা নিয়োজিত হবে? কারা? এরা কারা?

সত্যকাম সোৎসাহে বলে চললেন, "শুধু তাই নয়—এমন শক্তিশালী আলোকে আমরা আবিষ্কার করেছি যে তার সংস্পর্শে এলে বিমানযান, অর্ণবযান, মানুষ, শস্য,—সব কিছুই পুড়ে ছাই হয়ে যাবে"—

"সাধু সত্যকাম, সাধু। বৈজ্ঞানিক সত্যকাম দীর্ঘজীবি হোন"—

উল্লাসে ফেটে পড়ল সদস্যেরা, "যুদ্ধ—আমরা যুদ্ধ চাই।"

আর সহ্য করতে পারল না, অরিন্দম দাঁড়াল। মৃত্যুদূতেরা চারদিকে। সমস্ত দেহ তাঁর কাঁপছে, তার দেহের পেশীগুলো লোহার মত শক্ত হয়ে উঠেছে।

ধনরাজের দিকে তাকিয়ে সে বলল, "মহামান্যবর, আমায় কিছু বলবার অনুমতি দিন।"

ধনরাজ মৃদু হেসে মাথা নাড়লেন, "বেশতো—বলুন।"

প্রসেনজিৎ সদস্যের উদ্দেশ্যে বললেন, "শুনুন, আমাদের নূতন সহকর্মী কিছু বলবেন"—

সদস্যেরা করতালি দিয়ে সম্বর্দ্ধনা জানাল।

অরিন্দম একবার চারদিকে তাকাল। সবাই কৌতূহলী দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছে তার দিকে, কান পেতে আছে তার কথার জন্য। একবার মনটা কেমন যেন দুর্বল মনে হল কিন্তু পরমুহূর্তেই সে সামলে নিল। তার চোখের সামনে অসংখ্য মৃতের মুখ ভীড় করে এল। সেই বৃদ্ধ শ্রমিক, দামোদর, বলরাম, মনিশঙ্কর, অচেনা ক-ত মানুষ। এক মুহূর্তে তার মস্তিষ্কের কোষে যেন আগুন জ্বলে উঠল।

সে বলল, "সভাপতি মহাশয়, প্রধানমন্ত্রী এবং বন্ধুগণ, যুদ্ধ সম্পর্কে আপনাদের সিদ্ধান্ত শুনে আমি প্রতিবাদ না করে পারছি না।"—

অস্ফুটকণ্ঠে প্রসেনজিৎ বললেন, "প্রতিবাদ!—

অরিন্দম বলে চলল, "আপনারা রূপনগরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন, কিন্তু আমি আপনাদের অনুরোধ করছি যে একবার ভেবে দেখুন, যুদ্ধকে আপনারা প্রত্যাহার করুন। যুদ্ধ পশুত্বের নিদর্শন—আপনারা কি সেই পরিচয় দেবেন? যুদ্ধের সঙ্গে আসে মৃত্যু, দুর্ভিক্ষ, ব্যাধি, বেকারত্ব, দুর্নীতি—এমন সাংঘাতিক অবস্থাই কি আপনারা দেশের মধ্যে চান? আমি অনুরোধ করছি—আপনারা যুদ্ধকে প্রত্যাহার করুন। শান্তির পথে

অগ্রসর হোন। হিংসায় হিংসা বাড়ে। আজ রূপনগর পরাজিত হলেও তার জ্বালা মিটবে না, ভবিষ্যতে হয়ত আবার তারা আমাদের আক্রমণ করবে আর এমনিভাবেই অনন্তকাল চলবে—। শুনুন"—

প্রসেনজিৎ বাধা দিয়ে চীৎকার করে বললেন, "কিন্তু আমাদের স্বাধীনতা? আমাদের মর্য্যাদা? বন্ধুগণ, মর্য্যাদাহীন জীবন কি বাঞ্ছনীয়? পরাধীন জীবন কি সুখের?"

সদস্যেরা একযোগে মাথা নাড়ল, "না—না—না—"

ধনরাজ প্রসেনজিৎকে কানে কানে বললেন, "ব্যাপার কি প্রধান মন্ত্রী?"

প্রসেনজিৎ বিব্রতকণ্ঠে বললেন, "তাইতো—অরিন্দমের উদ্দেশ্য বুঝতে পারছি না—"

অরিন্দম থামল না, বলল, "মর্য্যাদা আর স্বাধীনতা তো আমাদের বিপন্ন হয়নি। সীমান্ত এলাকার গোলমাল অন্য উপায়েও থামানো যেতে পারে। তার চেয়ে বড় কাজ আমাদের সামনে—আসুন আমরা তার সমাধান করি। আমাদের দেশের লোকেরা অর্দ্ধাহারে, অনাহারে, ব্যাধিতে মারা যাচ্ছে, তাদের দুঃখ দূর করুন। স্বাধীনতা? কার স্বাধীনতার কথা বলছেন আপনারা? দেশ? দেশ মানেই তো দেশের মানুষ—আগে তাদের দুঃখ দূর করুন, তাদের মানুষের মর্য্যাদা দিন—তারপর যুদ্ধের কথা ভাববেন। বন্ধুগণ"—

"বন্ধুগণ", প্রসেনজিৎ গম্ভীর গলায় বললেন, "আমাদের নূতন মন্ত্রী অবস্থার গুরুত্ব পুরোপুরি উপলব্ধি করেননি বলে আমি দুঃখিত। আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে তাঁর ধারণা ভ্রান্ত—অতএব আপনারা কি—"

ধ্বনি উঠল, "যুদ্ধ—আমরা যুদ্ধ চাই"—

কি হিংস্র চাহনি সবার! কি গভীর ঘৃণা সবার চোখে মুখে! আঘাত কর, ওদের চৈতন্য ফিরিয়ে আনো।

আবেগের সঙ্গে অরিন্দম বলল, "শুনুন, আপনারা ঘৃণা আর হিংসা ছড়াবেন না পৃথিবীময়। আপনারা দেশের জন্য দায়ী বলেই তাকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দেবার অধিকার নেই আপনাদের। বন্ধুগণ, ভেবে দেখুন, লক্ষ লক্ষ লোকের মৃত্যু, শ্মশানের মত নগর, ব্যাধি, মড়ক আর দুর্ভিক্ষ কি চান আপনারা? রাজ্যময় জনতা অশান্ত, ক্ষুব্ধ, বিপ্লবের জন্য তৈরী—এসময়ে কি আপনাদের যুদ্ধ সাজে?"

সদস্যেরা টেবিল চাপড়ে গোলমাল সুরু করে দিল। উত্তেজিতভাবে কানাকানি করতে লাগল তারা।

"কি বলছে নতুন মন্ত্রী?"

"পাগল, ব্যবসার সুযোগটা নষ্ট হবে—"

"নিশ্চয়ই, যুদ্ধ না হলে কি কালোবাজার জমে?"

সবাই চীৎকার করে উঠল, "বু—বু—বু—উ—উ—উ—"

কেউ শুনছেনা তার কথা।

কিন্তু তবু হারবে না অরিন্দম, সে হাত নেড়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করতে লাগল, "বন্ধুগণ—বন্ধুগণ"—

প্রসেনজিৎ ধনরাজকে বললেন, "আর সন্দেহ নেই মহামান্যবর"—

ধনরাজ মাথা নাড়লেন, "হ্যাঁ, ও ছদ্মবেশী শত্রু—ওকে তাড়াও"—

অরিন্দম চীৎকার করে বলল, "শুনুন—আপনারা নিজেদের স্বার্থের জন্য দেশের লোকের জীবন বিপন্ন করবেন না। শুধু কি তাই? পৃথিবীর মানুষের জন্যও কি আপনাদের কোন দায়িত্ব নেই? শুনুন, ইতিহাসের কাহিনী স্মরণ করুন—যুদ্ধে কারো কোন লাভ হয় না—যুদ্ধের ফল চিরকাল এক—

প্রসেনজিৎ লাফিয়ে সামনে গেলেন, অরিন্দমের কথা চাপা দিয়ে গলা ফাটিয়ে বললেন, "বন্ধুগণ, আপনারা কি এখনো এই অসংবদ্ধ প্রলাপ শুনতে চান? এই ভদ্রলোক শক্তিমান হওয়ায় আমরা তাকে মন্ত্রীত্বে বরণ করেছিলাম, কিন্তু এখন কি দেখছি আমরা? উনি নির্বোধ, অকৃতজ্ঞ, দায়িত্বহীন—"

"ঠিক বলেছেন প্রধানমন্ত্রী—ঠিক বলেছেন"—

"শুধু তাই নয়, এখন মনে প্রশ্ন জাগছে উনি কি মন্ত্রীত্বের যোগ্য? রাজনীতির অ আ ক খ জ্ঞানও যাঁর নেই তাঁকে কি আপনারা"—

সভাগৃহ থেকে বজ্রনির্ঘোষ শোনা গেল, "না, আমরা ওকে আর চাইনা"—

"নতুন মন্ত্রীকে বরখাস্ত করুন"—

"ওকে আমরা চাই না"—

টেবিল চাপড়ে কোলাহল করে উঠল সদস্যেরা।

অরিন্দম মরিয়ার মত বলল, "আমি মেনে নিচ্ছি আপনাদের রায়। কিন্তু বন্ধুগণ, আর একবার ভেবে দেখুন। আপনাদের পরিচালনা করছেন যাঁরা—সেই সরকার স্বার্থপর। মিথ্যা, অবিচার এবং কপটতাই তাঁদের ধর্ম"—

"চুপ করুন"—

"শুনব না—আমরা কোন কথা শুনব না"—

"বু—উ—উ—উ—বু—উ—উ—উ"—

অরিন্দম গর্জে উঠল, "আপনাদের সরকার রূপনগরকে কেন আক্রমণ করবেন জানেন? সেখানকার তেলের খনির মালিক হবার জন্য। তাদের স্বার্থের যূপকাষ্ঠে দেশের লোকদের বলি দেবেন তাঁরা"—

প্রসেনজিৎ গর্জন করে উঠলেন, "অরিন্দমবাবু—সাবধান"—

অরিন্দম ভয় পেল না। এই তো শুরু হয়েছে তার মহান সংগ্রাম। ভাঙো, চক্রান্তজালকে অপসারিত করো।

সে বলল, "আমি ভয় করিনা, আজ আমি সত্যকে উদ্ঘাটিত করব"—

প্রসেনজিৎ অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন, সভাগৃহের দিকে তাকিয়ে বললেন, "শুনছেন, কোন যুক্তিতেই আপনাদের টলাতে না পেরে কিভাবে বিভ্রান্ত করতে চাইছে এই ভদ্রলোক?—কিন্তু আপনারা ভুল করবেন না, এই কালো চামড়ার লোকটিকে বিশ্বাস করবেন না। অশেষ শক্তির

পরিচয় দিয়েছিল বলেই কালো হওয়া সত্বেও ওকে বিশ্বাস করেছিলাম আমরা। এখন বুঝছি যে আমরা ভুল করেছিলাম কারণ, কালো মানুষেরা চিরকালই অমানুষ এবং বিশ্বাসঘাতক"—

অরিন্দম বলল, "আরো শুনুন—সীমান্ত আক্রমণ, লুণ্ঠন, নারীহরণ—নির্জলা মিথ্যা। বন্ধুগণ"—

ধনরাজ গর্জে বললেন, "বিশ্বাসঘাতক"—

প্রসেনজিৎ বললেন, "হ্যাঁ, এই নীচ ব্যক্তি বিশ্বাসঘাতক"—

অরিন্দম তবু বলতে চাইল, "কিন্তু বন্ধুগণ"—

নিষ্ঠুরতায় ভেঙ্গে পড়ল সভাগৃহ, ধনি তুলল, "শুনতে চাইনা—তুমি বিশ্বাসঘাতক"—

"ওকে বের করে দিন"—

অঘোরনাথ প্রসেনজিৎকে বলল, "ওকে গ্রেপ্তার করুন"—

অরিন্দম হাত নেড়ে কথা বলতে গেল, কিন্তু পারল না, পেছন থেকে মহানন্দ ও অঘোরনাথ তাকে ঠেলে নামিয়ে দিল বেদী থেকে।

"ভাই সব—শুনুন—" অরিন্দমের কণ্ঠ থেকে কান্নার মত কথা বেরোল।

হিংস্র পশুর মত সভাগৃহ ফেটে পড়ল, "বের করে দিন—বিশ্বাসঘাতককে বের করে দিন"—

একটি রক্ষীকে হাজির করলেন প্রসেনজিৎ। রক্ষীটি গিয়ে অরিন্দমের ঘাড়ে ধাক্কা দিল, ঠেলতে ঠেলতে বাইরের দিকে নিয়ে চলল।

পিঞ্জরাবদ্ধ বাঘের মত তবু বলল অরিন্দম, "ভাইসব শুনুন, মানুষের সুখ শান্তিকে বিপন্ন করবেন না।"

"বেরিয়ে যাও"—

"মানুষকে মানুষ বলে শ্রদ্ধা করুন"—

"শয়তান"—

"তাদের দুঃখ দূর করুন"—

"নীচুপাড়ার চর"—

"পৃথিবীকে সমভাবে ভোগ করুন সবাই"—

"বিশ্বাসঘাতক কুকুর"—

হিংসা, হিংসায় মুখ কালো হয়ে উঠেছে সবার। হিংসায় বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে। ভগবান।

একটি ধাক্কা ও পদাঘাত।

বাইরের পাথর-বাঁধানো পথের উপর ছিটকে পড়ল অরিন্দম।

"হাঃ—হাঃ হাঃ—শালা কুত্তা"—রক্ষীটি তার মুখের ওপর থুথু ফেলল।

আর ভেতরে সদস্যেরা গর্জে উঠল সেই সময়, "যুদ্ধ—আমরা যুদ্ধ চাই—আমরা রূপনগরকে ধ্বংস করব"—

আর ধনরাজ যেন প্রসেনজিতের কানে কানে কি সব বললেন।

মহাকাব্যের ভাগ্যাহত মহাবীরের মত অরিন্দম টলতে টলতে এগোল পথের দিকে। বেলা কত? কোন প্রহর? প্রহরী, আমি লাফ দিয়েছি। প্রহরী, তোমার ডাক আমি শুনেছি। হল না। ওদের ব্যূহকে ছিন্নভিন্ন করতে পারলাম না। হ্যাঁ, মুকুন্দ আর ললিতার কথাই ঠিক। নীচুপাড়ার জনতা, আমাকে ক্ষমা কর। কিন্তু ভাইসব, আমি এখনো পরাজিত হইনি, আমার সংগ্রাম সবে সুরু হয়েছে, এখনো তা শেষ হয়নি।

ক্লান্ত মনে হচ্ছে।

টলতে টলতে বাড়ীর দিকে গেল সে।

উঁচুপাড়ার জনতা কৌতূহলী দৃষ্টিনিক্ষেপ করে তার দিকে। নতুন মন্ত্রী পায়ে হেঁটে কোথায় চলেছে? কি ব্যাপার? এমন অঘটন তো কখনো ঘটেনি!

নিজের বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়াল অরিন্দম।

বাড়ীর সামনে আটজন আগ্নেয়াস্ত্রধারী রক্ষী।

ভেতরের দিকে পা বাড়াতেই রক্ষীরা তাকে বাধা দিল।

"খবরদার ভেতরে এসো না"—রক্ষীরা ধমকে বলল।

"কেন?" অরিন্দম অবাক হয়ে গেল।

রক্ষীদের একজন সহাস্যে বলল," সরকারের সঙ্গে লড়াই করলে কি আর বাড়ী ঘর থাকে বাবা। যাও এবার রাস্তায় রাস্তায় হাওয়া খাওগে। সরকার তোমার বাড়ী ঘর, টাকা পয়সা ও সম্পত্তি স-ব বাজেয়াপ্ত করেছে। যাও মন্ত্রী বাপধন—সরে পড়ো"—

রক্ষীটি তাকে ধাক্কা দিল।

অরিন্দম ঘুরে দাঁড়াল, ফিরে চলল।

রক্ষীরা হো হো করে হেসে উঠল।

এবার? কোথায় যাবে সে? কি করবে?

নীচুপাড়ায়? নীচুপাড়ায় ফিরে যাবে? এখনি?

না। উঁচুপাড়া তো শাসক-গোষ্ঠী আর সভাগৃহেই সীমাবদ্ধ নয়। উঁচুপাড়ার মানুষেরা যদি তার কথায় সচেতন হয় তাহলে কি সরকারের মত বদলাবে না? নিশ্চয় বদলাবে। হ্যাঁ, সেই চেষ্টাই করবে সে? নীচুপাড়া জাগ্রত হচ্ছে। উঁচুপাড়াকেও জাগ্রত করবে সে? তা না হওয়া পর্যন্ত সে এখানকার মাটি আঁকড়ে পড়ে থাকবে।

"মন্ত্রী—নতুন মন্ত্রী—"

অরিন্দমের চমক ভাঙল। উঁচুপাড়ার প[illegible]রী জনতা তাকে অনুসরণ করছে, তাকে দেখে আলোচনা করছে।

"কিন্তু কি ব্যাপার? মন্ত্রী যে হেঁটে যাচ্ছেন!"—

"চাল ভাই—নতুন মন্ত্রীর নতুন চাল—"

জনতা বাড়তে থাকে। অরিন্দম যত এগোয়, ততই তাকে ঘিরে জনতার সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

হঠাৎ খেয়াল হল অরিন্দমের। এইত সুযোগ। বাতাসে রাজ্য-বিজয়ের মধুর তান। বারংবার আঘাত হানো—

থামল সে, চারিদিকের জনতার উদ্দেশ্যে বলল, "ভাই সব—শোন—"

জনতা কৌতূহলী হয়ে উঠল।

"শোন শোন, মন্ত্রী মশাইয়ের কথা শোন—"

"রাস্তায় বক্তৃতা—বাঃ—"

অরিন্দম বলল, "ভাইসব, তোমরা হয়ত জানো যে রূপনগরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা হয়েছে—"

"যুদ্ধ! বাঃ—"

"আরে যুদ্ধ মানেই মোটা মুনাফা—"

"আর মুনাফা মানে? ছাগমাংস আর নারীমাংস—"

অরিন্দম বলল, "কিন্তু তোমরা তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ঘোষণা করো। তোমাদের জীবন যে যুদ্ধে বিপন্ন হয়, যে যুদ্ধে মানুষের দুঃখ বৃদ্ধি পায় তাকে তোমরা স্বীকার করো না, তাতে তোমরা যোগ দিয়ো না। শোন, তোমাদের শাসকগোষ্ঠী স্বার্থপর ও ক্ষমতা-লোভী—"

জনতা গুঞ্জনধ্বনি শুরু করল, "এ সব কী কথা বলছে হে মন্ত্রী?"

"এ আবার কি শুনছি?"

অরিন্দম বলতে লাগল, "তারা মনুষ্যত্বের শত্রু, স্বার্থে ও হিংসায় তারা অন্ধ। তাদের কথায় বিভ্রান্ত হয়োনা তোমরা, শোন, তোমাদের শোষণ করার জন্যই তাদের সমাজ-নীতি আর ধর্ম—শোন—"

হঠাৎ একটি সংবাদপত্র-বিক্রেতা উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করতে করতে এল সেখানে, "তাজা খবর—বিশেষ সংখ্যা—নতুন মন্ত্রীর কাণ্ড শোন—"

জনতা চঞ্চল হয়ে উঠল।

"কি খবর? কি খবর?"

"রূপনগরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা হয়েছে—যুদ্ধ—"

"নতুন মন্ত্রী সরকার-বিরোধী"—

"বিশ্বাসঘাতক!"—

অসহায় দৃষ্টি মেলে অরিন্দম বলল, "ভাই সব—শোন"—

কিন্তু কাদের বলছ সে? সংবাদপত্রে তার ছবি বেরিয়েছে, বেরিয়েছে তার নিন্দা, তাকে বিশ্বাসঘাতক শত্রু বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তাই পড়ে মুহূর্তে উঁচুপাড়ার জনতার মুখে চোখে ঘৃণার অন্ধকার নেমে এল।

"ভাইসব—শোন"—

কিন্তু কেউ শুনল না। মুহূর্তে হিংসায় ফেটে পড়ল তারা।

"বিশ্বাসঘাতক—শালা, শত্রু"—

"মারো—ব্যাটাকে মারো"—

রাস্তা থেকে ঢিল পাটকেল কুড়িয়ে নিল তারা, তার দিকে নিক্ষেপ করতে লাগল। হাতে, পায়ে, পিঠে, বুকে, মাথায় এসে লাগল তা। বেদনা, রক্ত। কিন্তু তবু যেন সে বাতাসে কার নূপুর-নিক্কণ শুনল, তবু যেন তার কানে ভেসে এল বীণার ঝঙ্কার—

"মারো শালাকে—হটাও"—

"বড় বড় কথা কপচাচ্ছো ব্যাটা—বটে!"

চারজন রক্ষী ছুটে এল, কাঠের ডাণ্ডা তুলে জনতাকে ভয় দেখিয়ে ছত্রভঙ্গ করে দিল।

তারপর রক্ষীরা অরিন্দমের কাছে এল, বলল, "খবরদার—রাস্তায় আর বক্তৃতা দেবেনা তুমি"—

অরিন্দম কথা বলল না, শুধু যন্ত্রণা-বিকৃত হাসি হাসল।

রক্ষীরা বলল, "যাও এখন—সরে পড়ো—হটো"—

অরিন্দম পা বাড়াল।

হল না। কোন ফলই হল না। বহুদিনের দাসত্ব এখন সংস্কারে পরিণত হয়েছে, বটবৃক্ষের মত অজস্র শিকড় মেলে মৃত্তিকাকে আঁকড়ে ধরেছে। কিন্তু থামবে না সে, হারবে না, সত্যকে সে প্রতিষ্ঠিত করবেই,

মানুষকে সে মুক্ত করবেই। দেহে বেদনা, রক্ত। তবু আকাশ কি সুন্দর! সেই মনিময় কক্ষে এখন মালবী রাগিনী মূর্তিমতী হয়েছে। সেই নর্তকীর স্বর্ণকেশ নৃত্য-তালে দুলছে, দুলছে। ললিতা, আমি পথভ্রষ্ট হইনি।

হেঁটে চলল সে।

অপরাহ্ন এল, গেল, সন্ধ্যা হল। রাত হল।

উঁচুপাড়ার রাজপথে, ঘরে আলোর সমারোহ। ভীড়। সংবাদপত্রের ঘোষণা। যুদ্ধ। নতুন মন্ত্রী বহিষ্কৃত। এখানে ওখানে জনতার জটলা।

হাস্যমুখ নরনারী। সুসজ্জিত, সুরভিত। ভীড়। যানবাহন লৌহবর্ত্মে ধাবমান বিদ্যুৎ-যান। ইস্পাতে ইস্পাতে সংঘর্ষ, অগ্নিস্ফুলিঙ্গ আর ধাতব গন্ধ। কোলাহল, হাসি উৎসব। মদমত্ত নরনারী। কটাক্ষ, স্তনাগ্রচূড়া আর নিতম্ব-নর্তন। মাতৃত্বহীনা নারী। অনর্গল কথা আর কামোন্মত্ত বনমানুষের হাসি ধর্মান্ধ, পৌরুষহীন পুরুষ। কুসংস্কারের আবর্জনাস্থল আর নীচতার মূর্তি। লালসা, লোভ আর হিংসার রক্ষক। ভাঙো—

"হাঃ হাঃ হাঃ—ঐ দেখো"—কে একজন চীৎকার করে বলল।

অরিন্দম তাকাল। কয়েকজন তাকে চিনতে পেরেছে। উঁচুপাড়ার সীমান্তে এসে পৌঁছেচে সে। দূর থেকে সে নীচুপাড়াকে দেখতে পেল। অন্ধকার নীচুপাড়া। সেই অন্ধকারকে রূপ দেবার জন্যই যেন এখানে ওখানে একটা দুটো নিষ্প্রভ বাষ্পীয় আলো। অনাহার, ব্যাধি, দারিদ্র্য আর মৃত্যুর সাড়া। সমস্ত বুক আলোড়িত করে দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরোল তার।

আর তার কানে এল, "দেখো—ঐ যে সেই বহিষ্কৃত মন্ত্রী"—

ভীড় জমল। অরিন্দম দাঁড়াল একটা আলোকস্তম্ভে হেলান দিয়ে। আরো ভীড় জমল। আরো।

একটা কিছু ছিল তার মুখে চোখে। হয়ত বেদনা, ক্ষুধা আর

শোণিতচিহ্ন তার মুখে একটা আকর্ষণীয় ছাপ এঁকে দিয়েছিল। তাই জনতা বাড়ল।

হাসাহাসি করতে লাগল তারা।

"মূর্খ"—

"কি মূর্খ লোকটা!"

"ইচ্ছে করে মন্ত্রীত্ব হারায়!"

"মূর্খ নয় হে—বিশ্বাসঘাতক"—

"নীচুপাড়ার দরদী"—

"হাঃ হাঃ হাঃ"—

"হি হি হি"—

অরিন্দম তাকাল তাদের দিকে। বেদনায় বুকটা তার মুচড়ে মুচড়ে উঠল। মানুষ—মানুষই মানুষের শত্রু। কারা হাসছে? হায়। যারা হাসছে তারা জানে না যে নিজেরা নিজেদের কি ক্ষতি করছে তারা।

সে সোজা হয়ে দাঁড়াল, বলল, "ভাইসব, আমাকে ঘৃণা করো, আমাকে দেখে হাসো—কোন ক্ষতি নেই। কিন্তু ভাইসব, দয়া করে আমার কয়েকটা কথা শোন"—

সে বলতে শুরু করল। জনতা সকৌতুকে তার কথা শুনতে লাগল।

একজন বলল, "দাও না ভণ্ডুল করে ব্যাটার বক্তৃতা—এঁ্যা?"

তার সঙ্গীরা বলল, "না—শোনা যাক না কি বলে"—

আর সবাই বলল, "যথার্থ—নির্বীষ ভুজঙ্গকে ভয় কি?"

অরিন্দম বলে চলল। উঁচুপাড়ার আলোকিত বিজ্ঞাপনের লেখা জ্বলতে লাগল, নিভতে লাগলো চারদিকে। বেতার-যন্ত্রের গান ভেসে এল দূর থেকে। আর তাকে ছাপিয়ে ভেসে এল বসন্তের আলাপ। মৃদঙ্গ বাজছে, নৃত্যশ্রমে মুক্তোর মত স্বেদবিন্দু জমেছে নর্তকীর ললাটে, বীণকারের বীণা কথা কইছে। হ্যাঁ, আজবনগরেও বসন্ত এসেছে। ভাই মানুষ, জাগো-ও-ও। উঠে দাঁড়াও, সংঘবদ্ধ হও, অত্যাচার আর শোষণের

অবসান করো। কুসংস্কার আর ভয় থেকে মুক্ত হও। মানুষে মানুষে ভেদাভেদ নেই। পৃথিবী সবার। যারা মানুষকে ধর্মের নামে, ভগবানের নামে, পূর্বজন্মের কথা বলে বিভ্রান্ত করে, যারা শোষণ করে স্বার্থকে সমৃদ্ধ করে, যারা সমৃদ্ধিবান হবার জন্য মানুষকে শ্রেণী এবং জাতিতে বিভক্ত করে তাদের উৎপাটিত করো। শোন, প্রত্যেকেই আমরা মুক্ত ও নগ্ন হয়ে জন্মাই। আমাদের ইতিহাস এক—আনন্দ থেকে রক্ত ও মাংস লাভ করি আমরা—আনন্দই আমাদের ধর্ম। সেই আনন্দের শত্রু হিংসা। হিংসাকে ধ্বংস করো। একটা হত্যা করার চেয়েও বড় হিংসা একজনকে ছোট মনে করা। অন্যায়ের বিরোধিতা হিংসা নয়। অন্যায় ভাবা আর মানুষকে অমানুষ ভাবা, তাকে ভাগ্যের কাছে অসহায় বলে প্রতিপন্ন করার চেষ্টাই হিংসা। ভাই মানুষ, তোমার মধ্যেই ঈশ্বর, নিজেকে দেখো, চেনো, জানো যে সত্য, সৌন্দর্য এবং প্রেমই ঈশ্বর। হিংসায় হিংসা বাড়ে। শান্তি চাই। কিন্তু এই সমাজ-ব্যবস্থা। সেই ব্যবস্থার রক্ষাকর্তা আর তোমাদের শাসকেরাই শান্তির শত্রু। তাদের জন্যই তোমরা শুধু জৈবিক তাগিদের কথাই ভাবো, ভালবাসতে পারো না। তাদের সরাও, তাদের পরাজিত করো, তাদের ধ্বংস করো। তারপর? মুক্ত মানুষ, সুখী মানুষ, প্রেমিক মানুষ আর চিরস্থায়ী শান্তি। স্বার্থপরেরা শাসন করে বলেই একদেশের সঙ্গে আরেক দেশের বিরোধ। মানুষদের শাসন প্রতিষ্ঠিত করো, পৃথিবীময় শান্তি বিরাজিত হবে। শান্তিই আত্মার পথকে প্রশস্ত করে। ওঠো, সংগ্রামের জন্য পাশাপাশি দাঁড়াও—মনুষ্যত্ব-হরণকারী হিংস্রকের হিংসাকে নিশ্চিহ্ন করো। ভাইসব—

হঠাৎ বাষ্পযানের শব্দ শোনা যায়, শোনা যায় অশ্বক্ষুরের শব্দ। অরিন্দম দেখতে পেল কিন্তু থামল না। জনতার নজর সেইদিকে ছিল না। কৌতূহলবশতঃ শুনতে শুনতে তারা ধীরে ধীরে আকৃষ্ট হয়ে পড়ছিল। কথাগুলো শুনতে ভাল লাগছে, যদিও একটাও বিশ্বাসযোগ্য

মনে হচ্ছে না। এমন লম্বা চওড়া বুলি তারা সাধু মোহনদাসের মুখে ঢের ঢের শুনেছে। এর চেয়েও ভালো ভালো কথা। কিন্তু কি হল? দরকার কি বাবা অত ঝামেলায়?

হঠাৎ গর্জন শোনা গেল, "মারো সবাইকে, মারো"—

অশ্বারোহী রক্ষীরা ঘোড়া ছুটিয়ে জনতার মাঝখানে এল, সবেগে এলোপাথাড়ি ডাণ্ডা চালাতে শুরু করল তারা।

"পালা-পালা শালারা"—

"পালাও—পালাও"—

"বক্তৃতা শোনা হচ্ছে—বিশ্বাসঘাতকের বক্তৃতা—বটে!"

"পালাও-পালাও"—

"উঃ"—

"আঃ"—

আর্তনাদ, কোলাহল। বিশৃঙ্খল পলায়মান জনতা।

অরিন্দম বিষণ্ণ হেসে বলল, "ভয় পেয়ো না—দেখ, সত্যের শক্তি দেখো। সত্য উচ্চারিত হয়েছে বলেই অসত্যের দাসেরা ছুটে এসেছে—শোন"—

রক্ষীরা গর্জে উঠল, "মারো শালা গুপ্তচরকে"—

কয়েকজন তার দিকে ছুটে এল।

তারপর কিল, চড়, ঘুষি, পদাঘাত। মাথা ফেটে গেল, রক্তে সর্বাঙ্গ ভিজে গেল।

অরিন্দম জ্ঞান হারাল।

একজন রক্ষী-প্রধান এগিয়ে এল, "শালাকে নীচুপাড়ার রাস্তায় টেনে ফেলে দাও আর পাহারা দাও এখানে—ও যেন আর এদিকে ঢুকতে না পারে"—

দুজন রক্ষী অরিন্দমের দু'পা ধরে টানতে টানতে নীচুপাড়ার রাস্তায় নিয়ে ফেলে দিল তাকে।

সব রক্ষীরা চলে গেল।

শুধু দূরে উঁচুপাড়ার সীমান্তে, চারজন আগ্নেয়াস্ত্রধারী রক্ষী টহল দিতে লাগল। পিচ-বাঁধানো কঠিন রাজপথের ওপর থেকে তাদের লোহার নাল-লাগানো ভারী জুতোর শব্দ বারংবার ভেসে আসতে লাগল—খট্ খট্—খট্ খট্—খট্ খট্—খট্ খট্—

ছয়

অরিন্দমের জ্ঞান ফিরে এল। একটু বাদেই। দেহে অসহ্য বেদনা। সে তাকাল ধীরে ধীরে। কোথায়? এযে পরিচিত জায়গা! নীচুপাড়ার রাস্তায় পড়ে আছে সে!

মাথার ওপর তারা-ঝক্‌ঝকে আকাশ। বসন্তের মৃদু বাতাসে নীচুপাড়ার শবগন্ধ। রাত কত? দ্বিতীয় প্রহর শেষ হতে চলল। তাই তো পঞ্চম রাগের বিলম্বিত তান ভাসছে কানের পাশে, পাখোয়াজ ধ্বনিত হচ্ছে ধমণীর তালে, সুর আর তাল যেন রস হয়ে বেদনাকে ম্লান করে দিচ্ছে। ললিতা, তোমার কথাই সত্য। মুকুন্দ, ক্ষমা করো। প্রহরী, এবার কি করব?

কে! অরিন্দম সচেতন হয়ে তাকাল ভালো করে। সপ্তমীর চন্দ্রদেব খণ্ডাকারে আকাশে উঠেছেন। তার অস্পষ্ট আলোয় নীচুপাড়ার গলি থেকে বহুলোককে ছায়ামূর্তির মত নিঃশব্দে এগিয়ে আসতে দেখা গেল।

তারা কাছে এল, অরিন্দমকে ঘিরে দাঁড়াল।

"কে?"

"কে?"

"আরে এযে অরিন্দম—"

"খবর দাও—অরিন্দমকে ওরা আহতাবস্থায় ফেলে রেখে গেছে—"

কয়েকজন ছুটে চলে গেল।

"তোলো ভাই—অরিন্দমকে তোল—"

ক্ষীণকণ্ঠে অরিন্দম প্রশ্ন করল, "তোমরা! আমাকে বয়ে নিয়ে যাবে? আমাকে কি আর ঘৃণা করো না তোমরা?"

লোকটি হাসল, "ঘৃণা! উঁচুপাড়ার কাগজে তোমরা সংগ্রামের কথা আমরা পড়েছি—তুমি তো আমাদেরি জন্য সংগ্রাম করেছ—"

"আমি—আমি"—

"হ্যাঁ, তুমি সত্যনিষ্ঠ, আদর্শ প্রেমিক—তুমি মহৎ যোদ্ধা—

আঃ—আঃ। অরিন্দম দু'চোখ বুজল।

বাকী সবাই তাকে ধরাধরি করে নীচুপাড়ার ভেতরে, একটা ফাঁকা জায়গায় নিয়ে শোয়াল।

দূর থেকে নরনারীদের ছুটে আসতে দেখা গেল।

"অরিন্দম—অরিন্দম এসেছে—"

"মহাবীর ফিরে এসেছে—"

"আমাদের যোদ্ধা—"

"আমাদের অরিন্দম—"

অসংখ্য নরনারী এসে জড় হল তার চারদিকে। দুঃখহত, দরিদ্র, মৃত্যুর ছায়ায় বিবর্ণ-মুখ মানুষেরা। ঘৃনা, লোভ, নীচতা আর অভাবের মধ্যে হাবুডুবু খেতে খেতেও যারা মানুষ হতে চাইছে, ভালবাসছে, শ্রদ্ধা করছে, আত্মত্যাগ করছে। মানুষ—মানুষই সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

"আহা, কে মেরেছে এমন করে?—"

"ওরা—ওই শত্রুরা—"

"আমাদের শত্রুরা মেরেছে—"

"সত্য বলার জন্য—"

"ভণ্ডের মুখোস খুলে ফেলার জন্য—"

হঠাৎ ভীড় ঠেলতে ঠেলতে এল মুকুন্দ আর ইন্দ্র, অরিন্দমের পাশে তারা হাঁটু গেড়ে বসল, ডাকল, "অরিন্দম"—

অরিন্দম হাসল, "আমাকে ক্ষমা করেছ?"

মুকুন্দ অনুতপ্তকণ্ঠে বলল, "তুমিই আমাদের ক্ষমা কর ভাই—তুমি প্রমাণ করেছ যে তুমি আদর্শনিষ্ঠ—"

"কিন্তু আমি যে ব্যর্থ হলাম—"

"তবু আদর্শচ্যুত হওনি—ভবিষ্যতে তাই আমাদের সার্থকতায় নিয়ে পৌছোবে!"

"ঠিক বলেছ মুকুন্দ—। মুকুন্দ, আমাকে তোমাদের সাথে সংগ্রামে যোগ দিতে দেবে?"

মুকুন্দ হাসল, "দেবনা? তুমি এখন থেকে আমাদের পুরোভাগে থাকবে।"

"মুকুন্দ—"

"উঁ?"

"তোমার ঋণ শোধ করা যায় না—"

"কি বলছ?"

"তুমিই তো আমার গুরু মুকুন্দ—"

"তুমি পাগল।" মুকুন্দ সস্নেহে অরিন্দমের মাথায় হাত বুলোল।

স্তব্ধতা।

"মনিশঙ্কর আর নেই মুকুন্দ—বোধ হয় জানো?"

"জানি—কিন্তু তার কর্ম আছে, কথা আছে, নির্দেশ আছে—"

"হ্যা—হ্যা—"

স্তব্ধতা। আনন্দময় পৃথিবী।

"মুকুন্দ—"

"বল—"

"এখানে কতদূর?"

"শক্তি বাড়ছে আমাদের প্রতিদিন—মানুষেরা আর মরতে ভয় পায় না।"

অরিন্দম সানন্দে হাসল।

স্তব্ধতা।

কে আসছে ? ভীড় সরে গিয়ে কাকে পথ করে দিচ্ছে ? তাপসকুমারীর মত শীর্ণা, প্রখর-যৌবনা ওই নারী কে ?

কাছে এল সেই নারীমূর্তি। পরণে ছিন্ন শাড়ী ও জামা তবু কি অপরূপ তার মুখ, কি গভীর তার চোখ !

"ললিতা !"

অরিন্দমের পায়ের কাছে বসে পড়ল ললিতা, তার দু'পায়ে মুখ লুকোল। তার সর্বাঙ্গ যেন অদৃশ্য একটা ঝড়ের ধাক্কায় কাঁপছে।

মুকুন্দ ইন্দ্রকে টেনে নিয়ে একপাশে সরে গেল। প্রণয়ীযুগল কথা বলুক।

"ললিতা—মুখ তোল—"

মুখ তুলল ললিতা। তার চোখে জল। যেন পদ্মের ওপর শিশির-বিন্দু।

"কাঁদছ !"

ললিতা হাসল, "হ্যাঁ।"

"কেন ?"

"আমি আজ সুখী।"

"কেন ?"

"তুমি—তুমি ফিরে এসেছ বলে। নির্যাতন সহ্য করে, প্রলোভনকে জয় করে তুমি সত্যকে ঘোষণা করেছ বলে—আর—"

"আর ?—"

"তুমি বীর বলে—"

"শুধু তাই ? আর কিছু নয় ?"

"হ্যাঁ—আর—"

"কি ?"

অরিন্দমের দিকে মুগ্ধভাবে তাকিয়ে ললিতা হাসল, তারপর মাথা নীচু

করে অস্ফুট স্বরে বলল, "আমার প্রিয়তমকে আবার পুরোপুরি ফিরে পেলাম বলে।"

আঃ। বীণা ঝঙ্কৃত হয়ে উঠেছে, পাখোয়াজ ধ্বনিত হচ্ছে, নর্তকীর দেহলাস্যে রক্ত-সমুদ্র আলোড়িত হচ্ছে। সপ্তমীর চন্দ্রদেব, আমি সুখী। বসন্তবায়ু, আমাদের প্রেমকে সুরভির মত পৃথিবীময় ছড়িয়ে দাও। আমি আমার নারীকে ফিরে পেয়েছি, প্রঃ নী-ই ই—এবার আমি ব্যর্থ হব না, এবার আমি পাহাড়কেও চুরমার করে ফেলব—। হে মূর্খ, মদমত্ত, উদ্‌ভ্রান্ত উঁচুপাড়া, তোমার দিন ঘনিয়ে এল, সাবধান—তোমার গগণস্পর্শী ঔদ্ধত্য একদিন তোমার আকাশচুম্বী সৌধাবলীর সঙ্গে ভেঙ্গে নীচুপাড়ার পথের ধূলোয় মিশবে, তোমার বহুদিনের সঞ্চিত পাপ একদিন তোমাকে রসাতলের অন্ধকারে ডুবিয়ে মারবে—

ভোর থেকেই নীচুপাড়ায় চাঞ্চল্য জাগল।

আহত, দুর্বল দেহ, তবু বসে থাকতে রাজী হল না অরিন্দম। মুকুন্দ আর ইন্দ্রকে নিয়ে সে নীচুপাড়ার সর্বত্র ঘুরে বেড়াতে লাগল। নীচুপাড়া থেকে লোক পাঠাল সে গ্রামাঞ্চলে। এক গ্রাম থেকে আর এক গ্রামে ছড়াতে লাগল তাদের কথা, তাদের ডাক। কিন্তু শাসকদের শক্তি যেখানে কেন্দ্রীভূত সেই আজবনগরেই বেশী কাজ করতে হবে।

প্রতি ঘরে ঘরে গিয়ে প্রচার শুরু করল তারা। তাদের পায়ের শব্দে ইঁদুরেরা গর্তে লুকোল, ছুঁচোরা অন্ধকারে অদৃশ্য হল, কুকুরদের ডাক এবং শিশুদের কান্না থেমে গেল। ঘরে ঘরে নারী-পুরুষে মিলে প্রাচীরপত্র লিখল।

তাদের কথা এবং প্রাচীরপত্রের কথা নীচুপাড়ার সর্বত্র এবং বিচিত্রপুরের গ্রামগুলোতে উত্তেজনা ছড়াল। এক হও। কালো ও সাদা

মানুষ, সাকার-বাদী ও নিরাকারবাদী মানুষ এক হও। উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম এক হও। ওঠো, জাগো, মনুষ্যত্ব অর্জন করে মানুষ হও, মানুষ হয়ে নিজের মধ্যস্থিত ঈশ্বরকে খুঁজে পেয়ে দেবতা হও। শোন, মানুষই মানুষের ভাগ্যনিয়ন্তা। এই সত্য। অর্ধসত্যকে বর্জন করো, ঘৃণা করো। শোন, কোন অদৃশ্য শক্তি নয়, মানুষের দুঃখের জন্য স্বার্থপর ও লোভী মানুষেরাই দায়ী। এক হও, স্বার্থপর এবং স্বার্থপরতাকে ধ্বংস করো।

দিন গেল। রাত হল।

রাত গেল। দিন হল।

ললিতা শুশ্রূষা করে অরিন্দমের, ক্ষতস্থান ধুয়ে মুছে দেয় তার। তারপরই আবার বেরোবার জন্য তৈরী হয় সবাই।

ঠিক সেই সময় ইন্দ্র আসে, বলে, "খবর শুনেছ ?"

"কি ?" অরিন্দম প্রশ্ন করে।

"তোমার নামে পরোয়ানা জারী হয়েছে—তোমাকে গ্রেপ্তার করবার জন্য গুপ্তচরেরা ঘুরে বেড়াচ্ছে।"

মুকুন্দ বলে, "কিচ্ছু ভেবো না, আমাদের লোকও প্রতি রাস্তায় টহল দেবে, কোন রক্ষী বা গুপ্তচর দেখলেই খবর দেবে।"

অরিন্দম বলে, "ঠিক। ভয় কি ? তাড়াতাড়ি তৈরী করো সবাইকে—ওদের অত্যাচার এবার বন্ধ করব।"

আবার গলি থেকে গলি। ঘর থেকে ঘরে।

আগুনের মত কথা ছড়ায় চারদিকে। জাগো। শোন, সত্য সুন্দর, সত্যকে জানলে সৌন্দর্যকে জানবে, সৌন্দর্যকে জানলে প্রেমকে জানবে। প্রেমই আনন্দ ও দেবত্ব। চেয়ে দেখ, হিংসা পৃথিবীকে গ্রাস করেছে। 'বীর-ভোগ্যা বসুন্ধরা' বলে মানুষ হিংসার ওকালতী করছে—আদিম যুগের এই অরণ্য-আইনকে বর্জন করো। উঠে দাঁড়াও, হিংসা এবং হিংসার আশ্রয়দাতাদের ধ্বংস করো।

মানুষেরা সাড়া দেয়। ফ্যাক্টরীর শ্রমিক, মুটে, লৌহকার ও কেরাণী।

সাড়া দেয় চাষীরা। যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ বৃদ্ধা, এমন কি শিশুরাও সাড় দেয়।

অন্ধ আসে, খঞ্জ আসে, আসে ভিখারীরা।

তারা বলে, "আমরা তৈরী। কবে, কবে এগোবে তোমরা?"

ওরা বলে, "স্থির হও, ডাক পড়বে, শিগ্‌গীরই।"

দিন গেল। রাত হল।

রাত গেল। দিন হল।

ক্লান্তি নেই। আবার কাজ। চারদিকে সতর্ক চাহনি। নবজীবনের বার্তা রটে চারদিকে। অন্যায়কারীকে দমন করো, ধ্বংস করো। তারা বাঘের মত হিংস্র, নিষ্ঠুর। তারা কখনো প্রেমের ভাষা বোঝে না। তারপর? প্রত্যেকের প্রহরী প্রত্যেকে, প্রত্যেকেই নিজের প্রহরী। সুখ, শান্তি আর সাম্যকে সবাই রক্ষা করো। প্রেম রাজত্ব করুক। চিন্তায়, বাক্যে ও কর্মে সংযত হও, পৃথিবীকে সমভাবে ভোগ কর। শোন, পৃথিবীতে প্রত্যেকে স্বতন্ত্র হলেও একা কেউ বাঁচতে পারে না। এক হও, নিরাপদ হও, নির্ভয় হও। তোমার জন্য সারা পৃথিবী সজাগ থাকবে।

দিন গেল।

দিন গেল।

পরদিন স্থির হল যে নেতারা সবাই একত্রিত হবে রাতে। নীচুপাড়া তৈরী হয়েছে—এবার কর্মসূচী ঠিক করতে হবে।

রাত ন'টার পর ইন্দ্রের বাড়ীতে সভা বসবে। একটা জীর্ণ বাড়ীর দোতালায় কামরাটা—এলাকাটাও নির্জন এবং নিঃশব্দ।

সময় হতেই অরিন্দম বেরোল। সঙ্গে চলল মুকুন্দ, ইন্দ্র এবং আরো চারজন যুবক। ললিতাও সঙ্গ ছাড়ল না অরিন্দমের, সে আর একদণ্ডও তাকে চোখের আড়াল করবে না।

লুকিয়ে, লুকিয়ে সন্তর্পণে তারা গলি বেয়ে চলল।

চলতে চলতে থমকে দাঁড়াল তারা।

তাদের সামনে একটি কঙ্কালসার শবদেহ।

বাতাসে দুর্গন্ধ।

কে যেন দূরে কাঁদছে। নারীকণ্ঠ। কে সে নারী?

অরিন্দম মুখ ঘুরিয়ে বলল, "আবার মরলাম আমি।"

ললিতা অরিন্দমের একটা হাত চেপে ধরল, বলল, "শান্ত হও—সংগ্রামের সময় কঠিনমনা হতে হয়।"

এগিয়ে গেল তারা।

কিন্তু কান্না তো থামে না! কে কাঁদে? নীচুপাড়ার সর্বত্র এ কার কান্না?

আবার থমকে দাঁড়াল সবাই।

ইন্দ্র বলল, "দেখো"—

একটা দেয়ালের ওপর সরকারী ঘোষণাপত্র—তাতে অরিন্দমের ছবি। ঘোষণা করা হয়েছে যে অরিন্দম নামক দেশদ্রোহীকে জীবিত অথবা মৃত যে ধরিয়ে দিতে পারবে তাকে এক হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে।

মুকুন্দ হাসল, বলল, "দামটা বড় কম ধার্য করেছে সরকার।"

সবাই হাসল।

ইন্দ্র এগিয়ে গিয়ে দেয়াল থেকে ছিঁড়ে ফেলল সেই ঘোষণাপত্র, অভিবাদনের ভঙ্গী করে কপট সম্ভ্রমের স্বরে বলল, "আজ্ঞে না মহামান্যবর, পাবেন না—জীবিতও নয়, মৃতও নয়।"

সবাই হাসল, এগোল।

আর ঠিক সেই সময়ে, পার্শ্ববর্তী গলির প্রান্তদেশ থেকে একটি ছায়ামূর্তি বিদ্যুৎবেগে সরে গেল।

অরিন্দম বলল, "আমি তাহলে ওদের কাছে গুরুত্ব অর্জন করেছি—"

মুকুন্দ হাসল, "করবে না কেন? ওদের কান যে বাতাসের মধ্যেও আছে—তুমি যে নীচুপাড়াকে উত্তেজিত ও সংগঠিত করছ সে খবর ওরা পেয়েছে এবং তোমার যে শক্তি আছে তার প্রমাণ তো তারা আগেই পেয়েছে। তাই তোমার মত মারাত্মক শত্রুকে তারা বাঁচতে দিতে পারেনা—"

ইন্দ্রের বাড়ী এসে গেছে।

ওপরে গেল সবাই।

অন্যান্য নেতারাও এসে পৌঁছেচে তাদের আগে।

সভা আরম্ভ হল।

টিমটিমে প্রদীপের শিখাটাকে উস্কে দিয়ে অরিন্দম বলতে আরম্ভ করল, "ভাইসব, বিচিত্রপুর রূপনগরকে আক্রমণ করেছে। বিমানযান, বড় বড় আগ্নেয়াস্ত্র ও বহুরকমের মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আমাদের সৈন্যরা দিনরাত রূপনগরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আরো সৈন্য চাই—তাই সর্বত্র সৈন্য-সংগ্রহের দপ্তরখানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে—নীচুপাড়াতেও তাদের মরণ-যজ্ঞের আহ্বান এসেছে। নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য তারা আমাদের বলি দেবে। তাদের স্বার্থ বৃদ্ধির জন্যই আমরা স্ত্রীর ভালবাসা, ছেলের ভক্তি, মাবা [illegible]র স্নেহ বিসর্জন দিয়ে প্রাণ দেব। চিরকাল তাই দিয়েছি আমরা—দেশের নাম করে, রাষ্ট্র রক্ষার নাম করে। কিন্তু আসল কথাটা কোনদিনই ভাবিনি আমরা। প্রাণ দিয়েও কেন আমরা মানুষের মত বাঁচবার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছি? নিজেদের স্বার্থ নিয়ে যারা অন্ধ থাকে তাদের পরের বিষয়ে ভাববার সময় কোথায়? ফলে চিরকাল আমরা দুর্ভিক্ষ, ব্যাধি ও অভাবে

মারা গেছি। এবারও তাই মরছি আমরা। ইতিহাস এক। কিন্তু আর না, আর সইব না আমরা।"

ছোট্ট ঘরটায় উত্তেজিত দেহমনের উত্তাপ। চোখে মুখে সবার ঘৃণা আর জ্বালা আর শপথ।

অরিন্দম বলে চলল। সব ঠিক। সবাই তৈরী। এই উপযুক্ত সময়। লাল লোহাকে রূপ দাও। আর তিনদিন পরে, আমরা দলবদ্ধ হয়ে উঁচুপাড়ার দিকে অগ্রসর হব, পরস্বাপহারী দস্যুদের ভোগের রাজত্ব আমরা দূর করব। সত্য আমাদের সহায়, সত্যই আমাদের একতাবদ্ধ করবে, আমাদের ঐক্যকে অটুট রাখবে। আগুন ও লোহার তৈরী অস্ত্র না থাকলেও আমাদের অস্ত্র আছে—ঘৃণা ও সত্য। আমরা এগোব, ওরা ওদের মারাত্মক অস্ত্র দিয়ে আমাদের কত মারবে? যদি মারে তো মরব। মৃত্যু পরাজয় নয়! বেঁচে থেকে দাসত্ব স্বীকার করাই মৃত্যু। যে যে ভাবে পারো লড়াই কর। যে সত্যকে জানে তার মৃত্যুভয় থাকে না। যার মৃত্যুভয় থাকে না সে অস্ত্রধারণ না করেও সংগ্রাম করতে পারে। এমন বীরেরাই পৃথিবীকে দেবভূমি করতে পারবে। কিন্তু যে সত্যকে পূর্ণভাবে জানেনি তাকে অস্ত্রধারণ করতে হবে। কাপুরুষতার চেয়ে হিংসা ভালো। আর অহিংসা মানে শত্রুকে ক্ষমা করা নয়। অন্যায় যখন অন্যায়কারীর আত্মা হয়ে দাঁড়ায় তখন সে বাঘের মতই ভয়ঙ্কর—তখন তাকে ক্ষমা করাই পাপ। যে ভালবাসতে পারে সেই অহিংস হয়েও সংগ্রাম করতে পারে, নিঃশব্দে প্রাণ বলি দিয়ে শত্রুর মনে ভীতি উৎপাদন করতে পারে। কিন্তু পৃথিবীতে তেমন কজন আছে? স্বার্থপরদের সৃষ্ট এই সমাজ-ব্যবস্থা প্রেমের শত্রু বলেই মানুষ ভালবাসার চেয়ে ঘৃণাই করে বেশী। এই সমাজ-ব্যবস্থার পরিচালকেরা মুখে বলে যে চুরী করা পাপ, মিথ্যে কথা বলো না, হিংসা করো না কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে তারা ঠিক বিপরীত কাজ করে কারণ পরকে বঞ্চিত না করলে একজন আর একজনের চেয়ে বেশী ভোগ করতে

পারে না। আর তাদের ভোগ দর্শনেই সাধারণ মানুষের চেতনা আদি-
তার স্তরে নামতে প্রলুব্ধ হয় এবং তারাও মনে মনে নতুন নীতি-বাক্য
রচনা করে যে চুরি করাই পুণ্য, সদা মিথ্যে কথা বলবে, অহিংসায় ফল
নেই। সুতরাং যে ভাবেই হোক, যে সব শত্রুরা এই ব্যবস্থার প্রবর্তন
করেছে এবং স্থায়ী রাখার চেষ্টা করছে, তাদের ধ্বংস করতে হবে। বিষ-
বৃক্ষের কাণ্ড ছেদন করলেও শিকড় থেকে নূতন কাণ্ড নির্গত হবে।
সুতরাং হিংসা অহিংসার প্রশ্ন তুলো না। বল কার ভয় হচ্ছে? যে
ভীরু, সে সরে দাঁড়াও। ভেবো না যে তুমি পরের জন্য সংগ্রামের মহৎ
ব্রত নিয়েছ—শোন, ব্রত তোমার নিজেরই জন্য। ভেবো না যে এ সংগ্রাম
শুধু নিজের জন্য, শোন—এ সংগ্রাম তোমাকে সবারই জন্য করতে হবে।

অরিন্দম থামল।

সবাই একে একে বলল, "তোমার কথা বর্ণে বর্ণে সত্য অরিন্দম—
আমরা রাজী, আর তিনদিন পর আমরা প্রাণকে পণ করে এগোব।"

অরিন্দম প্রশ্ন করল, "মাঝারি পাড়ার বাবুদের না আজ আসার কথা
ছিল?"

মুকুন্দ মাথা নাড়ল, "ছিল, তারা আসেনি এবং তারা এখন আসবেও
না অরিন্দম—তারা ফলাফল দেখেই লড়াইয়ে ঝাঁপাবে, তার আগে
নয়।"

অরিন্দম হাসল, "কতটুকুই বা পাড়া তা? তাদের কর্তাদের বুদ্ধি
থাকলেও তাদের জন্য আপনাদের সংগ্রাম পেছিয়ে থাকবে না। তাহলে
কি স্থির হল? তিনদিন"—

কথাটা শেষ হল না, তার আগেই বাইরে থেকে চীৎকার কোলাহল
ও আর্তনাদ ভেসে এল। নীচের গলিতে অনেকগুলো ভারী জুতোর খট্
খট্ শব্দ ধ্বনিত হল।

"কি হল?"

"কিসের শব্দ?"

সবাই সচকিত হয়ে উঠল।

একটি যুবক ছুটে এল।

হাঁপাতে হাঁপাতে সে বলল, "শিগ্‌গীর পালাতে হবে। রক্ষী ও সৈন্যরা পূর্বদিক ছাড়া নীচুপাড়ার তিনদিক ঘেরাও করছে, ঘরে ঘরে তারা অনুসন্ধান করছে অরিন্দমের—"

খট্ খট্—খট্ খট্—খট্ খট্—

এক ফুঁয়ে প্রদীপটা নিভিয়ে দিল ললিতা, অন্ধকারে সে অরিন্দমের হাত কঠিনভাবে আঁকড়ে ধরল। আঃ—বিপদও এমনও মধুর! মানুষের জীবন কি অপরূপ!

ইন্দ্র বলল, "এইদিকে বেরিয়ে এসো তোমরা—এইদিকে"—

চাঁদের আলো ঘরে ঢুকেছিল, সেই আলোতেই ঠাহর করে সবাই ইন্দ্রের অনুসরণ করল। বাড়ীটার ছাদে গিয়ে পৌঁছোল সবাই।

ইন্দ্র বলল, "আমি সব সময়েই তৈরী ছিলাম—তাই আগে থাকতেই পালাবার ব্যবস্থা করে রেখেছি"—

বাড়ীর ছাদ ও পাশের বাড়ীর ছাদের সঙ্গে একটা সেতু তৈরী করেছে ইন্দ্র। বাঁশের তৈরী। তারি ওপর দিয়ে সন্তর্পণে একে একে পার হল সবাই, পার হয়ে সেতুটা টেনে নিল। দ্বিতীয় বাড়ী থেকে তৃতীয় বাড়ীতেও একই ভাবে গেল তারা। নীচুপাড়ার ভেতর থেকে আর্তনাদ ও কোলাহলের রেশটা ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে ভেসে আসতে লাগল। কাছাকাছি কোথায় যেন বাড়ীঘরের জানালা দরজা ভাঙ্গছে রক্ষীরা।

তৃতীয় বাড়ীর পেছন দিক দিয়ে একটা মাঠে নামল তারা।

মাঠের পর অন্ধকার গলির গোলক-ধাঁধার ভেতর দিয়ে তারা পাহাড়ের দিকে পা বাড়াল।

সেদিকটা নির্জন, জঙ্গলাকীর্ণ।

মুকুন্দ বলল, "এতক্ষণে আমরা কিছুটা নিরাপদ হলাম।"

সামনের পাহাড়টাতে তারা উঠল। কঠিন প্রস্তর আর মাটির

পাহাড়। তার ওপর শাল, সরল, মহুয়া এবং পলাশের জঙ্গল, লতাগুল্মে ও নামহীন আগাছার ঝোপে নিবিড় হয়ে আছে। এত নিবিড় যে দ্বাদশীর চন্দ্রদেবও সেখানকার অন্ধকারকে সম্পূর্ণ দূর করতে পারেননি।

ললিতার হাত চেপে ধরে অরিন্দম মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করল, "কষ্ট হচ্ছে ললিতা?"

ললিতা হাসল, অন্ধকারেও তার হাসির দীপ্তি দেখা গেল। সে একটি মাত্র কথা বলল, "না।"

মুকুন্দ আগে ছিল, সবাইকে সতর্ক করে বলল, "সাবধানে চল, পাহাড়ে বন্য জন্তুর অভাব নেই"—

পা কাটল, কাঁটা ও ঝোপঝাড়ে লেগে দেহ ক্ষতবিক্ষত হল, ছিন্ন পরিধেয় আরো ছিন্ন হল। তবু থামল না তারা। অবশেষে প্রায় ঘণ্টা খানেক পরিশ্রম করে তারা পাহাড়ের চূড়োর একটু ফাঁকা জায়গায় গিয়ে পৌছোল। সেখানে একটা অর্ধ-ভগ্ন ইঁটের বাড়ী পড়ে আছে।

মুকুন্দ বসে পড়ল, বলল, "আঃ—বাঁচলাম"—

ললিতা বলল, "কিন্তু ওদিকে তাকিয়ে দেখ দাদা—ওই পশ্চিম দিকে—"

সবাই তাকাল। পাহাড়ের চূড়ো থেকে দেখা গেল যে নীচেকার সমতল ভূমির পশ্চিম দিকে কয়েকটা জায়গায় দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। মনে হল যেন কয়েকটা আগ্নেয় অজগর জিভ্ মেলে বাতাসকে লেহন করছে।

"কোথায় জ্বলছে ঐ আগুন?" ইন্দ্র প্রশ্ন করল।

অরিন্দম কঠিন হয়ে বলল, "কোথায় আবার? নীচুপাড়ায়।"

মুকুন্দ মাথা নাড়ল, "হ্যাঁ"।

সবাই স্তব্ধ হয়ে গেল। সবাই দাঁতে দাঁত ঘষল। নিঃশব্দে সবাই বসে রইল। সময় কাটতে লাগল।

ক্রমে নীচুপাড়ার আগুন নিভে গেল।

শুক্লা দ্বাদশীর চন্দ্রদেব মধ্যগগন অতিক্রম করে যেন পশ্চিমের অগ্নিকাণ্ড দেখার জন্য কৌতূহলী হয়ে উঠলেন। শালবন থেকে শম্বরের ডাক-মেশানো ঝিল্লীরব ভেসে এল, এল আরো নানা জানোয়ারের নৈশ-চীৎকার। আর ললিতার মুখ কি সুন্দর দেখাচ্ছে!

মুকুন্দ বলল, "অরিন্দম শোন"—

অরিন্দমের চমক ভাঙল, "বল"—

মুকুন্দ বলল, "নীচুপাড়ায় যেভাবে ওরা তোমার খোঁজ করছে তাতে তোমার এখন এখানেই এক আধদিন কাটানো উচিত।"

অরিন্দম দৃঢ়কণ্ঠে বলল, "কিন্তু সংগ্রাম? তিনদিন বাদে যে আমাদের দল বেঁধে বেরোতে হবে?"

মুকুন্দ অরিন্দমের কণ্ঠে আবেগ লক্ষ্য করে হাসল, বলল, "বেরোবে বইকি—সেই ব্যবস্থা যাতে নষ্ট না হয় তার জন্যই তোমাকে এখানে থাকতে হবে। ইতিমধ্যে আমরা ফিরে গিয়ে সবাইকে সেই দিনের কথা বলে দিই, রক্ষীদের অত্যাচারেও তারা যাতে ভয় না পায় তার জন্য তাদের সাহস জোগাইগে"—

"হুঁ"—অরিন্দম ভাবল খানিকক্ষণ, তারপর বলল, "আচ্ছা। কিন্তু নিষ্ক্রিয় থেকে তো আমি শান্তি পাবনা মুকুন্দ।"

মুকুন্দ বলল, "না পেলে। তোমার দেহের জন্য অন্ততঃ একটু বিশ্রাম তো পাবে। শোন, সকালেই লোক পাঠাব আমরা—তোমাকে খাবার দিয়ে যাবে সে।"

"হুঁ"—

"ওদিকে রক্ষীদের অত্যাচার কমলেই তোমাকে ফিরে যাবার জন্য খবর দেব আমরা। আর যদি তোমার খোঁজে তারা এদিকে অগ্রসর হয় তাহলে আমরা উঁচুপাড়ার দক্ষিণদিককার ঐ চন্দ্রচূড় পাহাড়ের চূড়োয় আগুন জ্বেলে সংকেত জানাব।"

"চন্দ্রচূড় পাহাড়ের চূড়ো কোনটি ?"

"ঐ যে—অর্ধচন্দ্রের মত বাঁকা যে পাহাড়টির চূড়ো দেখতে পাচ্ছ—"

অরিন্দম তাকাল। হ্যাঁ, চন্দ্রালোকে পাহাড়টাকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। চারটে পর্বত-চূড়ার পরেরটা।

মাথা নেড়ে সে বলল, "হ্যাঁ, দেখতে পেয়েছি।"

"তাহলে আমরা যাই ?

"এসো"

ইন্দ্র জামার ভেতর থেকে হঠাৎ একটা ছোরা টেনে বের করল, অরিন্দমের হাতে দিয়ে বলল, "এটা রাখো—পাহাড়ে জন্তু জানোয়ার আছে, বলা তো যায় না"—

"দাও"—

"আর ঐ ভাঙ্গা বাড়ীটাতে গিয়ে রাত কাটাও—ওর মধ্যে একটা ঘরে এখনো থাকা যায়—এই অঞ্চলের কাঠুরেরা জিরিয়ে জিরিয়ে সেটাকে বাসযোগ্য করে রেখেছে"—

"হুঁ"—

"আমরা চল্লাম—সাবধানে থেকো।" মুকুন্দ আবার বলল।

অরিন্দম জবাব দিল না শুধু ললিতা'র দিকে একবার তাকাল। ললিতার চোখে ব্যাকুলতা।

মুকুন্দ ডাকল, "চল্ ললিতা"—

ক্ষীণকণ্ঠে ললিতা সাড়া দিল—"চল।"

হতাশ দৃষ্টিতে অরিন্দম দেখল যে মুকুন্দ, ইন্দ্র এবং অন্যান্য লোকদের সঙ্গে ললিতাও নীচের দিকে নেমে যাচ্ছে। আর কি আশ্চর্য! ললিতা আর একবারও ফিরে তাকাল না!

শালবনের মধ্যে ওরা সবাই অদৃশ্য হয়ে গেল।

একা।

চাঁদের আলোতে অদ্ভুত দেখাচ্ছে পাহাড়গুলোকে। রহস্যময়।

আকাশের বুকে পুঞ্জ পুঞ্জ সাদা মেঘ—চাঁদের আলোতে স্নান করে তা যেন শুভ্রতর হয়েছে।

দূরে আজবনগরকে দেখা যাচ্ছে। খেলাঘরের মত ছোট দেখাচ্ছে বাড়ীঘরগুলোকে, জোনাকীর মত জ্বলছে সেখানকার বাতি।

আজবনগরের ওপর, পাহাড়ের ওপর হাল্‌কা কুয়াশা। চন্দ্রালোকে সেই কুয়াশা যেন একটা অবাস্তব পরিবেশের জাল ছড়িয়েছে সমস্ত কিছুর ওপর।

সে একা।

পাহাড়ের ওপরে একটু শীতবোধ হয়।

শালবনে পাতা ঝরছে একটার পর একটা। দক্ষিণের হাওয়ায় সেখানে মর্মরধ্বনি উঠেছে। হাওয়ায় ভাসছে মহুয়া আর ভুঁইচাঁপার সুবাস। মাঝে মাঝে হরিণের ডাক ভেসে আসছে, ভেসে আসছে নানা পাখীর ডানা ঝাপটানোর শব্দ আর বনকুক্কুটের ডাক। পাহাড়ের বুকে কোথায় যেন একটা ঝরণা বয়ে যাচ্ছে—তার শিলা থেকে শিলান্তরে আছড়ে পড়ার একটানা আওয়াজটা ভারী অদ্ভুত লাগছে, শুনতে শুনতে চেতনা স্তিমিত হতে চায়, দু'চোখের পাতা ভারী হয়ে ওঠে।

মনে পড়ে। এমনি পাহাড় সেখানে, এমনি শালবন। অদূরে ঐ ঝরণার মত রূপসী নদীর জলকল্লোল। সেখানেও হরিণ ডাকে, শালবনে মর্মরধ্বনি জাগে, টুপ্‌টাপ্‌ পাতা ঝরে। আর এই পাহাড়ের ঐ ভাঙ্গা ইটের বাড়ীটার মতই সেই প্রাচীন পাষাণগৃহ। তারি একটা কক্ষে, মণি-মাণিক্যের উজ্জ্বল আলোর মাঝে, সেই স্তিমিতচক্ষু বীণকার তার [illegible]ত্রী বীণাকে মুখর করেছে। তার পাৎলা পাৎলা আঙুলের আঘাতে যেন তারের বুক থেকে ললিত রাগিনী নিংড়ে বেরোচ্ছে আর সেই সুরের মূর্ছনাতেই যেন চন্দ্রালোকিত রাত্রি গলে গলে কুয়াশা হয়ে শেষ হচ্ছে।

সে একা।

"কি করছ?"

বিদ্যুদ্বেগে ঘুরে দাঁড়াল অরিন্দম। না, সে একা নয়।

"তুমি-!"

ললিতা হাসল, মাথা নেড়ে বলল, "হ্যাঁ। ফিরে এলাম।"

গভীর আনন্দে হৃদয় প্লাবিত হল, একপা এগিয়ে দুহাত বাড়িয়ে অরিন্দম ডাকল, "এসো—এসো—"

ললিতা এগিয়ে এল। তার চোখে জ্যোৎস্না, মুখে জ্যোৎস্না, সর্বদেহে জ্যোৎস্না—যেন সে জ্যোৎস্না দিয়ে গড়া একটা স্বপ্ন।

পাহাড়ের চূড়ো থেকে তারা সূর্যোদয় দেখল। পূর্বাচল থেকে সূর্যদেবের স্বর্ণমুকুট ঝিক্‌মিক্ করে উঠল, ধ্যানী ঋষিদের মত নিশ্চল-দেহ ও অরণ্যাবৃত পাহাড়ের ওপর তাঁর রাঙা আলোর আশীর্বাদ ছড়িয়ে পড়ল। শাল পলাশ আর মহুয়ার বনে পাখীর দল কলরব করে উঠল।

সূর্যদেব ওপরে উঠতে লাগলেন। রোদের তেজও ক্রমে প্রখর হয়ে উঠল।

কিছুক্ষণ পরে একটি যুবক এল নীচুপাড়া থেকে। তার হাতে দু'বেলার মত খাবার, একটি মোমবাতি ও দেশলাই।

ছেলেটির মুখে চোখে শঙ্কার ছায়া।

অরিন্দম প্রশ্ন করল, "খবর ভালো তো?"

যুবকটি মাথা নাড়ল, "আমাদের খবর ভালো কিন্তু নীচুপাড়ার অন্য খবর খুব খারাপ—"

"কেন?"

"কাল রক্ষী ও সৈন্তরা সেখানে ভয়াবহ অত্যাচার করেছে—"

"কি করেছে ?"

"গুলি করে তারা প্রায় পঞ্চাশজনকে মেরেছে, দুশো লোককে গ্রেপ্তার করেছে এবং তিরিশজন নারীর ওপর বলাৎকার করেছে—"

অরিন্দম মাথা নাড়ল, "হ্যাঁ, অত্যাচারীর ইতিহাস চিরকাল এক।"

"আমি তবে যাই ?"

"যাও।"

যুবকটি চলে গেল।

ললিতা কাছে এসে বলল, "বেলা যে বাড়ছে, এখন তো আর রোদে টিঁকতে পারবে না—"

"হুঁ—"

"চলনা—ঐ ভাঙ্গা বাড়ীটার ভেতরে যাই—"

"চল।"

ভাঙ্গা বাড়ীটার চারদিকে নিবিড় ঝোপ।

বনফুল, কাঁটা বৈচী আর বনকরঞ্জার ঝোপ। তার পেছনে কয়েকটা ঘন-সন্নিবিষ্ট মহুয়ার গাছ। অজস্র নতুন পাতায় স্নিগ্ধ-শ্যাম, থলো থলো ফুল আর ফলে অলংকৃতা রূপসী।

ঝোপের মাঝখান দিয়ে একটা সংকীর্ণ চলার পথ গিয়ে বাড়ীটাতে শেষ হয়েছে। একটা পোড়ো ইঁটের বাড়ী। হয়ত এককালে তিনচারটে ঘর ছিল, এখন মাত্র একটি ঘর টিঁকে আছে। কবে কোন্ প্রকৃতি-বিলাসী নির্জনতা-প্রিয় লোক যে ওটি নির্মাণ করেছিল তা কে জানে ?

ঘরের দেয়াল থেকে অশ্বত্থের চারা বেরিয়ে এসেছে। মাঝে মাঝে এক আধদিন পাহাড়টা হয়ত কেঁপেছিল তারই স্মৃতি বিসর্পিল ফাটলের রেখায় লিখিত আছে। ছাদের অর্ধেকটা ভাঙ্গা, জানালার শুধু গহ্বরটিই অবশিষ্ট। সেই সব রন্ধ্রপথ দিয়ে শীতশেষের শুকনো পাতা ভেতরে উড়ে

এসেছে, ঘরের অসমান মেঝের ওপর জমা হয়ে তা পুরু গালিচা তৈরী করেছে।

সেই শুকনো পাতার বিছানার ওপর ললিতা বসে পড়ল, চারদিক ভালো করে দেখে সে একটু হেসে বলল, "আমাদের প্রথম ঘর—"

অরিন্দম বসল, হাসল, বলল, "হ্যাঁ, আমাদের প্রথম সংসার—"

"সংসার!" ললিতা উচ্চারণ করল।

অরিন্দম মাথা নাড়ল, বলল, "হ্যাঁ। ভাঙ্গা ঘর, মাথার ওপরে আকাশের ছাদ, চন্দ্র সূর্যের আলো আর অনিশ্চিত জীবন নিয়ে আমাদের ঘর-সংসার—"

ললিতা কথা বলল না, তার দু'চোখের অন্তহীন গভীরতায় শুধু একটা বিচিত্র আলো দেখা গেল। নিঃশব্দে সে একখানা হাত রাখল অরিন্দমের হাতের ওপর।

অরিন্দম ললিতার হাতটা চেপে ধরল, দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল, "এমন আনন্দের দিন আমি কল্পনাও করিনি। পাহাড়ের চূড়োয়, সংগ্রামের মধ্যে তোমাকে আমি আজ পেয়েছি।" ললিতার চোখের গভীরতায় তার দৃষ্টি যেন ডুব দিল।

স্তব্ধতা।

পরস্পরের দিকে মন্ত্রমুগ্ধের মত তাকিয়ে রইল দুজনে।

অরিন্দম কম্পিতকণ্ঠে বলল, "সূর্য সাক্ষী—তুমি আজ থেকে আমার বৌ—"

ললিতা কেঁপে উঠল, বলল, "সূর্যদেব সাক্ষী—আজ থেকে তুমি আমার স্বামী—"

স্তব্ধতা।

কেবল দক্ষিণের বায়ুবেগে শালবনের অশ্রান্ত মর্মরধ্বনি। কেবল পাখীদের কাকলি, ময়ূরের কেকাধ্বনি, হরিণের ডাক আর পার্বত্য ঝরণার কল্‌কল্ শব্দ।

আকাশের সিঁড়ি বেয়ে সূর্যদেব আরো ওপরে উঠলেন।

হঠাৎ এক সময়ে অরিন্দম সেই ভাঙা ঘরের স্তব্ধতা ভেঙে বলল, "নীচুপাড়ার খবর শুনলে ?"

ললিতা মাথা নাড়ল, "শুনলাম। কি আর এমন নতুন খবর ? ছোটবেলা থেকে আজ পর্যন্ত ওরকম খবর কতবার শুনেছি।"

অরিন্দমের মুখে কাঠিন্যের অন্ধকার নামল, দৃঢ়কণ্ঠে সে বলল, "কিন্তু আর দু'দিন পর আমরা ইতিহাসকে নতুন পথে নিয়ে যাব।"

"পারবে ?"

"সন্দেহ কেন ললিতা ?"

"কি জানি—ভয় হয়—" ললিতার গলা কেঁপে উঠল, তার কথাগুলোর ভেতর দিয়ে একটা সূচীমুখ জ্বালাকে টের পাওয়া গেল। সে বলল, "অভাব, মৃত্যু কি কম ঘটছে ? এক পা এগোলেই তো রাস্তায় মরা মানুষ ডিঙোতে হয়। না খেয়ে শিশুরা শুকিয়ে মারা যায়, বুড়োরা গলায় দড়ি দেয়, যুবকেরা বিদ্রোহ করে মরে। কিন্তু কৈ ? আজো পর্যন্ত কিছুই তো হল না।"

অরিন্দমের শরীরে উত্তাপের তরঙ্গ ছড়াল, সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে সে বলল, "হবে! মানুষের ওপর বিশ্বাস রাখো ললিতা। তোমার দুঃখ আমার দুঃখ এখন পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষের দুঃখ হয়েছে—এবার দুঃখ দূর হবে। ললিতা, মানুষই প্রকৃতির সবচেয়ে বুদ্ধিমান জীব—তার বুদ্ধি এবার তাকে নিজেকে লক্ষ্য করতে বাধ্য করেছে—এবার পরিবর্তন হবে।"

"কিন্তু আগে তো—"

"আগেও হয়েছে ললিতা—। মানুষ প্রতিদিন প্রকৃতিকে নতুন করে দেখছে, নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করছে। প্রতিদিনই বুদ্ধি বাড়ছে তার—ফলে, যেমন সমস্যা বাড়ছে তেমনি তার প্রতিকারও হচ্ছে। ললিতা, নিশ্চিন্ত হও।"

"তারপর ? মানুষের ভবিষ্যৎ।"

"শান্তি, সুখ, সাম্য, আনন্দ।"

"তারপর?"

"মানুষ দেবতা হবে।"

"তারপর ?"

"তারপর তো আর বলা যায় না। মানুষ প্রকৃতির বুকে থাকে।"

স্তব্ধতা।

একটা দীর্ঘকর্ণ খরগোস ঘরের কাছাকাছি এসে মুহূর্তের জন্য অবাক হয়ে রইল তাদের দেখে, তারপর চকিতে অদৃশ্য হল।

হরিয়ালের ডাক ভেসে আসছে।

সূর্যদেব আরো ওপরে আরোহণ করলেন।

ললিতা বলল, "এবার একটু ভাবনা চিন্তা বিসর্জন দাও—"

"কেন ?"

"তোমার ক্ষিদে পায়নি ?"

"পেয়েছে বইকি। সংগ্রাম তো তারি জন্য।"

"তাহলে খাও।"

"দাও।"

দু'জনে খেল। রাতের জন্য কিছুটা খাবার তারা ঢেকে রেখে দিল।

ললিতা বলল, "কিন্তু জল কোথায় পাবে ?"

অরিন্দম হাসলো, "মূর্খ মেয়ে, জলের ডাক কি শুনতে পাচ্ছ না ?"

"ঠিক—তাহলে চল।"

ছুটে বেরোল ললিতা। অরিন্দম তার অনুসরণ করল।

শব্দ অনুসরণ করে ঝরণাতে গিয়ে পৌছোল তারা। চূড়োর বিপরীত দিকে তা। ভাঙ্গা বাড়ীটার পেছনে, মর্মারত শালবনের নিভৃত ছায়া অতিক্রম করে কিছুদূর গেলে পর ঝরণাটাকে পাওয়া গেল। নির্মল স্বচ্ছ, সুশীতল জলের ধারা। গলিতহীরকের মত। একটা শিলাখ

ওপর থেকে প্রায় বিশ হাত নীচেকার আর একটা শিলাখণ্ডের ওপর তা সবেগে আছড়ে পড়ছে। যেখানটায় পড়ছে সেখানে পাহাড় ক্ষয় হয়ে একটা অতিক্ষুদ্র জলাশয়ের সৃষ্টি করেছে, তারপর সেখান থেকে লাফিয়ে গড়িয়ে নীচের দিকে চলে গেছে ঝরণাটা।

সেই ঝরণার জল অঞ্জলি ভরে পান করল দুজনে।

আর পান করতে গিয়ে নিজেদের প্রতিবিম্ব দেখল তারা জলের ভেতর।

অরিন্দম বলল, "তুমি সুন্দর ললিতা—"

ললিতা হাসল, "ভাগ্যিস্ ঝরণাটা ছিল।"

দুজনে হাসল।

হাসতে হাসতে আবার জলের দিকে তাকাল অরিন্দম, হঠাৎ হাসি থামিয়ে বলল, "আশ্চর্য!"

ললিতা প্রশ্ন করল, "কি?"

"তোমার কথাই সত্যি।"

"কোন কথা?"

"একদিন তুমি বলেছিলে যে শক্তি আমার মুখে কালো ছায়া ফেলেছে। বিশ্বাস হয়নি কিন্তু বাড়ী ফিরে নিজের প্রতিবিম্ব দেখে ভয় পেয়েছিলাম। কিন্তু আজ—আজ তো আর ভয় হচ্ছে না?"

"আজ তুমি সুন্দর—তোমার মুখে আজ দুঃখ আর সত্যের জ্যোতি।"

স্তব্ধতা।

হঠাৎ খচমচ্ পাতার শব্দে তারা পেছন ফিরে তাকাল।

পাহাড়ের চূড়োর দিকে একটা হরিণ। ডাগর ডাগর দুটি নিষ্পলক চোখ মেলে সবিস্ময়ে নিরীক্ষণ করছে তাদের।

"হরিণ!" ললিতার চোখও সেই হরিণের চোখের মত হয়ে উঠল।

আর হরিণটা সেই শব্দে সচকিত হয়ে একটা লাফ দিল।

মুহূর্তকালের জন্য তার আঁকাবাঁকা শিং আর পা শূন্যের মধ্যে দেখা গেল, তারপর সে অদৃশ্য হল।

অরিন্দম বলল, "তোমার হরিণ পালিয়েছে কিন্তু আমার হরিণ পালায়নি।"

ললিতা হাসল, "তাহলে পালাই ?"

ছুটে ওপরে উঠতে গিয়ে সে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল, বলল, দাঁড়াও—"

"কি ?"

"তোমার ক্ষত ধুয়ে দিই।"

"দরকার নেই।"

"আছে—আমি জানি।"

ললিতা জল দিয়ে অরিন্দমের ক্ষত পরিষ্কার করে আবার বেঁধে দিল। তার সেই পরিচর্য্যা-রত সপ্রেম মুখটি লক্ষ্য করতে করতে অরিন্দমের বুক ভরে উঠল।

"এবার চল।"

"চল।"

ভাঙ্গা ঘরটার পাশে, একটা পলাশ গাছের তলায় তারা বসল।

ললিতা বলল, "একটু ঘুমিয়ে নাও। রাতে ঘুমোবার সুযোগ যদি না ঘটে ?"

অরিন্দম মাথা ঝাকাল, "না।"

"কেন ?"

"তোমাকে যে তাহলে দেখতে পাব না ?"

"তাতে কি! আমি তো দেখতে পাব।"

অরিন্দম হাসল, বলল, "ঘুমোচ্ছি।"

কিন্তু ঘুম আসতে চায় না। দূরে ধূসর পাহাড়ের সারি আর চারদিকে বসন্তের নবীন শোভা। গাঢ় সবুজ নতুন পাতা গজিয়েছে গাছপালায়। চারদিকে নব-জীবন। এখানে ওখানে অজস্র নাম-না-জানা বনফুল আর

তার মৃদুগন্ধ। জায়গায় জায়গায় পত্রহীন গাছগুলো পদাতিকের মত শ্রেণীবদ্ধ হয়ে আছে। কোথাও লতার গায়ে দুলছে স্তবকে স্তবকে ফুল। বিচিত্র-বর্ণ প্রজাপতিরা তার ওপর বসে পাখনা নাচাচ্ছে। নিকটে ও দূরে সবুজ পল্লবের ফাঁকে ফাঁকে দেখা যাচ্ছে পলাশের রক্তশোভা। মহুয়া গাছের নীচে অজস্র শুভ্র ফুলের রাশি, তার তীব্র গন্ধে বাতাস আকুল। আর শালবনে—পাতা ঝরছে, পাতা ঝরছে, পাতা ঝরছে। পাতা-ঝরার দিন এসেছে। ঝরুক, শুকনো, জীর্ণ, হলদে পাতা সব ঝরে পড়ুক, বাতাসে উড়ে যাক, নবজীবন শ্যামশোভায় ঝলমল করুক।

"ঘুমোচ্ছ না?"

"ঘুমোচ্ছি বইকি—কিন্তু মাথায় দেব কি?"

"এই বুঝি তোমার বীরত্বের নমুনা? বালিশ ছাড়া ঘুমোতে পারো না?"

"না।"

"কিন্তু কোথায় পাব বালিশ?"

"তাহলে তোমার কোলে মাথা রাখি।"

"তুমি দুষ্টু।"

"তা বলতে পারো।"

ললিতার কোলে মাথা রেখে অরিন্দম চোখ বুজল। আঃ—কী আশ্চর্য অনুভূতি! পাখীর কূজন, ফুরফুরে হাওয়া, পলাশের ছায়া আর ললিতার স্পর্শ—ঘুম না এসে কি পারে?

সময় কাটে।

মধ্য-গগন থেকে পশ্চিমাকাশে অবরোহণ সুরু করলেন সূর্যদেব। ক্রমে তার আলোর প্রাখর্য কমে এলো, শালবন আর অরণ্যের ছায়া গাঢ়তর হল, অপরাহ্ণের ম্লান আলো নামল পাহাড়ের সানুদেশে আর আজব-নগরের ওপরে। আর আকাশের বুকে নিরুদ্দেশযাত্রী মেঘের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পাখীর দল উড়ে চলল।

অরিন্দমের ঘুম ভাঙল।

কিন্তু কোথায়? ললিতা কোথায় গেল?

ধড়মড়িয়ে উঠে বসল অরিন্দম, ডাকল, "ললিতা"—

কিন্তু কোন সাড়া এল না।

"ললিতা"—

না, কাছাকাছি কোথাও দেখা যাচ্ছে না তাকে।

ভাঙ্গা বাড়ীটার ভেতরে গেল অরিন্দম। না, সেখানেও নেই ললিতা। তবে? কোথায় গেল সে? অরিন্দমের সর্বাঙ্গ যেন মুহূর্তে হিম হয়ে গেল।

একটু ভাবল সে, তারপর ঝরণাটার দিকে দ্রুতপদে অগ্রসর হল।

তখন বাতাস থেমে গেছে। চারদিকে একটা অসহ্য গুমোট। একটা গাছের পাতাও নড়ছে না। শালবনের ভেতরেও একটা থমথমে ভাব। কেবল থেকে থেকে পাখীদের ডাক শোনা যাচ্ছে। শোনা যাচ্ছে পায়ের তলায় শুকনো পাতার মড়মড় শব্দ।

ঝরণাটার কাছে গিয়ে একটা গাছের আড়ালে অরিন্দম থমকে দাঁড়াল। আশ্চর্য একটি ছবি তার সামনে! ঝরণার জলের সেই অগভীর সঞ্চয়ের মধ্যে ললিতা নগ্নদেহে স্নান করছে। তার ছিন্ন শাড়ী ও জামা একটা শুক্‌নো শিলার ওপর রাখা আছে।

অরিন্দমের দু'চোখে যেন স্বপ্ন ঘনাল। কী আশ্চর্য সুন্দর ললিতার দেহ! যেন সে নিখুঁত ভাস্কর্যের একটি নিদর্শন, যেন সে কোন মর্মর-খোদিত দেবীমূর্তি। চোখের তারায় যা কিছু ভালো বলে মনে হয় তা থেকে নিংড়ে নিংড়ে যেন ললিতার দেহবল্লরী রচিত হয়েছে। ফুল, পাখী, আকাশ, মেঘ, চাঁদ, সূর্য, নক্ষত্র আর মৃত্তিকা থেকে যেন তিল তিল আহরণ করেই এই তিলোত্তমার সৃষ্টি হয়েছে। নিঃশব্দে, নিরুদ্ধনিঃশ্বাসে অরিন্দম লক্ষ্য করতে লাগল। ললিতা জল থেকে উঠল, তার সুদীর্ঘ, সিক্ত, কেশরাশিকে নিংড়ে নিংড়ে শুকোল, দেহ মুছল, শাড়ী ও জামা পরল, তারপর ওপরের দিকে উঠে আসতে লাগল। শেষ অপরাহ্নের

রাঙা আলোতে ধোঁয়া ফুলের মত ঝকঝক করছে তার মুখটি, পিঠের ওপর আলুলায়িত হয়ে আছে তার কেশের অরণ্য।

অরিন্দম দেখল। দেখতে দেখতে তার সারা দেহমন যেন একটা ঝড়ের দোলায় মর্মরিত হয়ে উঠল। একটা আকুল তৃষ্ণা যেন বিদ্যুদ্বেগে ছড়িয়ে গেল তার চেতনায়, তার প্রতি রোমকূপে।

হঠাৎ ললিতা তাকে দেখতে পেল।

"তুমি!" সে যেন চমকে উঠল।

"হ্যাঁ।"

"গাছে হেলান দিয়ে ওখানে কি করছিলে?"

অরিন্দম ললিতার দিকে এগোতে এগোতে বলল, "তোমাকে দেখছিলাম—তুমি চান করছিলে"—

ললিতার মুখে লজ্জার রক্তিম আভাস দেখা দিল, সে দৃষ্টি ফিরিয়ে বলল, "তুমি চোর"—

অরিন্দমের চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, কাছে এসে হঠাৎ সে ললিতাকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিল। সে বলল, "আমি চোর নই—ডাকাত!"

"ছাড়ো"—

"না।"

"পাগলামী করোনা লক্ষীটি"—

"না।"

ললিতা আর কথা বলল না, অরিন্দমের বুকে মাথাটা এলিয়ে দিয়ে সে দু'চোখ বুজল। অরিন্দম তাকে অবলীলাক্রমে বয়ে নিয়ে চলল। ললিতা যেন একরাশ পাখীর পালক।

সূর্যদেবের রথের চাকা তখন পশ্চিম দিগন্তে ডুবে যাচ্ছে। বাতাস নেই, নিষ্কম্প গাছপালায় ঢাকা পাহাড়গুলো যেন কিসের প্রতীক্ষায় মৌন ও গম্ভীর হয়ে উঠেছে। একটা অসহ্য গুমোট। বোধ হয় ঝড় উঠবে।

সেই ভাঙ্গা বাড়ীর ঘরটায় গিয়ে অরিন্দম ললিতাকে সেই শুকনো

পাতার শয্যাতে বসিয়ে দিল, দুটি তৃষ্ণার্ত চোখের নিষ্পলক, প্রদীপ্ত দৃষ্টি মেলে সে ললিতার দিকে তাকিয়ে রইল। আশ্চর্য একটা তৃষ্ণায় দেহমন তার আচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে।

ঘাড় বেঁকিয়ে তাকে দেখল ললিতা, মৃদু গলায় প্রশ্ন করল, "তোমার কি হল ?"

"আমি পাগল হয়েছি।"

"কেন ?"

"তুমি সুন্দর"—

ললিতা জবাব দিল না, মাথা নত করল।

"শুনছ—ললিতা"—

"উঁ ?"

"তুমি এত সুন্দর কেন ?"

ললিতা মুখ তুলে তাকাল অরিন্দমের দিকে। তার মুখে গোধূলীর অপরূপ আলো। সেই আলোতে তাকে মৃত্তিকার জীব বলে মনে হল না, অপার্থিব একটা রহস্য যেন তার দু'চোখের বাষ্প-ঘন দৃষ্টিতে জ্বলজ্বল করতে লাগল, আর থরথর করে কেঁপে উঠল তার ঠোঁট দুটো।

"ললিতা"—

"অন্ধকার হোল, বাতিটা জ্বলি ?"

"জ্বালো।"

মোমবাতিটাকে জ্বালাল ললিতা, তারপর আড়নয়নে তাকিয়ে দেখল যে অরিন্দম একইভাবে নিরীক্ষণ করছে তাকে। নতদৃষ্টিতে সে চুপ করে বসে ঘামতে লাগল। লজ্জায়, পুলকে।

অরিন্দম লক্ষ্য করতে লাগল। তার সেই তৃষ্ণা এবার অন্তর্দাহী হয়ে উঠেছে। ললিতা কি সুন্দর! অরণ্যের মত কেশপাশ, অর্ধচন্দ্রের মত ললাট, উড়ন্ত বাজের ডানার মত একজোড়া ভুরু আর অমৃতলোকের রহস্য-ভরা একজোড়া ভ্রমর-কালো চোখ। প্রবালের মত রক্তিম দুটি

ঠোঁটের ওপরে ও নীচে, বাঁশীর মত নাসাগ্রে তার প্রেম আর লজ্জার মুক্তাবিন্দু। আর কি দেখবে সে? ঝরণার জলের মাঝে তার যে দেহকান্তি সে দেখেছে তার কি তুলনা আছে? কিন্তু শুধু তাই তো ললিতা নয়, সে তো শুধু দেহ নয়। আরো কিছু, আরো কিছু। স্নেহ, যত্ন, ত্যাগ, আদর্শ. প্রেম আর নির্ভীক ভালবাসা সব কিছু মিলিয়ে ললিতা। তাছাড়াও আরো কিছু—তা দেখা যায় না, তা শুধু অনুভব করে জানা যায়। সেই রূপ অনুভব করলে মানুষ পাগল হয়। অরিন্দমও পাগল হয়েছে।

ললিতা মুখ তুলল, অরিন্দমের দিকে তাকিয়ে এবার হেসে ফেলল, বলল "কি দেখছ?"

অরিন্দম কথা বলতে গেল, পারল না। নিরুত্তরে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে হঠাৎ সে ললিতার হাত নিজের হাতে টেনে নিল। স্পর্শ। দেহের ভেতর যেন একটা অনুভূতির পদ্মকলি দল মেলছে। আরো কাছে চাই। ললিতাকে নিজের দিকে আকর্ষণ করল সে। ললিতা কাছে এল। নিজেদের ঘন নিঃশ্বাসের শব্দ তারা শুনতে পেল। নিজেদের রক্ত-সমুদ্রের কল্লোলধ্বনি তাদের কানে ভেসে এল। হঠাৎ অরিন্দম ললিতাকে বুকে টেনে নিল। অন্তর্দাহী তৃষ্ণার একটা স্তর যেন মুহূর্তে অন্তর্ধান করল কিন্তু কোমল দেহের স্পর্শ, বাহুলতার বন্ধন, কঠিন ও কোমল বুকের মিলন যেন নতুন করে সেই তৃষ্ণাকে তীব্র করল। অরিন্দম তাকাল। বাষ্পাচ্ছন্ন দৃষ্টি মেলে ললিতাও তাকাল। ললিতার দুটো পাৎলা ঠোঁট কাঁপছে। কি যেন হল, নিজেরও অজ্ঞাতসার অরিন্দমের মুখটা এগিয়ে গেল ললিতার মুখের দিকে। তারপর তার ঠোঁট ললিতার ঠোঁটকে স্পর্শ করল। ললিতা চোখ বুজল. অরিন্দমের চোখও মুদ্রিত হয়ে এল, কাঁপতে লাগল দুজনের দেহ, দুজনের উত্তপ্ত নিঃশ্বাস ভারী হয়ে পরস্পরের মুখের ওপর পড়তে লাগল, বন্ধ হয়ে এল, চুম্বন দীর্ঘস্থায়ী হয়ে উঠল, ললিতার দুটো হাত ধীরে ধীরে অরিন্দমের

কণ্ঠদেশকে আরো নিবিড়ভাবে বেষ্টন করল। কদম্বফুলের মত রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল দুজনের দেহ।

হঠাৎ ললিতা তাকে ঠেলে দিল, বলল, "না—আর না"—

অরিন্দম আবিষ্টের মত বলল, "কেন?"

"কখন বিপদ ঘনিয়ে আসবে, কখন যে আগুনের সংকেত চন্দ্রচূড়ের ওপর দেখা যাবে তা কে জানে? চল, বাইরে যাই"—

"না"—

"শোন—সংগ্রামের মুহূর্তে অন্যদিকে মন দিও না"—

অরিন্দম হাসল, বলল, "তোমার ভয় মিথ্যে ললিতা"—

"শোন, বিপদ হতে পারে—"

"না ললিতা"—

আবার সে ললিতাকে চুম্বন করল। সেই বিচিত্র তৃষ্ণা, একটা বিচিত্রতর আবেগ তাকে আবার উন্মত্ত করে ফেলছে। ললিতার ওষ্ঠের স্বাদ কি অদ্ভুত! কি অদ্ভুত তার দেহসৌরভ! আর বাইরে কি অদ্ভুত স্তব্ধতা!

একটির পর একটি চুম্বন। ওষ্ঠদেশ ত্যাগ করে গালে, তারপর চোখে, ললাটে, কর্ণে, বুকে, হাতে, বাহুতে। একটা অন্ধ আনন্দ। আর কোন জ্ঞান নেই। ঘরের ভেতরে মোমবাতিটা জ্বলছে, গলছে।

"ওগো—আর না, থামো"—

"ললিতা, তুমি সুন্দর"—

"শোন"—

"তুমি আমার"—

"ওদিকে হয়ত সংকেত করছে ওরা"—

"ললিতা"—

বাইরে সন্ধ্যা অতিক্রান্ত হয়েছে, রাত হয়েছে, রাত গাঢ় হচ্ছে। অরিন্দমের তৃষ্ণাও গাঢ়তর হচ্ছে। দূরে, পাহাড়ের নীচের দিক থেকে

একদল শেয়ালের ডাক ভেসে এল, ভেসে এল হায়েনার চীৎকার। নিঃশব্দ, বায়ুহীন অরণ্যে ঝিঁ ঝিঁ পোকার দল অশ্রান্ত ঐকতান সুরু করল।

অরিন্দম ললিতাকে আরো নিবিড়ভাবে বুকে জড়িয়ে ধরল। ললিতা'র কেশের অরণ্য তার পিঠের ওপর বিশৃঙ্খলভাবে ছড়িয়ে পড়ল। দুটি দেহ যেন এক হয়ে মিশে গেল। পরস্পরকে তারা যেন বিশ্লেষণ করে বুঝে নিতে চাইল। আশ্চর্য একটা রংয়ের পৃথিবী, আশ্চর্য একটা আনন্দময় প্রবাহ তাদের চারদিকে।

"শোন—থামো"—

"কথা বলো না—চুপ"—

"কিন্তু বাইরে"—

"যাব—দাঁড়াও"—

"আমার কথা শোন"—

"তুমি আমার কথা শোন—ললিতা, তুমি এত সুন্দর! ললিতা, আমি তোমাকে ভালবাসি—আমি আজ পাহাড় উপড়ে ফেলতে পারি"—

"তুমি পাগল"—

"ললিতা—আমি মানুষ"—

অরিন্দমের মাথায় হাত বুলোল ললিতা, গাঢ় কণ্ঠে বলল, "জানি, জানি—আজ তোমার বুক থেকে মুহূর্তের জন্যও কি আমার সরতে ইচ্ছে করছে? কিন্তু কর্তব্য?"—

অরিন্দম ললিতার কাণের পাশে মুখ নিয়ে গেল, মৃদু ও কম্পিত কণ্ঠে বলল, "জানি, আমি তা জানি—কিন্তু ললিতা, চুপ করো, আমাকে মুহূর্তের জন্য মানুষ হতে দাও। ললিতা"—

"কি"—

"তুমি কি আমাকে ভালোবাসো?"

"কি বলব, কি জবাব দেব? 'ভালবাসি' বলেও কে বোঝাতে পারব কত ভালবাসি?"

"অথচ ভালোবাসায় ডুবে যেতে পারছি না—মানুষ নিজেকে অসহায় করে রেখেছে, মানুষ মানুষকে ভালোবাসতে পারছে না"—

একটা সমুদ্র যেন তোলপাড় করছে দেহের ভেতর। আকণ্ঠ সেই পিপাসাটা বারংবার দেহকে কাঁপাচ্ছে। চুম্বনেও তৃপ্তি নেই, আলিঙ্গনেও নিবৃত্তি নেই। দুঃসহ একটা কামনা, বন্যার মত দুর্জয় একটা বাসনা।

"ললিতা"—

"না--না"—

"হ্যাঁ"—

"তুমি সৈনিক"—

"আমি মানুষ"—

ললিতা বাধা দিল, কিন্তু পারল না, না পেরে সে নিজেকে ছেড়ে দিল। উন্মত্ত একটা প্রয়াস। অরিন্দম ললিতাকে বুকের মধ্যে মিশিয়ে নিল, তাকাল তার মুখের দিকে। ললিতা'র চোখে জল।

"তুমি কাঁদছ!"

"না—না"—ললিতা হেসে দু'চোখ মুদ্রিত করল, একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে অরিন্দমের বুকে মাথা লুকোল।

তারপরে সমুদ্র আছড়ে পড়ল। একটা চেতনা-লোপকারী অনুভূতি। বুকে বুক, মুখে মুখ, বাহুতে বাহু, উরুতে উরু। দুটি হৃদয়ের স্পন্দন এক হল। নদী গিয়ে সমুদ্রে পড়ল। পৃথিবীর পরিব্যাপ্ত যে আনন্দধারা ফুল ফোটায়, নক্ষত্রের জন্ম দেয়, বীজকে অঙ্কুরে পরিণত করে, সেই আনন্দধারায় একসাথে ডুব দিল দুজনে। সব কিছু মিলিয়ে গেল, চেতনার বাইরে চলে গেল। দুটি সুর মিলে একটি সুর হল, দুটি দেহ এক দেহ হল, দুজনের নিঃশ্বাস একই বাতাসে মেলাল। আনন্দ,

পৃথিবী মধুময়। নতুন প্রাণের বীজকে বপন করল তারা। দুর্ভিক্ষ, মৃত্যু, পশুত্ব আর হিংসার মাঝেও মানুষ তার সৃষ্টির স্বাক্ষর রাখল। রক্তমাংস, অস্থিমজ্জার অন্তরালে যে মন তা যেন এতদিনে পরিণতি লাভ করল। হ্যাঁ, এই সেই মনিময় কক্ষ আর ঐ মোমবাতিটা যেন চন্দ্রকান্তমণি। ধমনীর মাঝে সেই স্বর্ণকেশীর নৃত্য, বুকের মধ্যে সেই পাখোয়াজের ধ্বনি, মহুয়া-গন্ধে মন্থর নিস্তরঙ্গ বায়ুস্তরে ভাসছে নটমল্লারের বিলম্বিত তান। শালবনের মাথার ওপরে উঠেছেন ক্ষীরোদ-সমুদ্র-স্নাত চন্দ্রদেব, বারংবার হরিণেরা ডাকছে, ময়ূরেরা কেকাধ্বনি করছে, মৃগরাজ শম্বরের চীৎকারে অরণ্যের স্তব্ধতা খান খান হচ্ছে। পৃথিবী মধুময় হোক, প্রাণবাণ হোক, সুন্দরতর হোক।

"ললিতা"—

"উঁ" ?—

"ললিতা"—

"উঁ ?"—

"ললিতা"—

আবার নিঃশব্দ হয় দুজনে, পরস্পরের চেতনাতে মেশে। রাত বাড়ে। ঝিল্লীরবে অরণ্য মুখর হয়। হায়েনার ডাক ভেসে আসে, ভেসে আসে পাহাড়ী ঝরণার গান। আর সব নিস্তব্ধ। হাওয়া নেই, থমথমে ভাব, একটা গাছেরও পাতা নড়ে না। রাত বাড়ে। পাহাড়ের চূড়োয় চূড়োয় চাঁদের আলো গলে গলে কুয়াশা হয়, শিশির ছড়ায়, ফুলে ফুলে রং এঁকে দেয়।

আর ঈশান কোন থেকে নিরেট কালো একটা মেঘের পুঞ্জ দৈত্যের মত মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে থাকে। দ্রুতগতিতে। নিঃশব্দে।

আর চন্দ্রচূড় পর্বতের চূড়োয় আগুন জলে উঠেও একসময়ে নিভে যায়। কেউ সে সংকেত লক্ষ্য করে না।

অরণ্যাবৃত পাহাড়গুলো যেন কিসের প্রতীক্ষা করছে।

গভীর স্তব্ধতা।

হঠাৎ একটা শিলাখণ্ড গড়িয়ে পড়ল পাহাড়ের গা থেকে। শিলা থেকে শিলান্তরে আঘাত খেয়ে খেয়ে অনেকক্ষণ ধরে শব্দসৃষ্টি করল তা।

ললিতা চমকে উঠল, বলল, "শুনলে ?"

অরিন্দম হাসল, বলল, "ভীরু মেয়ে—ও কিছু নয়।"

"কিছ নয় ?"

"না। হয়ত কোন জানোয়ারের পা লেগে একটা পাথর গড়িয়ে পড়ল"—

"ওঃ"—

কিন্তু সঙ্গেই আর একটা শব্দ শোনা গেল। আগ্নেয়াস্ত্রের গর্জন। পাহাড়ের স্তব্ধতা খান খান হয়ে গেল, পাহাড়ের গায়ে গায়ে সেই ধ্বনি প্রতিধ্বনি তুলল। শাল আর মহুয়ার বনে পাখীরা ভয়ার্ত কোলাহল তুলল, হরিণের পাল বিদ্যুৎ গতিতে বনান্তরে পালিয়ে গেল।

লাফ দিয়ে উঠল দুজনে, শিথিল বেশবাস ঠিক করে নিয়ে সামনের দরজাহীন দ্বারপথের দিকে এগোল। পত্রবহুল গাছপালার ফাঁক দিয়ে মেঘাবৃত চাঁদের ক্ষীণ আলো এসে মাটিতে পড়েছে, অস্পষ্ট আলো আঁধারির সৃষ্টি করেছে। সেই সব গাছপালার আড়াল থেকে তারা হঠাৎ দেখতে পেল যে ছায়ামূর্তির মত একজনের পর একজন, অনেকগুলি সৈনিক গাড়ীটার দিকে এগিয়ে আসছে। তাদের হাতে আগ্নেয়াস্ত্র।

"পালাও"—ভীতকণ্ঠে বলল ললিতা।

তারা ঘুরে দাঁড়াল।

কিন্তু ঠিক সেই সময়েই আবার আগ্নেয়াস্ত্র গর্জে উঠল, পাহাড় কেঁপে উঠল আর ললিতা অস্ফুট আর্তনাদ করে কাঁধ চেপে ধরে মাটিতে বসে পড়ল।

"ললিতা !"

"পালাও"—

যন্ত্রনায় ললিতার মুখ বিবর্ণ, বিকৃত হয়ে গেছে, তার ক্ষত থেকে বহুমূল্য রক্তের ধারা আঙুলের ফাঁক দিয়ে শুকনো পাতার ওপর চুঁয়ে চুঁয়ে পড়ছে।

মুহূর্তে ললিতাকে কাঁধের ওপর ফেলে পেছন দিকের ভাঙ্গা দেওয়াল দিয়ে শালবনের ভেতর ছুটে গেল অরিন্দম।

পায়ের নীচে শুকনো পাতার রাশি দলে পিষে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলল সে। চাঁদসমেত অর্ধেকটা আকাশ নিকষ কালো মেঘের আড়ালে আত্মগোপন করেছে। এদিকটায় নিবিড় জঙ্গল, তাই অন্ধকারও নিবিড়।

ললিতা ক্ষীণকণ্ঠে বলল, "সাবধানে চল - পড়ে যেয়ো না"—

"ললিতা!" আর্তকণ্ঠে বলল অরিন্দম. "তোমার কি খুব কষ্ট হচ্ছে?

ললিতা হাসবার চেষ্টা করল, "কোথায়? ও কিছু নয়"—

"দাঁড়াও, এখুনি তোমার ক্ষত ধুয়ে বেঁধে দিচ্ছে"—

দাঁতে দাঁত ঘষে অনুতপ্তকণ্ঠে অরিন্দম বলল, "আমি—আমি কর্তব্যে অবহেলা করেছি বলেই এই শাস্তি—চন্দ্রচূড় পর্বত থেকে ওরা নিশ্চয়ই ঠিক সময়ে সংকেত জানিয়েছিল—কিন্তু আমি—। তোমার কথাও আমি শুনিনি ললিতা—"

ললিতা মৃদুকণ্ঠে বলল, "অনুতাপ দুর্বলতার লক্ষণ"—

অরিন্দম আর কথা বলল না। এগোল সে।

পেছনে অনবরত আগ্নেয়াস্ত্র গর্জাচ্ছে। শিকারী কুকুরের মত ওরা অরিন্দমকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

হঠাৎ আকাশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত মেঘের ডাক গড়িয়ে গেল। যেন ঢেউ খেলানো লোহার পাতের উপর দিয়ে এক অদৃশ্য দৈত্যরাজ তার লৌহরথ চালিয়ে গেল। শালবনের পাখীরা আর্তনাদ করে উঠল, হরিণের পাল এদিকে ওদিকে বিশৃঙ্খলভাবে

দোলাতে লাগল। ময়ূরেরা গদগদকণ্ঠে পেখম মেলে কেকাধ্বনি করতে লাগল।

আকাশ মেঘের আড়ালে সম্পূর্ণভাবে মিলিয়ে গেল। মেঘ আরো ডাকতে লাগল। যেন পাহাড়ের গুহা থেকে একদল সিংহ একটানা গর্জন করতে লাগল। ঘোর অন্ধকারে শালবন একাকার হয়ে গেল। তারি ভেতর দিয়ে সন্তর্পণে এগোল অরিন্দম। ললিতার বোঝা এখন ভারী মনে হচ্ছে অথচ পেছনে মেঘের ডাকের মাঝে মাঝে আশ্রবাস্বর দূরাগত গর্জনও শোনা যাচ্ছে।

আর একটু।

ঝরণার শব্দ নিকটবর্তী হয়েছে।

আর একটু।

ঝরণাকে দেখা গেল।

একটা গাছের নীচে ললিতাকে সযত্নে শুইয়ে দিল অরিন্দম। ললিতার মুখে স্বেদবারি, যন্ত্রনায় দু'চোখ মুদ্রিত, রক্তে তার শাড়ী রাঙা হয়ে উঠেছে। ললিতার রক্ত অরিন্দমের জামাকাপড়েও লেগেছে। ললিতার রক্ত—তা যেন অরিন্দমেরই বুকের রক্ত।

"ললিতা"—

"উঁ?" ললিতা সাড়া দিল, দু'চোখ মেলে তাকাল, হাসল, বলল, "ভয় নেই, আমি তোমাকে ছেড়ে মরব না।"

অরিন্দম তার মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, "দাঁড়াও—জল নিয়ে আসছি"—

"এসো"—

অরিন্দম উঠে দাঁড়াল।

সঙ্গে সঙ্গে ঈশান কোনের দিকে একটা গোঁ গোঁ শব্দ শোনা গেল। অতি মৃদু। মুহূর্তে তা প্রবল হল, প্রবলতর হল, প্রবলতম হয়ে আছড়ে পড়ল পাহাড়ের গায়ে, শালবনের বুকে। গোঁ গোঁ শব্দ। বোবা কান্নার

ত। যেন হাজার হাজার প্রাগৈতিহাসিক জন্তুরা পৃথিবীকে লণ্ডভণ্ড করে দেবার জন্য একজোট হয়েছে।

"ঝড় উঠল ললিতা"—

"হুঁ"—

"কিন্তু ভয় পেয়ো না তুমি—আমি আসছি"—.

অরিন্দম ঝরণার দিকে এগোল।

ঝড় বাড়ল, ভয়ঙ্কর হল। মড় মড় শব্দে গাছ উপড়ে পড়তে লাগল, পতিত গাছের আঘাতে পাহাড়ের গা বেয়ে শিলাখণ্ড গড়াতে লাগল, অসংখ্য অদৃশ্য হাত দিয়ে কারা যেন পাহাড়টাকে ধরে নাড়া দিতে লাগল।

অরিন্দম ভ্রূক্ষেপ করল না। ঝরণার ধারে গিয়ে সে পরিধেয় ছিঁড়ে জলে ভেজাতে লাগল।

ঝড় বাড়ল। মেঘের ডাক আবার শোনা গেল। গুরু গুরু গুরু গুরু —দৈত্যরাজের লৌহরথ সমানে ছুটে চলেছে। কোথায় যেন একটা বিরাট পাথরের প্রাসাদ ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ছে। হঠাৎ আকাশটা যেন ফেটে পড়ল, বারংবার বিদ্যুৎ চমকাল। নীল বিদ্যুতের প্রখর আলোর একটা ধারা এসে যেন অরিন্দমের চোখ ঝলসে দিল, তাকে স্পর্শ করল, তাকে অবশ করে দিল আর তার দু'চোখের সামনে পুঞ্জ পুঞ্জ কালো মেঘের মত অন্ধকার ঘনিয়ে এল, ধোঁয়ার মত চেতনা মিলিয়ে গেল।

মুহূর্তকাল মাত্র।

তারপরই সে আবার জ্ঞান ফিরে পেল, চারদিকে তাকাল। একি? বন্যার জলের মত দুর্দম বাতাসের বেগ তাকে শুকনো পাতার মত শূন্যে তুলেছে, তাকে আঘাতে আঘাতে সামনের দিকে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে! হঠাৎ নিজের দিকে তাকাল সে। একি! একি! সে আর্তনাদ করে উঠল। একি! সে যে আবার সেই পুতুলের দেশের প্রহরীতে রূপান্তরিত হয়েছে!

পেছন থেকে নারীকণ্ঠের ডাক ভেসে এল, "তুমি কোথায় ? তুমি কোথায় গেলে ?"

ললিতা ডাকছে।

"তুমি কোথায় ? তুমি কোথায় ?"

বাতাসে এবার স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। বাহারের আলাপ। শ্রীমন্ত বীণা বাজাচ্ছে, কীর্তিমান গাইছে, সেই নামহীন পাখোয়াজ-বাদক তার বাদ্যযন্ত্রে আঘাত করছে, উর্বশীর মত সুন্দরী মারিয়ানা নাচছে, টিমথির বেহালা থেকে নাইটিংগেলের গান বেরোচ্ছে। মনিমাণিক্যখচিত সেই পুতুলের দেশকে সে দেখতে পাচ্ছে সেখানকার প্রহরী সে। তার হাতে একটা বাঁকা তলোয়ার সে দেখত পাচ্ছে। অসংখ্য পুতুলেরা। আনন্দে বিভোর তারা। সুখ-স্বপ্নের মত সুন্দর তাদের দিন আর রাত। ছয়রাগ ছত্রিশ রাগিনীর আলাপ গায় স্বাচ্ছন্দে তাদের দিন রাত কাটে। দুঃখশোক জরামৃত্যুহীন তাদের জীবন ও যৌবন। আর তাদের মাঝে সেই পক্ককেশ বুড়ো শিল্পীরাজ। তার যেন সবাই তাকে ডাকছে।

"এসো—এসো"—

"প্রহরী, তুমি কোথায় ?"

"প্রহরী, তুমি ফিরে এসো"—

"প্রহরী-ই-ই-ই"—

ঝড় বাড়ছে, বায়ুবেগ বাড়ছে, শুকনো পাতার মত উড়ে চলেছে সে।

আর ঝড় ও বজ্রের সেই প্রলয়ংকর শব্দ ভেদ করে আর একটি ডাক ভেসে আসছে, "তুমি কোথায়? ওগো তুমি কোথায় ?"

অসহায়া মুমূর্ষু প্রেয়সীর কাতর আহ্বান।

না। সে আর পুতুলদের রাজ্যে ফিরে যাবে না। প্রজাপতি-পক্ষ-বাহিত মধু আর আর্দ্র বাতাসের পাখায় তার চাই না, নৃত্যগীতে ভরা আনন্দ-ঘন অস্তিত্বেও তার প্রয়োজন নেই। কর্মহীন, শ্রমহীন, সৃষ্টিহীন ও সংগ্রামহীন পুতুলের খণ্ড জীবনের আনন্দে তার কোন লোভ নেই।

সে শাস্ত জীবন চায়, সে পৃথিবীকে পাপমুক্ত করবে, কঠিন শ্রমের ঘর্মে ... করবে, সংগ্রাম করে কঠিন হবে, কঠিন হৃদয়কে আবার প্রেমের মাধুর্যে মধুর করবে। সে মানুষ হবে, মানুষের জীবনে সে পুতুলদের আনন্দময় অনুভূতিকে সত্য করবে। লোভ লালসা, নীচতা শঠতা, স্বার্থ, ব্যাধি, দারিদ্র, দুঃখ, পরাধীনতা, শোষণ ও নির্যাতন—অন্ধকার জগতের সব সর্প-ক্রূর দানবদের সে একে একে অপসারিত করবে।

"ওগো-ও-ও—তুমি কোথায়? তুমি এসো-ও-ও-ও—"

হ্যাঁ, সে পাপ করেছে। সংগ্রামের পবিত্র কর্তব্যকে সে ভুলে গিয়েছিল। কিন্তু আর না, ভবিষ্যতে আর কোনদিন সে ভুল করবে না।

চীৎকার করে সে বলল, "আমি আসছি—আমি আসছি ললিতা-আ-আ-আ"—

ঝড়ের হাহা শব্দে তার পুতুলের ক্ষীণ কণ্ঠ ডুবে গেল, মিলিয়ে গেল।

হ্যাঁ, সে মানুষ হবে। পুতুলদের ডাক সে শুনবে না, সে প্রলুব্ধ হবে না। শিল্পীরাজের কথা তার মনে আছে। সে জানে, সে প্রমাণ পেয়েছে যে ইচ্ছা থেকেই সব কিছু উৎপন্ন হয়। আজও সে ইচ্ছা করছে। সে মানুষ হবে, মানুষ হবে, মানুষ তাকে হতেই হবে।

"প্রহরী ফিরে এসো"—

"প্রহরী-ই-ই-ই"—

পুতুলেরা ডাকছে।

আর ডাকছে ললিতা, "তুমি কোথায় গেলে? তুমি এসো-ও-ও"—

ললিতা ডাকছে। যার দেহের স্মৃতি এখনো তার প্রতিটি রোমকূপে। এখনো যে শালবনের প্রান্তে, রক্তাক্ত শয্যায় শুয়ে তার প্রতীক্ষা করছে।

"আমি আসছি ললিতা—আমি আসছি—ই-ই-ই"—

হ্যাঁ, সে মানুষ হবে। আর ভুল করবে না সে, আর অবহেলা করবে না। সে মানুষ হবে, মানুষ হবে। উত্তেজনায় তার বুক বারংবার ওঠানামা করতে লাগল, নাকটা ফুলে উঠল, চোখের তারায় দাবানল জ্বলল।